মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

—০—

—অষ্টম বর্ষ—

কার্ত্তিক ১৩২৬ হইতে আশ্বিন ১৩২৭।

—০—

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা।

বিষয় সূচী।

অষ্টম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩২৬। | প্রথম সংখ্যা।

টুর্গনিভের গদ্য কাব্য।

প্রার্থনা।

মানুষ যাহা কিছু পাইবার জন্য প্রার্থনা করে তাহার মূলে কিছু একটা অলৌকিক কাণ্ড র হয়াছে। প্রত্যেক প্রার্থনার সার কথা এই—হে মহান্ জগদীশ্বর, যেন দুই আর দুইয়ে চার না হয়, তাহাই কর!

প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত প্রার্থনাই এইরূপ। পবিত্র শক্তির নিকট, মহাপ্রাণের নিকট, নানা দার্শনিকের নানা মতের নানা দেবতার নিকট এবং নিরাকার ভগবানের নিকট যে সমস্ত প্রার্থনা করা হয়, সেই সমস্ত অসঙ্গত ও অভাবনীয়।

কিন্তু ব্যক্তিগত, জীবন্ত মূর্ত্ত ভগবান্ কি দুই আর দুইয়ে চার না করিয়া পারেন?

প্রত্যেক বিশ্বাসী উত্তর দিতে বাধ্য, তিনি তাহা পারেন এবং তাহা করাইতে তাহাকে যুক্তি পরামর্শাদির দ্বারা প্ররোচিত করিতে বাধ্য করেন।

কিন্তু যদি যুক্তি তাহাকে এই নিবুদ্ধিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলে?

তখন মহা কবি সেক্সপিয়র বিশ্বাসীকে সাহায্য করিতে আসেন। "হরেশিয়ো, স্বর্গে ও মর্ত্তে আরও এমন কিছু আছে—" ইত্যাদি

যদি বিশ্বাসীরা সত্যের দোহাই দিয়া তাঁহার এই মতলব খণ্ডন করিতে আরম্ভ করে, তবে তিনি এই বিখ্যাত প্রশ্নটি উত্থাপন করিতে পারেন—সত্য কি?

সুতরাং তবে আর কি—এস আমরা খাই দাই, মজা করি, আর বাধা বুলি আওড়াইয়া প্রার্থনা করি।

মাথার খুলি।

বহু মূল্য দ্রব্য পূর্ণ একটি সুসজ্জিত সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ। অনেক ভদ্র মহিলায় ও পুরুষে ঘরটী ভরা।

সকলের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল—বেশ গল্পগুজব চলিতেছে। জনৈক বিখ্যাত গায়িকার সম্বন্ধে মজার কথাবার্ত্তা হইতেছে। তাহারা তাহাকে স্বর্গীয় দেবী বলিয়া মনে করে। ওঃ, কাল সে কেমন সুমধুর শেষ গানটি গাহিয়াছিল! এখনো কাণে সেই গানের রেশ লাগিয়া রহিয়াছে!

হঠাৎ যাদুকরের যাদুর মত প্রত্যেকের মাথার ও মুখের চামড়ার আবরণ সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মরা মানুষের মাথার সাদা খুলির মত সব সাদা সাদা খুলি সম্মুখে! মাংস বিহীন মুখের হাড় ও মাড়িগুলা এখানে সেখানে দেখিয়া চক্ষু স্থির!

ভীষণ ভয়ে আমি ঐ সব চোয়ালের ও মাড়ির নড়া চড়া দেখিতে লাগিলাম। মোমবাতির আলোকে ঐ সমস্ত পিণ্ডময় হাড়ের বলগুলা ঝকমক করিতেছিল। আবার গোল গোল গর্ত্তগুলার ভিতর অর্দ্ধশূন্য চক্ষুগুলি ঘুরিতে ফিরিতেছিল।

আমি নিজেই আমার মুখ স্পর্শ করিতে সাহস করি নাই; নিজকে আয়নাতে দেখিতেও বুকে বল পাইলাম না।

মাথার খুলিগুলা পূর্ব্বের মত ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। কণ্ঠস্বরও ঠিক আগেকার মতনই। টুকরা টুকরা ছেঁড়া লাল বস্ত্রখণ্ডের মত তাহাদের জিহ্বাগুলি কেমন অদ্ভুত ভাবে আধ আধ কথা বলিতেছিল! হাঁ, কেমন সুন্দর ভাবে অমরী গায়িকা সুমধুর শেষ গানটি গাহিয়াছিল।

বুড়া মানুষ।

জীবন মহা তিমিরে ঘিরিল। দেহ শক্তিহীন, আশা-হীন জীবনে প্রিয়জনের দুঃখ, বার্দ্ধক্যের তমসা সমাগত! তুমি যাহা কিছু ভালবাসিতে, যাহা কিছু প্রিয় মনে করিতে, যাহা কিছু আশ্রয় করিয়াছিলে—সে সব শৃঙ্খলা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে! এখন পতনের পথে, ধ্বংসের মুখে ধাবিত হইতেছে।

তুমি কি করিতে পার? দুঃখ প্রকাশ? ক্রন্দন? কিন্তু তাহাতে কোনো ফল নাই—না নিজের, না পরের।

নুইয়ে পড়া শুকনো গাছের পাতা গুলি আকারে ছোট, সংখ্যাতেও কম; কিন্তু ভিতরটা আগেকার মতই সরস ও সবুজ!

তুমি অন্তর্মুখী হও; নিজের ভিতরে, নিজের স্মৃতির ভিতরে ডুবিয়া যাও! আত্মার অন্তস্তলে প্রবেশ লাভ কর; অতীতের স্মৃতি উদ্ঘাটন তোমারই হাতে! দিন আসিবে। শুভ বসন্ত সুকুমার সরস সৌন্দর্য্য আবার আনয়ন করিবে।

হা হতভাগ্য বুড়ো, সাবধান—আর সম্মুখে তাকাইও না।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

জ্ঞানপথের সহায় ও অন্তরায়।

গত জুন সংখ্যক 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে The Intellectual Life (সাহিত্যিক জীবন) নামক একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞ লেখক "গ্রন্থবিলাসী" (Bibliophile) এই কাল্পনিক আখ্যার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে এ সতর্কতা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হইলেও তাঁর এই কল্পিত নামটি যে সুপ্রযুক্ত ও সার্থক হইয়াছে, ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রবন্ধের ভিতরেই রহিয়াছে। জ্ঞানপিপাসু লেখক জ্ঞানার্থীর উন্নত জীবনাদর্শটি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া এবং ঐ আদর্শকে জীবনে উপলব্ধি করিবার পক্ষে যে সকল বাধা বিঘ্ন আসিয়া জোটে তদ্বিষয়ে নিজের এবং বিখ্যাত মনীষিগণের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার এই চেষ্টা আমাদের শিক্ষিত-সমাজে কিয়ৎপরিমাণেও সাহিত্যিক চেতনা এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিতে সহায়তা করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। যাই হউক, লেখকের প্রশংসা কিম্বা তাঁহার সমগ্র লেখাটীর সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে,—সাহিত্য-চর্চ্চার যে সকল সামাজিক অন্তরায়ের উল্লেখ করিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

"Proper study of mankind is man" 'মানুষ কি, মনুষ্যত্ব কিসে—এই তত্ত্বের অনুসন্ধানই মানব জাতির জ্ঞানচর্চ্চার প্রকৃত বিষয়'—এই প্রাচীন উক্তির সারবত্বা কে অস্বীকার করিবে? ফলতঃ দেখিতে পাই, মানুষের প্রথম জ্ঞানোন্মেষের মুহূর্ত্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার সকল উচ্চতর কর্ম্ম প্রচেষ্টা ও সাধনার মূলে ঐ মনুষ্যত্বের সন্ধানরূপ একমাত্র উদ্দেশ্য রহিয়াছে। তবে, প্রাচীনদের ও আধুনিক কালের জ্ঞানানুশীলনে যাহা কিছু প্রভেদ তাহা প্রণালীর বিভিন্নতায়, উদ্দেশ্যের পার্থক্যে নহে। প্রাচীন জ্ঞানীরা বাহিরকে, বিশ্ব-জগতকে ভুলিয়া আত্মস্থ হইয়া তাঁহাদের জ্ঞেয় পদার্থকে খুঁজিতেন—তাঁহাদের প্রণালী ছিল অন্তর্ম্মুখীন (introspective)। কিন্তু আধুনিক মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অতীন্দ্রিয় প্রণালীই প্রচুর নহে, ইন্দ্রিয়েরও সহায়তা আবশ্যক। মানুষের বাহিরে মহান্ বিশ্ব-কবি-রচিত বিরাট্ দৃশ্যকাব্য বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহার এক অঙ্ক অতীতের তিমির ঘন সুদূর দিগন্তের সীমানা পর্য্যন্ত প্রসারিত, এক অঙ্ক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সঙ্গীতময়ী বাহ্য প্রকৃতির সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্র-পটে অঙ্কিত, এবং আরেক অঙ্ক সুখ-দুঃখ-কর্ম্মান্দোলিত বর্ত্তমান মানব সমাজের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে সজীব অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইতেছে। মানুষকে জানিতে হইলে সে আদিম শৈশবাবস্থায় কিরূপ ছিল এবং সে অবস্থা হইতে অবস্থা ও অভিজ্ঞতা বৈচিত্রের মধ্য দিয়া কিরূপে বর্ত্তমানের সুসভ্য মানুষে উদ্বর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নিজের চেষ্টায়, ইতিহাসের আলোকে, অতীতের

অন্ধকার অপসারিত করিয়া আমাদিগকে জানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এবং যোগ কোথায়, তাহা দর্শন-বিজ্ঞানের সাহযো প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থ পাঠে আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে। আবার, দেশ কাল নির্ব্বিশেষে মানুষে মানুষে তুলনায় ও সংযোগ-সম্মিলনে আসল মানুষটীকে আবিষ্কার করিতে হইবে। এই বহু শাখা বিশিষ্ট প্রণালীকেই বিশেষ ভাবে আধুনিক জ্ঞানযোগের প্রণালী বলা যাইতে পারে। প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান-চর্চ্চা হইতে মধ্যযুগীয় পন্থা অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল—তাহা একান্ত অতীন্দ্রিয় ছিল না, কিন্তু প্রাকৃতিক ও মানবীয় সংস্রব বিহীন, একান্ত গ্রন্থগত ছিল। এবং আমার মনে হয়, আমাদের একালের জ্ঞানার্থিগণের উপর মধ্যযুগীয় প্রভাব এখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই।

গ্রন্থই যে জ্ঞান পথের প্রধান পাথেয় ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। মানুষের যুগযুগান্তর ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা অর্জ্জিত উচ্চচিন্তা, উদার ভাব, মহৎ আদর্শের বাহন, দর্শন-বিজ্ঞান কাব্য-ইতিহাসাদি বহু অঙ্গ বিশিষ্ট যে সাহিত্য আমরা পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমাদের বর্ত্তমানের মানসিক কারবারের শ্রেষ্ঠ মূলধন। এই অতীতের দানকে অগ্রাহ্য করিলে, অতীতের এই রত্ন ভাণ্ডার আপনার করায়ত্ত না করিলে, অতীতের সঙ্গে আপনার দেহ-প্রাণ-মন-আত্মার অচ্ছেদ্য বন্ধন প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিলে, মানুষ পিতৃ-মাতৃ-গৃহহীন অনাথ শিশুর ন্যায় কত নিঃস্ব ও নিঃসহায় হইয়া পড়ে—তাহার ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খা অঙ্কুরিত হইতে না হইতে শুকাইয়া যায়,—তাহার অতীত-ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধহীন উদ্যম প্রেরণা বিহীন ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের বোঝা তাহার পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। তাই মানুষ অতীতের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তার বর্ত্তমানের পান্থনিবাস ও চিরাকাঙ্খিত ভবিষ্যতের স্বর্গখণ্ড গড়িয়া তুলিতেছে। এমন কি সুদূর অতীতের আকর্ষণের তাহার স্বর্ণময় সত্যযুগ অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ অনাগত ভবিষ্যতে নহে, তাহা বহুদিন গত অনৈতিহাসিক অতীতের কল্পলোকে! তাই রহস্যময় পুরাতনের চিন্তনে, পুরাতনের ধ্যানে, সে জীবনের সকল সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খা-লক্ষ্য একেবারে ডুবাইয়া দিয়া নিষ্ক্রিয় সমাধিস্থ হইয়া পড়ে—ইহার প্রমাণ ইতিহাসে বিরল নহে।

এই সমাজবিমুখীনতা ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার হইলেও ইহাই তাঁহার প্রকৃত গন্তব্য পথের এক প্রধান শঙ্কট, তাঁহার সাধনার এক অন্তরায়। এই সংসার বৈরাগ্য মানব সভ্যতার কি পরিমাণ অনিষ্ট করিয়াছে, মানুষের জ্ঞান-চেষ্টাকে কিরূপ খর্ব্ব ও নিস্ফল করিয়াছে, তার স্পষ্ট প্রমাণ ঐতিহাসিক যাহাকে 'তামস যুগ' বলেন সেই কালে, এবং বিশেষ ভাবে ভারত ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে। এই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাহা কিছু স্পষ্ট আমাদের চোখে পড়ে, তাহা এই যে, যে কতিপয় মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞানের ক্ষীণ আলোক-রশ্মিটি জিয়াইয়া রাখিতেন, তাঁহারা প্রকৃত বীরের ন্যায় গৃহে গৃহে বিচরণ করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান-সম্পদের অংশ বিলাইয়া দিতেন না,—পক্ষান্তরে সমাজের কলুষ-স্পর্শের আশঙ্কায়, নারী জাতির সম্মোহিনী শক্তির ভয়ে কাপুরুষের মত নিজ নিজ তথাকথিত আধ্যাত্মিক বা মানসিক স্বার্থ সিদ্ধির আশায় ফল মূলাহারী গুহাবাসী হইয়া পড়িতেন। ইহার ফলে, একদিকে অবজ্ঞাত প্রকৃতি যেমন তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত না, তাঁর মনুষ্যত্বকে পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ করিয়া রাখিত, অপর দিকে সমাজও উন্নত আদর্শের প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া সংকীর্ণ ম্রিয়মান হইয়া পড়িত—ক্ষুদ্র ভাব, ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া মানুষে মানুষে পশু সুলভ লড়ালড়ি কাড়াকাড়ি চলিত, মানুষ অন্তর্নিহিত বিচার বুদ্ধিকে অবহেলা করিয়া প্রচলিত প্রাণহীন অর্থশূন্য প্রথার দাসত্ব করিত। বস্তুতঃ জ্ঞানী ও সমাজের প্রাকৃত জনগণের মধ্যকার এই দুস্তর বিচ্ছেদ ব্যবধানই গত কয়েক শতাব্দীর ভারতীয় সমাজের অধঃপতনের প্রধান কারণ। আর এই কারণে

আলোকের মধ্যেও সময় সময় যে সকল নবভাবের অঙ্কুর গজাইয়া উঠিত তাহা মানব সম্বন্ধের সঞ্জীবন উত্তাপের অভাবে পুণ্য কর্ম্ম পরম্পরায় বিশাল মহীরুহে বিকশিত হইবার সুযোগ পাইত না। উচ্চ চিন্তা ও মহদ্ভাবের পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা যে পুণ্যকর্ম্মে—তাহা বহুকাল হয় আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ লেখক পারিবারিক কর্ত্তব্য এবং সামাজিক আচার সৌজন্যের সঙ্গে জ্ঞানার্থীর জীবনাদর্শের বিরোধ ঘটে বলিয়া যে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, ইহার মূলেও সেই মধ্যযুগীয় প্রভাবের জের রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। * জ্ঞান চর্চ্চার পক্ষে নির্জ্জনতা যেমন আবশ্যক, তেমনি সময় সময় সজনতা বা মানব সঙ্গের উপযোগীতা আছে, তাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহার—এবং যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের উক্তি তিনি নিজ মতের পোষকতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন তাঁহাদের—মতে অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ জন সাধারণের সংস্পর্শ অত্যন্ত ক্ষতিজনক এবং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়;—কেবল যাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, যাঁহাদের সঙ্গে জ্ঞানার্থী সমস্তরের লোকের ন্যায় মন খুলিয়া ভাব বিনিময় করিতে পারেন, তাঁহাদের সঙ্গ ও ভাবগ্রাহিতা-মূলক সহানুভূতিই জ্ঞানার্জ্জনের সহায়ক, নব নব ভাবের উদ্বোধক হইয়া থাকে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে সকল যুগেই শ্রেষ্ঠমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা মুষ্টিমেয়, আবার কোন কোন কালে ঐরূপ ব্যক্তির একান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়া থাকে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথীয় যুগ বা ভিক্টোরিয়া যুগ কয়টা দেখা গিয়াছে? ভারতীয় ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য যুগের নবরত্ন সঙ্ঘের পুনরাভিনয় হইয়াছে কি? 'French Academy' বা গোল্ডস্মিথ-জনসন্-বার্ক-হোগার্থ-গেরিকের "Literary club" কত কাল সজীব ছিল? তাই, যদি সাহিত্য-সেবীকে উচ্চস্তরের লোক সঙ্গের অপেক্ষা করিতে হয়, তবে তাঁহাকে অনেক স্থলেই অধ্যয়নাগারের সংকীর্ণ প্রাচীর সীমার কারায় সন্ন্যাসীর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হয়. মানব স্পর্শের সজীবতা ও প্রেরণা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য সেবাজন্য উচ্চাঙ্গের আনন্দ মাত্রকেই যদি আমাদের মুখ্য লক্ষ্য মনে না করি, জ্ঞানযোগকে যদি আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন আত্মোন্নতি ও আত্মোপলব্ধির অন্যতম উপায় স্বরূপ মনে করি, তবে আবশ্যক মত আমাদিগকে ছোট বড় সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার তারতম্য বশতঃ মানুষে মানুষে যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহার অন্তরালে ও নিম্নদেশে এমন একটি মূল সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, এমন একটি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত যোগসূত্র আপাতবিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র মনুষ্য খণ্ডগুলিকে বাঁধিয়া একটা অখণ্ডতার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ছাড়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। অথচ এই ঐক্য ও সাম্যের উপলব্ধিতেই আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের সার্থকতা—ইহার ফলেই আমাদের হৃদয় গুহা হইতে সেই প্রেমের উৎস খুলিয়া যায়, যাহা বিশালদেহা কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়া উচ্চ নীচ জাতিবর্ণ দেশবিদেশের সর্ব্ব প্রকার বিভেদ রেখা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমগ্র মানবমণ্ডলীকে আলিঙ্গন করে এবং অবশেষে এক বিরাট একত্বের অতলহীন মহার্ণবে গিয়া আত্ম সমর্পণ করে।

কিন্তু, জ্ঞানার্থীর পক্ষে সামাজিকতা শুধু যে সামাজিক কল্যাণের কিম্বা তাঁহার নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণের

* আধুনিকতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আধুনিক যুগের কবি-প্রতিভাও কখনো কখনো পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টি সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ড্ লক্ষ্য করিয়াছেন :—

"Wordsworth retired (in the middle Age phrase) into a monastery. I mean, he plunged himself in the inward life, he voluntarily cut himself off from the modern spirit. * * Scott became the historiographer of feudalism. Keats passionately gave himself up to a sensuous genius, to his faculty for interpreting nature. * Wordsworth, Scott and Keats have left admirable works; but their works have this defect,—they do not belong to that which is the main current of the literature of modern epochs, they do not apply modern ideas to life they constitute, therefore, minor currents."

জন্ম আবশ্যক তাহা নহে,—তাঁহার মানসিক আহার্য্যের, মনের পুষ্টির জন্যও যেমন একদিকে নির্জ্জনে 'কেতাবী' বিদ্যার আলোচনা আবশ্যক, তেমি অন্য দিকে সমাজ প্রিয়তা চর্চ্চার প্রয়োজন। বস্তুতঃ সমাজের নিকট আমরা কি পরিমাণে ঋণী সে বিষয়ে অনেক স্থলেই আমরা সজ্ঞান নই। তার কারণ মাতৃদানের বা প্রকৃতির দানের ন্যায় সমাজের দানও অজস্র, আমাদের জানা ও অজানা মতে তাহা অশেষ হিতসাধন করিতেছে, তাহাতে আমরা জন্মাবধি অভ্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের হাত হইতে কি পরিমাণ গ্রহণ ও আত্মসাৎ করিয়া আমরা মানুষ হইয়াছি, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? দৈবী প্রতিভা লইয়াও যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদিগকেও বহুল পরিমাণে এই গ্রাহিণী শক্তির (assimilating power) উপর নির্ভর করিতে হয়—তাঁহারা যেমন নিজেদের ভিতরকার প্রতিভালোকের এবং অতীতের নিকট, তেমনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মানবীয় আবেষ্টনের নিকট ঋণী। কত শ্রেষ্ঠ কবির নিখুঁত সুন্দর চিত্র জীবিত মানুষের মুখাবয়ব এবং চিত্ত ও মনোবৃত্তির বিকাশকে সূত্র করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কত চিন্তাশীল লেখকের চিন্তার বীজ সাধারণ লোকের অসতর্ক বাক্যের ইঙ্গিতের ভিতর গুপ্ত রহিয়াছে, তাহা ঐ সকল কবি ও লেখকগণের মনস্তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারিব। তাই মহা কবি গেটে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়াছেন—"What would remain to me if this art of appropriation were derogatory to genius? Every one of my writings has been furnished to me by a thousand different persons, a thousand things: wise and foolish have brought me, without suspecting it, the offering of their thoughts, faculties and experience. My work is an aggregation of beings taken from the whole of nature; it bears the name of Goethe"—অপরের সম্পদকে আত্মসাৎ করিবার যে শিল্পনৈপুণ্য তাহা যদি প্রতিভাবান্ কবির যশের হানিজনক হয়, তবে আমার নিজের কি অবশিষ্ট থাকে? আমার প্রত্যেকটি লেখা সহস্র সহস্র ব্যক্তি ও সহস্র পদার্থের হাত হইতে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞানী মূঢ় সকলেই তাহাদের নিজ নিজ শক্তি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অঞ্জলি আমাকে অর্পণ করিয়াছে, যদিও তাহারা নিজেরা এ দানের বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমার গ্রন্থাবলী সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি হইতে সংগৃহীত উপকরণ রাশির সমষ্টি মাত্র, আমি কেবল গেটে নামের স্বাক্ষরটি তাহার উপর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি।

আবার, অতীতকে প্রকৃত ভাবে বুঝিতে হইলেও, সুদূর অতীতের ইতিহাসের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে হইলেও সজীব বর্ত্তমানের মনুষ্য সাধারণের ভাব স্বভাবের টীকার সাহায্য নিতে হয়। তাই ম্যাক্স মুলার আমেরিকার আদিম অধিবাসিদিগকে Living manuscript সজীব হস্তলিপি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানব সমাজ শৈশবাবস্থায় কিরূপ ছিল তাহা আজ আমরা নবোদ্ভাবিত তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ও পৌরাণিক তত্ত্বের (Comparative philology and comparative mytlology) সাহায্যে অনেকটা জানিতে পারিতেছি। কিন্তু ঐসকল নববিজ্ঞানের অনুমানলব্ধ সিদ্ধান্তগুলির অভ্রান্ততার প্রমাণ কিসে? বস্তুতঃ বর্ত্তমানের মানব শিশু চরিত্র এবং (শিশুসদৃশ) আদিম অবস্থাপন্ন, অসভ্য সমাজের মানসিক প্রকৃতি, আচার ব্যবহার এবং জীবন প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা ঐ সকল সিদ্ধান্তকে যদি আমরা বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিতাম, তবে ঐ সব বিজ্ঞান "বিজ্ঞান" নামে অভিহিত হইবার দাবি করিতে পারিত কিনা সন্দেহ, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের ইতিহাস ও অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া যাইত। পূর্ব্বোক্ত সজীব হস্তলিপির টীকার সাহায্যে অতীতের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, দিবা, রাত্রি, সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, মেঘ, রৌদ্র, বজ্র বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বিস্মিত নেত্রে দেখিয়া শিশু মানব কিরূপে অভিভূত হইয়া পড়িত, ঐ সকলে তাহারা জীবনী শক্তি আরোপ করিত, আমরা জানিতে পারি ঐ সকল প্রাকৃতিক জড় শক্তি হইতে মানুষ কিরূপে প্রথমে সমুজ্জল দেহধারী বহু

দেবতার কল্পনায় উপনীত হইয়াছিল এবং অবশেষে মানবাত্মার অমরত্ব এবং এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মার বিশ্বাসে পঁহুছিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত লেখক মহোদয়ের ক্ষোভের আর একটি কারণ এই যে. আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের পারিবারিক জীবন সুশিক্ষিত প্রতীচ্য দেশের পরিবারের মত সাহিত্য চর্চ্চার সহায়তা না করিয়া প্রতিকূলতা করিয়া থাকে। কথাটা যে আংশিক ভাবে সত্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ. পাশ্চাত্য দেশের ও আমাদের দেশের সাধারণ ভদ্র পরিবারকে আক্ষরিক বিদ্যা বিষয়ে তুলনা করিলে পাশ্চাত্য ভদ্র পরিবারকেই শ্রেষ্ঠতার আসন দিতে হইবে। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রকৃত Culture, অর্থাৎ মানসিক উৎকর্ষ এবং হৃদয়ের উদারতা, ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী আক্ষরিক বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। এবং Culture বিষয়ে সাধারণ পশ্চাত্য রমণীরা তাঁহাদের ভারতীয় ভগ্নীগণ অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ এ কথা এখনো প্রমাণ সাপেক্ষ। যে সাহিত্যিকের ভাগ্যে Dorothy Wordsworth বা ফরাসীদেশীয়া বিদুষী Eugenie De Guerin কিম্বা Charles Lamb এর প্রতিভাশালিনী ভগ্নীর ন্যায় সহযোগিনী, উৎসাহদায়িনী সহোদরা জুটিয়াছে, অথবা Elizabeth B. Browning এর মত কাব্য-রাজ্যের সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী লাভ হইয়াছে তাঁহার সৌভাগ্যের তুলনা কোথায়? কিন্তু এরূপ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য-জগতেও আমরা কয়জন দেখিতে পাই? অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিদের লৌকিক জীবন-সঙ্গিনীর বিদ্যমানতা সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদের কাব্যাদিতে কিম্বা কাব্যের উৎপত্তি বিকাশ-সম্পর্কিত জীবনী গ্রন্থে তো কিছুই শুনিতে পাই না; পক্ষান্তরে, প্রায় সমুদায় 'কবিপ্রিয়াই' মানস লোকের কাল্পনিক সৃষ্টিমাত্র দেখিতে পাই। বিখ্যাত রুশীয় ঔপন্যাসিক কাউণ্ট টলষ্টয় পূর্ব্ব জীবনে পত্নীর নিকট হইতে তাঁহার গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার শেষ কয়েক বৎসরের পারিবারিক ও সাহিত্যিক কাকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ঔপন্যাসিকের জীবনী পাঠক বিশেষ ভাবে জানেন। আর, গ্রীক জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সক্রেটিশ-পত্নী Xantippe ত রসনা-লালিত্য এবং স্বভাবের সৌকুমার্য্যের জন্য প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছেন! তাই আমাদের এ বিষয়ে ক্ষোভপ্রকাশ নিরর্থক মনে হয়।

কিন্তু অল্পসংখ্যক অসাধারণ পত্নী-সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য গণনায় না আনিলে. সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে রমণী সংসর্গ সাহিত্যসেবীর বা জ্ঞানার্থীর গন্তব্য পথের কণ্টক নহে, পক্ষান্তরে, ঐ পথের এক প্রধান পাথেয় স্বরূপ। স্ত্রীজাতির নিকট আমরা সাধারণতঃ বুদ্ধির প্রাখর্য্য, চিন্তার গাম্ভীর্য্য কিম্বা বিদ্যার প্রাচুর্য্য প্রত্যাশা করি না—হৃদয়ের মাধুর্য্য. প্রীতির অমৃতত্বেই নারীর নারীত্ব ও মহত্ত্ব! জ্ঞানান্বেষী যখন গ্রন্থস্তূপের "অ-নীর" মরুভূমের মধ্য হইতে তথ্যের শুষ্ক উপলরাশি সংগ্রহ করিতে করিতে ক্লান্ত ও তৃষিত হইয়া পড়েন, তখন কিসের জন্য তিনি আকুল হইয়া উঠেন? এক বিন্দু প্রেম-বারির জন্য নয় কি? অধিকন্তু, তাঁহার বহুচেষ্টাসঞ্চিত তথ্যের লৌহখণ্ডগুলিকে প্রকৃত জ্ঞানের সুবর্ণ কণিকায় রূপান্তরিত করিতে হইলে প্রীতির অলৌকিক পরশ পাথরের স্পর্শ অত্যাবশ্যক। প্রাচীন কালে যাহাকে alchemy বলা হইত তাহার সন্ধান এখনো নারী-প্রেমের মধ্যেই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, আমাদের বহুশ্রমলব্ধ লৌকিক জ্ঞানের পরস্পর বিরোধী অসংলগ্ন উপকরণরাশির সঙ্গে যখন প্রেম-সুধার রসবিন্দু মিশ্রিত হয় তখন, কি এক রহস্যময় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে, তাহা এক স্বতন্ত্র অমৃত পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়,—তখনই, মানুষের যাহা প্রকৃত কামনার বস্তু, তাহার যাহা জীবনব্যাপী পিপাসার বারি, সাধনার সিদ্ধি—আধ্যাত্ম বা পরাজ্ঞান—তাহার উদ্ভব হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ কঠোর জ্ঞানের পথ অতিক্রম করিয়া যখন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছিয়াছিলেন, তখন ঐ প্রেমের বাণীই প্রচার করিয়াছিলেন: সত্যের যাহা প্রমাণ অর্থাৎ একত্ব-বোধ—তাহাই আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য—যাহা কিছু আমা-

প্রেমই সত্য, বিদ্বেষই অসত্য' যেহেতু অসত্য বহুত্ব-বিরোধের জন্ম দেয়। * * প্রীতির বন্ধন সকল বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া, সমস্ত মানব-জাতিকে প্রাণী রাজ্যের সঙ্গে এক করিয়া দেয়—প্রেমই জীবন, প্রেম ও পরমাত্মা অভিন্ন। × × পবিত্র হৃদয়ের আলোকে মানুষ পরমাত্মার দর্শন লাভ করে, মানসিক শক্তি বা মনীষা (Intellect) দ্বারা নহে। মনোবৃত্তি আমাদের গৌণভাবে সাহায্য করে, তাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারে প্রহরীর কাজ করে, হৃদয়ের গন্তব্য পথের আবর্জ্জনারাশি ঝাঁটাইয়া মুছিয়া দেয় মাত্র। বুদ্ধিবৃত্তি অন্ধ, চলচ্ছক্তিহীন কিন্তু হৃদ বৃত্তিই সক্রিয়, তাহার গতির সঙ্গে বিদ্যুতেরগতির তুলনা হয় না। হৃদয়ের প্রেমের শক্তি যখন বর্দ্ধিত, প্রগাঢ় ও পূর্ণাভিব্যক্ত হইয়া দৈবী শক্তিতে পরিণত হয়, তখনই সমুদায় সৃষ্টপদার্থের ও নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার উপলব্ধি জন্মে, কিন্তু মানসিকতা দ্বারা তাহা অসম্ভব। *

প্রেমবিরহিতা বিদ্যা কিরূপ বন্ধ্যা নারীর ন্যায় নিষ্ফলা হইয়া থাকে, তাহা আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীরা রূপকচ্ছলে সুন্দর দেখাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত—কচ-দেবযানীর পৌরাণিক উপাখ্যান। দেব-গুরু বৃহস্পতি পুত্র কচ, দৈত্য গুরু-গৃহে সহস্র বৎসর প্রবাসের পর স্বর্গের জন্য সঞ্জীবনী বিদ্যা আহরণ করিয়া বিদায় কালে বিদ্যা ও যশের আকর্ষণে গুরু দুহিতা দেবযানীর প্রেমের অর্ঘ্য প্রত্যাখ্যান করিলেন, তার ফলে প্রেমের অবমাননাকারী কচের মস্তকে যে ভীষণ অভিশাপের বজ্রপাত হইল, তাহা বঙ্গীয় কবির ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে,—

"যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ ;—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবেনা ভোগ,
শিখাইবে, পারিবেনা করিতে প্রয়োগ !"

• ওঁ বাঙ্‌মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌। •আবিরাবীর্ম এধি—আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও—এই শান্তি বচন দ্বারা মনকে প্রস্তুত করিয়া প্রাচীন বিদ্যার্থী তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়নে নিযুক্ত হইতেন। অদ্যকার বিদ্যার্থীকে স্মরণ রাখিতে হইবে—নিমিলিত নেত্র. ধ্যানস্তিমিত যোগীর ন্যায় কেবল হৃদয়-গুহার ভিতরে সেই 'আবির' প্রকাশকে অনুসন্ধান করিলে তিনি নিজের স্বরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন না, কিম্বা শুধু গ্রন্থকীটের মত গ্রন্থের জীর্ণ পত্ররাশিদ্বারা আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মিটাইতে চাহিলে এ দারুণ বুভুক্ষা কিছুতেই প্রশমিত হইবে না—পক্ষান্তরে, সেই স্বপ্রকাশের যে অন্তহীন প্রকাশ বাহ্য-অভ্যন্তরে, জল-স্থল-অন্তরীক্ষে, স্থাবর-জঙ্গম-চরাচরে, বর্ত্তমানে, অতীতে রাত্রিদিন অবিশ্রান্ত চলিয়াছে এবং চলিতেছে তাহা সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার অবারিত রাখিয়া, আমাদের চক্ষু-কর্ণ-হৃদয় মন-আত্মা দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে, নতুবা আমাদের সকল চেষ্টা সকল আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অন্তর ও বাহিরের, সজনতা ও বিজনতার, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের, ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়ই প্রকৃষ্ট পন্থা—এই পরম শিক্ষাই যুগ যুগান্তরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আধুনিক মানবের জন্য বহন করিয়া আনিয়াছে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

* স্বামীজীর ইংরাজী বক্তৃতাংশ হইতে অনূদিত।

বেদিয়া

ঘর বাঁধেনা, নৌকোয় থাকে ;
ওটাই তাঁদের ঘর বাড়ি !
জোত জেরাতের ধার ধারে না,
পাইক পিয়াদার ঝকমারি।

এ-দেশ সে-দেশ ক'রে বেড়ায়—
জন্ম ভূমির নাই দাবি ;
কেমন ধারা কাটায় জীবন ?
অবাক হ'য়ে তাই ভাবি!

বহর বেঁধে চালায় তরী—
সহর খানা যায় ভাসি!
বৈঠে চালায় বেদেনীরা
ভঙ্গী দেখে পায় হাসি!

সারাটা দিন ঝগড়া ঝাটি,
কণ্ঠে হারে ফুলুরা;
চুপটি ক'রে কুকুর মত
মিন্সে দেখে দুল নড়া!

নিত্য নূতন নদীর বাঁকে
বহর খানা হয় বাঁধা;
গঞ্জে বেরোয় সবাই মিলে—
নাইকো তাঁদের ভয় বাধা।

কেউ বা দেখায় ভোজের বাজি
"আত্মারামের মন্তরে,
দেখলে তাদের কারসাজিটা
ভ্রান্তি জাগে অন্তরে!

শূন্যে বাঁধা দড়ির 'পরে
"ভানুমতির" কারখান —
ছোট্ট মেয়ের কাণ্ড দেখে,
বীর পুরুষের হার মানা!

গোখ্‌রা নিয়ে, কেউটে নিয়ে,
খেলছে তারা নির্ভয়ে!
'বেউলা" সতীর দুঃখ গেয়ে—
চক্ষু ভাসে নীর ব'য়ে!

এমনি ক'রে ভিন্ গাঁয়েতে
কাটছে তাদের দিন খানা!
রেতের বেলা বহর জুরে—
তাক্ ধিনা ধিন্, ধিন্ তানা!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

সমস্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"নমস্কার।"

"এই যে, জগবন্ধু বাবু আসুন, আসিতে আজ্ঞা হউক; আমার নমস্কার। ভালতো।

"ভগবানের ইচ্ছায় ভালই; আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন তো?

"তা একরকম আছি—দয়াল—দয়াল" বলিয়া ভদ্র-লোকটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

জগবন্ধু বাবু তাঁহার ছেলে শৈলেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "শৈলেন, ইনি তোমার মেসো মহাশয় হন।" শৈলেন মাথা নত করিয়া দুর্গাদাস বাবুকে অভিবাদন করিল। দুর্গাদাস বাবু কহিলেন—',থাক বাবা, তুমিই কাল আমাকে তোমার বাবার খবর দিতে আসিয়াছিলে না!"

শৈলেন মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া নখে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—"আজ্ঞা হাঁ।"

"ব'সো বাবা, তোমরা ব'সো.—নগেনের দিকে চাহিয়া দুর্গাদাস বাবু বলিলেন "এ ছেলেটীকে যে চিনিতে—"

জগবন্ধু বাবু বলিলেন—"এ আমাদের গ্রামের তারা চরণ মুখুর্য্যার ছেলে নগেন—এম. এ, পড়িতেছে—সঙ্গে সঙ্গে ল লেকচারও এটেণ্ড করিতেছে।"

নগেনও বৃদ্ধকে নত হইয়া অভিবাদন করিয়া শৈলেনের পাশেই ধীরে ধীরে উপবেশন করিল।

জগবন্ধু বাবু আলাপি লোক। তিনি প্রথমে কথা তুলিলেন, "প্রাতে আপনার রোগী দেখিবার সময়, সে জন্যই কাল শৈলেনকে পাঠাইয়া আপনাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম—এতদিন পরে কলি-কাতায় আসা গেল—সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া চাই, অথচ আপনারা সকলি কর্ম্মীলোক।"

দুর্গাদাস বাবু হাসি হাসি মুখে বলিলেন—অতি উত্তম করিয়াছেন, নতুবা আমরা পরের দাস, অর্থের দাস, সময়ের দাস, ঘড়ি ধরিয়া চলিতে বাধ্য হই—সাক্ষাৎ না হইলে কত বড় একটা ব্যথা অনুভব করিতাম—আপনার

খবর পাইয়া আজকার Routin বদলাইয়া লইয়াছি; সাক্ষাতে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। দয়াল—দয়াল--তারপর, কলিকাতা আর আছেন কত দিন?"

"আজই চলিয়া যাইব।"

"বাড়ীতে কি ভাল থাকেন?

"মন্দ থাকি না।"

"গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে এই সুখ—শেষ বয়সটা পেন্সন, আর হরি নাম—দয়াল ব্রহ্ম—"

ওই শেষটারই অবসর কম; দলাদলির এত মার পেচ্ যে অনিচ্ছা সত্বেও তাহাতে লিপ্ত হইতে হয়।"

দুর্গা—"আপনাদের পূর্ব্ববঙ্গের লোক পশ্চিম বঙ্গের লোক হইতে কিন্তু খুব sincere যাই হউক!"

জগবন্ধু বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আর কোন বিষয়ে না হইলেও শত্রুতা সাধনে খুবই—"

দুর্গা দাস বাবু হাসিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সকল দলাদলির বিষয় কি?"

"একেবারে কিছুই না। অথচ পথ্য হজম করিবার একমাত্র গ্রাম্য মহৌষধই ঐ দলাদলির হুজুগে বৃথা লম্ফঝম্ফ দৌড় ধাপ—বাক্যব্যয়; যা ইচ্ছা তাই—"

দুর্গাদাস বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন—"যাই হউক ছেলেটী উপযুক্ত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া তিনি শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এবার কোন year তোমার বাবা?"

শৈলেন ও নগেন এতক্ষণ ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া যেন বেশ শান্তি পাইতেছিল। পরিষ্কার হলটী সুন্দর সাজান—যে স্থানে যেটী রাখিলে মানাইবে, ঠিক সেই জিনিসটী সেইস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। ঘরের দেয়ালে মহাত্মাদিগের চিত্র আয়নার ফ্রেমে ঝুলান—এক দিকে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, অন্যদিকে ত্রৈলঙ্গ-স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, একদিকে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, অন্যদিকে মেরির ক্রোড়ে যিশুখৃষ্ট, তার দুইদিকে দুইটী প্রার্থনাপরায়ণা বালিকা—চিত্রগুলির দিকে তাকাইলে গৃহস্বামীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া পড়ে। চিত্রগুলির মাঝে মাঝে সুন্দর বড় বড় অক্ষরে "একমেবাদ্বিতীয়ম" "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্." "সত্যমেব জয়তে," "ধর্ম্মই সুখ" ইত্যাদি 'মোটো' গুলি বিন্যস্ত হইয়াছে।

শৈলেন ও নগেন মুগ্ধনেত্রে সেগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। দুর্গাদাস বাবুর প্রশ্নে সে মস্তক নত করিয়া বলিল--"এটা 5th year"

"বেশ বাবা, ভগবান করুন, পাশ হইয়া আইস।"

দুর্গাদাস বাবু "বসুন" বলিয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। কিছু কাল পরেই তাঁহার মেয়ে ছেলেরা পর্দ্দা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল; পাছে পাছে দুর্গাদাস বাবুও আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দুর্গাদাস বাবু ছেলে মেয়েদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওদেরে প্রণাম কর, তারপর বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাও।"

পারুল, বকুল, আশা ও তাতা পিতার আদেশ অনুসারে একে একে তিন জনকেই প্রণাম করিল।

পর্দ্দার আড়ালে গৃহিণী দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া জগবন্ধু বাবু উঠিয়া ভিতরে গেলেন। আশা শৈলেনের কবলে ও তাতা নগেনের কবলে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল এবং প্রতি-প্রশ্ন করিয়া শৈলেন এবং নগেনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

নগেন হাসি মুখে—সকলেই শুনে অথচ চুপি চুপি—তাতাকে বলিল "তোমার দিদিদের পরিচয় দাও দেখি; পরিচয় না হইলে আলাপ করিব কি করিয়া?" নগেনের কথা শুনিয়া বড়মেয়ে পারুল হাসি মুখে কাপড় গুজিয়া সরিয়া পড়িল, তারপর বকুলও তাহার দিদির অনুসরণ করিল।

নগেন তাতাকে বলিল "তোমার দিদিদের নাম কি? তাতা বলিল—ছোট দিদির নাম বকুল, বড় দিদির নাম পারুল।" তাতা থামিল না—বলিতে লাগিল "বড় দিদি ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের ক্লাস নাইনে পড়ে। আমি স্কুলে ভর্ত্তি হই নাই। আমি, ছোট দিদি, আর দাদা বাড়ীতে পড়ি। আশা দাদা সুন্দর ছবি আঁকিতে পারে।"—বলিয়া তাতা দৌড়িয়া গিয়া পার্শ্বের কোঠার দরজার পর্দ্দা সরাইয়া নগেন ও শৈলেনকে

ডাকিয়া বলিল—"এখানে আসিয়া দেখুন -তার আর্ট ষ্টুডিও।"

কৌতুহল পরবশ হইয়া তাহারা উভয়ই তাহার অনুসরণ করিল।

সুন্দর একটী চিত্র-কক্ষ। দেয়ালের গায়ে আয়না ফ্রেমে আটা শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের চিত্রটী দেখিয়া উভয়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। শৈলেনের তাহা এত ভাল লাগিয়াছিল যে সে চিত্র-শিল্পীকে টানিয়া বক্ষে চাপিয়া লইয়া একটা ইজি চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল।

এই সময় পারুল দুই হাতে দুই খানা ডিস্ ও বকুল দুই হাতে দুই পেয়ালা চা লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইল।

অবস্থা দেখিয়া শৈলেন নগেনের মুখের দিকে, আর নগেন শৈলেনের মুখের দিকে চাহিল।

টেবিলের উপর খাদ্য রাখিয়া পারুল মাথা নীচু করিয়া কহিল—"একটু চা খান।"

পারুল অনুরোধ করিয়াই মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। শৈলেন বা নগেন কেহই প্রথমে কোন কথা বলিল না। কিছুক্ষণ পরে পারুল ও বকুলের মুখের দিকে চাহিয়া নগেন বলিল—"খেতে বলছ—এ যে একটা অত্যাচার—না খেলে হবে না?" পারুল একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—"সে হবে না। এ বাজারের জিনিষ নয়, ঘরে করিয়াছি।"

বকুল ও দিদির সঙ্গে কথায় যোগ দিয়া হাসিয়া বলিল—"জাত যাইবার ভয় করেন কি?"

নগেন হাসিয়া বলিল—"করি না, একথাই বা বলি কেমন করিয়া?"

বকুল হাসিয়া বলিল—"এখানে কেউ নাই, আমরাও কাহাকে বলিব না।"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"মানুষের ভয়ই কি সকলের চেয়ে বড় ভয়?"

পারুলও হাসিয়া বলিল—"ভগবানের নিকট কি আর জাতি বিচার আছে?"

শৈলেন হাসিল, কোন কথা বলিল না।

নগেন পারুল ও বকুলের দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"বামুনের ছেলের জাতটা তবে তোমরা মারিবেই সঙ্কল্প করিয়াছ?"

নগেনের গাম্ভীর্য্য প্রকাশ ও অনিচ্ছার ভাব দেখিয়া পারুল ও বকুলের মুখ মলিন হইয়া গেল।

আশা হাসিয়া বলিল—"ও বিস্কিট্ গুলি বিলাতি, ন হয় সে গুলিই খান—সেতো সকলেই খাইয়া থাকে।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"হাঁ, তাহা হইলে সে গুলি অবশ্যই খাওয়া যাইতে পারে, কি বল হে শৈলেন! কিন্তু তোমার দিদিরা তো কেবল তাহা খাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন না।" পারুল হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা তাহাই খান।"

এই সময় গৃহিণীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে মাথা নত করিয়া অভিবাদন করিল।

গৃহিণী শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তা বাবা তোমরা যখন পরিচিত হইলে, তখন সর্ব্বদাই আসা যাওয়া রাখিও। এত দিন এখানে আছ, কই, এক দিনও তো এসে বাবা পরিচয় কর নাই। আপনার আপন মাসি মার মতোই মনে করো বাবা।" নগেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বাবা পরিচয় হইল, ব্যবহারে পরকেও আপন করা যায়। তোমাকে ও শৈলেনকে আমরা যেন আপন বলিয়াই মনে করিতে পারি বাবা, আসিলে গেলেই অতি পরও আপন হয়—সহানুভূতি না থাকিলে অতি আপনও পর হইয়া যায়। একটু খাও বাবা,—তোমরা কলেজের ছেলে তোমাদের নিকট ব্রাহ্ম-হিন্দু কি বাবা—আর এ কলিকাতার সহরে এসব কি চলে বাবা।" বলিয়া গৃহিণী শৈলেন ও নগেনের মুখে ও মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন। তাহাদের উভয়ের চক্ষু ভারাক্রান্ত হইয়া গেল, মন শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়িল। এমন স্নেহ এমন আপ্যায়ন তাহারা পল্লিগ্রামের বাহিরে পাইবেন, সেরূপ আশা করিয়াছিলেন না।

নগেন মাটির দিকে চাহিয়া নত মস্তকে বলিল—"আপনি যান আমরা খাইতেছি।"

* * * *

রাস্তায় আসিয়া নগেন আস্তে আস্তে শৈলেনকে বলিল—"জাতিটা একেবারে মাঠে মারা গেল।"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—'দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থাও আছে—কলিকাতার অনেক লোক রাত ভরিয়া কুকর্ম্ম করে, প্রাতে গঙ্গা স্নান করিয়া সে পাপ ধুইয়া দেয়—চল গঙ্গা স্নান করিয়া আসি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগবন্ধু বাবু একটা দেওয়ানী মোকদ্দমার আপিল করিতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষ করিয়া, বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া ও ছেলেকে তাঁহাদিগের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া সেই দিনই রাত্রির গাড়ীতে বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন।

পীরপুর ঢাকা জেলার একটী গণ্ড গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নমশূদ্র, মালী মুসলমান সকল জাতিই দুই চার-দশ ঘর করিয়া আছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ যে গ্রামে যত বেশী, সামাজিক দলাদলিও সে গ্রামে তত বেশী হইয়া উঠে। পীরপুর এই সামাজিক দলাদলির অবধি ছিল না।

জগবন্ধু বাবু এই গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ঠ তালুকদার। তিনি ত্রিশ বৎসর কাল কালেক্টরীর সেরেস্তাদারী করিয়া এখন পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। জীবন ভরিয়া বিদেশে থাকিয়া তাঁহার সমাজ ও সংসার জ্ঞান একেবারেই ছিল না। পূজার ছুটীতে বৎসরে একবার করিয়া যখন বাড়ী আসিতেন, তখন বার দিনের পল্লিচিত্র তাঁহার মনে পুণ্য ভাব জাগাইয়া দিত। গ্রামের ভদ্র ইতর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার যে গুণ কীর্ত্তন করিত, তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইতেন। বহু গ্রাম্য বিবাদ ও দলাদলি নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া এবং উপদেশ ও পরামর্শ প্রার্থীকে সদুপদেশ ও সৎ পরামর্শ দান করিয়া তিনি আত্ম প্রসাদ লাভ করিতেন। এই সকল কারণে পেন্সন লইয়া আসিয়া এইরূপ সৎ-সহবাস ভোগ করিয়া যে তিনি জীবনের শেষ দিন গুলি সুখে ও শান্তিতে কাটাইতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার আশা ছিল। এখন দেখিলেন, তাঁহার সে কল্পনা, তাঁসের ঘরে গৃহস্থালী অবস্থা দেখিয়া প্রথম কয়েক বৎসর তিনি বাড়ী ছাড়িয়া পুনরায় সহরে আসিয়াই বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যখন নিজকে নিরাপদ রাখিতে পারিলেন না; মামলায় মোকদ্দমায়, সমাজে-সালিসে নিজকে সম্পূর্ণ জড়িত দেখিতে পাইলেন, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া ঘরে আসিয়াই বসিলেন।

এখন জগবন্ধু বাবুও একজন সমাজপতি। তিনি আর এখন সামাজিক গোলমালে বা মামলা মোকদ্দমায় নিজকে বিপন্ন মনে করেন না; বরং একটু অগ্রসর হইয়াই তাহা মাথা পাতিয়া লন।

জগবন্ধুর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈলেশ কালেক্টরের কেরাণী, দ্বিতীয় পুত্র শৈলেন বি, এস্ সি. পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছে। এবার তাহার শেষ পরীক্ষার বৎসর।

জগবন্ধু বাবু যে গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম ডাক্তার দুর্গাদাস চৌধুরীও সেই গ্রামের জামাতা। প্রথম বয়সে উভয়ই কেশব সেনের বক্তৃতা ও প্রার্থনা শুনিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—এই সূত্রে তাঁহাদের পরিচয়। যৌবনের ভাব উত্তেজনা কাটিয়া গেলে জগবন্ধুর ব্রহ্মজ্ঞান টুটিয়া যায়, তিনি জীব বিশেষের ন্যায় সরল ভাবে সংসার কোটর অবলম্বন করেন। এখন তিনি এক জন পূজা আহ্নিক পরায়ণ আনুষ্ঠানিক হিন্দু; দুর্গাদাস বাবু ব্রাহ্ম সমাজের নিষ্ঠা পরায়ণ ব্রাহ্ম।

জগবন্ধু বাবু দুই সপ্তাহ বাড়ী ছাড়া ছিলেন। আসিয়া শুনিলেন—সমাজে কয়েকটী নূতন মীমাংসার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার একটী লইয়া গ্রামে হুলুস্থুল বাঁধিয়া গিয়াছে।

সমস্যাটী এই—কালী গ্রামের গুরুপ্রসাদ বাবুর আদ্য শ্রাদ্ধ, তাঁহার ব্যারিষ্টার পুত্র খুব সমারোহ সহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধে পীরপুরের ব্রাহ্মণ সমাজ বিরোধী ছিলেন; তাঁহারা বিলাত ফেরতাকে সমাজে লইতে নারাজ। এখন যাঁহারা এই শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছেন, তাহাদিগকে সমাজ চ্যুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পীরপুরের জীবন তর্করত্ন এই শ্রাদ্ধে

গিয়াছেন। জীবন তর্করত্নের সঙ্গে গিয়াছিল বলিয়া রমণ ভাণ্ডারীর নাতি অতুলও আটকে পড়িয়াছে। রমণ জগবন্ধু বাবুর খানা বাড়ীর প্রজা। সুতরাং জগবন্ধু বাবুও উপস্থিত সমস্যায় জড়িত।

এই সমস্যা উঠাইয়াছেন—তারাচরণ মুখুর্য্যা। তর্করত্ন মুখুর্য্যার বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়া তাঁহার একখানা মূল্যবান সম্পত্তি হস্তচ্যুত করাইয়াছেন। সম্পত্তি খানা তারাচরণ পৈত্রিক ঋণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বেনামী করিয়াছিলেন—তর্করত্নের সাক্ষ্যে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এহেন শত্রুকে কবলে পাইয়া তারাচরণ চুপ করিয়া থাকিবেন? তা কখনও হইতে পারে না!

মুখুর্য্যার পৈত্রিক সম্পত্তি খুব বেশী ছিল না। যাহা ছিল, পৈত্রিক ঋণে নীলাম হইয়া গিয়াছিল। তিনি পুলিসের দারগা ছিলেন। দারগগিরির জৌলসে তিনি নিজেও বিস্তর সম্পত্তি করিয়াছিলেন। এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়িয়া তাঁহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হয়—সম্পত্তিও তাহাতে অনেক বাহির হইয়া যায়। তারিণী ক্রমান্বয়ে তিন পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্রই আমাদের নগেন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় পক্ষের কোন সন্তান নাই। এখন তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ও তাহার দুই পুত্র বর্ত্তমান।

তারিণীচরণ এবার তর্করত্নের উপর কিস্তি চালিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন—যেরূপেই হউক তাহাকে সমাজ চ্যুত করিতেই হইবে।

গ্রামে দলাদলির একটা সূত্র পাওয়া গেলেই তাহাকে উপকরণ সংযোগে স্থূল দড়িতে পরিণত করিতে অধিক সময় বা অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। প্রতি পক্ষ দুর্ব্বল হইলে সমস্যা সহজেই মীমাংসা হয়, আর উভয় পক্ষে পরামর্শ দাতা জুটিলে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিয়া সমাজের পুষ্টি সাধন করে ও তাহার সবল অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে থাকে।

গ্রাম্য দলাদলিতে কোন পক্ষেই লোক জনের এবং পরামর্শের অভাব হয় না—তাহা সুপরামর্শই হউক আর গ্রামে দুই দল হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ সমাজ তর্করত্নকে আটক দিলে কায়স্থ, বৈদ্য ও শূদ্র সমাজ তর্করত্নের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন।

জগবন্ধু বাড়ী আসিয়া সমস্তই অবগত হইলেন। অশিতিপর বৃদ্ধ রমণ ভাণ্ডারী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহাকে সমস্ত খটকা বুঝাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দী কালের পীরপুর সমাজের দলাদলির ইতিহাস বিবৃত করিলেন। শুনিয়া জগবন্ধু বলিলেন—"সমাজে আপাততঃ কোন ক্রিয়া কাণ্ড উপস্থিত না হইলে কে, কাহাকে, কাহার সমাজ হইতে, কি উপায়ে বাহির করিবে? অনর্থক ঝগড়া ডাকিয়া আনা সঙ্গত নহে;—দেখা যাউক কি হয়। আপাততঃ চুপ করিয়া থাকিয়া তারিণী মুখুর্য্যার কার্য্য লক্ষ্য করা যাউক। সমস্যা নিকটবর্ত্তী হইলে তখন কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রবিবার ৩টায় নগেন্ শৈলেনদের মেসে আসিয়া দেখিল শৈলেন বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে, আর তাহার পার্শ্বে বসিয়া আশা আর্ট জার্ণালের পাতা উল্টাইয়া ছবি দেখিতেছে।

নগেন কে দেখিয়া আশা কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বলিল—"আপনার বাসা কত দূরে নগেন্ বাবু?"

নগেন বলিল "এই যে নিকটেই; তুমি কখন আসিয়াছ? শৈলেন ঘুমাইতেছে কতক্ষণ?"

শৈলেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে শয্যায় শয়ান থাকিয়াই হাত পা মেলিয়া শরীরকে দীর্ঘে মুচ্ড়াইয়া উঠিয়া বসিয়া নিদ্রার কৈফিয়ত দিল—"কাল রাত একেবারে বসিয়া কাটাইয়াছিলাম, একটা ডিয়ুটী (duty) ছিল। তুমিতো এই আসিলে! আশা রায় কখন হে?"

"আমি আপনার এই টাইমপিসের ১টা ৪৭ মিনিটে আসিয়াছি।"

"বেশ, বেশ, বসো।" বলিয়া শৈলেন ঘটী হাতে লইয়া বাহিরে গেল।

নগেন আশাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"কি হে আশা

আশা সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"সে তো শৈলেন দাদাই দিলেন। আপনি তো আর আমাদের বাড়ী গেলেন না?"

"তুমিও তো আমাকে নিয়ে যাইতে আসিলে না!"

আশা ভাবিল, শৈলেনের নিকট তাহাকে দেখিয়াই বুঝি নগেন বাবু তাহাকে একথা বলিলেন।—সে কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"আপনার ঠিকানা তো আমাকে বলেন নাই, শৈলেন দাদা আর্ট জার্নাল নিতে বলিয়া আসিয়াছিলেন—চলুন না আপনার বাসাটা দেখিয়া আসি।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"তা বেশ, শৈলেন আসুক, তারপর চল যাই, তোমাদের বাড়ীর ওঁরা সব আছেন কেমন? আমাদের কথা—"

নগেনের মুখে কথা আটকাইয়া গেল।

আশা বলিল—"সকলেই ভাল আছেন। আপনারা তো আর গেলেন না; চলুন না আজ যাই। বাবা, মা প্রায়ই তো আপনাদের কথা বলেন।"

নগেন আর কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে ছিল, পারিল না। কেবল বলিল—"তবে, আমাদের বাড়ী যাবে, না তোমাদের বাড়ী যাব?"

"চলুন—আজ আমাদের বাড়ীতেই যাই; আমি অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছি—আধ ঘণ্টার জন্য আসিয়াছিলাম—"

"এই সময় মুখ ধুইয়া শৈলেন ঘরে প্রবেশ করিল। আশা বলিল—"শৈলেন দা আমাদের বাড়ী চলুন!"

"কেন হে?"

"যাইতে নাই কি?"

নগেন আশার পক্ষ হইয়া বলিল—"বেচারা আধ ঘণ্টার ছুটী লইয়া আসিয়াছিল—তুমি দুই ঘণ্টা করিলে।"

"আচ্ছা তবে চল—এই তোমার আর্টজার্ণাল দু খানা লও।" বলিয়া শৈলেন চিরুণী লইয়া কেশ বিন্যাসে রত হইল।

নগেন ও শৈলেন রবিবার বিকালে একবার দুর্গাদাস বাবুর বাড়ী যাইবে স্থির করিয়াছিল। আশার অনুরোধ উপলক্ষ মাত্র।

স্মৃতির বিচার।

(Shelley's to the music হইতে)

গীতের লহর চাহে চিরকাল গীতের সাথেই হইতে শেষ,
স্মরণে কিন্তু প্রতি পলে পলে বাজি উঠে তার সুরের রেশ।
মল্লিকা তা'র মরণ সাঁঝে মৃত্যু আঁধারে অঙ্গ ঢাকে,
অমিয় মধুর গন্ধ টুকু মন্দ অনিল জড়ায়ে রাখে।
গোলাপ যখন শুকায় শোকে পাপড়ী হয়ে ধুলায় ঝরে,
প্রেমিকা তাহে কুঁড়িয়ে রাখে শয্যাপাশে যত্ন করে।
প্রিয়ার মরণ মর্ত্তে কভু হয়না প্রেমিক পরাণ মাঝে,
সুখের স্মৃতি ভুলিয়ে তারে মত্ত রাখে সকাল সাঁঝে।

প্রমোদচন্দ্র চৌধুরী।

ইতিহাসের কয়েকটী কথা।

বর্ত্তমান সময় ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ নানাবিধ গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা অতীত ভারতের গৌরবময় যুগের বিস্মৃত কাহিনী—রীতি-নীতি ও সভ্যতার আদর্শ পুনরুদ্ধার করিয়া আধুনিক উন্নত মার্গে প্রতিষ্ঠিত জাতি সমবায়ের সমক্ষে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই শুভ প্রচেষ্টার ফলে বর্ত্তমান সভ্য জগতের সমক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে যে আধুনিক সভ্যতার লীলাভূমি নবীন আমেরিকা এবং প্রাচীন ইউরোপ যখন মহারণ্য বক্ষে লইয়া কেবল অরণ্যের পশু পক্ষী ও বর্ব্বর জাতির আবাস স্থলে পরিণত ছিল, তাহারও বহুপূর্ব্ব হইতে এই আর্য্যভূমিতে সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিষয়ে অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপিত ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে মধ্যযুগে ভারতের কীর্ত্তিগৌরব আধুনিক সভ্য সমাজের নিকট যাঁহারা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন, সেই সকল নৃপতি কিংবা মহাপুরুষগণের ইতিবৃত্ত বিশেষভাবে ও বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া এখনও প্রকাশিত হইতেছে না, অথচ সেই সকল মহাপুরুষের কাহিনী জানিবার আবশ্যকতা প্রতিদিন অনুভূত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে একটা কথা সকলেই বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধযুগের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই আমাদের সামাজিক, কেবল সামাজিক কেন, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ও স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া সর্ব্বপ্রকারে জাতীয় সংহতি শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ কথাটা এইরূপ দাঁড়ায় যে ধর্ম্ম ও সমাজের শক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তদানীন্তন মহাপুরুষগণ রাজনীতির দিকটা অবহেলা করিয়াছিলেন অথবা প্রাচীন রীতি নীতির উপর প্রতিষ্ঠা রাখিয়া যখন নূতন করিয়া কিছু কড়াকড়ি ভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন হইতে আমাদের সমাজে যে জাতি বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠে, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও আমাদের সংহতি শক্তি লুপ্ত হইয়া যায় এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের সময় হইতেই আমাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ আরও একটি কথা এখন আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে ; একদল তার্কিক বলেন যে ভারতবর্ষ অতীতকালে যতই কেন উন্নতির মার্গে আরূঢ় হইয়া থাকুক না কেন তথাপি প্রাচীন আর্য্যজাতির রীতি নীতি ও শাসন পদ্ধতিতে একটা কোথাও এমন দোষ ছিল, যে কারণে ভারতবর্ষ যখনই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সামরিক শক্তির সহিত সংঘর্ষে আসিয়াছে, তখনই ঐ পাশ্চাত্য শক্তির নিকট আর্য্যশক্তি পরাভব স্বীকার করিয়া বিজয়ীর বিজয়-বৈজয়ন্তী আপন স্কন্ধে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে এই সকল অভিযোগ বড়ই গুরুতর এবং কঠিন বিচার সাপেক্ষ। আমাদের প্রবন্ধের বিষয় বহির্ভূত হওয়ায় আমরা এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় বিরত রহিলাম, কিন্তু অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব।

যদি একটা জাতি আপনার শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগ দ্বারা বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে, এবং সেই জাতিতে প্রতি শতাব্দীতে যদি এইরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি আবির্ভূত হইয়া সুবৃহৎ রাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন, তবে সেই জাতিকে কি রাষ্ট্রীয় হিসাবে মৃত কিংবা বিধ্বস্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়? বৌদ্ধ যুগের অবসান কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের গৌরব যুগ চলিয়াছিল ইহা স্বীকৃত সত্য। এখন দেখিতে হইবে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যখন পতন আরম্ভ হইল, তখন হইতে এইরূপ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা এবং দ্বিতীয় কথা এই যে এই সকল রাজত্বের কোনটি আধুনিক সভ্যতার সহিত কিংবা বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল কি না?

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে এই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহু প্রতাপশালী নৃপতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সসম্মানে বৈদেশিক কিংবা আভ্যন্তরিক বিজিগীষু মহারথীগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বিধ্বস্ত করিয়া স্বীয় বিজয় পতাকা সগর্ব্বে উত্তোলন করিতেছিলেন। এই ধারাবাহিক ইতিহাসে নিম্নলিখিত কয়েকটী যুগ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

(১) খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত মৌর্য্য সাম্রাজ্য, এই বংশে মহাপুরুষ অশোক জন্মগ্রহণ করিয়া সুদূর আফগানিস্থান হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ;

(২) খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য,—এই বংশে ভারতের নেপোলিয়ান সমুদ্রগুপ্ত, বিদ্যানুরাগী চন্দ্রগুপ্ত, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহারা হূনগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া আর্য্যধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সার্ব্বভৌম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ;

(৩) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সর্ব্বজনবিদিত বর্দ্ধন বংশের গৌরবে বিশেষতঃ হর্ষবর্দ্ধনের কীর্ত্তিসমূহ যেন ভারতের লুপ্ত গৌরবের পুনরায় জয় ঘোষণা করিয়াছিল ;

(৪) খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট ও চালুক্যবংশে নররাজ গোবিন্দ, বীরাগ্রগণ্য দ্বিতীয় পুলকেশী প্রভৃতি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সগৌরবে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন ;

(৫) ভারতের সমুদ্র উপকূলে দক্ষিণ সীমান্তে নবম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চোলবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে রাজরাজনন্দন রাজেন্দ্র চোল (১০১৩—১০৪২) কলিঙ্গদেশ, দক্ষিণ লাটদেশ, বাঙ্গাল দেশ জয় করিয়া মহাবীর বঙ্গেশ্বর ধর্ম্মপালের মনেও ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়ভেরী নিনাদিত হইয়াছিল ;

(৬) খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গের পাল ও সেনরাজবংশ,—এই পালবংশের সম্রাট ধর্ম্মপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন এবং এই পালবংশেরই নরপতি গৌড়াধিপ দেবপাল উৎকল প্রদেশের গৌরব বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং হূন গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দ্রাবিড়াধিপতি ও গুর্জ্জরাধিপতির পতাকা বাহুবলে অবনত করাইয়াছিলেন।

যাহারা অনুমান করেন ভারতের স্বাধীনতার ও গৌরবের ইতিহাস হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া কেবল মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিবর্গের রাজত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারাও দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদের এ অনুমাণ ভ্রমপূর্ণ। আধুনিক বঙ্গীয় ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সুসন্তানগণের উৎসাহে ও চেষ্টায় বঙ্গের পালরাজগণের, দাক্ষিণাত্যের চোল রাজগণের এবং মধ্য ভারতের অধীশ্বর বিজয়নগরাধিপতি নরেন্দ্রবর্গের যে ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে মধ্যযুগের বিজয়ী মহাপুরুষ বিজয়নগরাধিপতিগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও পালরাজগণ ও চোলদেশাধিপতিগণ সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনায় কৃতকার্য্য হইয়া সুবিশাল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সম্মানে, আধিপত্যে, ক্ষমতায় এবং প্রতিপত্তিতে হর্ষবর্দ্ধনাদি কিংবা চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ইতিহাস, সামাজিক উন্নতির ধারা, ধর্ম্মের পরিপুষ্টি কিংবা বাণিজ্য ও শিল্পের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি যে সকল বিষয় অতীতের গৌরবের স্থল অধিকার করিয়াছিল তাহা বর্দ্ধনবংশের পতনের সঙ্গেই সপ্তম শতাব্দীতে বিলুপ্ত হয় নাই। পরন্তু যখন দিল্লী, আজমীর, লাহোর, গুর্জ্জর প্রভৃতি প্রদেশে রাজপুত মহীপতিগণ মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের উত্তর প্রদেশে শৌর্য্য, বীর্য্য ও প্রতাপের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মাতৃভূমি রক্ষাকল্পে প্রফুল্লবদনে আত্মোৎসর্গ করিতেছিলেন এবং শোণিত তর্পণে দেশমাতৃকার পূজা করিয়া আত্মসম্মান বর্দ্ধন করিতেছিলেন, তখনও একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পূর্ব্ব প্রদেশে পালরাজগণ এবং দক্ষিণে চোলরাজগণ আর্য্যভূমির সমৃদ্ধিভাণ্ডার—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও স্থপতি বিদ্যায় পূর্ণ করিতেছিলেন। সুতরাং পূর্ব্ব ও দক্ষিণের এই দুই রাজবংশকে সর্ব্বতোভাবে সার্ব্বভৌম নৃপতি হর্ষের কিংবা বর্দ্ধনরাজবংশের উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে—এখানে অনুমানের স্থান নাই।

(৭) চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতের দ্বাররক্ষক কাশ্মীর নরপতিগণের কীর্ত্তি ও কাহিনী সুন্দরভাবে "রাজতরঙ্গিনী" ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহা হইতে হরিরাজ, ললিতাদিত্য, জয়াপীড় প্রভৃতি মহাপুরুষগণের বিজয়গাঁথা পাঠ করিলে মনঃপ্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

(৮) খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিজয়নগরাধিপতিগণের রাজত্ব। দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রদেশের প্রতাপশালী নরপতিগণের প্রমাণযোগ্য ইতিহাস অদ্যাবধি বিশদভাবে লিখিত হয় নাই। যখন বিজয়ী মুসলমান মহাপুরুষগণ দুর্জ্জয় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া প্রবল বন্যার ন্যায় ক্রমে ক্রমে ভারতের উত্তরখণ্ড অধিকার করিতেছিলেন এবং অবশেষে দাক্ষিণাত্যের উপর লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তখন তদ্দেশ বাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু নরপতিগণ আনেগুণ্ডি প্রদেশের নরপতির পতাকার নিম্নে সমবেত হইয়া মুসলমান আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিয়াছিলেন। আনেগুণ্ডি অধিপতি ক্রমে ক্রমে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়

কৃষ্ণদেব রায় প্রভৃতি মহীপতিগণ মন্ত্রণাগৃহে, যুদ্ধক্ষেত্রে, সমাজ প্রতিষ্ঠায় এবং মন্দিরাদি সংস্কার কার্য্যে উন্নত আদর্শের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা তদানীন্তন বৈদেশিক পর্য্যটকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।

(৯) অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাধোজী সিন্ধিয়া, বাজীরাও, বালাজী বাজীরাও প্রভৃতি পেশোয়াগণ কি অদ্ভুত বীরত্বের সহিত বিগ্রহাদি সংঘটন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন; এবং

(১০) অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহীশূরাধিপতি টিপু সুলতান রণ চাতুর্য্যে ও বুদ্ধি কৌশলে কেবল যে একটি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এমন নহে পরন্তু তাহাতে তদানীন্তন শক্তিশালী বৃটীশ ও ফরাসীজাতীর মনেও ভীতি সঞ্চার হইয়াছিল।

ইতিহাসের স্তর নিরূপণ ফলে আমরা বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দবংশ পর্য্যন্ত আলোচনায় বিরত রহিয়াছি এবং তৎপরেও সময়ে সময়ে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের কথাও আলোচনা করিলাম না, কারণ উক্ত নরপতি সমূহ প্রায়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদাই ইহা মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাদের ইতিহাসও অতি নগণ্য নহে।

সুতরাং দেখা গেল বৈদেশিক আক্রমণে প্রতিহত হইয়া সর্ব্বদাই যে ভারতবাসী রাজন্যবর্গ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিলেন এমন নহে; পক্ষান্তরে ইতিহাসের বিস্মৃত পৃষ্ঠাগুলি একটি একটি করিয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অতীত কালে দারায়ুস, আলেকজেন্দার প্রভৃতি মহারথিগণ ভারত আক্রমণ করিলেও ভারতের রাজন্যবর্গের অসীম বীরত্বের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপনের লিপ্সা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শক ও হুনগণ বারংবার আর্য্যভূমি আক্রমণ করিলেও অবশেষে সাম্রাজ্য স্থাপন তো দূরের কথা পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে তাহাদের জাতীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমান সম্রাটগণও উত্তর প্রদেশে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া যে পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে রাজগণকে পরাভূত না করিয়াছিলেন, ততদিন দিল্লির সিংহাসনে নির্ব্বিঘ্নে উপবিষ্ট হইতে পারেন নাই। সম্রাট আলাউদ্দীন খিলীজির সেনাপতি মালিক কাফুর "৩১২টী হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব, এবং ৯৬,০০০ মন স্বর্ণ এবং বহুবিধ রত্ন মুদ্রাদি" দাক্ষিণাত্য অভিযানের "দ্রব্যাদি স্বীয় প্রভুকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন" (ফিরিস্তা) এরূপ লুণ্ঠন সত্ত্বেও প্রায় দুই শত বর্ষকাল বিজয় নগর-হিন্দু রাজত্বের উপর আলাউদ্দীন আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। এবং পর্ত্তুগীজ বণিকগণও কোনও কৌশলেই বিজয় নগরে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই। এই সকল বিষয় বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, বিজয়োন্মত্ত বিদেশীয় মহাপুরুষগণ আক্রমণ করিবা মাত্রই যে আর্য্য অধিবাসীবৃন্দ ভারতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আগন্তুককে সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাহাদিগের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন—এই কথা সত্য নহে; পক্ষান্তরে বৈদেশিক আক্রমণকারীর পুনঃ পুনঃ পরাভবের চিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন হুনবিজয়ী দেবপালের নাম কল্পনার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে; কুমার গুপ্ত, শশাঙ্ক প্রভৃতি নরপতিগণ নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছেন, বিজয় নগরের রাজ্যের ইতিহাস "Forgotten Empire" পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। ফলে ভুলিতে ভুলিতে আমরা একটা "আত্ম বিস্মৃত" জাতি হইয়া পড়িয়াছি; আমাদের জ্ঞানের, আমাদের বিজ্ঞানের, আমাদের বীরত্বের অর্থাৎ আমাদের বিশেষত্ব যাহা কিছু ছিল, সকল বিষয়ের কথাই আমরা ভুলিয়াছি। আমরা তথা কথিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত যে ইতিহাস পাঠ করিতেছি, তাহা ভারতের জাতীয় সম্পত্তি নহে; উহাতে ভারতের গৌরব গাথা তো গীত হয়ই নাই, পরন্তু ভারতবাসীর অবসাদের ও আত্মদ্রোহের বিচিত্র চিত্র এমন নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, যে সেই বিকৃত বিবরণী পাঠ করিয়া ভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতা বলিতে শিখিয়াছে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার অষ্টাদশ অশ্বারোহী মাত্র সমভিব্যাহারে "নোদীয়া" আক্রমণ করিলে তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া অশীতিপর বৃদ্ধ "রায় লখমনীয়া" পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু ইতিহাস লেখক কেহই বিচার করিলেন না যে মিনহাজের "বিশ্বাসী লোকের" বিবরণ কতদূর সত্য কিম্বা "নোদীয়া" কোনও সময়ে বাঙ্গালার অধীশ্বরের আবাসভূমি ছিল কি না, কিম্বা বখ্‌তিয়ারের বিজয়কালে লক্ষ্মণসেন জীবিত ছিলেন কি না? যাহা হউক, ইহাই এখন আমাদের বিকৃত বিচিত্র ইতিহাস!! এইরূপ কত ঘটনার উল্লেখ করা যায়। বর্দ্ধন বংশের অপতিহত প্রতাপের গতিরোধ করিয়া যিনি বৌদ্ধধর্ম্মে ভ্রিয়মান্ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ জাগরণ করিয়াছিলেন সেই কর্ণসুবর্ণাধিপতি শশাঙ্ক বিদেশীয় পর্য্যটকের নিকট 'দুষ্টাত্মা' বিশেষণে ভূষিত হইয়াছেন, "বঙ্গের শেষবীর" প্রতাপাদিত্যও বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত হইতেছেন এবং শিবাজীও দস্যু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এইরূপ ইতিহাস পাঠ করিলে জাত্যাভিমান জাগ্রত হয় না, মনে শক্তির সঞ্চার হয় না, আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় না, নিজের কার্য্যদক্ষতার উপর বিশ্বাস থাকে না। এইরূপ ইতিহাস পাঠ করিলে "আত্মবিস্মৃত"ই হইতে হয়। এত শত ঘটনা ইতিহাসে বর্ণিত থাকিতেও "ভারতের ইতিহাস" প্রণেতা Vincent Smith লিখিয়াছেন "India remained unchanged; She continued to live her life of isoletion" যেন ঘাত প্রতিঘাতেও ভারত পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধনাদি দ্বারা নিজকে গড়িয়া তুলিতে পারে না; Mathew Arnold লিখিয়াছেন:—

"The East bowed low before the blast;
In patient deep disdain;
She let the legions thunder past;
And plunged in thought again"

যেন রাজনীতি ক্ষেত্রে উদাসীন থাকিয়া, বৈদেশিক শক্তির নিকট মৌনে পরাভব স্বীকার করিয়া, ভারত গভীর ধ্যানে পরমার্থ বিদ্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়া পার্থিব চিন্তা বিনা বাক্যব্যয়ে ত্যাগ করিল। ইহাই কি ইতিহাস? বৈদেশিক মনীষিগণের ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে আমাদিগের কতকগুলি বদ্ধ সংস্কার জন্মিয়াগিয়াছে—যাহাকে Historical Orthodoxy বলা যায়, ইহা ইতিহাস পাঠের একটা গুরুতর বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগকে সেই সকল বিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোনও ঘটনাকে বিচার পূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে—আমাদের ইতিহাস গঠিত হইবে না, জাতির শক্তির পুনর্গঠনও হইবে না। সত্যবটে 'Nation makes history' কিন্তু তদপেক্ষা অনেক সত্য "History makes nation"

বড়ই আশার কথ যে আধুনিক শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধার ও জাতীয় শিষ্টতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা সাড়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাস ক্ষেত্রেও একটা আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফলে আমাদের সম্মুখে এত বিবিধ বিষয় উপস্থিত হইবে যে কে, কি, রামস্বামী আয়েঙ্গার মহোদয়ের মত Lord Acton এর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে হয় যে এখন "Less danger of a draught than of a deluge".

শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

অজানা দেশ।

(দুর্ভিক্ষ চিত্র)

আষাঢ় মাস। মধ্যাহ্ন কাল, প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে সমস্ত রামপুর গ্রাম খানি যেন খা খা করিতেছে, মাঠের শ্যামল তৃণ পর্যন্ত সূর্য-উত্তাপে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। বৃষ্টির কণা মাত্র নাইগ কৃষককুল ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় পাগল প্রায় হইয়া উঠিয়াছে; চাষ আবাদ বন্ধ। উপায় নাই।

রামপুর গ্রামে খোরসেদ সেখের বাস। তাহার কিছু জমি আছে, তাহাই চাষ আবাদ করিয়া এ পর্য্যন্ত দিন গুজরাণ করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এখন দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

মা সরস্বতীর সহিত খোরসেদের পূর্ব্ব পুরুষের কোন সম্বন্ধ ছিল না, সুতরাং সেও আর নূতন করিয়া ঐ দেবীর সহিত কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করা সঙ্গত মনে করে

নাই। সে তাহার বাপ দাদার মত ঘর গৃহস্থালী করিয়া, [illegible]দের সে সনাতন প্রথা বজায় রাখিয়া, সেই গোরক্ষণ—চাষের কাজ প্রভৃতিই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম—এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

সে যখন ছোট ছিল, তখন প্রাতঃকালে উঠিয়া বিশেষ কোন কাজ করিত না। একটু বেলা উঠিলে 'পান্তা' ভাত ও যাহা কিছু 'ছালুন' থাকিত তাহাই মুখে গুঁজিয়া গরুর পাল লইয়া মাঠে যাইত। মাঠে গরু চড়াইয়া, তামাকু ভরিয়া বেশ সুখে সময় কাটাইত। আড়াই প্রহর বেলার সময় বাড়ী আসিয়া তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া আবার মাঠে যাইত, অপরাহ্নে গরুর পাল লইয়া বাড়ী আসিত। তারপর সন্ধ্যার পর গ্রামের রায় বাড়ীতে খুঞ্জরী বাজাইয়া গান বাজানা করিত। রাত্রি দেড় প্রহরের সময় নিদ্রা যাইত। এইরূপে তার দিন কাটিয়া ছিল। তারপর যখন বড় হইল, তখন বাপ খুড়ার সহিত তাহাদের চাষ আবাদ কাজে সহায়তা করিত।

খোরসেদ পিতার একমাত্র সন্তান, সুতরাং আবদুল ও তাহার পত্নী ছেলেকে বড়ই ভালবাসিত, ছেলের জন্য কত কি আনিয়া দিত। খোরসেদও পিতামাতার আজ্ঞাবহ ছিল। জমির যাহা আয় হইত, তাহাতে তাহাদের ছোট সংসার খানা বেশ সুখেই চলিতেছিল।

এক বৎসর খুব সু জন্মা হইল। কৃষকেরা বলিল, গত পঁচিশ বৎসরেও এমন শস্য জন্মে নাই। সেবার ধান বিক্রয় করিয়া আবদুল দুই পয়সা ঘরে আনিল। বাড়ী খানা একটু বেশ মেরামত করিয়া দুই খানা নূতন ঘর তৈয়ার করিল। পর বৎসরও পাটের দর বেশ চ'ড়া হইয়া উঠিল। আবদুল এবারও কিছু নগদ টাকা হাতে পাইল। এইবার তাহার স্ত্রী ধরিয়া বসিল, যে এই বার ছেলের বিবাহ দিতে হইবে। ছেলেত আর এখন নাবালক নহে, তাহার বয়স আঠার পার হইয়াছে। শরীরের কথা বলা যায় না, কখন কি হয়।

একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য আবদুলের স্ত্রী স্বামীকে বড়ই চাপিয়া ধরিল। আবদুল পত্নীর এই সঙ্গত প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে পারিল না। অনেক অনুসন্ধান করিয়া আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গৃহস্থের বয়স্থা সুন্দরী কন্যার সহিত ৮০৲ টাকা নগদ পণ দিয়া খোরসেদের বিবাহ স্থির করিল।

টাকার গরম অনেকেই সহ্য করিতে পারে না। যে পারে সে সংসারে কৃপণ বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমাজ তাহাকে হেয় চক্ষে দেখিতে সাহস পায় না; আর যে পারে না, সে সমাজে সম্মান বাড়াইবার জন্য হাতের টাকা খরচ করিয়া দিনে দিনে হেয় হইয়া পড়ে, ও পুরুষানুক্রমে ফল ভোগ করিয়া থাকে। আবদুলেরও তাহাই হইল। সে একমাত্র পুত্র খোরসেদের বিবাহে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিল। ধান ও পাট বিক্রয় করিয়া যে ২১৩৴১৫ আনা পাইয়াছিল তাহাতে তাহার ষোল আনা ব্যয় কুলাইয়া উঠিল না। সে গ্রামের মহাজন হরকিশোর দাস হইতে মাসিক শতকরা ২॥০ টাকা সুদে আরও দুইশত টাকা ধার করিল। আবদুল মনে করিল, এবার যেরূপ পাট পাইয়াছি, আর দুই বৎসর এরূপ পাট পাইলেই মহাজনের ধারত শোধ হইবেই, অধিকন্তু বাড়ীর পূবের ভিটায় এক খানা বড় টীনের ঘরও হইবে।

যথা সময়ে বিবাহ হইয়া গেল। গ্রামের অনেক আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া বিবাহে যোগদান করিল। আবদুল মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিল। সকলে বলিল, হাঁ বিবাহে খুব ঘটাই করিয়াছে। আবদুলের সাতটা, পাঁচটা ছেলে নাই, এই এক ছেলে খোরসেদ। তাহার বিবাহে এই রকম দুই পয়সা ব্যয় না করিলে কি ভাল দেখায়?

আবদুল এই অর্থব্যয় সার্থক মনে করিল।

মানুষ ভাবে এক, বিধাতা ঘটান আর। আবদুল মনে ভাবিল, আগামী দুই বৎসরও খুব শস্য হইবে, তাহার ধার শোধ হইবে, তাহার পূবের ভিটায় বড় টীনের ঘর উঠিবে। যিনি মানুষের সকল ভাবনা অলক্ষ্যে বসিয়া দিনরাত ভাবিতেছেন, তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন অন্য প্রকার। আবদুলের আশায় ছাই পড়িল। পর বৎসর ইয়ুরোপে মহাসমর আরম্ভ হইল। পাট আর কেহ ধরিল না। ২৲।১॥ টাকা মনে পাট বিক্রয় হইতে লাগিল। আবদুল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া

পড়িল। ক্ষেতে যে কিছু শস্য জন্মিল, তাহাতে সম্বৎসরের খোরাকী চলাই ভার হইল। শুধু আবদুল বলিয়া নয় সকলেরই মুখে এক কথা—এবার কি উপায় হইবে?

বিপদ কখনও একা আসে না। বিপদ হইয়াই বিপদ আসে, ইহাই বিধাতার বিধি। এই সময় একদিন আবদুলের জ্বর হইল। জ্বর হইয়াছে, তার আর কি? দুই এক দিন উপবাস দিলেই সারিয়া যাইবে। গরীব মুসলমান জ্বরে কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজ ডাকেও না, ডাকার তাহাদের সামর্থ্যও নাই। তাহারা জ্বরে ভোগে, উপবাস করে, পাড়ার মাতব্বর লোকে যাহা বলে, তাহা খায়, সেই সকল টোট্‌কা ব্যবহার করে। বড় বেশী হইলে পোষ্টাপিস হইতে দুই পয়সার কুইনাইন আনিয়া খায়, শেষে পরমায়ু থাকিলে বাঁচিয়া উঠে। নতুবা জীবলীলা শেষ হয়। আবদুলের জ্বরেও সেই ব্যবস্থা হইল। দিন দুই উপবাসের পরও যখন জ্বর গেল না তখন প্রতিবেশী বৃদ্ধ রহিম মণ্ডল কি একটা টোটকা দিল ও দুই দিন আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িয়া দিল। তাহাতেও জ্বর গেল না, বরং আরও বাড়িয়া উঠিল। তারপর এক দিন রাত্রিতে আবদুল সকলকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

সংসারে মাতা ও যুবতী পত্নী, ঘরে অন্নাভাব, সর্বোপরি মহাজনের ঋণ। খোরসেদ বড় বিপদ গণিল। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। এই দুঃখ ও বিপদের সময় প্রতিবেশীরা সকলেই মুখে সহানুভূতি দেখাইল। সকলেই বলিল "মাথার উপর আল্লা আছেন।" এই প্রাণিগুলিকে ভাতের অভাবে মারিবেন না।" আশ্বাস বাক্যে খোরসেদ মনে বল পাইল।

যথা সময়ে দুইটী ভালগরু বিক্রয় করিয়া খোরসেদ পিতৃকার্য্য শেষ করিল। মহাজন ইহার মধ্যে দুই দিন টাকার তাগাদা করিয়া গিয়াছেন। খোরসেদ বলিয়া দিয়াছে দাস মহাশয় টাকা মারা যাইবেনা, তবে কিছু দেরী হইবে। আমি বাকির ধার রাখিব না, যেমন করিয়া হউক শোধ করিব।" কিন্তু কেমন করিয়া যে সে সংসার প্রতিপালন করিয়া ধার শোধ দিবে, তাহা

কৃষক পল্লিতে অনেকেরই সে বৎসর অতি কষ্টে দিন চলিল। যাহাদের কিছু ধান সঞ্চিত ছিল, তাঁহাদের একরকমে বৎসর কাটিল, যাহাদের সঞ্চিত কিছুই ছিল না, তাহারা ২।৪ টা গরু বেচিল, কেহবা ঘটি বাটী বন্ধক দিয়া কোন প্রকারে দিন চালাইল। খোরসেদের তিনটী গরু ও বাড়ীর দক্ষিণের ভিটের ঘর খানা এই দুর্দ্দিনে ক্রেতার বাড়ীতে গেল। উপায় নাই। সপরিবারে ত আর না খাইয়া মরিতে পারে না। সকলে ভাবিল, আগামী বৎসর অবশ্যই কিছু জন্মিবে; কিন্তু পরের বৎসরও অজন্মা হইল, মাঠের ধান গাছ মাঠেই শুকাইয়া গেল। এক বিন্দু বৃষ্টি হইল না। চারিদিকে হাহা-কার উঠিল। কেমন করিয়া দিন পাত করিবে ভাবিয়া কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া বসিল। রামপুর পল্লির অধিকাংশ কৃষকই মহা বিপদ গণিল। খোরসেদ শেষে দিন-মজুরী আরম্ভ করিল।

(২)

কালের ক্রোড়ে আরও তিন বৎসর গড়াইয়া পড়িয়াছে। খোরসেদের মাও সেই আহ্বানের মুখে যথারীতি সাড়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখনও তাহার সংসারে তিনটী প্রাণী। লাঙ্গল ধরিয়া চাষ আবাদ করিয়া সুখে না হউক, শান্তিতে না হউক, কোনরূপে তাহার দিন পাত হইতেছিল। খোরসেদের স্ত্রী তাহার অনুগতা এবং একান্ত সুশীলা। সমস্ত দিন পরিশ্রমেও তাহার মুখে কথাটী ছিল না। রূপ অপেক্ষা তাহার স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য অধিক মাত্রায় ফুটিয়া উঠিত। খোরসেদের আকর্ষণ ঠিক নেশার মত ছিল, কিন্তু সেজন্য কোন দিন তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

যৌবনের মোহ দীর্ঘকাল থাকে না, এবং সংসারের সুখও ক্ষণ স্থায়ী। মালেকার অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই। বিশ বৎসরের সময় তাহার পুত্র সামসু ভূমিষ্ঠ হইল।

ষষ্ঠী দেবী অনেক সময় মানুষের উপর অযাচিত ভাবেও কণ্টক বাড়াইবার জন্য অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন। সামসু ভূমিষ্ঠ হইবার এক বৎসর পরে খোরসেদের একটী

সাধ হইল কন্যাকে দুই গাছি বালা প্রস্তুত করিয়া দেয়, কিন্তু খোরসেদ তার সে সাধ পূর্ণ করিতে পারেন না। ঋণে সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। মহাজন যখন তখন তাহাকে বলিয়া থাকে—খোরসেদ দেনা শোধের কি করিয়াছ. সুদে আসলে যে অনেক টাকা হইয়া গেছে, তোমার বাড়ী ঘরেরও ত জীর্ণ দশা আমি আর এত টাকা ফেলিয়া রাখিতে পারিব না। যদি সত্বর টাকা শোধ না দেও, তবে আমাকে বাধ্য হইয়া আদালতের আশ্রয় নিতে হইবে।"

খোরসেদ সবিনয়ে বলিত "আর দু চার মাস অপেক্ষা কর, আসে চৈতে তোমার সব টাকা শোধ করিব।" কিন্তু শোধ যে কোথা হইতে হইবে, তাহা খোরসেদ বুঝিত না, দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ শুকাইয়া যাইত। সেইরূপে তাহার মনের প্রফুল্লতা, উৎসাহ, উদ্যম—সব চলিয়া গেল।

যুদ্ধ থামে নাই সুতরাং দেশের এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত একটা অভাবের সাড়া পড়িয়াছিল। এই দুর্ভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। পর মুখাপেক্ষীর যাহা হয়, বাঙ্গালার সে সময় সেই দুর্গতি ঘটিল। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, তৈল নাই, ঘরে দীপ জ্বালাইবার উপায় পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। যে শ্রমজীবি দৈনিক আট পয়সা উপার্জ্জন করে, তাহাকে সুজন্মার বৎসরও চারি টাকা মনে চাউল কিনিয়া সংসার চালাইতে হয়। খোরসেদ দেখিল এক মন মোটা চাউল কিনিতে ৯৲ টাকার কমে হয় না। প্রত্যেক রোজ এক বেলা খাইলেও তাহার মাসে এক মন চাউলের কম চলিতে পারে না। কিন্তু কোন মাসে সে পাঁচ ছয় টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। ক্রমে এমন হইল যে তাহার দুই বেলা আহার চলে না।

মহাজনের পীড়াপীড়িতে উপায়ান্তর নাই দেখিয়া সে তাহার চাষ আবাদের সম্বল গরু ২টী ও বিক্রয় করিবে স্থির করিল কিন্তু তাহাতেও মহাজনের সুদের টাকার অর্দ্ধেক ও শেষ হইবে না। কিন্তু যে দুটী গরু ছিল, তার একটী গাভী, ও একটী বলদ। গাভীটী কিছু দুধ উপায় ছিল, কিন্তু কি করিবে সে? উপায় নাই। মহাজনকে বাধ্য রাখিতে হইবেতো? নতুবা যে সে ভিটা ছাড়া করিবে।

সে দিন রাত্রে খোরসেদ দুইটা কাঁঠালের কোষ মুখে দিয়া এক ঘটি জলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া শুইয়া তামাকু টানিতে লাগিল। মালেকা নিকটেই এক খানা মাদুর বিছাইয়া তাহার দুই দিকে দুইটী সন্তান লইয়া পড়িয়া আছে। তাহার আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, রুক্ষ কেশ, মলিন বস্ত্র, অন্নাভাবে দেহ শীর্ণ, চিন্তায় মন অবসন্ন। কেবল স্বামী ও পুত্রের মুখ চাহিয়া সে সকল যাতনা সহ্য করিত, কোন দিন রাত্রে সে মুষ্টি চাউল চিবাইয়া ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিত, কোন দিন হয়ত ঘরে চাউল থাকিত না দুটা একটা কাঁঠালের বীচি ভাজিয়া খাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিত। বাড়ীতে কয়টী কাঁঠাল গাছ ও কলা গাছ ছিল তাই রক্ষা।

(৩)

মা! মা! কোন শব্দ নাই। পাঁচ বৎসরের শিশু আবার ডাকিল 'মা'। তেমন নিস্তব্ধ। নিকটে মালেকা মাদুরে শুইয়াছিল। শিশু একবারে মায়ের পিঠের উপর আসিয়া পড়িল এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিজের মাথাটি মায়ের গায়ের উপর রাখিয়া তাহার কোমল কর পল্লবে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আধ আধ স্বরে বলিল? "মা তুমি কাঁদ। বাবা কি বক্‌ছে?"

মালেকা সত্য সত্যই কাঁদিতেছিল। এবার প্রবল বেগে চোখের জল তাহার দুই গাল বহিয়া ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে মাকে ভুলাইবার জন্য বলিল "মা বড় ক্ষুধা দুধ খাব।" মায়ের দুঃখ সমুদ্র আরো উথলিয়া উঠিল মালেকা ছেলেটিকে জড়াইয়া বুকে লইয়া বলিল "বাচা তুমি কেন এই হতভাগিণীর পেটে জন্মিয়াছিলে। আমি এমন পাপিষ্ঠা যে তোমাদের ভাই বোনকে পেট ভরিয়া দুই বেলা ভাত খাইতে দিয়াও বাঁচাইতে পারি না। আল্লা, তোমার মনে এই ছিল?

খোরসেদ দাবায় বসিয়া তামাক টানিতে ছিল, কলিকার আগুণ অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে; সহসা এই কথা গুলি তাহার শরীরে যেন একটা অগ্নি কণা ছড়াইয়া দিল—মনের মধ্যে তাহার যে কি ব্যথা লাগিয়াছিল, তাহা যাহারা দুই বেলা খাইতে পায়, তাহাদের অনুভব করিবার শক্তি নাই।

চারি বৎসরের শিশু দুধ চাহিয়া চাহিয়া মায়ের কোলের কাছে মাটীতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার মাথা মায়ের কোলের উপর ছিল; মালেকার অজ্ঞাতসারে কয়েক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু ছেলের মুখে গড়াইয়া পড়িল।

মেয়েটীর এখনও দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই। যত দিন গাভীটী ঘরে ছিল, যে দুধ টুকু হইত ছেলে মেয়েকে খাইতে দিত। এখন আর গরু নাই, একবার ভাত খাইয়া আর ছেলে মেয়ে থাকিতেও পারে না। তাই সে ভাতের ফেন খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল কোন দিন একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া, কোন দিন একটু গুড় গুলিয়া তাহা মিষ্ট করিয়া দিত। আজ রায় বাড়ীতে মালেকা একটু গুড় চাহিয়া আনিতে গিয়াছিল, বাড়ীতে আসিয়া দেখে, একটা কুকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার ফেন টুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

ছেলেটীর বুদ্ধি হইয়াছিল। সে বলিত—মা এ দুধ ভাল নয়, আমি এ খাব না। আমি আমাদের লাল গাইয়ের দুধ খাব। আমাদের লাল গাই কই গেছে মা, তাকে কে নিয়া গেছে, আমি তার দুধ খাব। মালেকার শুধু নিষ্ফল অশ্রু বিসর্জ্জন ভিন্ন আর এসকলের কি উত্তর দিবার আছে?

ভাদ্র মাসের মধ্যভাগে এক দিন খোরসেদকে সপরিবারে উপবাস থাকিতে হইল। মালেকা এ পর্য্যন্ত সকল কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। আজ আর পারিল না। রাত্রে কাতর ভাবে স্বামীর নিকট বলিল "এতদিনে বুঝি অনাহারে ছেলে মেয়ে দুটা মারা যাবে। আমরা না হয় না খাইয়া মরলাম, ছেলে মেয়ে দুটা যে মারা যায়, তার উপায় কি? ছেলেটী বলিল "মা কিছু খাইতে দে, পেটে যে বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। মেয়েটা তাহার মুখ দিয়া ক্রন্দন সরিতেছিল না। সে কোঁকাইয়া কাঁদিতেছিল, আর তার চক্ষু দুটী দিয়া অশ্রুধারা গাল বাহিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিন ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করিয়াই এমন অবসাদ আসিয়াছে। মালেকার উপবাসে উপবাসে কখানা অস্থি মাত্র অবশিষ্ট ছিল, স্তনে দুগ্ধ কোথা হইতে আসিবে?

মানুষ এ যাতনা চক্ষে দেখিতে পারে না। খোরসেদও পারিল না। বাহির হইয়া গেল। কতক্ষণ পরে সে কতকগুলি কচি বেল লইয়া আসিল। মালেকা তাহাই জলে সিদ্ধ করিয়া একটু লবণ মাখিয়া তাহার স্বামী ও পুত্রকে খাইতে দিল কিন্তু তাহার পেট ভরিয়া দিতে পারিল না। মালেকা নিজে উপবাস থাকিয়া মেয়েটীকে কোলে লইয়া সেই সিদ্ধ বেল একটু একটু তাহার মুখে দিতে লাগিল। খোরসেদ আহারান্তে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কিছু খাইলে না? মালেকা নীরব। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসায় সে মুখ নত করিয়া বলিল—"সবতো সিদ্ধ করি নাই, যে টুকু সিদ্ধ করিয়া ছিলাম তাহা আর নাই, সকালে উঠিয়া ছেলে মেয়ের মুখে কি দিব? তাই কিছু রাখিয়া দিয়াছি। আমার জন্য ভাবনা কি? ঘুমাইলেই রাত কাটিয়া যাইবে।" খোরসেদ কাতর ভাবে বলিল "একরাত কাটিলেই কি চলিবে? আবার যে রাত আসিবে। কাল কি করিয়া সংসার চলিবে?" খোরসেদ স্থির করিল যে প্রকারে হয়, কাল একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে; ছেলে মেয়ের প্রাণ বাঁচাইতে হইবে তো?

(৩)

প্রভাতে খোরসেদ কাজের সন্ধানে বাহির হইল। গত বৎসর প্রবল বন্যায় মাঠের সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়াছিল। এবার বৃষ্টির অভাবে বোর ধান্য প্রভৃতি না হওয়ায় দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। চাউল প্রতি মণ ৮৷৷০ হইতে ৯৲ টাকা। অধিকাংশ লোকেই আলু খাইয়া কোন প্রকারে দিন যাপন করিতেছে। দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। চারি পয়সা দিয়াও কেহ মজুর লয় না। দরিদ্র গ্রামবাসিগণ অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কাজ জুটাইতে

কাজের সন্ধানে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কাজ জুটাইতে পারিল না। তখন অবসন্ন প্রাণে গ্রামপ্রান্তে বসিয়া আপন ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিল, আর ভগবানকে ধিক্কার দিতেছিল। সহসা তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ও তৎসঙ্গে একটী অব্যক্ত ধ্বনি মধ্যাহ্ন বায়ুতে মিশিয়া গেল। সে কাতরকণ্ঠে একবার ডাকিল "এ আল্লা।"

মানসিক যন্ত্রণায় তাহার প্রাণ ছটফট করিতেছিল। গৃহে দুইটী শিশু ক্ষুধার তাড়নায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যদি সে কাছে থাকে, তাহা হইলেও তাহার কতকটা শান্তি হইতে পারে—ভাবিয়া সে ছুটিয়া বাড়ীতে চলিল।

বাবাকে আসিতে দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে বালক বলিল 'কি আনিয়াছ বাবা, দাও, আমার যে বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। আজ যে আর কিছু খাই নাই, এই দেখ পেট।' ছেলে তাহার পেট দেখাইল। বালিকাও পিতাকে দেখিয়া একবার সকাতরে চাহিল। কিন্তু সর্ব্বংসহা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি মালেকা কোন কথা বলিল না, একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মস্তক নত করিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিল। সে বুঝিয়াছিল, খোরসেদ খালি হাতেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কোন সংস্থান হয় নাই।

খোরসেদ আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার চক্ষু হইতে টস টস করিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। "আর সহ্য হয় না, আচ্ছা দেখি ভিক্ষা করিয়া দুমোঠা চাউল মিলাইতে পারি কি না ?"

খোরসেদ উন্মত্তের ন্যায় ছুটিল। বালক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হেলিয়া দুলিয়া দৌড়িয়া গেল, বলিতে লাগিল "বাবা আমাকে নিয়া যাও, বড় ক্ষুধা, আমাকে নিয়া যাও, আর কাঁদবো না, বাবা!"

বালকের কণ্ঠস্বর দূরে খোরসেদের কর্ণে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল। খোরসেদ আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিল—"এ আল্লা।"

মালেকা পাছে পাছে যাইয়া পথ হইতে পুত্রকে ঘরে প্রবেশ করিয়া ছেলেটীকে কোল হইতে নামাইয়া ফিরিল, তখন দেখিল ২।৩টী ভদ্র যুবক মাথায় চাউল লইয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত।

যুবক দুটী জিজ্ঞাসা করিল "খোরসেদ সেখের এই বাড়ী?"

প্রত্যুত্তরে মালেকা বলিল "হাঁ," তারপর আগ্রহের সহিত বলিল—বাবা তোমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছ?"

"আমরা তোমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছি। তোমরা কত জন? প্রত্যহ কতটা চাউল প্রয়োজন, আমরা জানিতে চাই।"

মালেকা তাহাদের কথা শুনিয়া হাতে যেন স্বর্গ পাইল। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, সজলনেত্রে স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল 'আমরা চারি জন।'

যুবকগণ যথারীতি চাউল রাখিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল আমরা প্রত্যহ আসিয়া তোমাদিগকে চাউল দিয়া যাইব। তোমরা ভয় করিও না, কোন চিন্তা করিও না। আমরা রামকৃষ্ণ মিসন হইতে আসিয়াছি। তাহারা অন্য পাড়ায় চলিয়া গেল।

মালেকার হৃদয় আজ যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তাহা বলিবার নহে। আজ সে যে পতি পুত্রকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতে পারিবে, ভুক্তভোগী ব্যতীত সে আনন্দ কে বুঝিবে?

মালেকা উঠিয়া হাঁড়িতে চাউল বসাইয়া দিল। ভাত হইলে ছেলে মেয়েকে বেশ করিয়া খাওয়াইয়া দিল। কিন্তু খোরসেদ যে এখনো ফিরল না? সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল; তথাপি খোরসেদ ফিরিল না, মালেকা উপবাসী পতির জন্য ভাত প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছে। খোরসেদ নাই। বুঝিবা স্ত্রীপুত্রের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সে কোন অজানা স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইল, তথাপি

ভাঙ্গিয়া পড়িল। অনাহারে অবসন্ন প্রাণে মালেকা বিছানা লইল। শেষ রাত্রিতে একবার মালেকা জাগিল, কিন্তু দেখিল তখনও খোরসেদ আসে নাই। মালেকার প্রাণ ছটফট করিতেছিল একবার উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, অবসন্ন প্রাণে পড়িয়া রহিল।

* * *

অনেক বেলাতে ছেলে মেয়ের আর্ত্তনাদে প্রতিবেশীরা আসিয়া যখন দরজা খুলিল, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, মালেকাও পতির সন্ধানে সেই অচেনা দেশে চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সঙ্কলন ও সংগ্রহ।

চিনির নূতন উপকরণ।

ইক্ষু, খেজুর, বিট, আলকাতরা, প্রভৃতি হইতে চিনি বহুকাল যাবত তৈয়ার হইতেছে; অধুনা কিন্তু এক অভিনব জিনিষ হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার জোগার হইতেছে। ইংলণ্ডে ইহার বিশেষ আলোচনা চলিতেছে, বোধ হয় ইহার ঢেউ ভারতেও আসিয়া পঁহুছিবে। এবার চিনি তৈয়ারের চেষ্টা হইতেছে— করাতের গুড়া হইতে, পূর্ব্বে উহা বোতল শিশি পেক্ করিতে কিম্বা বরফ অবিকৃত ভাবে দীর্ঘ সময় রক্ষা করিতে ব্যবহৃত হইত। প্রথমতঃ করাতের গুড়া হইতে মদ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা ছিল; কিন্তু আইনের ফেরে মদ তৈয়ার করা তত সহজ নহে মনে করিয়া উহা দ্বারা চিনি তৈয়ার করার চেষ্টা হইতেছে। করাতের গুড়া জল মিশ্রিত সালফিউরাস্ এসিডে জীর্ণ করতঃ ৬ কিম্বা ৭ বায়ব্য চাপের দ্বারা উহার শত করা ২৫ অংশ চিনিতে পরিণতঃ হয়, ইচ্ছা করিলে পচন ক্রিয়া দ্বারা এই চিনির ⅔ অংশ মদে পরিণত করা যায়।

সঙ্গীতে ব্যয়।

অর্থ ব্যয়ের দ্বারা দেশের অবস্থা বুঝিতে হইলে আমেরিকাকে সঙ্গীত প্রধান দেশ বলা যাইত। জন ফ্রিমাণ্ড বলিয়াছেন যে, সমস্ত যুক্ত প্রদেশে বৎসর ১২০,০০০,০০০ পাউণ্ড সঙ্গীতাদিতে ব্যয় হয়। আমেরিকাতে সামরিক ও নৌ সেনাতে মাত্র ইহার এক তৃতীয়াংশ খরচ হইয়া থাকে। যে জার্ম্মান দেশ সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ, তথায় সঙ্গীতাদির ব্যয়ের দশ গুণ সামরিক ও নৌ সেনাতে খরচ হইয়া থাকে। আমেরিকাতে সঙ্গীত ও বাদ্য যন্ত্রাদিতে ভজনালয়ে বৎসর ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ হইয়া থাকে। বৎসর ২৭,০০০,০০০ পাউণ্ডের পিয়ান, ২০০০,০০০ পাউণ্ডের অর্গেন, ১৩,০০০,০০০ পাউণ্ডের গ্রেমফোঁরেকর্ড ও ২,১০০,০০০ পাউণ্ডের সঙ্গীত পুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার শত করা ৭০ হইতে ৭৫ পাউণ্ড মহিলাগণ ব্যয় করিয়া থাকেন।

মনুষ্য শরীরের উপাদানের মূল্য।

এক জন জার্ম্মান রাসায়নিক, এক অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। মনুষ্য শরীরের উপাদান সকল বিশ্লেষণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিলে উহার কত দাম হয় তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন। „মেডিকেল প্রেস ও সার্কুলার নামক কাগজে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১ মন ৩৫ সের ওজনের একটি মনুষ্য দেহের উপাদানের মূল্য ১পাউণ্ড ১১শিলিং ৩পেন্স। ঐরূপ একটি দেহে ১০শিলিং ৫পেন্সের মেদ (চরবি) পাওয়া যায়। উহাতে যে লৌহ থাকে, তাহার পরিমাণ অতি কম। উহাদ্বারা অতিকষ্টে ১ইঞ্চ পরিমাণ একটি পেরেগ তৈয়ার করা যায়, ইহাতে মুরগির একটি বড় রকমের ঘরের চুন কাম হইতে পারে এরূপ চুন পাওয়া যায়। সেই দেহের ফস্ ফরাসের দ্বারা ২২০০ টি ম্যাচ বাতির কাঠী প্রস্তুত হইতে পারে। একটি মানব দেহে ১০০ শত ডিম্বের এলবুমেন (ডিম্বের শ্বেত পদার্থ) পাওয়া যায়। বোধ হয় ইহাতে চায়ের চামচের আন্দাজ সর্করা ও অল্প মাত্র লবন পাওয়া যায়”।

প্রথম দেখিতে মনে হয় যেন এক নূতন বাণিজ্যের পন্থা উন্মুক্ত হইল।

মৃত ব্যক্তিদিগকে চূর্ণে পরিণতঃ করিয়া জীবিতগণ দ্বারা কুকুট গৃহ চুন কাম করাইয়া লওয়া যত সহজ মনে হয় বস্তুতঃ ইহা তত সহজ নহে। উপাদান সকল, দ্বারা প্রকৃত মনুষ্য দেহ একবার গঠন করিলে উহা বিশ্লেষণ করিতে (আমাদের) উপাদানের মূল্যে ১পাঃ ১১শিঃ ৩পেঃ অধিক লাগে। আমাদের মৃত্যুর পর দেহটা দোকানদারকে দিয়া যাইতে পারিনা ইহাই দুর্ভাগ্য।

আলোক পক্ষী।

আমাদের দেশে কাহার কাহারো মুখে শুনা যায় যে রাত্রিতে কেহ ২ এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে আলোক পিণ্ড চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। আমাদের দেশে ইহার কারণ নির্দেশ করিতে আর কোন লেঠাই নাই, কারণ উহা ভূতের ঘাঁড়ে চাপাইয়া দিলেই সব চুকিয়া গেল। বস্তুতঃ পক্ষে কখন কখনও রাত্রিতে একরূপ জ্যোতিষ্মান পাখী দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু ইহা অত্যন্ত বিরল। ১৯০৭সনে সার ডিগ্‌বি পিগট পক্ষী বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত গণের (Ornithologists) নিকট প্রকাশ করেন যে ঐরূপ একটী পাখী কেম্ব্রিজে দেখাগিয়াছে। ঐ দেশে ১৮৬৬ সনে মিঃ হার্বি ব্রাউন একটি ভ্রাম্যমান আলোক অনেক সময়ে দেখা যাইত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ কথা তখন কেহ গ্রাহ্য করে নাই; কারণ সকলেই মনে করিয়াছিল যে উহা সাধারণ গ্রাম্য লোকের ভ্রম বিশ্বাস মাত্র। সার ডিগ্‌বি পিগট বলেন যে; ১৯০৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নর্ফোকের নিকটে একজন পক্ষী রক্ষক ঐ রূপ এক জোরা পাখী দেখিয়া একটীকে মারিয়াছিল। পরে দেখা গেল যে উহা একটি সাধারণ পেচক মাত্র। ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসে মিঃ পার্কি এবং মিঃ সেপনসার ঐ রূপ একটি পাখী দেখিতে পান। উহা পুনরায় ১৯ শে ও ২২ শে ডিসেম্বর দেখা গিয়াছিল। প্রথম বারে যখন দেখা যায় তখন উহার আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল; কারণ উহা বৃক্ষের যে শাখাতে উপাবষ্ট ছিল, ঐ আলোর প্রভাবে তাহা দেখা গিয়াছিল। দ্বিচক্র গাড়ীর (bicycle) আলো ৩।৪ শত গজ দূর হইতে যেরূপ দেখা যায়, উহার আলোও সেইরূপ ছিল। ঐ পাখী দর্শকের বিপরীত দিকে উড়িয়া গেলে উহার আলো অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে পাখীর বক্ষস্থলই আলো বিকীরণের স্থান। মিঃ হার্মেন ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে কেম্ব্রিজের জলাভূমিতে ঐ রূপ একটি পাখী দেখিয়াছিলেন। ১৯০৭ ও ১৯০৮ সনে অনেকেই এই দৃশ্য দেখিয়াছেন; কিন্তু ১৯০৯ সনে উহা আর দেখা যায় নাই। ঐ পাখীর বক্ষের দীপক পদার্থের দ্বারাই ঐ রূপ আলো হওয়া অনুমান করা যায়, এবং পালক উঠিলেই উহা নির্ব্বাপিত হয়।

সুনিদ্রা ও অনিদ্রা।

নিদ্রা একরূপ অভ্যাস মাত্র। এই অভ্যাস অনেক টা স্বাভাবিক এবং ইহা অত্যন্ত উপকারী। অমিতাচারের দ্বারা ইহা সহজেই নষ্ট হইতে পারে। ঔষধের দ্বারা অনিদ্রা রোগ, আরোগ্য করা সহজ সাধ্য নহে। সুনিদ্রার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা অনেক সময়েই বিপদ জনক এবং চিকিৎসকের উপদেশ ভিন্ন ব্যবহার করা উচিত নহে। যদি দেখিতে পাও যে তোমার সুনিদ্রা হইতেছে না এবং এই অভ্যাস ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহা হইলে বাজে কাজ অনেকটা কমাইয়া দিয়া নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিবে।

নিদ্রার জন্য শরীর ও মন উভয়েরই বিশ্রামের দরকার যাহারা নিদ্রা হইতে বঞ্চিত, তাহারা জানেনা শরীর মন কিরূপ ভাবে বিশ্রাম দিতে হয়। তাহারা শয্যায় শয়ন করে বটে; কিন্তু সেখানেও তাহারা নানারূপ চিন্তায় মগ্ন থাকে নিদ্রার জন্য শরীরও মনের সম্পূর্ণ অবসাদ আনিতে হয়।

নিম্ন লিখিত ব্যায়াম যথাযথ রূপ অভ্যাস করিলে অনিদ্রা রোগে বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভব।

শরীর সহজ ভাবে রাখিয়া সরল ভাবে দাঁড়াও, হস্ত দুইটি দুই পার্শ্বে অলসভাবে ছাড়িয়া দেও, এখন ধীরভাবে নাসারন্ধ্র দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিতে থাক এবং সেই সঙ্গে হস্তদ্বয় দুই পার্শ্বে ধীরে ২ উঠাইতে থাক। হস্ত এরূপ ভাবে উত্তোলন করিবে যে যখন মস্তকের উপর হস্ত উত্তোলিত হইয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সংলগ্ন হইবে ঠিক সেই সময়ে বক্ষস্থলে পূর্ণ ভাবে বায়ু গ্রহণ করা শেষ হইবে। সে সময়ে মস্তক একটু উর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিয়া দম বন্ধ না করিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিবে, এবং সে সঙ্গে হস্তদ্বয় সম্মুখের দিকে ও নিম্নদিকে ক্রমে নামাইতে থাকিবে। এই কার্য্যটি এরূপ ভাবে করিবে যে প্রশ্বাস ফেলা শেষ হইবার সঙ্গে ২ হস্তদ্বয় দেহের দুই পার্শ্বে নামিয়া অলসভাবে ঝুলিতে থাকিবে। এই সকল ক্রিয়া অত্যন্ত ধীর ভাবে করিলে হইবে যেন কোনরূপ আয়াস করিতে না হয়। অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকার দরুণ যদি অস্থির ভাব হয় তাহা হইলে নির্ম্মল বায়ুতে কিছু শারীরিক পরিশ্রম করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। অত্যন্ত শ্রান্তি জনিত অনিদ্রা ধীরে ২ বাহিরে ভ্রমণ ও গভীর শ্বাস প্রশ্বাসদ্বারা দূরীভূত হয়। সুশীতল কক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়া সমস্ত দেহের ভার শয্যায় ছাড়িয়া দিবে। মনে করিবে যে শয্যা তোমাকে ধারণ করিয়াছে কিন্তু তুমি শয্যাকে ধারণ কর নাই। নিদ্রা হইতেছেনা বলিয়া উদ্বিগ্ন হইও না। স্থির হইয়া কিছু সময় থাকিলে নিদ্রা আপনা হইতেই আসিবে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।
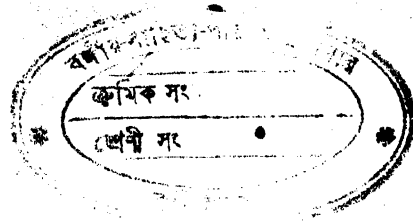
অষ্টম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬। | দ্বিতীয় সংখ্যা।

টুর্গেনিভের গদ্য কাব্য।

—সন্ন্যাসী—

আমি একজন সংসার ত্যাগী পুণ্যাত্মা সন্ন্যাসীকে চিনিতাম। তিনি প্রার্থনার মধুরতায় মশ্‌গুল্‌ হইবার জন্যই যেন জীবন ধারণ করিতেন। শীতকালে ধর্ম্ম মন্দিরের মেঝেতে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে করিতে শীতে তাঁহার পা অবশ ও কাঠের মত শক্ত হইয়া গেলেও প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। এসব কষ্টকে তিনি গ্রাহ্যই করিতেন না। ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেবলি প্রার্থনা করিতেন।

আমি তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিতও হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, যে, তিনিও আমার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হউন; আমাকে যেন তুচ্ছ তাচ্ছল্য না করেন। আমার জন্য তাঁহার আনন্দও অপ্রশমনীয়।

তিনি নিজকে, ঘৃণ্য অহংকে নাশ করিবার পন্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমিও——। আমি যে প্রার্থনা করি না, সেটা আত্মানুরাগের জন্য নহে।

তাঁহার অহং তাঁহার কাছে যেমন, হয়তো আমার অহং আমার কাছে তদপেক্ষা বেশী ভারী ও ঘৃণ্য।

কেমন করিয়া নিজকে ভুলিতে হয়, তাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু আমিও তাহা পাই বটে, তবে অব্যাহতরূপে পাই না।

তিনি মিথ্যা কথা বলেন না; আমিও মিথ্যা কথা বলি না।

—জীবন যাপনের বিধি—

এক চালাক বুড়া জুয়াচোর আমাকে বলিল—"গ্যাখো হে, যদি তুমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেশ করে চটিয়ে তার ক্ষতি করতে চাও, তো, তার যদি কোনো ত্রুটি কিম্বা কলঙ্কের কথা তোমার জানা থাকে, তবে সেই কথা উল্লেখ করে তাকে খুব কসে গাল পাড়ো। খুব রাগ দেখাও আর বেশ চুটিয়ে গাল দাও।

"প্রথমতঃ, আর সকলে ভাববে তোমার নিশ্চয়ই ঐরূপ কোনো কলঙ্ক নেই।

"দ্বিতীয়তঃ, তোমার রাগটা প্রকৃত পক্ষে খাঁটি হওয়া চাই। তোমার নিজের বিবেকের খোঁচায় তোমার বদল হতে পারে।

"ধর—যদি তুমি স্বপক্ষ ত্যাগী হও, তো, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার গভীর বিশ্বাস নেই বলে খুব তিরস্কার কর।

"যদি তোমার হৃদয়টা কৃতদাসের মত ছোট হয়, তবে তারও হৃদয়টা কৃতদাসের মত ছোট—একথা জোরের সঙ্গে তাকে বল। বল, যে, সে সভ্যতার দাস, ইউরোপের দাস, সমাজ সংস্কারবাদের গোলাম!"

আমি প্রকারান্তরে উল্লেখ করিলাম—"কেউ হয়তো বল্‌তে পারেন কৃতদাসত্বের বিরুদ্ধতার দাস।"

ধূর্ত্ত জুয়াচোর আমার মতে মত দিয়া বলিল—"তুমি তা—ও বল্‌তে পার।"

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বৈদিক যুগে বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়।

ঋগ্বেদে আমরা তিনটী দেব সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। বসু, আদিত্য ও রুদ্র নামে ইহাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইন্দ্র বসুদিগের প্রধান ছিলেন। অগ্নি ও অঙ্গিরা ঋষিগণ বসু-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ত্বষ্টা নামে এক দেব বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে সবিতা বলা হইত। কারণ তিনি দেবগণের মধ্যে স্বর্গীয় সোমরস বিতরণ করিবার অধিকারী ছিলেন। তিনিই দেব, দানব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতিকে গর্ভে আকার প্রদান করেন। এই জন্য ত্বষ্টাদেব সর্ব্বদা দেবী দিগের দ্বারা পরিবৃত থাকেন—বেদে বর্ণিত হইয়াছে। উষাকে তাঁহার কন্যা এবং পূষাকে তাঁহার পুত্র বলা হইয়া থাকে। ইন্দ্র পূষার ভ্রাতা রূপে বেদে বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব ত্বষ্টাদেবই প্রাক্-বৈদিক যুগে বসুদেব গণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ক্রমে বসু পূজক আর্য্য সম্প্রদায়ের কোন শাখা ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠদেব রূপে গ্রহণ করে। এই সম্প্রদায়ের সহিত ত্বষ্টা-পূজক সম্প্রদায়ের বিরোধ উপস্থিত হয়। এইরূপে বসু পূজকগণ ইন্দ্র ও ত্বষ্টা প্রমুখ দেব পূজক রূপে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঋভু দিগের যে সকল বৃত্তান্ত ঋগ্বেদের ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে উভয় দলের মধ্যে বিবাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ঋভুগণ ইন্দ্র প্রধান বসু সম্প্রদায়ের পূজক ছিলেন। গল্প আছে, ত্বষ্টা দেব একটী চমসকে চারি ভাগে বিভাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ঋভুগণ তাহা সহজে করিতে সক্ষম হন। ইহাতে ত্বষ্টা পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। বৈদিক কালে আর একটী গল্প প্রচলিত ছিল যে ইন্দ্র বল পূর্ব্বক ত্বষ্টার সোম পান করেন। তাহাতে ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে সংহার করিবার জন্য বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। কিন্তু ইন্দ্র তাহাকেও বধ করেন। ক্রমে ত্বষ্টা ইন্দ্রের ভয়ে কম্পান্বিত হইতেন এবং ইন্দ্রের জন্য বজ্র নির্ম্মাণও করিতেন। 'ব্রাহ্মণে' দেখিতে পাই—বৃত্র বা অহি ত্বষ্টারই পুত্র ছিল। এই বৃত্রকেও ইন্দ্র বধ করিয়া আর্য্য দিগকে জল আনিয়া দিয়াছেন। ঋগ্বেদের কোন ঋষি বর্ণনা করিয়াছেন—ইন্দ্র উষার শকট ভগ্ন করেন ও উষাকে বিশেষ রূপে নির্য্যাতন করেন। এমন কি ইন্দ্র আপন মাতাকে বিধবা করেন, বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বর্ণনা হইতে আমরা বেশ অনুভব করিতেছি যে ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র ছিলেন, ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু প্রাক্-বৈদিক কালে ইন্দ্র-পূজক সম্প্রদায়ের সহিত ত্বষ্টা-পূজক সম্প্রদায়ের বিবাদ চলিয়াছিল; পরে ত্বষ্টা-পূজক সম্প্রদায়ের কোন কোন দল যথা ত্বষ্টা, উষা ও পূষা-ভক্তগণ ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠদেব বলিয়া স্বীকার করিলে ইন্দ্র-পূজক দলের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বৃত্র-পূজক দল এরূপ মিলনে স্বীকৃত হয় নাই।

ঋগ্বেদের ঋষিগণ অহিবুধ্ন নামে এক দেবের পূজা করিতেন। অহিবুধ্ন অর্থে আকাশের অহি বা সর্প। আমরা অনুমান করি বৃত্র সম্প্রদায়ও ত্বষ্টা ও অহিবুধ্নের পূজা করিত; কিন্তু ইহারা ইন্দ্রের পূজা গ্রহণ করে নাই। সেই জন্য ইন্দ্র পূজক আর্য্যের তাহারা শত্রু ও বেদে অহি-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ইন্দ্র-প্রধান বসু সম্প্রদায় ইন্দ্র অগ্নি, ত্বষ্টা, অঙ্গিরাগণ, উষা, পূষা এই সকল দেব পূজা করিত। ইহাদের অগ্নি অঙ্গিরা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

যে সকল জাতি আদিত্য দিগের উপাসক ছিল; তাহারা মনে করিত দক্ষ ও অদিতি হইতে আদিত্যগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। ঋগ্বেদে আট জন আদিত্যের উল্লেখ আছে, যথা, মিত্র, বরুণ, ভগ, আর্য্যমা, অংশ, সূর্য্য, মার্তাণ্ড, ও দক্ষ। এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ট অগ্নিকে দক্ষ বলা হইত। সম্ভবতঃ ইহারা মনে করিত সূর্য্যে এই অগ্নি অবস্থান করেন। বিশ্ব সংসারে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও অধর্ম্মের শাসন মিত্র, বরুণ প্রভৃতি আদিত্য গণের কার্য্য, এই সম্প্রদায় ইহা বিশ্বাস করিত। সেইজন্য আদিত্যগণ ঋগ্বেদে বিশেষ ভাবে রাজন্য ও ক্ষত্র বিশেষণে বিভূষিত হইয়াছেন। পৌরাণিক যুগে এমন কি ঋগ্বেদের কালে ও আদিত্য পূজক সম্প্রদায় সূর্য্য বংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য ঋষি—মিত্র বরুণের পুত্র ছিলেন। অতএব অঙ্গিরা ঋষিগণ যেমন অগ্নি বংশীয় ঋষি ছিলেন, সেইরূপ বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য আদিত্য বংশীয় ঋষি ছিলেন। প্রাক্ বৈদিক যুগে আদিত্য সম্প্রদায়ের সহিত বসু-সম্প্রদায়ের বিবাদ হইত। ইহার অস্তিত্ব ঋগ্বেদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আরো অনেক জাতি ছিল, যাহাদিগকে আমরা রুদ্রোপাসক বলিতে পারি। ইহাদের শ্রেষ্ঠ অগ্নির নাম রুদ্র। মরুৎগণ ও অশ্বিদ্বয় রুদ্র বংশীয় বলিয়া ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ। গাভী ও পৃথিবী ইহাদের দেবী ছিল। পৃশ্নি গাভীর গর্ভে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ জন্ম গ্রহণ করেন। বোধ হয় এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা শাখা ছিল ও ভিন্ন ভিন্ন শাখায় রুদ্র, মরুৎগণ, ও অশ্বিদ্বয় বিশেষ ভাবে পূজিত হইতেন। রুদ্রকে বেদে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মনে হয়, রুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান হইতেন, তাঁহারা ঔষধ প্রস্তুত করিতেও দ্রব্যগুণ নির্দ্ধারণে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারাই সমাজে বৈদ্যের কার্য্যে অধিকারী হইতেন। এই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকে সৈনিকের কার্য্য করিত ও আপনাদিগকে মরুৎ-গণের সন্তান মনে করিত। কিন্তু উহাদের মধ্যে আর এক শ্রেণী ছিল, যাহারা অস্ত্র চিকিৎসায় পারদর্শী হইত। উহারাই অশ্বিদ্বয়ের পূজক ছিল। অশ্বিদ্বয়ের পূজক দিগের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাহারা সার-থির কার্য্য শিক্ষা করিত। রুদ্র দিগের মধ্যে যাহারা গাভী ও পৃথিবী পূজকছিল, তাহারাই কৃষি ও গোপালনে নিযুক্ত হইত।

ঋগ্বেদের যুগে এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনের চেষ্টা হয়। বিবস্বান পুত্র মনু ও যম কতকগুলি বসু, আদিত্য ও রুদ্র পূজক সম্প্রদায়ের মিলন দ্বারা এক নব সমাজ ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। মনু ধর্ম্ম সংস্কারে এবং যম সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বসু, আদিত্য ও রুদ্র দেবগনের প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে মনু ১১টী দেব লইয়া ৩৩ দেবের পূজা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে অগ্নি বেদীতে আহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞ করেন, তাহা ঋগ্বেদে ইড়া নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার যজ্ঞে ৭ জন হোতা নিযুক্ত হইতেন। বোধ হয় ইঁহাদের অধিকাংশ বসু ও আদিত্য সম্প্রদায়ের ঋষি বংশীয় ছিলেন। কবি পুত্র উশনা মনুর যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করেন, বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে যে সমাজ গঠিত হয়, তাহাই 'মানব' সমাজ নামে বিখ্যাত। যম এই সমাজে নব বিবাহ প্রথা প্রচলন করেন। বসু-সম্প্রদায়ে ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ প্রচলিত ছিল। যম কিন্তু ইহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া প্রচার করেন। তিনিই সম্ভবতঃ অগ্নি দ্বারা মৃত দেহের সৎকার-প্রথা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা এক প্রকার যজ্ঞ। এই যজ্ঞে দেহ আহুত হইলে দেহী স্বর্গ লোকে যাইতে পারে। যম এই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে প্রেত লোক অভিহিত হয় এবং তিনি উহার রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন। ঋগ্বেদে বিবস্বানকে আদিত্য বলা হয় নাই। মনু ও যম বোধ হয় আদিত্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা সূর্য্য বংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগে তাঁহা-দের পিতা বিবস্বান একজন আদিত্য রূপে গৃহীত হন। তাহাতে আদিত্য দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মানব সমাজে আদিত্য ও বসুগণ সমান সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ইন্দ্র, ত্বষ্টা ওপুষাকে আদিত্য দিগের অন্তর্গত করিয়া দ্বাদশ আদিত্যের কল্পনা হইয়া-ছিল। এই কল্পনা ঋগ্বেদের কালে সম্পন্ন হয় নাই। মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার পরে ঋগ্বেদ রচিত হয়। ঋগ্বেদ মানব সম্প্রদায়ের ঋষি দিগের রচিত স্তোত্রাবলী। এই জন্য এই বেদ বিশেষ ভাবে মানব জাতির বেদ।

যে সকল সম্প্রদায় মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহারা দেবপূজা করিলেও আর্য্য মানব দিগের শত্রু হইয়া পড়ে। ইহারা সেই জন্য বেদে বৃত্র নামে আহুত হইত। আমাদের মনে হয় কতকগুলি আদিত্য, ত্বষ্টা ও রুদ্র পূজক জাতি (tribes) মানব সমাজে যোগ দেয় নাই। ইহাদের মধ্যে পারস্য দেশে জরদ্-উষ্ট্রের ধর্ম্ম সম্প্রদায় আদিত্য পূজক হইয়াও অঙ্গিরা-মনু প্রতিষ্ঠিত মানব ধর্ম্মের বিরোধী ছিল। মহাভারতে বর্ণিত তক্ষক বা নাগ জাতি বৈদিক বৃত্র বা দানব জাতির বংশোদ্ভুত। ইহারা ক্রমে প্রবল হয়। ইহারাই ইতিহাসে শক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শক গণের ধর্ম্ম রুদ্র ও ত্বষ্টার ধর্ম্ম-মিলনে উদ্ভুত। এই জন্য ইহাদের রুদ্র দেবের ললাটে চন্দ্র এবং তাঁহার ভূষণ সর্প। এই সম্প্রদায়ে রুদ্রের নাম মহাদেব। ঋগ্বেদে শিব, রুদ্র প্রভৃতি নাম আছে; কিন্তু মহাদেব নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঋগ্বেদে বর্ণিত রুদ্রের দেহে সর্প নাই ও ললাটে চন্দ্র নাই। ইহা হইতে বেশ অনু-

ভুত হইতেছে যে কতকগুলি রুদ্র ও ত্বষ্টা পূজক সম্প্রদায় মিলিত হইয়া মহাদেবের পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই মিলনে তাহাদের মধ্যে নব শক্তির আবির্ভাব হয়। রাজপুতানার ইতিহাসে টড সাহেব এই নব-ধর্ম্ম-প্রবুদ্ধ জাতির বিজয় বার্ত্তা প্রদান করিয়াছেন।

মানব-সমাজ গঠন কালে যাঁহারা ঋষি পদ বাচ্য ছিলেন, তাঁহাদের বংশোদ্ভুত বেদবিদ্ সন্তানগণ যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ঋত্বিকের পদ প্রাপ্ত হইতেন। ইঁহাকে ব্রহ্মা বলা হইত। ব্রহ্মা নাম হইতে ব্রাহ্মণ শব্দ উদ্ভুত হইয়া ঐ সকল বংশীয় দিগকে বুঝাইত, মনে করি। অধিকাংশ অঙ্গিরা বংশীয়গণ ব্রাহ্মণ উপাধি প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইঁহারা ব্রাহ্মণ জাতি গঠন করেন। সেইরূপ মনু বংশীয়গণ ক্ষত্র ও রাজন্য নামে প্রসিদ্ধ হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন২ বংশ যজ্ঞে হোতার কার্য্য করিতেন। অপর সকলে রাজ্য শাসন করিতেন। ক্ষত্রিয় জাতি এইরূপে উদ্ভুত হয়। রুদ্র বংশীয় মরুৎগণ দেব-বিশ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের পূজকগণও মানব সমাজে বিশ নামের অধিকারী হন। বিশ শব্দ হইতে বৈশ্য শব্দের উৎপত্তি। ঋগ্বেদের কালে গৃহস্থের গৃহে দাস রাখা পদ্ধতি ছিল। এই দাসগণ কোন্ জাতীয় ছিল সে বিষয়ে নানাপ্রকার অনুমান সম্ভব। প্রথম অনুমানঃ—দাস-জাতির উল্লেখ, ঋগ্বেদে বর্ত্তমান। এই দাস জাতির সহিত আর্য্য মানব দিগের যুদ্ধ হইত। বোধ হয় যুদ্ধে যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিত, তাহাদিগের মধ্য হইতে অনেককে আর্য্য দিগের গৃহে দাসের কার্য্য প্রদান করা হইত। ক্রমে ইহারা সমাজের অঙ্গীভুত হইলে শূদ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় অনুমানঃ—ঋগ্বেদের কালে একজন প্রসিদ্ধ রাজার নাম সুদাস। মরুৎগণকে সুদানব বলা হইত। বৃত্রকে দনুর পুত্র দানব বলিতে দেখি। ইহারা আর্য্যদিগের শত্রু ছিল। সেইরূপ অনেক দাস জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা আর্য্যশত্রু ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, দাস ও দানব শব্দে সু উপসর্গ যোগ করিয়া আর্য্যগণ আপনাদিগের ও দেবতাদিগের নাম রাখিতে ঘৃণা বোধ করিতেন না। বসিষ্ঠ ঋষি এক স্থলে আপনাকে দেবতাদিগের দাস বলিয়াছেন। অতএব আমরা অনুমান করি আর্য্য দিগের বিশের মধ্যে এক সম্প্রদায় ছিল যাহারা আর্য্য ধনবানদিগের গৃহে দাসের কার্য্য করিত। ইহারা ঋগ্বেদের কালে ভিন্ন জাতি রূপে পরিগণিত হয় নাই। ইহাদের নাম হইতেই অনার্য্য আর্য্য-শত্রুগণ 'দাস' নামে অভিহিত হইয়াছিল। অনার্য্য দাস জাতি ও আর্য্যদিগের মধ্যে যাহারা দাস্য বৃত্তি করিত তাহারা এক নহে। ক্রমে আর্য্য বংশীয় দাসগণ 'দাস' নামে বোধ হয় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। ইহার মীমাংসা হয় 'শূদ্র' শব্দের ব্যবহার দ্বারা। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে শূদ্রগণ বিরাট পুরুষের পদদ্বয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা এই সময়ে সমাজে নির্দ্দিষ্ট জাতিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। যখন ঋষিগণ এই মীমাংসা করেন, তখন সম্ভবতঃ অনেক অনার্য্য জাতিও আর্য্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং নবপ্রতিষ্ঠিত শূদ্র সমাজে স্থান পাইয়াছিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

অশ্রু।

হেমন্ত আজ শিশির কণা
দিচ্ছে ঢেলে নয়ন কোণে,
শীতল হাওয়া হৃদয় মাঝে,
মলয় পবন ডাক না শোনে!
উষার রবি নাই সে ছবি
বিষাদে আজ আঁধার মাখা!
স্মৃতি দেবী বিরস মনে
ভুলেছে সেই চিত্র আঁকা।
হৃদয় আমার ভেঙ্গে গেছে
ছিন্ন আজি বীণার তার!
মর্ম্মে মর্ম্মে বিষাদ গাঁথা
গায়না ললিত বেহাগ আর!
ফুলের মত প্রস্ফুটীত
প্রাণের যত ভালবাসা,
চাঁপার মত প্রেম ও প্রণয়
চাতকের ন্যায় প্রাণের আশা,—
কোঁয়াসার ন্যায় বিলীন হয়ে
আজ্ নিমেষে গেছে চলে!
বিষাদ মনে আঁধার প্রাণে,
ভাস্‌ছি বসে নয়ন জলে!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

নাস্তিক।

মুর্শিদাবাদ এখন শুধু ভগ্ন কবরের অচেতন বিস্মৃত প্রায় রাজধানী! এ পরিত্যক্ত রাজধানীতে এখনো দেখিবার মত যা কিছু ঐতিহাসিক লুপ্তাবশিষ্ট বর্ত্তমান, তার মাঝে, আমার মতে শুবে বাংলার নবাব-নাজিমদের কবর স্থানটাই এখনকার মত একমাত্র দেখিবার জিনিষ। যাঁকে কোনো দিন অন্ধকার রাত্রে জাফ্রাগঞ্জের পথে মুর্শিদাবাদ হইতে জিয়াগঞ্জের দিকে যাইতে হইয়াছে, তিনি কখনো এ আশ্চর্য্য কবরস্থানের হৃদয় বিদারক সৌন্দর্য্যের কথা ভুলিতে পারিবেন না।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর লাল-নীল-সবুজ দীপমালায় নবাব নাজিমদের শ্রেণীবদ্ধ মর্ম্মর সমাধিগুলি যখন বিচিত্র আলো-ছায়ায় রঞ্জিত হইয়া উঠে, তখন আমার মনে হইতে থাকে, যেন বাংলার ইতিহাসের এক রক্তাক্ত যুগের বিস্ময়কর স্বপ্নে মণ্ডিত হইয়া সমগ্র সমাধিভূমিটাই স্মৃতি ও বিস্মৃতির মাঝে অত্যন্ত সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। কবর স্থানের যে অংশটায় রংমহলের সুন্দরীগণ আপনাদের ঝটিকাপূর্ণ জীবনের অবসানে নবাবিয়ানার সুখটুকু চিরনিদ্রার শান্তি মাঝে জন্মের মত বিস্মৃত হইবার জন্য সুনীল ওড়নার সোণার আঁচলটী পাতিয়া রাখিয়াছেন, সে স্থানটাও নবাব নিজামদের প্রকাশ্য কবরস্থান হইতে সমুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। যেন মৃত্যুর পরপারেও নিজামতের বেগমদের আব্রুরক্ষার জন্য পরলোকগত নবাবদের সচেতন উৎকণ্ঠা কিছুতেই দূর হইতেছে না!

সন্ধ্যার পর এই কবরস্থানের গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে হইত, এই কবরস্থানেই বুঝি কোনো একটা জটিল রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসার জন্য নবাবদের একটা নিস্তব্ধ মজলিশ বসিয়াছে! রাত্রির পর রাত্রি আবহমান কাল ধরিয়া অধিবেশন চলিতেছে। মিরজাফর হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার শেষ নবাব নাজিম পর্য্যন্ত সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়াও সে সম্বন্ধে যেন কেহ কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছেন না! এমন সমস্যা-সঙ্কটে পতিত হইয়াই যেন বাংলার নবাবগণ দুনিয়ার পান্থনিবাসগুলির সকল মুসাফেরগণের প্রতিই অত্যন্ত জরুরী আহ্বান প্রেরণ করিয়া, তাহাদেরই আগমন প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন-চিত্তে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত রাজদরবারে অপেক্ষা করিতেছেন! যদিও আমার উপর সে দরবারের পরোয়ানা মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ীর দস্তুর মত জারি হয় নাই, তবু আমার সর্ব্বদাই মনে হইত, —সে নীরব গম্ভীর বিরাট স্তব্ধ রাজ সভায় প্রত্যহ দিনান্তে হাজির হইয়া হুজুর দিগকে অন্তত একটীবার কুর্নিশ না জানাইয়া আসিলে, হয়ত আমার এ বেয়াদবী শেষকালের দরবারে কখনো 'মহকুব' হইবে না!

যদিও পোষ্টাফিসে অল্পমূল্যের কুইনিন বিক্রি করাই আমার ব্যবসায় এবং নব্য বাংলার অর্দ্ধ শিক্ষিত নব দম্পতি কুলের অপরিপক্ক প্রেমালাপ সম্বলিত ভারি ওজনের চিঠিগুলির উপর পোষ্টাফিসের মার্কা মরিয়া অতিরিক্ত ডাকমাশুল আদায় করিয়া আমি এমনি দারুণ অভিশাপ-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যে কার্য্যস্থলে সস্ত্রীক বাস করিবার মত সঙ্গতিও আমার ছিল না, তবুও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোনো পুরুষের আমীরিয়ানার ধার না ধারিলেও, আমার মুর্শিদাবাদে বদলি হওয়ার সঙ্গে২ নবাবী আবহাওয়ার গুণে আমার ভাবভঙ্গির ভিতর দিয়া এমনি সব খাস-নবাবী চাল-চলন সময়ে অসময়ে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া সবেগে পেখম ধরিয়া উঠিতে লাগিল, যে আমি নিজেই অবাক হইয়া গেলাম! যে সে লোকের সঙ্গে সহজভাবে মেলা মেসা, ওজন না করিয়া কথা বলা এবং মীরণ-মির্জ্জাফরের নিম্নস্তরের লোকদের সঙ্গে কোনো শিষ্টাচারের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলা আমার পক্ষে ক্রমশঃই অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল! আমি ভাবিয়াছিলাম এই জাফ্রাগঞ্জের কবরস্থানেই আমাদের সাবেক নবাবী আমলের রাজদ্বার ইতিহাসের শ্মশানে আসিয়া চিরদিনের মত মিলিত, হইয়াছে। আমাদের হিন্দু শাস্ত্র মতে এমন স্থানে বন্ধু লাভই প্রশস্ত মনে করিয়া আমার কবরস্থানে বেড়াইবার সুময় দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! বলিতে পারি না কেন, আমার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে নিশ্চয় কোনো না কোনো দিন এক ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না

রাত্রে কোনো এক মোগল বংশীয় সম্ভ্রান্ত নবাব কোনো এক অদৃশ্য সমাধিতল হইতে উঠিয়া আসিবেন এবং তাঁর বহুমূল্য কিঙ্খাবের জরিদার ঝোলা আস্তিনের ভিতর হইতে শুভ্র বলিষ্ঠ হাত দুটী বাহির করিয়া আমাকে সুপ্রচুর শিষ্টাচারের সহিত "তস্লিম" জানাইতে জানাইতে চারিদিক অত্যুৎকৃষ্ট গুলাবি আতরের সুমধুর গন্ধে মসগুল করিয়া দিয়া আমার সঙ্গে হাত মিলাইয়া আমার বন্ধু হীনতার সমুদয় দুঃখ এক মুহূর্ত্তে দুর করিয়া দিবেন! মুর্শিদাবাদের মত সহরে থাকিয়া তদপেক্ষা নীচের থাকের মনুষ্যজাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা, 'নৈবচ, নৈচব।'

কথায় বলে পরম কারুণিক জগদীশ্বর মানুষের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা কখনো অপূর্ণ রাখেন না। এটা ঘোরতর সত্য কথা! কারণ এই কবরস্থানেই, এমনি এক সন্ধ্যা বেলায় আমার এক আশ্চর্য্য বন্ধুলাভ ঘটিয়াছিল।

সে দিন বিকাল বেলা আমি জাফাগঞ্জের কবরস্থানে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত পশ্চিমের আকাশটা জুড়িয়া একটা সুন্দর কমলা রঙ্গের আভা যেন ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল! আশে পাশে দুচারিটী সবুজ ঝোপ ঝাড়ের ভিতর হইতে দুই একটী করিয়া জুঁই ফুল নিঃশব্দে ঝরিয়া পরিয়া সমাধিতলে নিদ্রিতা কোনো উন্মেসিত যৌবনা সুন্দরীকে চির বিরহের দুঃসহ বেদনার মাঝে সচেতন করিয়া তুলিতেছিল কিনা, বলিতে পারি না, কিন্তু দুচারিটী গোলাপ অঙ্কুর হইতে অস্ফুট সৌন্দর্য্যের জগতে সলজ্জ পঙ্কজলে জড়িত মৃদু পাদক্ষেপ করিয়া প্রিয়জনের মর্ম্মর স্মৃতির উপর সাশ্রু স্নেহ নিবেদনের ছলেই বুঝি অত্যন্ত মমতায় সঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল! একটী পত্রহীন আম্র শাখায় বসিয়া একটী শ্যামা আপন ভাবে বিভোর হইয়া সমাধি ভূমি হইতে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বুলিয়া যাইতেছিল! প্রাণপূর্ণ হৃদয় সঙ্গীতের ঝঙ্কারের মাঝে বিস্মৃত পরলোক পুনর্জ্জীবিত করা যায় কিনা, তারি যেন পরীক্ষা চলিয়াছে।

ঠিক সেই সময়ে, কবরস্থানের কোনো অদৃশ্য সমাধিতল হইতে কেহ সশরীরে উঠিয়া আসিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সারি সারি কবরের ভিতরস্থিত পাথর বাঁধা সরু সোজা পথে, দেখিতে পাইলাম, কে একজন বরাবর আমার দিকে চলিয়া আসিতেছিলেন। তাঁর মাথার টুপির উপরকার কারচুপির কাজের উপর সন্ধ্যার আকাশ হইতে ঠিকরাইয়া পড়া কমলা রঙ্গের কুঁড়িগুলি যেন থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তাঁর জরদা রঙ্গের পাঞ্জাবীর ঝুলটী সাটিনের ঢিলা পাজামার উপর এমনভাবে নামিয়া পড়িতেছিল, এবং পাঞ্জাবীর উপর বেগুনী মকমকের ফুলদার কাবাটী এমন কায়দা করিয়াই পড়িয়াছিলেন যে তাঁকে নবাব বই আর কোনো প্রকার মনুষ্য বলিয়া ভুল করিবার কোনো ওজুহাত ছিল না। তাঁর স্বচ্ছ মুখকান্তির উপর একটুকু মধুর গোলাপী আভা এমনি চমৎকার মিশিয়া গিয়াছিল, যে আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারিতাম, ইনি দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার কোনো ঐতিহাসিক নবাব, এ কালের সরকারি পেন্সন ভোগী নবাব বংশের কেউ নন, যদি তিনি চোখে সুর্মা পড়িয়াছিলেন কিনা, এই টুকু নিঃসন্দেহ জানিতে পারিতাম! কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সময়ে তিনি চোখে নীল চসমা পরিয়াছিলেন বলিয়া চোখ দুটী ভাল দেখিতে পাই নাই; কিন্তু বাজি যে ধরি নাই সেটা বোধ হয় বুদ্ধি মানের কার্য্যই হইয়াছিল!

তিনি যখন কবরের সমুদ্র পার হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি সঠিক কে, তা ঠাহর করিতে না পারিলেও, আমি তাঁকে খাস নবাবী কায়দায় সেলাম ঠুকিয়া সসম্ভ্রমে তাঁর পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম! ভদ্রলোকটী কৌতুহলোৎফুল্ল চোখে নীল চসমার ভিতর দিয়া আমার আদ্যোপান্ত ভালরকম দেখিয়া লইয়া আমাকে খাঁটী দেশী প্রথায় একটী নমস্কার করিয়া সহাস্য শিষ্টাচারের সহিত জানাইলেন যে তিনি আদৌ মুসলমান নন!

আমি হাঁ করিয়া কতক্ষণ ব্যাকুবের মত তাঁর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিলাম। বাস্তবিক তাঁর মোগলাই পোষাকের উপর আমীরি ভাবটী এমনি খাসা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে তাঁকে মুসলমান নবাব বই আর কিছু মনে করাই তখন আমার পক্ষে ভারি শক্ত। যতই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম, ততই আমার মনে হইতে লাগিল,

যদিও খাঁটী মুসলমান ব্যতীত ভিন্ন জাতীয় কাহাকেও এমন জাঁকালো মুসলমান বেশ পরিয়া বাহির হইতে কখনো দেখি নাই, তবু শুনিয়াছি আমাদেরই পিতৃ পিতামহগণ মুসলমান আমলে নাকি এই বেশেই আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করিতেন। মনে করিলাম, হয়ত আজকালকার বিলাতী সভ্যতার দিনেও মুর্শিদাবাদের লোকেরা নবাবী পরিচ্ছদের জাঁক জমকের আসক্তি এখনো ত্যাগ করিতে পারেন নাই! সে যাই হোক, ভদ্রলোকটী নবাব শ্রেণীর জীব নন শুনিয়া এক দিকে আমার উৎসাহ টা যেমন দপ করিয়া নিবিয়া গেল, অপর দিকে হিন্দুর বর্ণাশ্রমের সমুদয় ভেদ-জ্ঞান আমার মস্তিষ্কে টনটন করিয়া উঠিতেই আগন্তুক ভদ্রলোকটী আমার নমস্য কিনা সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারায় আমি কতকটা অভদ্রের মতই তাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম ; "আপনি ব্রাহ্মণ ?"

তিনি আমার পানে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "না, আমি নাস্তিক।"

তাঁর উত্তরটা শুনিয়া আমি বিস্ময়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়া কতকক্ষণ তাঁর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিলাম। যদিও আমাদের বর্ত্তমান বস্তুতন্ত্রতার দিনে আস্তিকতা অনেকের মধ্যেই লুপ্ত অকারের চিহ্নের মত অত্যন্ত উহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তবু এরূপ উদার চেতা, স্পষ্টবাদী নাস্তিকের সঙ্গে তো ইতঃপূর্ব্বে আমার আর কখনো সাক্ষাৎ হয় নাই! নাস্তিক শুনিয়া আমার শ্রদ্ধার অপমান যন্ত্রের পারা অনেকটা নামিয়া গেল বটে ; কিন্তু নিজের স্বাধীন মতামত এতটা দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আছে দেখিয়া লোকটার সম্বন্ধে আমার কৌতুহল অনেকটা বাড়িয়া উঠিল।

ভদ্রলোকটীর সঙ্গে আমার আলাপটা জমিয়া উঠে নাই, এমন সময় তাঁর জমকালো নবাবী পোষাক দেখিয়া কবরখানার কোরান পড়িবার মুন্সী বকশিশের জন্য সেলাম ঠুকলেই তিনি দুই ধমকে তাকে দুর করিয়া দিলেন। অথচ সে সময় যে জীর্ণ শীর্ণ ধুনকর রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তাকে ডাকিয়া আনিয়া তার হাতে একটী পাঁচ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন :—'বাপুহে,' সন্ধ্যার পর আরো কিছু দিন তোমায় চলা ফেরা বন্ধ রাখতে হচ্চে! ফের যদি তোমার ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়, তবে তোমায় বাঁচিয়ে তোলা মুস্কিল হবে!"

অনুমানে বুঝিলাম, ডাক্তারি ভদ্রলোকটীর ব্যবসায়। মুনসীর উপর ধমকের চোট টা কিছু অতিরিক্ত জেয়াদা হইলেও, গরীব ধুনকরের উপর তাঁর সহৃদয় ব্যবহার দেখিয়া আমি একটু খুসী হইয়াই বলিলাম ;—

"নাস্তিক হয়েও তো জগদীশ্বরের জীবের উপর দয়া আপনার হৃদয়ের ভিতর দিয়ে দিব্যি কাজ করে যাচ্চে! আপনার ভিতর ঈশ্বর বেঁচেই উঠছেন, ধুলো হয়ে উড়ে গিয়েছেন বলে তো মনে হয় না!"

তিনি একটা সুতীক্ষ্ণ হাসির ঝড়ে আমার মন্তব্যটা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শেষ কালে উদার মুরুব্বিয়ানা ভাবে একটী কথায় উত্তর করিলেন,—"পাগল—"

আমি প্রতিবাদের সুরে যথেষ্ট উত্তেজনার সঙ্গেই বলিয়া উঠিলাম,—"শুধু অস্তি অস্তি বলে চিৎকার করার চাইতে, চুপ করে তাঁর আজ্ঞা পালন করে যাওয়ার ভিতরে তো আস্তিকতা সামান্য নয়।"

ভদ্রলোকটী প্রচুর সহৃদয়তার সহিত উত্তর করিলেন,—"সে বিষয়ে ঘোরতর মতভেদ আছে। আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে বিচার কর্ত্তে প্রস্তুত! কিন্তু তা হলে আপনার একবার গরীবের ঘরে পদধূলি দিতে হচ্চে!"

আমি একটু মৃদু আপত্তির স্বরেই বলিলাম,—

"মিউনিসিপালটীর যেরূপ সুবন্দোবস্ত তাতে লোকে ঘরে বসেই পদধূলির জ্বালায় অস্থির, তার উপর আবার রাস্তার লোক ঘরে ডেকে নিয়ে—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"সে তো স্বায়ত্তশাসনের উন্নতির লক্ষণ! কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার পূর্ব্বেই ঈশ্বরকে নিয়ে যে তর্কটা উঠেছে, তার একটা বুঝাপড়া করে নেওয়া মন্দ কি! তা হলে আজ রাত্রে ঠিক আট টার সময় গরীবের ঘরে পদধূলি দিচ্ছেন একবার ?"

আমি অগত্যা রাজি হইতেই ডাক্তার আর একটী মাত্র কথাও না বলিয়া চট্ করিয়া অন্ধকারের ভিতরে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

২

হুমায়ুন মনজিলের নিকটে প্রকাণ্ড পড়ো বাড়ীতে ডাক্তারকে পাকড়াও করিতে আমাকে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। মুর্শিদাবাদ সহরে ডাক্তার ধীরেশচন্দ্রের অসাধারণপ্রতিপত্তি। মুর্শিদাবাদ সহরটাকে কেন্দ্র করিয়া ডাক্তার এই ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত দেশটার উপর চিকিৎসা সূত্রে একাধিপত্য রাজত্ব করিতেন। নবাব বাড়ীর মটোর, আজিমগঞ্জের জুড়ি এবং সাধারণ লোকের ভিড় তাঁর দরজার গোড়ায় দিবা রাত্রি যেন লাগিয়াই আছে।

ডাক্তার ধীরেশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হইয়া ক্রমশঃ বুঝিতে লাগিলাম, পোষ্টাফিসের দৌলতে বাংলার অনেক মুলুক নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া এতদিনে এক আশ্চর্য্য ধরণের লোকের হাতে পড়িয়াছি। তাঁর সঙ্গে আমার যতই জানা হইতে লাগিল, ততই আমার মনে হইতে লাগিল, তাঁর সম্বন্ধে আমার না জানার দিকটাই ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। বাস্তবিক লোকটার চরিত্র আগাগোড়া এক দুশ্ছেদ্য রহস্য জালে আবৃত। লোকে বলিত তিনি ব্রহ্মদেশ হইতে ডাক্তারী শিখিয়া আসিয়া তিব্বতের লামাদের নিকট গুপ্ত ঔষধ-বিদ্যা আদায় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, অথচ তিনি নিজে ভারতবর্ষের সীমানার বাহিরে যাওয়াই স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বলেন, ডাক্তার খাঁটী পূর্ব্ববঙ্গের লোক, কিন্তু কথায় বার্ত্তায় তাঁকে খাস শান্তিপুরে ভদ্রলোক বৈ আর কিছু মনে করা সহজ নয়। কেহ বলে তিনি অপত্নীক, কেহ বলে বিপত্নীক আমি কিন্তু পোষ্টাফিসের ছিদ্রপথে তাঁর সঙ্গে কাঁচা মেয়েলি হাতের চিঠিপত্র রীতিমত আনা গোনা করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি ঝড়ের বেগে রোগী দেখিয়া বেড়াইতেন। বহির্জগতের সামাজিক শিষ্টাচারের তিনি কোন একটা ধার ধারিতেন না। নবাব বাড়ীর নিমন্ত্রণ ফেলিয়া বিনা ভিজিটে রোগী দেখিতে যাইতেন। কখনো তিনি পুরাদস্তর সাহেব, কখনো আলখেল্লা পরা ফকির, আবার কখনো তিনি সাবেক দিনের আমীর ওমরাহদের উজ্জ্বল বেশধারী একটী যথেচ্ছাচারী তরুণ নবাব। অনেক দিন তাঁরসঙ্গে মিলা মিশা করিয়াও তাঁর চালচলনের কিছু ঠিকানা করিতে পারিলাম না, অথচ সন্ধ্যার পর, তাঁর ঘরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছি, তখন পুরু তোষক মোটা তাকিয়া এবং সুমিষ্ট মুর্শিদাবাদের তামাকের গন্ধে তাঁকে বাঙ্গালী ফুল বাবু ভিন্ন আর কিছু বলিয়া কখনো ভুল হয় নাই।

ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা আরো কিছু ঘণীভূত হইলে টের পাইলাম, তাঁর প্রতিদিনের সান্ধ্য-সমিতির একমাত্র সভ্য ছিলাম, আমি, আমি বই সে রাজ্যে আর কোন জীবিত মনুষ্যের সাড়া শব্দ ছিল না। তিনি যেন আমাদের এত বড় পৃথিবীর লোকারণ্যের মাঝেও নিতান্তই নিঃসঙ্গ! গোটা পৃথিবীটার দিকে পেছন ফিরিয়া তিনি যেন কখনো কখনো আমার পানেই তাঁর রহস্যময় মনের পর্দাটা ক্ষণকালের জন্য তুলিয়া ধরিতেন, কিন্তু সে অতি ক্ষণিক, এবং সে সময়েও পর্দার আড়ালেই তাঁর মনের বেশীর ভাগটা ঢাকা পড়িয়া থাকিত। যেটুকু দেখা যাইত সে টুকুও তাঁর অস্পষ্ট কুহেলী আচ্ছন্নমনের একাংশ মাত্র!

চিকিৎসা ছাড়াও তিনি যেন কি একটা গুপ্তসাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। আমাদের যে কামরায় সন্ধ্যার পর মজলিস বসিত, তার সমুখে একটা বারান্দার পরই ডাক্তারের লেবরেটরি। সে খানে ডাক্তার নিজে ব্যতীত আর কোনো জীবিত মনুষ্যের প্রবেশ করিবার অধিকারছিল না। হঠাৎ কোনো দিন সন্ধ্যার পর বাহিরের চপল বাতাসে লেবরেটরী ঘরের দরজায় লম্বিত কালো বনাতের ভারি পর্দা একটু উঠিয়া গেলে দেখিতে পাইয়াছি, তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকে সারি সারি মনুষ্যের কঙ্কাল সেখানে ডাক্তারের নিশীথ অভিসারের জন্য নীরব অস্থি-সার শুভ্র হাস্যে অপেক্ষা করিতেছে। সেখানে সে মনুষ্য কঙ্কালের নীরব সভা গৃহে, তীব্রগন্ধ আরকের জ্বালাময় ধূমের মধ্যে, রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া কি গভীর অনাবিষ্কৃত সত্যের পেছনে একাকী ঘুরিয়া বেড়ান, লোকের নিকট সে সম্বন্ধে তিনি কোনো সদুত্তর দেওয়ার অংশুকতাই স্বীকার করেন না।

চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে ডাক্তার বলিয়া থাকেন যে মানুষের জীবনী শক্তিই সকল রোগের একমাত্র মহৌষধ!

এই জীবনী শক্তির অভাব হইতে থাকিলে অস্ত্র চিকিৎসার বা ঔষধ সেবনে কবে মানুষের রোগ সারিয়াছে! চিকিৎসায় মানুষের জীবনীশক্তি কখনো বাড়াইতে পারে না। চিকিৎসাটা আজ কাল আমাদের মত এক শ্রেণী লোকের জীবিকা উপার্জ্জনের একটা অত্যুজ্জ্বল ছলনা মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি বলিলাম—চিকিৎসার মূল্য যাই হোক না কেন, চিকিৎসা যে পর্য্যন্ত দোকানদারী ছাড়িয়া একমাত্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের অন্তর্ভূক্ত না হইবে, ততদিন দরিদ্র লোক চিকিৎসকের নিকট প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হইবে।

আমার এই মতের প্রতিবাদ করিয়া ডাক্তার বলেন যে পৃথিবী হইতে চিকিৎসার মূল্য একেবারে উঠিয়া গেলে, জীবন ধারণের জন্য মানুষকে অন্যের নিকট কতটা ঋণী থাকিতে হয়, সে কথাটা জগতের রোগী নিরোগ সকল মনুষ্যই একেবারে ভুলিয়া যাইবে। অথচ সেটা সব সময় মনে থাকা সামাজিক মনুষ্যের মস্ত একটা শিক্ষা। বিনা মূল্যের প্রত্যুপকার মানুষকে কেবল অকৃতজ্ঞতাই শিক্ষা দিতে পারে। আমাদের আকাশ বাতাস রৌদ্র বৃষ্টি প্রতিদিন বিনা মূল্যে আমাদের কত খানি দিয়া যাইতেছে, মানুষ তাহা বুঝিত, যদি তার মূল্য চুকাইয়া লইবার জন্য একজন কেউ থাকিত!

ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর মত এই যে মানুষের ভোগ তৃষ্ণা এ পৃথিবীতে তৃপ্ত হয় না বলিয়াই মৃত্যুর পরে ও পরলোকে তার তৃপ্তির কোন সুবন্দোবস্ত করা যায় কিনা সৃষ্টির আদি কাল হইতে এই লইয়া মানুষের চিত্তে যে সমুদয় জল্পনা কল্পনা আবিষ্কৃত হইয়াছে তারি উপর নানা ধর্ম্মের নানা মত সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের এই অতৃপ্ত ভোগ তৃষ্ণাই মানুষের অসীম ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সক্ষম একটী সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের মূর্ত্তি নিজের মনে খোদাই করিয়া কাল্পনিক স্বর্গ লোকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বাস্তবিক মানুষই আপন আপন রুচি অনুসারে মনের মত ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। মানুষকে কোনো ঈশ্বর কখনো সৃষ্টি করেন নাই!

এরূপ অতি প্রাকৃত মানুষ আর আমার কখনো চক্ষে পড়ে নাই। আমি নিজের মনে হাসিয়া ভাবিলাম, আমাদের সেকালের প্রজাপতি ঠাকুরদা বার্দ্ধক্য হেতু ডাক্তারের মনের পরদা গুলি সাজাইবার সময় কোথাও এমন একটা কিছু মারাত্মক ভুল করিয়া রাখিয়াছেন, যার ফলে সকল জিনিষের ছবিই তাঁর মনের উপর উল্টে হইয়াই পড়ে। মানুষকে ভগবান অনেক দান করিয়াও তাকে তিনি ইচ্ছা করিলে কত চির-দরিদ্র করিয়া রাখিতে পারেন, সে রহস্য বোধ করি ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় না হইলে আমি কখনো বুঝিতেই পারিতাম না!

কখনো কখনো তাঁর নাস্তিকতা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহের কালো মেঘের উদয় হইত। তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে কখনো কখনো আমার মনে হইত যেন একটা চলন্ত অনন্ত কলের ভিতর হইতে ক্ষণকালের জন্য ডাক্তারেরই মত আরেকটী মানুষ—আমাদেরই মত রক্ত মাংসের দেহ, আমাদেরই মত আকাঙ্ক্ষা বেদনা ময় মানব হৃদয় লইয়া তাঁর মনের অগোচরে বাহির হইয়া আসিয়া আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইত। তাঁর দীপ্ত মুখ মণ্ডলে, তাঁর চঞ্চল নয়ন প্রান্তে এমনি একটা অশান্ত ফেনিল তরঙ্গ সঙ্কুল হৃদয়োচ্ছ্বাসের বেদনা জাগিয়া উঠিত, যাহা দেখিয়া মনে পড়িয়াছে এই অশান্ত হৃদয়-সাগরের তিমিরাবৃত তটপ্রান্তে কোথাও কি একটী শিশির-সিক্ত শ্যামল বসন্ত প্রভাত কোনো তরল স্বর্ণ পরিস্নাত আরক্ত কপোলা উষার লক্ষারাঞ্জিত কনক অঙ্গুলির অমৃত পরশের অপেক্ষায় অনন্তকাল ধরিয়া আসন্ন হইয়া আছে? তাঁর চিত্তের কোন একটা অনাবিষ্কৃত দেশে ঘন পল্লবিত তরুকুঞ্জের পুষ্প সুরভি ছায়া তলে, কত না মধুর কলধ্বনি, কত না অনাদি কালের ভ্রমর গুঞ্জন, একটী মাত্র সাহায্য ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বুঝি চিরকালের জন্য মৌন হইয়া আছে! ডাক্তার আপন হৃদয়ের মধ্যে অমৃতের সন্ধান পান নাই বটে কিন্তু একবার সে চিরবসন্তের সাড়া পাইলে, এক মুহূর্ত্তে তাঁর হৃদয় মরুভূমি শ্যামল হইয়া বেদনার অশ্রুনীরে জগদীশ্বরের পদ্মাসনটী প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে পারে! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমার মনে হইত, এ সবি আমার মনের ভ্রান্তি মাত্র। তাঁর হৃদয় এক অনন্ত অশান্ত হাহাকার ময় মরুভূমি মাত্র। তাঁর মনের শুষ্ক ঐশ্বর্য্য রাশির

মাঝে নিখিল আনন্দের সরলতা লাগিয়া হৃদয়ের একটী শুষ্ক-শাখাও শ্যামল হইয়া উঠে নাই। ডাক্তারের হৃদয়ে অন্ধ নাস্তিকতা বই আর কিছুই ছিল না।

৩

সে দিন সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বেড়াইতে যখন অশ্বখুরের আকৃতি বিশিষ্ট মোতিঝিলের কিনারায় আসিয়া পঁহুছিলাম, তখন আকাশের চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মোতিঝিলের পদ্মের কুঁড়িগুলি পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় প্রভাতের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে থাকিয়া থাকিয়া মৃদু পবনে শিহরিয়া উঠিতেছিল। ঘননীল বনানীর নিবিড় বাহু বন্ধনের ভিতরে মোতিঝিলের মসজিদের চূড়াগুলি স্বর্ণাশ্রু ধারায় সিক্ত করিয়া দিয়া স্বপ্নের চাঁদ এক টুকরা ছিন্ন মেঘের আঁচল ধরিয়া মাতালের মত, নীলাকাশে কোনো মতে দুলিতেছিল। চারিদিকে লোকালয় হীন বনবাজির হৃদয় মুখরিত করিয়া নিশীথের ঝিল্লি রব মৃত্যুপথের দুই ধারে এক টানা সুরের তরঙ্গ তুলিয়া পৃথিবী হইতে বরাবর যেন স্বপ্নলোকের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে!

এরূপ নীরব জ্যোৎস্নালোকে মোতিঝিলের কিনারায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার পর, আমার মনে হইতে লাগিল, যেন মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের রক্তাক্ত পরিচ্ছেদ গুলি সন্ধ্যার পবনে কোনো অদৃশ্য স্বপ্নলোক হইতে ভাসিয়া আসিয়া মোতিঝিলের জ্যোৎস্নামাখা নাট্যশালায় পুনরাভিনয় সুরু করিয়া দিবে!—সে আশ্চর্য্য সময়ের যেন আর বেশী দেরী নাই!

মনে পড়িল, হয়ত এমনি এক নীরব জ্যোৎস্না রাত্রে সিরাজের লুণ্ঠনোৎপীড়িতা ঘাসেটী বেগম এই মোতিঝিলেই যখন ক্লাইবের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া ইংরেজ বণিকের নিকট আপনার লাঞ্ছনার কাহিনী জানাইতে ছিলেন, তখন সে মর্ম্মবেদনাতেই বুঝি বাংলার রাজ সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বুঝি বা এমনি রাত্রে সাদানা ফকির রাজ কুল বধূ হতভাগিনী লুৎফউন্নিসার পেলব বাহুবন্ধনের ভিতর হইতে পলাতক সিরাজকে ছিন্ন করিয়া নিলে তাঁর নিরুপায় কান্নার সম্মুখস্থিত অভুক্ত রুটী সহসা বিষের মত নীল হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর দেখিলাম, জাফ্রাগঞ্জের দরবারে আপনার বিশ্বাস ঘাতক সেনাপতির সম্মুখে হতভাগ্য সিরাজ কঠোর লৌহ শৃঙ্খলে বন্দী! অদূরে মীরণ উজ্জ্বল স্বর্ণপাত্রে প্রদীপ্ত মণিরত্ন-রাশি পুঞ্জীভূত করিয়া যখন মহম্মদী বেগকে গুপ্তঘাতকের শানিত ছুরিকা হতভাগ্য সিরাজের বক্ষে বিদ্ধ করিবার জন্য প্রলোভিত করিতেছিল, তখন লোক চক্ষুর অন্তরালে মীরণের মাথার উপর নিয়তির কালমেঘ প্রাণনাশী বিদ্যুৎশক্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল!

ঠিক সেই সময়ে নিকটস্থিত জঙ্গলের ভিতরে সজীব মনুষ্যের বেদনা বিধুর রোদনধ্বনি শুনিয়া আমি যেন একবার চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু তখনো আমি ইতিহাসের স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম বলিয়া আমার বাস্তবের রাজ্যে ফিরিতে বিলম্ব হইল। প্রথমে সে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া আমার মনে হইল বুঝি নিবিড় বনান্তরাল হইতে কোনো তরুলতা সমাচ্ছন্ন অদৃশ্য সমাধিতল বিদীর্ণ করিয়া ফৈজীর অতৃপ্ত আত্মার বিপুল রোদনধ্বনি সন্ধ্যার আকাশ বাতাস ব্যথিত করিয়া কোন লোকলোকান্তরে ভাসিয়া চলিয়াছে! ফৈজী!—দিল্লীর পুষ্পোদ্যানের অম্লান নৈশরাণী, অনিন্দ্যসুন্দরী ফৈজী! সিরাজ যাকে দিল্লির সৌন্দর্য্যের পণ্যশালা হইতে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রায় কিনিয়া আনিয়া অবশেষে জীবন্তে সমাহিত করিয়া নারীর হৃদয়ের উপর দাসত্বের রাজমূল্য অনন্তকালের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন! কাণ পাতিয়া যেন স্পষ্টই শুনিতে পাইলাম, তরুমর্ম্মর তারি বিদীর্ণ হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা-সঙ্গীত মুর্শিদাবাদের ধ্বংশরাশির উপর দিয়া চিরকাল ধ্বনিত হইতেছে! কিন্তু একি শুধু অতীতের রক্তরঞ্জিত নাট্যশালায় অভিনীত ইতিহাসের কাতর ক্রন্দন, একি সুধু—সচেতন সুখদুঃখের অতীত পরলোকের অনন্ত অশান্ত ক্রন্দনের ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি মাত্র!—না-না! সে নীরব সন্ধ্যার নিরানন্দ ক্রন্দন ধ্বনির সঙ্গে যে আমাদের রক্ত মাংসের দেহমনের সুখদুঃখের সদ্য-নিস্থত অশ্রুধারার একান্ত যোগ ছিল! সে যে আমাদের পরিদৃশ্যমান জগতের সতত অভিনীত ভগ্নহৃদয়ের সচেতন উচ্ছ্বসিত আকুল সান্ত্বনাহীন ক্রন্দনধ্বনি! আর আমার মনে কোথাও ইতস্ততঃ থাকিল না। ইতিহাসের স্বপ্নলোক আমার পেছনে পড়িয়া রহিল—আমি আর

মুহূর্ত্তেক বিলম্ব না করিয়া সে অধীর বেদনা-কম্পিত রোদনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া লোকহীন সন্ধ্যার তটে ঝিল্লী কম্পিত মৃদু অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যের ভিতর উন্মত্তের মত প্রবেশ করিলাম!

নিবিড় জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে কতক্ষণ পাগলের মত ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া একটা ফাঁকা যায়গায় আসিয়া স্থির হইয়া নিশ্বাস লইয়া বাঁচিলাম; সেই ফাঁকা যায়গার চারিদিকে নীল জঙ্গলের বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে তখন জোনাকজ্বালা দীলালির আলোর হাট বসিয়া গিয়াছে! সবুজ ঘাসের উপর চাঁদের আলো যেন সবুজ রঙের হাওয়ার সাড়ীর মত ফাঁকা যায়গাটীর অঙ্গে ছড়াইয়া জড়াইয়া গিয়াছে! তার উপর একটী সবুজ সমাধি শিশির সিক্ত জ্যোৎস্নায় অত্যন্ত অশ্রুময় হইয়া উঠিয়াছে! কবরের এক পাশের দেয়ালের কুলুঙ্গির ভিতরে একটী মৃদু দীপরেখা অগুরুর সুগন্ধি ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া চিত্রার্পিত দীপরেখার মত অনুজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছিল!

কবরের উপর অসংখ্য পুষ্পরাশি বিক্ষিপ্ত! আর কে একটী মানুষ সেই কবরের উপর একটী হাত রাখিয়া জ্যোৎস্না-সিক্ত আকাশের লুপ্ত প্রায় নক্ষত্র পুঞ্জের ভিতরে কবর যেন স্নিগ্ধ দৃষ্টি ধারার অন্বেষণ করিতেছিল! তার মুখের উপর দুটী অশ্রুরেখা মৃদু জ্যোৎস্নায় স্বর্ণরেখার মত ঝিকমিক করিতেছিল! কবরের ফুলের রূপরস স্পর্শের সঙ্গে মানুষের স্নেহ ও অশ্রু মিশিয়া গিয়া যেন মৃত্যুকেও সেখানে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল।

লোকটীর মুখের পানে চাহিয়া চিনিলাম, তিনি আর কেহ নহেন, আমার সেই জাফ্রাগঞ্জের কবরস্থানের বন্ধু ডাক্তার ধীরেশচন্দ্র! বাস্তবিক কবরের উপরকার বনফুল তাঁর হৃদয়ের স্পর্শে অশ্রু হইয়া গিয়াছিল, কি তাঁর অশ্রুই কবরের উপর পড়িয়া শিশিরসিক্ত ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিছু মাত্র স্থির করিতে না পারিয়া অনেকক্ষণ আমি সেখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। আমার মনে হইল, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝামাঝি স্থানে সে জ্যোৎস্নার সমাধি যেন ফুলের গন্ধে ও হৃদয়ের গন্ধে উথলিতেছিল! জানি না, সে সুন্দর স্থানে, সে ঝিল্লিমুখর জোনাকজ্বালা স্বপ্নের নাট্যশালায় প্রেমের ভিতরে ইহলোক আসিয়া পরলোকের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল কিনা, কিন্তু আমি সে সকরুণ সুন্দর মরণের তটে তদ্গত ভক্তের এত সাধের তপ ভঙ্গ করিয়া দিব, তত বড় নিষ্ঠুর নই! তাই ডাক্তারকে একটী মাত্র কথাও না বলিয়া সেখানে আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম!

কিছুকাল পরে ডাক্তার চক্ষু মুছিয়া পেছন ফিরিতেই আমাকে দেখিতে পাইয়া যেন একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, কিন্তু দুঃখিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না! আমি একটু আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলাম,—

"জগদীশ্বরকে আমার ধন্যবাদ, যে এতদিনে তিনি আমার ভুল ভাঙ্গিলেন!" ডাক্তার স্বপ্নাবিষ্টের মত উদাস ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম!"

আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "আপনি হিন্দু না হতে পারেন, ডাক্তার বাবু, কিন্তু আপনি কখনো নাস্তিক নন!"

ডাক্তার অবিচলিত ভাবে উত্তর করিল,—

"এ তোমার চোখের ভুল, আমি ঘোরতর নাস্তিক!"

আমি খুব জোরের সহিতই বলিয়া উঠিলাম, "আপনার মুখের কথার চাইতেও যদি আমি স্বচক্ষে দেখাকে বেশী বিশ্বাস করে থাকি, তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ভুল বুঝিবার কোনো কারণ নেই!"

ডাক্তার একটু উদার ভাবে বলিলেন,—"আছে! কিন্তু সব কথাটা খুলে না বলা পর্য্যন্ত সহজে তোমার সন্দেহটা দূর হবে না—"

আমি একটু সপ্রতিভ ভাবে বলিলাম,—"যদি কোনো আপত্তি না থাকে তবে"—

ডাক্তার একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন:—

"বলতে বলতে হয়ত একাদশীর চাঁদ ডুবে যাবে! অত রাত পর্য্যন্ত ধৈর্য্যরক্ষা করে শোনা"—

আমি অত্যন্ত ব্যগ্রস্বরে বলিলাম:—"ভোর রাত্রি পর্য্যন্ত রাজীনামা দিচ্ছি!" ডাক্তার একটু খুসী হইয়া বলিলেন:—"তবে চল, মোতিঝিলের ঐ বাঁধা ঘাটটার উপরে গিয়া বসি! সেই খানেই আমার কথাটা জমবে ভালো, কারণ ঐ বাঁধা ঘাটেই, এমনি জ্যোৎস্না রাত্রে আমার জীবনের একটী অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার ঘটেছিল!"

৪

জ্যোৎস্নালোকিত গম্ভীর রাত্রে মোতিঝিলের বাঁধা ঘাটের উপর বসিয়া ডাক্তার স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত চন্দনবাটী নামক এক পল্লীগ্রামে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে শুনিয়াছি, আমার জন্ম। কিন্তু নিজের কুল সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেই আমার কুল নির্ম্মূল হইয়াছিল। পৈত্রিক উত্তরাধিকার সূত্রে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দৈন্যকেই একমাত্র সম্পত্তিরূপে লাভ করিয়া আমি যখন একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমি উলঙ্গ শিশু-মাত্র। এই যদি তোমাদের করুণাময় পরমেশ্বরের অসীম করুণার নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিতে চাও, হবে, তাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি যে নাস্তিক, তবু আমি তোমাদের ঈশ্বরের ঘাড়ে করুণার অতবড় একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত চাপাইয়া তোমাদের কল্পনা শক্তিকে অযথা তিরস্কার করিতে ইচ্ছা করি না।

আমি যখন পিতামাতাকে হারাইয়া একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার অবস্থাপন্ন আত্মীয় কুটুম্বদের ঘরে আমার জন্য মাথা রাখিবার মত এত টুকুও যায়গা পাওয়া গেল না। আমি ছাড়াও তাঁদের নিজেদেরই ঝঞ্ঝাটের অন্ত ছিল না; তার উপরে আমার মত হতভাগ্য জীবকে বহিবার সাধ বা অবসর তাঁদের কারো ছিল না, এটা ষোল আনাই সত্য কথা। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটী নিরুপায় ব্রাহ্মণের বিধবা ছিলেন, পরের ঝঞ্ঝাট সহিবার মত মনের ক্ষমতা একা তাঁরি ছিল, কারণ তাঁর ঘরে থাকিবার মত, আর কিছুই ছিল না।

আমি জানি আমার শৈশবের পনেরোটী বছর তাঁর অপরিসীম স্নেহে দুঃখের মাঝেও কত সুখে কাটিয়াছিল। কিন্তু তাঁর স্নেহের মর্য্যাদা এবং তাঁর আত্মত্যাগের মাধুর্য্য আমি ষোল বছর বয়সে পা দিয়া তবে বুঝিতে পারিলাম বাস্তবিক জন্মের পর মানুষের বুদ্ধি এতই ধীরগামী হইয়া থাকে। যারা আত্মীয় হইয়াও আমাকে দাঁড়াইবার মত একটু স্থান দিতেও বিমুখ হইলেন, আমার মত গৃহহীনকে ঘরে লওয়ার বিধবার বিচারের ভার গিয়া পড়িল তাঁদেরি হাতে। বাঃ! তোমাদের পরমেশ্বরের বিচারের ব্যবস্থা কি চমৎকার!

তাঁরা যে সমুদয় কাণ্ড করিলেন, সে সব খুলিয়া বলিতে হইলে আরব্য উপন্যাসের মত একাধিক সহস্র রজনীতেও আমার কাহিনী শেষ করিয়া উঠিতে পারিব না। সংক্ষেপে এইটুকু জানিয়া রাখ যে তাঁরা সেই চির-দুঃখিনী বিধবার মাথায় লজ্জাকর কলঙ্কের বোঝা চাপিয়া দিয়া তাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এত বড় অপরাধে তাঁরা বিধবাকে যে ফাঁসির হুকুম দেন নাই, আমি ভাবি সেই তো তাঁদের অনুগ্রহ। বিধবা হাসি মুখে সমাজ ত্যাগ করিয়া আসিলেন, কিন্তু আমাকে কখনো ত্যাগ করেন নাই। আমাকে লইয়া সমাজের নিকট পনেরোটী বৎসর তিনি যে লাঞ্ছনা পাইয়া ছিলেন, সে সব কি তোমাদের পরমেশ্বরের দান? তোমরাই জান, তোমাদের পরমেশ্বর কেমন।

ষোল বৎসর বয়সে পা দিয়া যে দিন প্রথম টের পাই-লাম যে আমারি দুষ্টজন্ম নক্ষত্র বিধবাকেও আমার সঙ্গে সমাজের বাহিরে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, সেই দিনই আমি তাঁর চরণধূলি মাথায় লইয়া চন্দনবাটী হইতে প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম। সে সময় আমার বিপন্ন হৃদয় ব্যতীত আমার সঙ্গে আর কেহই ছিল না,—বোধকরি তোমাদের করুণাময় জগদীশ্বরও না।

চন্দনবাটী হইতে বাহির হইয়া মনে করিলাম এবার একেবারে হৃদয়হীন, স্বার্থ কলুষিত হিংস্র পৃথিবীটার বাহিরে যদি কোথাও একটু আরামের স্থান পাই, তবে একেবারে সেই খানে গিয়াই দাঁড়াইব। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে যখন তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমার পথ চলা বন্ধ হইয়া গেল, তখন দেখিতে পাইলাম, আমি মুর্শিদাবাদ সহরে আসিয়া পঁহুছিয়াছি।

মুর্শিদাবাদ সহরে আমি কাউকে চিনিনা কিন্তু সেজন্য আমার কোনো দুঃখ হইল না। কারণ আমার জন্মের প্রথম দুর্ভাগ্যের দিন হইতে সর্ব্বত্রই আমার আসা, অপরিচিতের মধ্যেই আসা। বিদেশে বাহির হইবার পূর্ব্বে জন্মভূমির যেটুকু চিনিয়া আসিয়াছি, সে টুকুও আমার অচেনা থাকিলে অন্ততঃ জন্মভূমিকে ভালবাসিতে পারিতাম।

সারাদিন মুর্শিদাবাদের ধূলিধূসরিত রাজপথে শুষ্ক-মুখে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, রাস্তায় লোক চলাচলের ভিড় নাই। দুচারিটী তকমা পরা নকল মানুষকে বড়

লোকের পোষা হনুমানের মত হাসিতে দেখিলাম এবং একাল সেকালের রংকরা বড় মানুষদের রাস্তার উপর আশ্চর্য্য পুতুল নাচ দেখিয়া যে কিছু কৌতুকও না পাইলাম তা নয়। কিন্তু বড় লোকের সহরেও খাঁটী মানুষের হৃদয়ের সন্ধান না পাইয়া আমার কৌতুকস্পৃহা অতি সহজেই চরিতার্থ হইয়া গেল।

সে যাহা হোক, পড়ো সহরে হৃদয়ের সন্ধান না পাইলেও, পড়োঘর ও ভাঙ্গা দালানের অসদ্ভাব ছিল না। সন্ধ্যার পর যখন এমনি একটা পড়ো বাড়ীর সমুখে গিয়া বসিয়া পড়িলাম, তখন দারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল কিন্তু কাঁদিবার মত সজল নয়ন ধারা তখন আমার চোখে ছিল না। অবশেষে ক্লান্ত দেহমন লইয়া আমি যে কখন সেখানে ঘুমাইয়া পড়িলাম, সে খবর আমি নিজেই ভাল করিয়া জানি না।

যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখি একটী ঝাউ গাছের শাখা ব্যবচ্ছেদের ভিতরে চাঁদের ছবিটী অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর দেখিতে পাইলাম, একটী সুন্দরী মুসলমান যুবতী একটী চীনামাটীর রেকাবে কতকগুলি সুমিষ্ট ফলের গুচ্ছ সাজাইয়া আমার সমুখে রাখিয়া দিয়া, স্নেহ-বিস্ময় মণ্ডিত চোখে আমার পানে তাকাইয়া আছে। তেমন দুটী চোখের ভিতর মধুরতর হৃদয়ের সংবাদ পাইয়া সে সময়ে জীবনে একটী বারের জন্য তোমাদের করুণাময় পরমেশ্বরের কথা আমার মনে হইয়াছিল বটে। কারণ সান্দ্র নেত্র পল্লবের স্নিগ্ধ ছায়ায় নীল নক্ষত্রের মত তেমন দুটী করুণা বিগলিত চক্ষু আমি জীবনে কখনো দেখি নাই।

সে ক্ষীণাঙ্গী মুসলমান সুন্দরীর সুনীল স্নেহ দৃষ্টির ভিতরে আমি জীবনে সর্ব্বপ্রথম নারী হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, সে অপরিচিতার নব বসন্তের অস্ফুট মাধুরী পূর্ণ চক্ষের মাঝে যে আনন্দ রাজ্যের সংবাদ পাইলাম, তাহা যেন এতকাল আমার নিকট রুদ্ধ ছিল। আমি যেন এক মুহূর্ত্তে শৈশব হইতে যৌবনের সুমধুর স্বপ্নরাজ্যে পদার্পণ করিলাম। আমার চক্ষু যেন সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর শ্যামল সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চিরকালের জন্য ধন্য হইয়া গেল।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া যুবতী তার চম্পক দামতুল্য অঙ্গুলিটী তুলিয়া সমুখের ভাঙ্গাবাটী দেখাইয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিল :—"এই তো আপাততঃ তোমার দৌলত খান।"—

আমি সাশ্রুনেত্রে যুবতীর পানে তাকাইয়া বলিলাম;—"ভাঙ্গাবাড়ীর ভাড়া দিয়ে বাস করবার ক্ষমতাও আমার নেই। এ পৃথিবীতে আমি অত বড়ই নিঃস্ব।"

যুবতী রাজরাণীর মত আমার প্রতি সুমধুর স্নেহের আদেশ প্রচার করিয়া বলিল, "তুমি গিয়া তোমার দৌলতখানা নির্ভয়ে দখল কর। বনের পায়রাকে মিউনিসিপালিটীর টেক্স দিতে হয় না।"

যুবতীর নাম ফিরোজা বিবি। সে আমার ভাঙ্গাবাড়ীর প্রতিবেশী, এক মুসলমান ধুনকরের পালক মেয়ে। লক্ষ্মীর সোণার আঁচলের সাড়া পাইয়া দৈন্য যেমন খিড়কী দরজা দিয়া পলায়নের পথ পায় না, ফিরোজার খোস মেজাজের মিঠা হাওয়া লাগিয়া আমার ভাঙ্গাঘরের শূন্য ভাণ্ডার যেন তেমনি দিন দিন রাজৈশ্বর্য্যে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। ফিরোজার স্নেহে আমার অন্নাভাব দূর হইয়া গেল। সে নিজে আসিয়া আমার ভাঙ্গা দালানে রীতিমত বৈঠকখানা সাজাইয়া ছিল। একদিন সে নিজামতের মুন্সীকে ডাকাইয়া আনিয়া আমাকে মণিবেগমের বিনামাইনার ইস্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিল। আমি নিরবচ্ছিন্ন দৈন্যের শিশু হইয়াও যে হৃদয়ে মানুষ হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, এবং সেই দুরাকাঙ্ক্ষার একটী তরঙ্গই যে এক ধাক্কায় আমাকে চন্দনবাটী হইতে মুর্শিদাবাদে আনিয়া ফেলিয়াছে, সে কথা আমি নিজে ফিরোজাকে কখনো বলি নাই কিন্তু সে আমার মুখ দেখিয়াই আমার সবটুকু হৃদয় যুক্তাক্ষরহীন সহজ শিশু-শিক্ষার মত পড়িয়া লইয়াছিল।

ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াই ফিরোজা আজকালকার অভিভাবকদের মত সহজে নিশ্চিন্ত হইল না। সে নিজামতের মুন্সীকে দিয়া মাঝে মাঝে আমার শিক্ষকের নিকট খোঁজ লইত, আমি রীতিমত পড়াশুনা করিতেছি কি না। কতদিন তাকে কপাটের আড়ালে লুকাইয়া আমার পড়া শুনিতে দেখিয়াছি। তুবড়ীর মধুর ধ্বনি শুনিয়া দৃপ্তা ভুজঙ্গিনী যেমন মুগ্ধ হইয়া যায়, আমাকে মনযোগের সহিত পড়া করিতে দেখিয়া কপাটের আড়াল হইতে তার

নীল পদ্মের মত দুটী সুন্দর চক্ষু আনন্দের সূর্য্যোলোকে প্রফুল্ল হইয়া উঠিত! সে চোখের—আফিমের মত নেশায় যদি আমার মনটা জড়াইয়া যাইত, পড়ার পুঁথির আখরের মাঝে যদি আমি ফিরোজাকেই দেখিয়া আনমনা হইয়া পরিতাম, ফিরোজা কোথা হইতে বৈশাখী ঝড়ের মত আমার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তর্জ্জন করিয়া বলিত:—"ফের যদি তোমার পড়াশুনায় এমন অমনোযোগ দেখি, তবে আমি তোমার পড়ার খড়চা সব বন্ধ করিয়া দিব।"

ফিরোজার নিকট গালি খাইয়া আমার চোখের পাতা পর্য্যন্ত সারামুখ লাল হইয়া উঠিত। কারণ আমি জানিতাম, পড়া না করা ছাড়াও আমার হৃদয় তাঁর সৌন্দর্য্যের নিকট কত বড় অপরাধী!

ফিরোজা অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত আমার স্নেহের সমুদয় অত্যাচার সহ্য করিয়া রণজয়ের রক্তপতাকা উড়াইয়া প্রতিদিন চলিয়া যাইত। তার স্নেহের দানের অন্ত ছিল না; কিন্তু তার যেটুকু স্বপ্ন লইয়া আমার হৃদয়ে নিশিদিন গোলপী ঝড় বহিয়া যাইত, সেটা আমার চুরি! ফিরোজা তার চোরাই মালের সবটুকু স্বত্বত্যাগ করিয়া আমায় মুখ ফুটিয়া কিছু বলে নাই বলিয়া সময় সময় আমি অভিমান করিয়া ভাবিতাম, এত দান করিয়াও সত্যি সত্যি ফিরোজা বুঝি আমাকে কিছুই দেয় নাই! অথচ আমাকে সুখী করিয়া তার যে সুখ, আমার তৃপ্তিতে তার যে কি আনন্দ, আমার সফলতায় তার যে কি গৌরব, সে কথাটীর মর্ম্ম আমার মনে কখনো উদয় হয় নাই। বাস্তবিক মানুষের লোভ চিরদিনই এমন কাঙ্গাল, এত স্বার্থপর! এই ফিরোজাকে লইয়া আমার হৃদয়ের অদৃশ্য রাজ্যে যে বিচিত্র সুখ দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছিল, আমি তার ভিতর দিয়াই যেন তাড়াতাড়ি বয়সের অধিক অনেক খানি বড় হইয়া উঠিলাম!

ফিরোজার অজস্র ক্ষরিত স্নেহ ধারায় আমি যেমন একদিকে মানুষ হইয়া উঠিতে লাগিলাম, অপর দিকে তার নবপল্লবিত সৌন্দর্য্যের নীরব অত্যাচারে আমার নবোদ্ভিন্ন তরুণ হৃদয় একেবারে রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। একি স্নেহ, একি উৎপীড়ন! একি দয়া, একি নিষ্ঠুরতা! একি স্বর্গ নরকের আশ্চর্য্য সমাবেশ। এক দিন আমি সাহস করিয়া কথার ইঙ্গিতে আমার হৃদয় বেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলাম:—"ফিরোজা তোমার ভাঙ্গা ঘরে সোণার ভাণ্ডারটী কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, দেখতে আমার সাধ হয়!

ফিরোজা আস্তে আস্তে পদ্মের মৃণালের মত হাত খানা আপন হৃদয়ে রাখিয়া আকাশের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর করিল:—পুরুষের দশ দিক, স্ত্রীলোকের এক হৃদয় সম্বল!"

আমি অতি মৃদুস্বরে বলিলাম,—"আমি যদি কোনো দিন মানুষ হই ফিরোজা!"—

ফিরোজা তার মুখ খানার উপর একটু ম্লান হাসি ছড়াইয়া দিয়া বলিল—"সে দিন মানুষ করার সখ আমার মিটবে!"

আমি একবার ভাব-বিভোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম "তাতে তোমার মানুষ করবার সখ মিটতে পারে কিন্তু আমি বলচি, আমার মানুষ হওয়া মিথ্যা হবে, যদি আমার হৃদয়টা তোমার পায়ের উপর জন্মের মত বিসর্জ্জন করতে না পারি!"

মুহূর্ত্তের জন্য ফিরোজার মুখ খানা তার পারশী মাকড়ি পড়া কর্ণমূল দুটী পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রভাতের চাঁদের মত অত্যন্ত পাংশুর হইয়া গেল। ফিরোজা পাথরের মত আবেগহীন চক্ষে আমার পানে চাহিয়া বলিল:—"তুমি অমন আশা কখনো মনে স্থান দিয়ো না। আমি বিবাহিতা, এক স্বামীর হৃদয় ছাড়া আর কিছু রাখবার আমার যায়গা কোথায়?"

ফিরোজার সুনীল চক্ষে একদিন আমি যে পরমেশ্বরকে দেখিয়াছিলাম, সে এক মুহূর্ত্তের ঝড়ে ধূলিসাৎ হইয়া আমার হৃদয়হীন নাস্তিকতার মাঝে চিরদিনের মত বিলীন হইয়া গেল। আমি আজো নাস্তিক, কালো নাস্তিক, হায়! তোমাদের পরমেশ্বরের উপর আর কোন বিশ্বাসই রাখিতে পারিলাম না!

যথা সময়ে আমি মণি বেগমের ইস্কুলে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পাশ হইয়া কলিকাতা ম্যাডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ডাক্তারি পড়িতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু কলিকাতায় ডাক্তারি পড়ার সঙ্গতি আমার ছিল না,—কিন্তু অবস্থার সঙ্গে মিল রাখিয়া জীবনের কোনো কাজ করিতেই আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ফিরোজা আমার জন্য যা করিয়াছে, এ জগতে তার তুলনা নাই। কিন্তু আমি আর কোন মুখে তার নিকটে কলিকাতায় পড়ার খরচ চাহিব! কলিকাতা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া ফিরোজাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলাম,—

"শুনেচ ফিরোজা আমি পরীক্ষায় পাশ হয়েচি?"

ফিরোজা ঝড়ের মত খুব এক পশলা হাসিয়া বলিল,—

"সে আবার কি কথা. তোমার বলা উচিত ছিল, ফিরোজা আমায় মানুষ করে দিয়েছে !

আমি ছল ছল চোখে মাটির পানে মুখ করিয়া বলিলাম :—"তুমি মানুষ করতে কসুর কর নি, কিন্তু আমি যে এখনো মানুষ হই নি। মানুষ যদি কখনো হই, তবে তোমার কথা ভুলবো না।"

ফিরোজা হাসিয়া বলিল :—"মানুষ হয়ে তুমি ফিরোজাকে মনে রাখবে, শুনে খুসী হলুম, কিন্তু তোমার মানুষ না হওয়া পর্য্যন্ত ফিরোজাকে তো তোমায় মনে রাখতে হবে। এখন কি করবে ঠিক করেছ ?"

"কলকাতায় ডাক্তারি পড়বো।"

"তারপর"

আমি কাতর ভাবে বলিলাম,—সেখানে কি আর ফিরোজা আছে যে আমাকে এমন করে সুখে দুঃখের ভিতর মানুষ করে তুলবে। সে খানে আমার নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে।"

ফিরোজা বিজয় গর্ব্বিতা রাণীর মত বলিল :—

"তুমি মনে করো না, নির্ব্বোধ, মুর্শিদাবাদের বাসা ভেঙেই ফিরোজাকে এড়াতে পারবে। আমার নবাব বাড়ীর বেগম মহলে সুর্ম্মা বিক্রি করে যে মাইনে হয়, তাতেই তোমার কলকাতার পড়ার খরচাও চলে যাবে এখন। সে জন্য তোমার ভাবনা কি।"

আমি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে ফিরোজার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলাম,—তোমার সুর্ম্মার ভিতরে হীরার কুচী আছে নাকি, যে আমাকে মানুষ করে না তোলা পর্য্যন্ত কিছুতেই তোমার আটকায় না।

ফিরোজা হাসিয়া বলিল,—"কেন. তুমি কি কাণা যে তা দেখতে পাওনা।" ফিরোজার সুর্ম্মাপরা ডাগর ডাগর চোখ দুটী যেন হীরার কুচিভরা হাসির সায়রে সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছিল। আমি এমন চোখেই তাকাইলাম যে ফিরোজা হয়তঃ বুঝিল, যে আমি আর যাই হই, অন্ততঃ কানা হই। ফিরোজা তখন তার খোপার ভিতর হইতে একখানা বহুমূল্য হীরকখণ্ড বাহির করিয়া আমার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল :—"এই নাও, তোমার কলকাতায় পড়ার খরচা।"

আমি অবাক হইয়া হাত গুটাইয়া বলিলাম,—"এযে ডাক্তি মাসের হীরার মত দেখাচ্ছে।"

ফিরোজা একটু হাসিয়া বলিল :—"তত বেশী নয়, আমার স্বামীর যৌতুকের তালিকায় দশ হাজার দাম লেখে।"

আমি এবার একেবারে শক্ত হইয়া বলিলাম :—'তোমার স্বামীকে দিয়ে শেষকালে আমাকে চোরাই হীরা রাখার জন্যে জেলে পাঠাতে চাও নাকি ?"

ফিরোজা আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল :— "আমায় অত বোকা মনে করো না তুমি। এই চিঠি দেখে তিনি তোমার কাছ থেকে হীরাটা উচিত দাম দিয়ে কিনে নেবেন এখন। হীরাটার জন্যে তিনি যে একেবারে পাগল।"

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমার স্বামী কি কলকাতায় ?

ফিরোজা গম্ভীর ভাবে বলিল :—"তিনি লক্ষ্ণৌর নবাবের ভাই, মেটেবুরুজে তাঁর বাসা"—

আমি ব্যাকুবের মত ফিরোজার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলাম,—"তবে তোমার এ দুর্দ্দশা কেন ?"

ফিরোজা একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল,—"সে কথা এই হীরার টুকরাকেই একদিন জিজ্ঞাসা করো, জানতে পাবে। এখন শুধু এই টুকুই জেনে রাখ যে অন্দর মহলের নবাবের বেগমদের অনেক ঘাট পার হয়ে, তবে কবরের নীচে এসে পৌঁছাতে হয়। এ দুনিয়ায় নবাবী-আনায় অনেক সুখ।"

এই কথা কটী বলিয়া ডাক্তার হঠাৎ আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার কি বড্ডো ঘুম পাচ্ছে ?"

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম,—"রাত ভোর হবার আর বেশী দেরী নেই! শেষটা শুন্‌বার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠা হচ্ছে।" ডাক্তার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "গল্পটারও আর বড় বেশী বাকী নেই, শেষের অংশ টুকু বড়ই সংক্ষেপ. কিন্তু তুমি খুব মনদিয়ে শুনে যেয়ো।" এই বলিয়া ডাক্তার আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—কলিকাতায় ডাক্তারী পড়া শেষ করিয়া পরীক্ষা-পাশের সুখবরটা ফিরোজার নিকট পৌঁছাইবার জন্য মুর্শিদাবাদে ছুটিয়া আসিলাম।

ধুনকরের নিকট ফিরোজার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই বাঁধাঘাটে, এমনি এক মৃদু শীতল বসন্তের জ্যোৎস্না রাত্রে মোতিঝিলের জলে ফিরোজা ডুবিয়া মরিয়াছে।

এই বলিয়াই ডাক্তার একটা প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে সজোরে আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া দুই চক্ষু অত্যন্ত বড় করিয়া আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"শুনচো ?"

আমি মাথা দিয়া হুঁ ঠুকিলাম বটে কিন্তু আমার

সমস্ত শরীরটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। কারণ সেটা আমার চোখের ভুল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যেন দেখিলাম, কে এক দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী তার ক্ষীণ তনুলতা সিক্ত নীল বসনে সংবৃত করিয়া যখন মোতিঝিল হইতে উঠিয়া আসিয়া অদৃশ্য কোমল চরণ ক্ষেপে আমাদের বাঁধা ঘাটের উপর দিয়া পেছনে আম্র কুঞ্জের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন আকাশের চাঁদ অস্ত শিখরে অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া পৃথিবীর উপর মৃদু অন্ধকারের যবণিকাটী নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করিতে ছিল।

আমি শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ভীতি-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি দেখচেন ?" ডাক্তার স্বপ্নাবিষ্টের মত উদাস ভাবে বলিলেন,—স্বপ্ন! কিছুক্ষণ আমি ও ডাক্তার দুই জনেই মোতিঝিলের বাঁধা ঘাটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলাম।

তারপর ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন—এই সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌর হীরাটী ফিরোজাকে তার স্বামী যৌতুকের মধ্যে দিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া ফিরোজার শ্বশুর তার স্বামীকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইলে ফিরোজাকে লইয়া তার স্বামী মুর্শিদাবাদে পালাইয়া আসেন। কিছুদিন পর, ফিরোজার স্বামী চলিয়া গেলেন; যৌতুকের হীরাটী যাইবার সময় সঙ্গে নিয়া যাইতে চাহিলেন কিন্তু ফিরোজা তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। মেটিয়াবুরুজে ফিরিয়া গিয়া তিনি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি ফিরিয়া পাইলেন বটে কিন্তু এই হীরাটী লইয়া স্বামী স্ত্রীতে জন্মের মত বিচ্ছেদ হইয়া গেল।

ধুনকরের নিকট মৃত্যুর পূর্ব্বে ফিরোজা আমার জন্য রাখিয়া গিয়াছিল, শুধু তার দুটী সুন্দর আদেশ। প্রথম আদেশটী এই যে আমি যদি কখনো ডাক্তারী পাশ করিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসি, তবে নিজ ব্যয়ে ধুনকরদের চিকিৎসার ভার আমাকে লইতে হইবে। স্বামীর স্নেহে আজন্ম বঞ্চিত থাকিয়া যার গৃহে ফিরোজা তার দুঃখের জীবন এমন নিষ্ঠুর ভাবে শেষ করিয়া চলিয়া গেল, এই মনোরম আদেশ টীর ভিতর দিয়া সে সমগ্র ধুনকর সমাজের উপর তার অসীম কৃতজ্ঞতা কি মধুর ভাবেই না চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গেল।

আমার প্রতি তার দ্বিতীয় আদেশটী আরো গভীরতর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত! সেটী ছিল এই যে আমার ধর্ম্মমত যাই কেন হোক না, আমি যদি প্রতি মৃত্যু তিথিতে সমাধির উপর ফুলের অঞ্জলি দিয়া খোদাতাল্লার নিকট পরলোকে তার সুখের কামনা করি, তবে তিনি তার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পরলোকে তাকে সুখী করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস লইয়াই সে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তার পরলোকের সুখের ভার আমার উপর রাখিয়া সে যেন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়াই মরিয়াছে।

আমি নাস্তিক। আমার জীবনের উপর দিয়া এই যে ঘটনার ঝড়গুলি বহিয়া গিয়াছে, তারি ভিতরে তোমাদের ঈশ্বর আমার চক্ষে চিরকালের মত শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছেন!

কিন্তু একটা কথা! আমার উপর খোদাতাল্লাকে ডাকিবার ভারটী রাখিয়া পরলোকে সুখের আকাঙ্ক্ষাটী লইয়া কি নিশ্চিন্ত মনেই সে চলিয়া গিয়াছে। আমার উপর তার চিরদিনের অখণ্ড বিশ্বাস টুকু রাখিয়াই সে এ জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে। আমার মনুষ্যত্বের উপর যদি তার স্নেহের দাবী কিছুমাত্র থাকে, তবে আমি নাস্তিকই হই, আর যাই হই, ফিরোজার চক্ষে বিশ্বাস ঘাতী হইবার আমার কি অধিকার আছে! আমাকে দিয়া ইহলোকে সে যা পায় নাই, পরলোকে যদি সেই টী পাইবার আশা করিয়া থাকে, তবে তার সেই অটল বিশ্বাস টুকুর জন্য আমি ঈশ্বর কে কেন, সয়তানকেও আরাধনা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার ধারণা এই যে ফিরোজার চক্ষে জীবনে মরণে বিশ্বাসঘাতী হওয়ার ভিতরে আমার যে অধর্ম্ম, তা আমার হৃদয়হীন নাস্তিকতাও কখন সইবে না!

ফিরোজার বিশ্বাসের উপর আমার কোনো হাত নাই। কিন্তু তার আদেশ কি আমার সমুদয় নাস্তিকতা অপেক্ষাও বড় নয়? সেই জন্যই আজ তার মৃত্যু বাসরে যখন আমি ফিরোজার হইয়া খোদাতাল্লাকে ডাকিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা! কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নাস্তিক, সে সম্বন্ধে তুমি মনে কোনো সন্দেহ আনিও না!"

তিনি যখন তাঁর সুদীর্ঘ কাহিনী এই বলিয়া শেষ করিলেন, তখন আমি আস্তিক নাস্তিকের ভিতরে কিছুমাত্র তফাৎ না দেখিতে পাইয়া ভক্তির সহিত তাঁর পবিত্র পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ভোরের আলোয় সদর রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। তখনো ডাক্তার সেই মোতিঝিলের বাঁধা ঘাটেই মগ্ন মূকের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

—:০:—

মহাত্মা রামমোহন রায়।

যে কালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সঙ্কটময় যুগ-সন্ধির কাল—তখন পুরাতন অনবরত ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া নিঃশেষ হইতেছে, এবং নূতন স্পষ্টভাবে দেখা না দিলেও পুরাতনের ভগ্নস্তূপের মধ্যে অলক্ষ্যে গজাইয়া উঠিতেছে। তখন বহু শতাব্দীব্যাপী তমোময় যুগ (Dark Age) প্রায় অবসান হইতে চলিয়াছে; এবং অপরদিকে আরেকটা নবযুগের পূর্ব্ব সূচনার সূত্রপাত নীরবে চলিতেছে। ঐ সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেই হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ জাতির পরস্পর সংযোগ ও সংঘর্ষ হইতে যে এক দেশব্যাপী ভূকম্পনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে প্রাচীন প্রথার দুর্ভেদ্য প্রাচীর-ঘেরা হিন্দুসমাজের 'অচলায়তন' কাঁপিয়া ধসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের হিন্দুশক্তি বৃটিশ শক্তির প্রবল আঘাতে চুরমার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্র অভ্যুত্থানের মূলে যে মহৎ ভাবটা ছিল, তাহা সমুদায় ভারতীয় সমাজের ক্ষত বিক্ষত বেদনাময় চিত্তক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ রামমোহন রায়ের আবির্ভাব কালের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী কালটা এক বিশাল নবতর জীবনের বীজ গর্ভে ধারণ করিয়া আসন্নপ্রসবের অসহনীয় বেদনায় যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তির এবং ধর্ম্মপ্রভাবের আলোড়নে তখন হিন্দুসমাজ বহুকালের মোহনিদ্রা হইতে অর্দ্ধজাগরিত হইয়া, একবার সুদূর অতীতের দিকে, আবার অজ্ঞানিত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। আমার ত মনে হয়, সেই সঙ্কটময় কালে বহুধা বিক্ষিপ্ত ভারতীয় সমাজের সমষ্টিগত মনের মধ্যে কি একটা অজ্ঞাত, অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা,—একটা নবীন জীবনের আদর্শের জন্য প্রতীক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল।

দৈবীশক্তিসম্পন্ন, যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের আবির্ভাব আমাদের স্থূল দৃষ্টির নিকট একটা আকস্মিক ঘটনা, একটা প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা বিধাতার নিগূঢ় বিধানের কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ নৈসর্গিক ঘটনা মাত্র। পূর্ব্বোক্ত ভারতীয় সমাজ যে আকাঙ্ক্ষার বেদনা অন্তরে অন্তরে অস্পষ্ট অনুভব করিতেছিল, যে নব জীবনাদর্শকে মনে মনে অন্বেষণ করিতেছিল, তাহাই সাকার মূর্ত্তি ধরিয়া রামমোহন রায়ের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিল।

মহাত্মা রামমোহনের জীবনের কেন্দ্রগত সত্যটি কি, তিনি কোন্ বাণী প্রচার করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, কোন্ আদর্শের প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি নিজের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন? এক কথায় বলিলে, তাহা অদ্বৈততত্ত্ব—ঈশ্বরের একত্ব, এবং মানবের অভিন্নত্ব: একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই আছেন যিনি স্বরূপতঃ এক অপরিচ্ছিন্ন, ত্রিঅঙ্গবিশিষ্ট, কিম্বা বহু অংশে বিভাজ্য নহেন। আর, মানুষে মানুষে প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থক্য নাই—জাতি-বর্ণ স্ত্রী-পুরুষের বাহ্যিক প্রভেদ সত্ত্বেও শক্তি-সামর্থ্য, অধিকার এবং জীবনের লক্ষ্য ও সার্থকতা বিষয়ে একমানুষ অপর মানুষের সদৃশ, সমকক্ষ। এই একই কথা ভাষান্তরে বলিলে, রামমোহনের জীবনের মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র—সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার মন্ত্র। মানুষ সাংসারিক ব্যাপারে, চিন্তাশক্তি পরিচালনে, সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে নিজের অন্তরগত আলোকেরই অনুসরণ করিবে, অপর মানুষের প্রভুত্ব স্বীকার করিবে না, মানুষ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে অপর মানুষের বা শাস্ত্রীয় শাসনের, কিম্বা বহুদেবতার দাসত্ব করিবে না; সে একমাত্র উপাস্য দেবতার অন্তরের নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া নিজের শক্তিতে নিজের পথ কাটিয়া নিবে;—এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতেই রামমোহন জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই নূতন গণতন্ত্রের (Democracy) জন্মভূমি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদের সংবাদে এবং ফরাসী বিপ্লবের শেষভাগে স্বাতন্ত্র্য ও সাম্য মন্ত্রের উপাসকদলের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে তিনি অপূর্ব্ব ভাবসাগরে নিমগ্ন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের অনুরাগই তাঁহার সকল প্রকার সমাজ-সংস্কার, রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার এবং শিক্ষাবিস্তারবিষয়ক চেষ্টার মূলীভূত কারণ। এই জন্যই হিন্দুবিধবার সহমরণ

প্রথার উচ্ছেদ, যুক্তিমূলক পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্ত্তন, জুরীর বিচার সর্ব্বত্রব্যাপী করিবার চেষ্টা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা, সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র পরিচালনা, শ্রমজীবী ও কৃষীজীবীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন, বঙ্গীয় হিন্দুর সম্পত্তির উপর আত্মকর্ত্তৃত্ব অটুট রাখিবার জন্য দায়ভাগের প্রমাণ সংগ্রহ, প্রভৃতি বহুবিধ আয়াসসাধ্য কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত দেখি। অপরদিকে, মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ সরল করিবার জন্য রামমোহন রায় কোন শ্রমকেই শ্রম বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। বস্তুতঃ এই ধর্ম্মানুরাগ এবং আবিলতামুক্ত সত্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই তাঁহার বহুধাবিভক্ত কর্ম্মজীবনের একমাত্র প্রেরক। এই প্রেরণায়ই পিতৃগৃহ তাড়িত, সংসারানভিজ্ঞ ষোড়ষবর্ষীয় বঙ্গীয় বালককে দুর্লঙ্ঘ্য হিমগিরি উত্তীর্ণ হইয়া রহস্যময় তিব্বত রাজ্যে উপস্থিত হইতে দেখি—এই প্রেরণায়ই, সেই সর্ব্বত্রব্যাপী অজ্ঞানতার দিনে তাঁহাকে শুধু আপনার মনীষা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে দেশীয় ও বিদেশীয় বহুতর দুরূহ ভাষা আয়ত্ত করিয়া, নানা বিরুদ্ধ শাস্ত্রের দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া সত্যধর্ম্মের, একেশ্বরবাদের অমৃত ফল আহরণ করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়মূলক এক সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজাতিক ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে দেখি। এই কারণেই তাঁহাকে নির্ভীকচিত্ত মহারথীর ন্যায়, সুযুক্তি ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া, লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারান্ধ ত্রীশ্বরবাদী খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদের বিরুদ্ধে, এবং সংখ্যাহীন সমাজিক কুপ্রথা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে দেখি।

রামমোহন রায়ের মনোপ্রকৃতিতে দুইটি, দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়---একটি, তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকারিণী বুদ্ধি (Analytic intellect), অপরটি, সমন্বয় মূলক গ্রাহিকা শক্তি (Synthetic Assimilation). একদিকে তাঁহাকে যেমন ধর্ম্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনকারীরূপে দেখিতে পাই,—স্তূপীকৃত অসার অসত্যের ভিতর হইতে সত্যের স্বর্ণকণিকা সংগ্রহ করিয়া অসত্যকে নিষ্ঠুর আঘাতে চুরমার করিয়া দিতে দেখি, অপর দিকে আবার, হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ সকল সত্যের খণ্ডগুলির সমবায়ে এক অখণ্ড সত্যের আদর্শ গঠন করিতে দেখি। যে রামমোহন আচার-সর্ব্বস্ব লৌকিক ধর্ম্মের সংহারকরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনিই আবার কি অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যান করিয়া ও মণ্ডক্য, মণ্ডুক, কঠোপনিষদ প্রভৃতির অনুবাদ ও প্রকাশ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় সাধনার অমূল্য রত্নরাজি বিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা করিলেন; আবার হিব্রুভাষার দুরূহতা ভেদ করিয়া যীশুখৃষ্টের অপূর্ব্ব উপদেশাবলী সংকলিত করিয়া জগতের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিলেন।

আমার ত মনে হয়, রামমোহন রায়ের জীবনের মর্ম্মগত সত্য যতটা তাঁহার সমন্বয় ও সংরক্ষণকারিণী শক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে ততটা বিশ্লেষণ শক্তিতে নহে। এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শের উদ্ভাবনা ও প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্বরূপেই তিনি তাঁহার বিশ্লেষণ শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কারক বলিতে আমরা সাধারণতঃ ইংরাজীতে যাহাকে Iconoclast বলে, অর্থাৎ দেবপ্রতিমা ভঙ্গকারী, পরধর্ম্মদ্বেষী, সংকীর্ণচিত্ত ব্যক্তিকে বুঝি। উদারহৃদয়, সত্যোপাসক রামমোহনকে ঐ অর্থে সংস্কারক বলিলে তাঁহার মহত্ত্বকে খাটো করিয়া ফেলা হয়। বস্তুতঃ মনীষী এমার্শন প্রাচীন দার্শনিক Plato সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আধুনিক মহাত্মা রামমোহন সম্বন্ধেও সেই কথা বর্ণে বর্ণে প্রযোজ্য :—

"The Unity of Asia, the details of Europe; the infinitude of the Asiatic soul, and the defining, result-loving, machine-making, surface-seeking, opera-going Europe, Plato came to join, and by contact, to enhance the energy of each. The excellence of Europe and Asia is in his brain. The metaphysics and natural philosophy represent the genius of Europe; he substructs the religion of Asia as the base."

যাঁহারা রামমোহন রায়ের জীবনের বিচিত্র চেষ্টা ও ঘটনাবলীর ভিতরকার তাৎপর্য্য ধরিতে পারিয়াছেন

তাঁহারা জানেন, এই মহাত্মার মনোপ্রকৃতির স্তরে স্তরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধনার যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা যেন গ্রথিত রহিয়াছিল। বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বকে তিনি যেমন জীবনের ভিত্তি স্বরূপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মশক্তিকে মুক্তিদিবার জন্য, এবং তাঁহার দৈন্যপীড়িত স্বদেশের দুঃখময় ঐহিক জীবনকে হাস্যোজ্জ্বল করিবার জন্য, যুক্তিমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান এদেশে প্রচলিত করিবার জন্য তিনি কিরূপ প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনটি কঠোর সাধনা এবং অশ্রান্ত ত্যাগের ইতিহাস,—অথচ তিনি সংসার বিমুখী ছিলেন না, ন্যায়োপেত ভোগ হইতে তিনি নিজেকে এবং অন্যকে বঞ্চিত করিতে চাহিতেন না। তাই জীবনের সায়াহ্নে ইংলণ্ড প্রবাস কালে এই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে যেমন ঐ দেশীয় ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরদের সংসর্গ করিতে দেখি, তেমনি সে সময়কার বিখ্যাত অভিনেত্রী Mr. Kembleএর সঙ্গে প্রীতি-সম্ভাষণ করিতে, তাহার অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখি। কারণ, রামমোহনের আদর্শ সেই প্রাচীন ঋষির আচরিত আদর্শ ঃ—

> অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
> ততো ভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
> বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদ উভয়ং সহ।
> অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতম শ্নুতে॥
> ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা, মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

অর্থাৎ জ্ঞানহীন কর্ম্মাসক্তি, কর্ম্মবিহীন জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রত্যেকটিই আমাদের ধ্বংসের হেতু। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের, অনুরাগ ও বৈরাগ্যের, ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য, ঐহিক ও পারত্রিকের সমন্বয়ই আমাদের মুক্তির—ঐহিক ও পারত্রিক মুক্তির—একমাত্র উপায়।

কিন্তু এই প্রাচীন আদর্শ হইতে আমরা বহুকাল স্খলিত হইয়া বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম—এই আদর্শ এতকাল "রাত্রিদিন জীর্ণশাস্ত্রে শুষ্কপত্র মাঝে" রুদ্ধ হইয়া ছিল, জীবনের পরিচালনে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল না। তাই আজ মানুষের এত দুঃখদৈন্য, এত ভয়ভাবনা। তাই, যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তিমন্ত্র, জগৎব্যাপী গণতন্ত্রের ভাব এবং মানবের ভ্রাতৃভাব প্রচার করিতেছিল, কার্য্যতঃ তাহা হইতে এক সর্ব্বসংহারক হলাহল উদ্ভূত হইয়াছে। তাই আজ "জাতি প্রেম নামধারী প্রচণ্ড অন্যায় ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।" ফলতঃ দুষ্পূরণীয় ভোগস্পৃহামূলক বিশালকায় কর্ম্মান্ধতা প্রতীচীকে অপঘাত মৃত্যুরদিকে দ্রুত লইয়া যাইতেছে। আর এদিকে, পরুষকারহীনতা কপট সাত্ত্বিকতা ও বৈরাগ্যের ছদ্মনামে সমগ্র ভারতবর্ষকে জড়ভরতে পরিণত করিয়াছে, যাহার ফলে মৃত্যুর অসংখ্য দূত সকল—দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি—দিবারাত্র বক্ষের শোণিত শোষণ করিয়া আমাদিগকে কঙ্কালসার করিতেছে!

এই আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে জগতকে রক্ষা করিবে কিসে? আধুনিক জগতে এই বিষম প্রশ্নের, এই জীবন মরণ সমস্যার সদুত্তর মহাত্মা রামমোহন প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী দ্বারা দিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের রূপকের ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিলে বলিব—ভোগকর্ম্মরূপী যে পক্ষীটি আজ পশ্চিম সমুদ্র তীরে স্বাদু ফলাস্বাদনে তন্ময় হইয়া আছে তাহাকে তাহারি নিরাহারী ত্যাগরূপী সখাটির সঙ্গে আবার অচ্ছেদ্য সখ্যসূত্রে বাঁধিয়া দিয়া সমাজবৃক্ষে সমারূঢ় করিয়া দিতে হইবে। রজোপ্রধান, কর্ম্মময় প্রতীচ্য সভ্যতা এবং ধ্যান-জ্ঞান-প্রধান প্রাচ্য সাধনার পরিণয় হইতে ভবিষ্যতে যে অভিনব সভ্যতা জন্মলাভ করিবে তাহার সম্ভাবনীয়তা কত ইহা কে গণনা করিবে? এই শুভ পরিণয়ের সূত্রপাত মহাত্মা রামমোহন আপনার জীবন দ্বারা করিয়া গিয়াছেন; এবং গৌরবের বিষয়, তাঁহারি আধ্যাত্মিক বংশধর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহারি পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মানবজাতির সেই প্রত্যাশিত পরিপূর্ণ সুপ্রভাতকে নিকটবর্ত্তী করিবার প্রয়াস করিয়াছেন ও করিতেছেন। বস্তুতঃ রামমোহন রায় শুধু নবভারতের জনক নহেন, তিনি জগতের নব সভ্যতার প্রবর্ত্তক, যে সভ্যতা বিধাতার আশীর্ব্বাদে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে সকলপ্রকার দ্বন্দ্বদ্বেষ

দূর করিয়া দিয়া এক সর্ব্বগ্রাহী প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিবে।

চঞ্চল বীচিমালা দ্বারা যেমন সমুদ্রের অতলতার পরিমাপ করা যায় না, সেইরূপ কর্ম্মময় বাহ্যজীবন হইতে মহাপুরুষদের আধ্যাত্ম জীবনের গভীরতা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পঁহুছিতে পারা যায় না—তাঁহাদের অন্তর জীবনটা আমাদের কাছে রহস্যই থাকিয়া যায়। তাই মহাত্মা রামমোহন আধ্যাত্মিকতার কোন্ সোপানে পঁহুছিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতলেখকদের পক্ষে জোর করিয়া বলা সুকঠিন। তবে তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, তিনি ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা, পাতা ও বিধাতা-রূপেই দেখিতেন, শক্তির আধার রূপে দেখিতেন—কিন্তু রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ বলিয়া দেখিতেন না। তাই মনে হয়, তাঁহার আন্তর প্রকৃতিতে জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তির যতটা প্রাধান্য ছিল বুঝিবা ভক্তির ততটা প্রধান্য ছিলনা। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনের যাহা প্রধান ব্রত (mission) ছিল, তাহা স্মরণ করিলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং শৈশব কালে তাঁহাতে ভগবদ্‌ভক্তির উন্মেষ দেখিতে পাওয়া গেলেও বিধাতার নির্দ্দেশে তাঁহাকে অন্ধভক্তি বিশ্বাসের পথ ত্যাগ করিয়া, যুক্তির সম্মার্জ্জনী হস্তে যুগযুগান্তর সঞ্চিত অজ্ঞান-কুসংস্কারের আবর্জ্জনারাশি দুর করিয়া দিয়া মানুষের প্রকৃত মুক্তির পথ সুগম করিবার জন্য জীবনের চেষ্টা নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। তাই বিজনতায় বসিয়া উপাস্য দেবতার ধ্যানে ও সৌন্দর্য্যে একান্তভাবে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিবার অবসর তাঁহার কোথায় ছিল? তবে জীবনের কর্ম্মাবসানে য়ুরোপ প্রবাসকালে রামমোহনের অন্তরনিহিত ভক্তিবৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা Miss Collet এর লিখিত জীবনী হইতে জানিতে পারা যায়।

মানুষের শক্তি যে অপরিসীম, তাহার অভিব্যক্তির ধারা যে অন্তহীন, মানুষের জ্ঞান-যুক্তি যে তাহাকে নাস্তিকতার জড়ত্বের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে না, যুক্তি-মূলক জ্ঞান এবং প্রকৃত ভক্তিবিশ্বাসের মধ্যে যে কোনও বিরোধ নাই—এই পরম শিক্ষা, এই মহতী আশার বাণী আজন্ম জ্ঞানোপাসক নিষ্কামকর্ম্মযোগী রামমোহন রায় আধুনিক যুগকে দান করিয়া গিয়াছেন। *

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

* বিগত রামমোহন রায় স্মৃতি সভায় পঠিত।

সমস্যা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশাকে দেখিয়া পারুল বলিল—"এই বুঝি তোর আধ ঘণ্টা?"—

পশ্চাতে শৈলেন্ ও নগেনকে দেখিয়া সে আর আশাকে কোন কথা বলিতে পারিল না; মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিল—"আসুন, বসুন,—মাকে বলি গিয়া—।" অভ্যর্থনা করিয়া পারুল আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। ভিতরে চলিয়া গেল।

শৈলেন্ ও নগেন্ আশার আর্ট ষ্টুডিওতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই তারা আসিয়া উভয়কে জানাইল—"বাবা ভিতরে যাইতে বলিয়াছেন।"

দুর্গাদাস বাবুর আহ্বান শুনিবা মাত্র শৈলেন ও নগেন তাহার অনুসরণ করিল।

দুর্গাদাস বাবু তাঁহার পাঠগৃহে বসিয়া ষ্টেটসম্যান পড়িতেছিলেন। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র বলিলেন—"বসো তোমরা।" তারপর শৈলেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমার বাবা কি চলিয়া গিয়াছেন?"

শৈলেন বলিল—"তিনিতো সেই দিনই মেল ট্রেনে চলিয়া গিয়াছেন; বাড়ীতে গিয়া পঁহুছ তত্ত্বও দিয়াছেন।"

তাহারা দুজনে দুখানা চেয়ারে উপবেশন করিল।

উভয়ের শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর দুর্গাদাস বাবু শৈলেন কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমার কি প্রুফ দেখিবার ভাল অভ্যাস আছে শৈলেন?"

শৈলেন কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—"ভাল নাই, তবে কলেজ মেগাজিন্ চালাইবার ভার আমার উপর ছিল, তাহাতে যা একটু—"

"ভাল, দেখা যাউক কি রকম। আমার 'Medical Jurisprudence'এর আর একটা এডিসন তাড়া-তাড়ি বাহির করিবার প্রয়োজন, এই এগারর ফর্ম্মার প্রুফটা তুমি, এইবার দেখিয়া দাও দেখি। আসিবা মাত্রই খাটুনিরকথা, কিছু মনে করিও না কিন্তু!" বলিয়া দুর্গাদাস বাবু হাস্য করিলেন।

শৈলেন টেবিলের উপর হইতে সুতাবাঁধা প্রুফসিট লইয়া হাসিয়া বলিল—"এ আর কি বেশী খাটুনি!"

দুর্গাদাস বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—"তাহা হইলে তুমি এই স্থানে বসিয়াই দেখ, আমরা বারান্দায় যাইয়া বসি। যাহাকে এ কর্ম্মের ভার দিয়াছিলাম, তাহার দেখা ভাল হইতেছে না; দশটা ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে, ভুলের অবধিই নাই; এই এগারর ফর্ম্মাটার জন্য তুমি দায়ী কিন্তু!"

দুর্গাদাস বাবু তাঁহার আব্দারটা একটু কড়া হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া একটু থামিয়াই বলিলেন—"কোন চিন্তা নাই, শেষ প্রুফ আমি নিজে আর একবার দেখিয়া দিব। তুমি পারুলকে লইয়া দেখ; সে ছাপান অরিজিনেল দেখিয়া পড়িয়া যাইবে, তুমি মিলাইয়া সংশোধন করিবে।"

পারুল ও বকুল সেইখানে ছিল। পিতার ইঙ্গিতে মুখে কাপড় গুজিয়া পারুল টেবিলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আইস নগেন্ বাবু, আমরা গিয়া বারান্দায় বসি।"—বলিয়া দুর্গাদাস বাবু উঠিলেন।

দুর্গাদাস বাবুর 'বাবু' সম্বোধনে নগেন কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল—"আপনি আমাকে 'বাবু' বলিলে—, "আচ্ছা দেখা যাইবে।" বলিয়া দুর্গাদাস বাবু বরান্দায় গেলেন, নগেন্ ও তাঁহার অনুসরণ করিল।

দুর্গাদাস বাবু নগেনের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার বাড়ী-ঘর, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ-বিত্ত, সম্পর্কে আলাপ হইতেছিল। দীর্ঘ আলাপের পর দুর্গাদাস বাবু নগেনকে প্রশ্ন করিলেন—

"ওকালতিই তবে তুমি তোমার শিক্ষার চরম ফল বলিয়া ধরিয়া নিয়াছ?"

"যার মুরুব্বির জোড় নাই, তার আর কি বেশী আশা করা চলে?"

"আমি সে দিকের কথা বলিতেছি না; সার্ব্বিসই আমাদের শিক্ষিত যুবকদের সাধনার শেষ পুরস্কার—এ আমার মত নহে।"

লজ্জা বোধ করিয়া নগেন বলিল—"কিন্তু আজকাল সেটাই আমাদের সমাজের গর্ব্বের বিষয় যেন হইয়াছে। আমাদের দেশের অর্থবান জননেতারাও গোপনে তৈল মর্দ্দন করিতে পারিলে যেন কৃতার্থতা লাভ করেন।"

"সেটা ব্যক্তিগত হইতে পারে, নেতা মাত্রেরই উপরে এরূপ দোষারূপ করা যায় না।"

দুর্গাদাস বাবুর সহিত এপর্য্যন্ত নগেনের বিশেষ আলাপ হয় নাই; সুতরাং তিনি কোন মতাবলম্বী, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

এবারও নগেন্ লজ্জিত হইয়া কথাটা আর এক দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"বাবার ইচ্ছা, আমি পুলিসে ঢুকি, না হয় উকীল হই। আমি কোন পন্থাই এ পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই; তাই পড়াই চালাইতেছি।"

"তোমার বাবা সহজে অর্থ আসিবার পন্থা দেখিয়াছেন, মনুষ্যত্ব কিন্তু ইহাতে—"

এই সময় একটী ভদ্রলোক একটী ছোট ব্যাগ ও ছাতা হাতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

দুর্গাদাসবাবু তাহার দিকে চাহিতেই সে ভদ্রলোকটী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"কি কাণ্ডটাই হ'য়ে গেল দেকুন দিক! লোকটাকে এ্যাকেবারে মার্ডার ক'রে ফেল্লে—এ্যার কি কোন রেমিডি নেই?"

ভদ্রলোকটীর কথা শুনিয়া নগেনের বিস্ময় বাড়িয়া গিয়াছিল, সে বলিল—"কার, কি হইয়াছে?"

ভদ্রলোকটী বলিল—"এ লোকটা ছেলো সেই ক্লাসের এক জীব, যার জীবনকে পুষ্পল করে তুলবার জন্যে সে নিবিড় ভাবে তার মুহূর্ত্তগুলোকে খাটিয়ে নিত পথের মজুরগিরিতে, আর তার কাজটা হ'য়ে যাওয়ার জন্যে আর একটা দিকে উৎফুল্ল হ'য়ে চেয়ে থাকতো আর কতগুলো জন যাদিককে কায়মনে নিরীক্ষণ কত্তে হ'তো এই হতভাগাকেই।"

নগেন বিস্ময়ের সহিত ভদ্রলোকটীর কথা শুনিতেছিল, কথা শেষ হইলে বলিল—"আপনার কথা যে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, হইয়াছে কি? সহজ করিয়া বলুন না?"

ভদ্রলোকটী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"ও সব লোকের প্রতি যে আমাদের সিম্‌পেথি নেই—দৃষ্টির অভাব, সেটা কারো ব্যক্তিগত দোষ নয়—আমাদের উদাসীন জাতীয় ভাবেরই দোষ।"

দুর্গাদাস বাবু এতক্ষণ তাঁহার মুখের দিগে চাহিয়া শুনিতেছিলেন ; এইবার বলিলেন—"কথাটা কি ?"

ভদ্রলোকটী বলিলেন "একটা ইউরোপিয়ান একটা বাঁকা মুটেকে লিভারের উপর কিক্ কোরে এ্যাকেবারে মেরে ফেলেছে ; আর কি !"

তাচ্ছল্যের সহিত হাসিয়া নগেন বলিল—"এই কথা! ওতে আর একটা বিশেষ রহস্য কি আছে !"

ভদ্রলোকটী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"বল্‌ছেন্ কি মশাই, ও কুলী মজুর বলে কি ও মানুষ নয় ? ওর ভেতর মানুষের সোল্ নেই ? ভগবানের অজস্র দানের অধিকারী হ'তে সে এ্যাকেবারেই নিজকে অনধিকারী কল্পনা করে নেবে ?"

নগেন হাসিয়া বলিল—"একেবারেই নাই !"

"অ্যাঁ—ভগবান্ এর ভেতর নেই ? ও সুখ দুঃখ ফিল্ করে না ? আপনি বলছেন কি ?" বলিয়া যেন ভদ্রলোকটী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নগেনের দয়া হইল না,—বলিয়া ফেলিল—"ভগবান্ এই টেবিলেও আছেন, এই বিড়ালটীতেও আছেন—চেতন-অচেতন উদ্ভিদ- মাত্রেই তার অস্তিত্ব ভাবিতে গেলে আছে, না ভাবিলে নাই। কিন্তু ভগবান্ থাকিলেই তাহাতে আপনার কথিত সোল্ আছে, তাহার প্রমাণ আছে কি ?"

ভদ্রলোকটী নিকটের একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং নগেনের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—

"আপনি কি বল্‌ছেন—আমি এ্যাকেবারেই গ্রেস্প কত্তে পাচ্ছিনে। ও লোকটার ওই সেড্ডেথ্ এ আপনার ফিলিং ক্রিয়েট্ হলো না, অণুমাত্রও সিম্পেথি হলো না—আশ্চর্য্য লোক্ দেখছি আপনি মশাই—ওয়ান্ডার ফুল।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"আমি বলিতেছি—লাইফ সোল্ থাকিলেই যে তার প্রতি সকলের দুঃখ হবে, এ ঠিক নয়! অন্ততঃ আপনি-আমি তাহা অনুভব প্রায় করি না।"

ভদ্রলোকটী আশ্চর্য্যভাবে বলিল—"বলেন কি ?"

নগেন হাসিয়া বলিল—"আপনি কি আগাছা আবর্জ্জনা কাটিয়া ফেলিতে দুঃখ বোধ করেন ? চিন্তা করুন, উদ্ভিদেরও কিন্তু লাইফ আছে। আপনি কুকুর বিড়ালকেও সর্ব্বদা ঘৃণা করেন—তাদেরও লাইফ আছে। এদিকে ডাঃ বসুর মত মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা উদ্ভিদের জন্য দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন, অনেকে কুকুর বিড়ালকে মানুষের চেয়ে বেশী আদর করিয়া থাকে, তাতো দেখিতেছেনই। অথচ এগুলির মধ্যে সোল নাই। আপনি বলিতে চান মানুষের মধ্যে লাইফ ও সোল আছে কিন্তু পণ্ডিতেরা সকল মানুষেরই সোল আছে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—'পরাধীন জাতির আত্মা নাই—থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহার জন্য দুঃখ করা নিষ্প্রয়োজন।"

ভদ্রলোকটী ঘৃণার সহিত বলিলেন "ছেঃ ছেঃ! কি হার্টলেস্ এক্সপ্রেসন্।"

নগেন—"আপনার যে ঐ ব্যক্তির জন্য সিম্পেথি, তাহা আপনি তাহার সম অবস্থাপন্ন বলিয়া এবং তাহারই মত দুর্ব্বল বলিয়া ; আপনার এ সিমপেথির মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর—দুই একবার আহাঃ, উহুঃ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

দুর্গাদাসবাবু পত্রিকার উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন—'দয়াল,—দয়াল, নগেন্ ঠিক কথাই বলিয়াছে।"

ভদ্রলোকটী বলিল—"ক্ষমা করেছি মশাই, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা আছে আমাদের, তাই রক্ষে। আপনারও এই রক্ত মাংসের অনুভূতির অভ্যন্তরে সাশ্রু স্নেহ, সকরুণ সহানুভূতি, বেপথুমান দুঃখ বেদন দুর্ণিবার নির্ঝরের প্রবল উচ্ছ্বাসের ন্যায় সচেতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে আত্ম প্রকাশ করাই ছেল এরূপ অমানুষিক পৈশাচিক অন্যায়ের প্রতিকূলে স্বাভাবিক ; সে স্থলে এরূপ হৃদয় হীনতার পরিচয় !"

নগেন হাসিয়া বলিল—"আজকাল যে ক্ষমাকে গুণ বলিয়া মনে করে, তাহার পক্ষে গলা ধাক্কাই পুরস্কার। এবং অহরহঃ তাহাই তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। ঐ গলাধাক্কা হজম করিবার শক্তির নামই কিন্তু সহিষ্ণুতা। এ উভয় গুণেরই জন্ম প্রতিকারের শক্তির অভাব হইতে। ইহার প্রতিকূলতা হৃদয় হীনতা নয় বরং অনুকূলতা ঘোরতর অপরাধ, তাহা অন্যায় সৃষ্টির সহায়ক।"

ভদ্রলোক—"উত্তেজিত হবেন না। মানবের অমূল্য জীবনকে পরম কারুণিক মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে গুণ রাশিতে নন্দিত করে রেখেছেন, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা তার মাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—মহাদান।"

নগেন—"শক্তি ও গৌরবের বিকাশ যে ক্ষমায়, তাহা গুণ; শক্তিশালী ও গৌরবান্বিত ব্যক্তির সহন শক্তির নাম সহিষ্ণুতা। নিরুপায়ের বেদনা হজম করিবার শক্তিকে সহিষ্ণুতা বলে না, অক্ষমের প্রতিশোধ লইবার অনিচ্ছাকেও ক্ষমা বলে না। এই সকল দুর্ব্বল লোকের ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অন্তরালে অক্ষমতা ও চক্ষুষ্মল মূর্ত্তিমান। সে ক্ষমা পাপ, সহিষ্ণুতা ঘোরতর অপরাধ।"

ভদ্রলোকটী ঘৃণা মিশ্রিত রাগের সহিত বলিলেন—"দুর্ব্বল মানুষের প্রতি যে মানুষের সহানুভূতি নেই, সে পুচ্ছ বিষাণ বিহীন নর-পশু।"

এ কথায় নগেন চটিল না, হাসিয়া বলিল—"সুতরাং তারও আত্মা নাই।" তারপর একটু মোলায়েম ভাবে বলিল—"দেখুন, জাতির দুর্ব্বলতাকে সহানুভূতিতে সিক্ত করিয়া মনে করুণ রসের প্রশ্রয় কোন স্বাধীন জাতি দেয় না; স্বাধীন রাজপুত জাতি দেয় নাই, হিন্দুর পরম ধর্ম্মগ্রন্থ গীতা তারস্বরে এ নীতির নিন্দাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছে।"

ভদ্রলোকটী হতাশ হইয়া বলিলেন—"Man is man only by the heart. পরের দুঃখ যে না বুঝে, সে কিসের মানুষ!"

নগেন বলিল—"হিন্দুধর্ম্মের তো বটেই, খৃষ্ট ধর্ম্মেরও এ একটা সুন্দর উপদেশ, কিন্তু খৃষ্টের ধর্ম্ম, আর খৃষ্টান জাতির ধর্ম্ম, দুইটী ঠিক এক পদার্থ নহে—সেতো প্রত্যক্ষই দেখিলেন। আর পরের দুঃখ বুঝার মানে এই নয় যে তাহার দুঃখ দেখিয়া মুখে আহাঃ উহুঃ করা বা চক্ষের জল ফেলা। আপনি ঐ রূপ চক্ষে বান না ডাকাইয়া, বক্ষে দুর্ব্বলতার আসন না দিয়া, যদি ঐ স্থলে ঐ লোকটার পক্ষে দাঁড়াইয়া আর কিছু করিতে পারুন আর নাই পারুন, একটু বীর রসের অবতারণা দ্বারা সিমপেথি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলেও আপনার ভিতর পরের দুঃখের অনুভূতির প্রমাণ পাওয়া যাইত; পরাধীন জাতিও যে মানুষ, তারও যে সোল্ আছে, তাহা যাঁহারা অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে অন্ততঃ একটু চিন্তা করিবারও অবসর দেওয়া যাইত।"

"আপনি দেখ্‌ছি, আমার খুব হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু! তা হলেই আরো একটা ফেসাদ ঘটে উঠ্‌ত—রুলের গুঁতো আর হাজত খানায় বাস—লোকটী আপনিও মন্দ নন।"

ভদ্রলোকটীর কথায় ও মুখ ভঙ্গিতে সকলে হাসিয়া উঠিল।

"তবে দুর্ব্বলের মৃত্যুই—বিশেষ অপমৃত্যুই ভগবানের ইচ্ছা জানিবেন। আপনার সোল আছে—দেখুন সিম-পেথি প্রকাশ দ্বারা তাহার কোন উপকার করিতে পারেন কিনা—যত্নে কৃতে যদি—"

নগেন দুর্গাদাসবাবু যে সম্মুখে উপবিষ্ট তাহা বাক্য-যুদ্ধে ডুবিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল; হটাৎ জিহ্বা কাটিয়া কথা এইখানে বন্ধ করিয়া দিল।

কথা যখন উভয়েরই মাত্রা লঙ্ঘন করিয়া উচ্চ গ্রামে পঁহুছিয়াছিল, তখন সুরগোল শুনিয়া পারুল, বকুল, আশা, তাতা সকলি আসিয়া একত্র হইয়াছিল। এমন কি গৃহিনীও আসিয়া পর্দ্দার পাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। বাদানুবাদ বন্ধ হইয়া গেলে সকলেই প্রস্থান করিলেন।

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন—"প্রুফটা আজ শৈলেনকে দিয়াছি বিধুবাবু; আজ আর আপনাকে দেখিতে হইবে না।" বলিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া 'আপনারা বসুন, গল্প করুন, আমাকে এখন সমাজে যাইতে হইতেছে।" বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

দুর্গাদাসবাবু কাপড় লইতেছিলেন, শৈলেন বলিল—'প্রুফটা দেখা হইয়াছে, একবার আপনি দেখিয়া দিলেই পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।"

দুর্গাদাসবাবু যথারীতি উল্টাইয়া দেখিয়া বলিলেন—"বেশ হইয়াছে। আমি এখন সমাজে যাই, আমার আসিতে একটু রাত্রি হইবে, রাত্রে আমি আর এক বার দেখিয়া কাল পাঠাইয়া দিব। প্রুফ দেখিতে যদি নিতান্ত কষ্টবোধ না হয়, তবে প্রাত শানবার আর বুধ বারে প্রুফটা কিন্তু দেখতে হইবে।"

শৈলেন তাঁহাকে কথা বলিতে না দিয়া উৎসাহের সহিত বলিল—"এ কিছুই না, এক ফর্ম্মা প্রুফ—ছাপার কাগজ দেখিয়া কম্পোজ করা—আমসন টামসনের গোলমাল না থাকিলে খুব বেশী হয়তো আট দশে আশি মিনিটের বেশী সময় লাগিতেই পারে না। বুধবার আর রবিবার আমিই দেখিয়া দিব। এখানে না পারিলে, রাত্রিতে বাসায় লইয়া গিয়া দেখিয়া দিব। এও একটা কাজ? বরং এতে আমাদের নাম কাম দুই যথেষ্ট আছে।"

দুর্গাদাসবাবু সমাজে চলিয়া গেলেন।

পারুল বলিল—"আপনার বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে।"

শৈলেন বলিল—"তা যদি মনে হইয়া থাকে—পারিশ্রমিক দাও।" পারুল লজ্জা পাইয়া হাসিল।

শৈলেন বারান্দায় আসিয়া নগেন ও বিধুবাবুর সহিত যোগ দিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। পারুল ও বকুল যাইতে দিল না, বলিল—"মা আসিতেছেন,বসুন।"

বারান্দার সম্মুখেই গাড়ী-বারান্দার খোলা আঙ্গিনা। ঐ আঙ্গিনায় মাটির টবে নানা জাতীয় বৃক্ষ ও লতা সজ্জিত আছে; সূর্য্যাস্তের পর ঐ স্থানে বসিয়া দুর্গাদাস বাবু পুত্র কন্যাগণকে লইয়া গার্হস্থ্য শান্তি উপভোগ করিয়া থাকেন।

সূর্য্যাস্ত হইয়াছে দেখিয়া বেহারা ঐ স্থানে টেবিল চেয়ার ফেলিয়া দিল। সকলে তথায় উপবেশন করিলেন।

পারুল ও বকুল, আশা ও তাতা মিলিয়া চা ও মিষ্টি টেবিলের উপর রাখিল।

বকুল একটু হাসিয়া নগেন কে বলিল—"জাতিতো সেদিনই গিয়াছে—আজ আর ভয় করি না।" নগেন ও হাসিয়া কহিল—"উদর বড় কুমন্ত্রী, লোভ দেখাইলে রক্ষা নাই কিন্তু! জাত যাইবার এখন ও ঢের দেড়ি।" বলিয়া নগেন গলার উপবীত গাছা দেখাইয়া হাসিয়া ফেলিল।

বিধু বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আপনি ব্রাহ্মণ?" নগেন তেমনি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল "নতুবা ব্রাহ্মের ঘরে খেয়েও হজম করতে পারতেছি? আপনি?"

"আজ্ঞে সমাজেরই একটী নগণ্য কীট।"

"পেসা?"

"জগতে অস্তিত্ব রক্ষা করবার জন্যে জীবনকে যত রকমে খাটিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কসুর হচ্চে না—ফটোগ্রাফ আছে। টি কোম্পানী আছে, লাইফ এন্‌সিউরেন্স, চসমা আছে। দালালীও করে থাকি, সাহিত্যচর্চ্চার পাগলামিটেও বাদ দিতে পারিনে; তারপর যখন যা জোটে, ক'রে থাকি।" বলিয়া নগেনের দিগে চাহিয়া বিধুবাবু হাসিলেন।

নগেন হাসিয়া বলিল "আপনি দেখিতেছি জেক্ অব্ অল্ ট্রেডস।"

বিধু—"কিকরি বলুন, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা; বসে আছি জীবনের ঐ শেষ দিনের প্রতীক্ষায়, যে দিন নিবিড় হয়ে এসে জীবনের কর্ম্ম সূত্রকে টেনে ধরে জানিয়ে দেবে—ওগো কর্‌ছ কি তুমি, ভবিষ্যতের অন্ধ তামস নিশিথিনীর—

নগেন বাধা দিয়া বলিল—"দোহাই মহাশয়, এরূপ ছাপার অক্ষরে কথা বলিলে আমাদের নিরক্ষরদের সহিত পোষাইবে না আপনার।"

বিধু বলিল—ক্ষমা করবেন মশাই, সাহিত্য চর্চ্চা করে থাকি কিনা; তা আপনার বুঝি সাহিত্য চর্চ্চা নেই?"

নগেন বলিল—"না, আমি সাহিত্য সেবী নই।"

বিধু—"ও ভারি সুন্দর আনন্দময় জীবন, যাতে কোরে জীবনের পুলককে তার রূপ রস গন্ধ স্পর্শে তরঙ্গায়িত করে বিমল আনন্দের দিকে অভিযান করাতে পারা যায়।"

এই সময় গৃহিণী আরও একখানা থালাতে করিয়া কিছু মিষ্টি লইয়া আসিয়া তাহাদের পাত্রে দিতে লাগিলেন। বিধুর কথা থামিয়া গেল।

শৈলেন হাসিয়া বলিল "মাসী মা এত কেন?" গৃহিণী বলিলেন—"তোমরা তো আর বাবা রোজ আইস না!"

শৈলেন পারুলের দিকে চাহিয়া চুপে চুপে বলিল—"এরূপ পারিশ্রমিক বরাদ্দ থাকিলে যে রোজ আসিতে পারি।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন—"তা বেশ বাবা রোজ সন্ধ্যা বেলা আসিয়া মাসী মার দেওয়া চা খাইয়া যাইও; না আসিলে কিন্তু তোমাদের শ্বশুরের দোষ।"

"তবে সেই হবে মাসী মা!" বলিয়া তাহারা তাহাদের সম্মুখস্থ পান পাত্রের সংবর্দ্ধনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

চা'র পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নগেন্ বিধু বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"কতগুলি গ্রাহক আমি সংগ্রহ করিয়া দিব। কিন্তু মহাশয়, আপনি যদি দীর্ঘজীবী হইতে চান, তবে—এতগুলি ফেসাদের হাত হইতে নিজকে রক্ষা করিয়াই চলিবেন। আর গ্রাহক বৃদ্ধি করিতে হইলে ও আলাপের ভাব টী একদম্ নির্ব্বাসিত করিতে হইবে।"

বিধু বলিল "নিশ্চয়! আপনার থাকা হচ্ছে কোথায়? ঠিকানাটা বলিলে—"

নগেন বিধুর কথায় মনযোগ না দিয়া রসগোল্লাটি মুখে দিতে দিতে বকুলকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা পড়া শুনা কর কখন বকুল!"

"রাত্রিতে ৭ টা হইতে ৮ টা আর প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা। আজ সন্ধ্যার পর উপাসনা হইবে। তারপর পড়িব।"

"কোথায় উপাসনা হইবে?"

"আমাদের নীচের অঙ্গিনায় পৃথক ঘর আছে। আপনারা থাকিবেন কি?"

নগেন খুব আস্তে আস্তে বলিল—"না জাতি যাইবে"।

বকুল হাসিয়া বলিল—'ব্রাহ্মণের জাত কতবারে নষ্ট হয়?"

নগেন তেমনি ভাবে বলিল—"৩৬৫ বারের অনাচারে বৈদিক ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট হইতে পারে"।

"আচ্ছা দেখা যাউক, মনে রাখিবেন, আজ লইয়া দুইবার।"
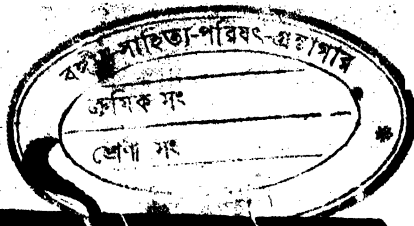
অষ্টম বর্ষ। ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩২৬। তৃতীয় সংখ্যা।

আধুনিক উপন্যাস ও গল্প।

অনেকের মতে—বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গসাহিত্যের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর ভাষা Anglo-Bengali -, কোন রকমে কেবল ভাব প্রকাশক মাত্র; ইতিহাস কোন এক রকমে লিখিত হইলেই হয়,—এগুলির সহিত সাহিত্য রসের কোন সম্বন্ধ নাই। এই অবস্থায় কেবল কবিতা এবং গল্প ও উপন্যাসই সাহিত্যের উন্নত ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই মত ঠিক নহে। সম্প্রতি পরলোকগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন; এখনও অক্ষয়কুমার ইতিহাস লিখিতেছেন; ললিতকুমারের লেখনী হইতে সমালোচনা প্রসূত হইতেছে। এরূপ আরও অনেক সুলেখকের নাম করা যাইতে পারে। এই সকল রচনা যেমন চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ, তেমনি ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবের প্রাচুর্য্যে মনোরম। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে এই সাহিত্য ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হইতেছে; কবিতা এবং কথা-সাহিত্যই বঙ্গসাহিত্যের দুকূল প্লাবিত করিয়া বিপুল উচ্ছ্বাসে চলিয়াছে।

কবিতা এই প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশই আমাদের উদ্দেশ্য।

আজকাল যে সমস্ত সাহিত্য লিখিত ও মুদ্রিত হইতেছে, তৎসমুদয়ের শতকরা নিরানব্বই না হউক, ছিয়ানব্বই সংখ্যকই উপন্যাস ও গল্প। গত আশ্বিন মাসের বসুমতীর নবপ্রকাশিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ২১২ খানা ছিল উপন্যাস ও গল্প এবং অন্য সাহিত্য পুস্তক ছিল ১০ খানা; ভারতবর্ষের বিজ্ঞাপনে ৩৫১ খানা উপন্যাস ও গল্প এবং অন্য সাহিত্য ১৬ খানা। আমাদের প্রাণারাধ্য বঙ্গ সাহিত্যের এই বিপুল অংশ সাহিত্যের অন্যান্য ধারার ন্যায় সত্য ও সৌন্দর্য্যের খাতে প্রবাহিত হইতেছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

সাহিত্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য মানুষের মনে সদ্ভাবের উদ্দীপন। সাহিত্য সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা পরিবর্জ্জন করে। যাহা কিছু উদার, পবিত্র ও মহান তাহাই সাহিত্যের বিষয়ীভূত। "সাহিত্যের যেখানে ক্ষুদ্রতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতার পোষক নহে; সে ক্ষুদ্রতা, তুলনায় মহত্ত্বের মহিমা পরিস্ফুট করিয়া দেয়, এই মাত্র।—সাহিত্যের মহত্ত্ব প্রবর্ত্তক,—সাহিত্যের ক্ষুদ্রতা নিবর্ত্তক।" * গল্প ও উপন্যাস সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে সাহিত্যের এই আদর্শই আমাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে।

উপন্যাস ও গল্পের উদ্দেশ্য মানুষের মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া, হৃদয়ের প্রেম, স্নেহ, মমতা এবং জীবনের উদ্দেশ্য লোকচক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহারদিকে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করিয়া মানুষের জীবনের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করা। এই রূপে কথা-সাহিত্য সমাজের দূষিত অংশ পরিহার জন্য পাঠকবর্গকে উন্মুখ করিয়া থাকে,—সমাজ সংস্কার সাধিত হয়।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য ছাড়া যদি উপন্যাস ও গল্পের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা সাহিত্য নহে। নীচ,

* সাহিত্য, তৃতীয় বর্ষ।

সঙ্কীর্ণ এবং হীন কথা যদি ভাষার ললিতছন্দেও অঙ্কিত হয়, তাহা হইলেও তাহা সাহিত্য হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই জন্যই বিদ্যাসুন্দরকে সাহিত্যের "ভেজাল" বলিয়াছেন। *

উপন্যাস ও গল্পের উক্তরূপ উদ্দেশ্য জন্যই কোন জাতি ও সমাজের উত্থান বা পতন সময়ে সাহিত্যের ও উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে; অর্থাৎ সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের সাহিত্যে জাতীয় ও সামাজিক যে চিত্র অঙ্কিত করেন, সমাজে ও জাতিতে তাহা প্রভাব বিস্তার করে। এই তত্ত্ব সর্ব্বজনবিদিত ও স্বীকৃত, সুতরাং উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজের জাতীয় জীবনের প্রভাতেই সেক্সপীয়রের আবির্ভাব হইয়াছিল; আর মুসলমান বিলাসের সংস্পর্শে জাতীয় অধোগতির দুর্দ্দিনে কৃষ্ণনগরের বিলাসী রাজার সভায় বসিয়া ভারতচন্দ্র সুমার্জ্জিত অশ্লীলতা বিতরণ করিতেছিলেন।

অধুনা যে সমস্ত সামাজিক উপন্যাস ও গল্প বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, ইহার বেশীর ভাগেরই উদ্দেশ্য কেবল পাঠকদের মনে ক্ষণিক আনন্দদান; সে আনন্দও অনেক সময় বিমল নহে। যে সাহিত্যের ফল ক্ষণিক অথবা দূষিত আনন্দ ভোগ, তাহা সাহিত্য নামের অযোগ্য।

এই সকল উপন্যাস ও গল্পে ভাষার ঝঙ্কার ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু এমন কোন পবিত্র চরিত্র তাহাতে অঙ্কিত হয় নাই, যাহা সর্ব্বজন মনোহর, পবিত্র; যাহাতে প্রীত হইয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ তদালোচনা করে, যাহাতে লালাকাঙ্খা জন্মে এবং যাহার প্রতি অনুরাগী হইয়া মানুষের চরিত্র সংশোধিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এইরূপ চরিত্র সৃষ্টিতেই কথাসাহিত্যের সার্থকতা। *

আধুনিক উপন্যাস ও গল্পে যে কিছু সৃষ্টি দেখা যায় তাহা স্বভাব অনুযায়ী ও সুন্দর নহে। আধুনিক উপন্যাস ও গল্প লেখকগণ বাঙ্গালীর গৃহে যে নায়ক নায়িকা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দেশী কাপড় পরা বিলাতী সাহেব বিবির রূপান্তর মাত্র। তাঁহারা যে সামাজিক চিত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত; তাদৃশ রীতিনীতি প্রকৃত বঙ্গসমাজে দুষ্প্রাপ্য,—কদাচিত কোন ইঙ্গবঙ্গ সমাজে তাহা দৃষ্ট হয়। তাহাদের অঙ্কিত চিত্রের বর্ণ এরূপ উজ্জ্বল যে, সাধারণের মন ঐ অতিরঞ্জিত চিত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়,—কিন্তু এইরূপ অতিরঞ্জিত চিত্র স্বভাব অনুযায়ী নহে বলিয়া তাহা প্রশংসনীয় নহে। কারণ "সৃষ্টি মাত্রেই প্রশংসনীয় নহে। রেনলড্স্ নামক ইংরাজি আখ্যায়িকা লেখকের রচনা মধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি ঐ সকল অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে গণনা করিতে হয়। কেননা সেই সকল সৃষ্টি স্বভাব অনুকারিণী এবং সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাব অনুকারী এবং সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট না হইলে কোন প্রশংসা নাই।" *

আধুনিক উপন্যাস ও গল্পের অধিকাংশই বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানার উত্তেজক এবং পুরাণ রীতি ও পদ্ধতির নিন্দা ও শ্লেষে পূর্ণ। বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানার উত্তেজক উপন্যাস ও গল্প যে সমাজের অমঙ্গলকর, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আংশিক আচার নিয়ম পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। সুতরাং প্রাচীনের নিন্দা মাত্রেই দোষ নহে। কিন্তু সকল পুরাতন আচারই শ্লেষের বিষয় নহে, আধুনিক উপন্যাস ও গল্প লেখকগণের সকলেই ইংরেজী শিক্ষিত, তাঁহাদের অনেকেই দেশীয় আচার নিয়ম উঠাইয়া দিয়া ইংরেজী আচার নিয়ম বঙ্গদেশে প্রবেশ করাইবার চেষ্টায় আছেন। বঙ্গদেশের সমস্ত আচার নিয়মই উঠাইয়া দেওয়া উচিত কি না এবং ইংরেজী সবই বঙ্গদেশে খাপ খাইবে কিনা, তাহা তাঁহাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। বঙ্গসমাজে যে সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা আছে, তাহার উচ্ছেদ সকলেই কামনা করেন; কিন্তু দেশীয় সকল আচার নিয়মই দূষিত নহে। আমাদের ব্যবস্থাপকগণ আহার পরিচ্ছদ সমস্ত বিষয়ে দেশোপযোগী আচার নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; আমরা একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্যবস্থাপকগণ আমাদের যে সমস্ত আহার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের শরীরের উপযোগী। আহারের যে

* বঙ্গদর্শন, প্রথম খণ্ড। পৃষ্ঠা, ৩৯২।

* বঙ্গদর্শন, প্রথম খণ্ড। পৃষ্ঠা, ২৫৫।

* বঙ্গদর্শন ১ম খণ্ড ২৫০ পৃঃ।

সময় ও প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের অবস্থার উপযোগী। প্রাচীন বাঙ্গালীর যে স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন ছিল, তাহার কারণই এই যে, তাঁহারা আপনাদের শরীরোপযোগী খাদ্য ঠিক সময়ে ও প্রণালীতে আহার করিতেন। আমরা তাহার অন্যথা করিয়া স্বদেশকে রোগের আকর করিয়া তুলিয়াছি,—অজীর্ণ বাঙ্গালীর বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কতক রসনার তৃপ্তিকর খাদ্যের মোহ, কতক ইউরোপীয় প্রণালীর অনুকরণ প্রবৃত্তি, আমাদের আহার সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন সাধিত করিতেছে।

আধুনিক উপন্যাস ও গল্প পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় যে, ইহার লেখকদের ইচ্ছা যে, বাংলাদেশ সাহেবিআনায় ভরিয়া যাউক এবং সকলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া পুরাণ পদ্ধতি ও আচার ত্যাগ করুক, মেয়েরা শাড়ী গাউনের মত করিয়া পরুক, মাটিতে বসিয়া হাতদিয়া ভাত না মাখিয়া বাঙ্গালী টেবিলে চেয়ারে বসিয়া কাটা চামচে ধরুক। এবং আদব কায়দায় সম্পূর্ণ সাহেব হইয়া যাউক। যাঁহারা উপন্যাস লিখিয়া বাঙ্গালীকে সাহেব করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহারা ধনী,—সাহেব হওয়া তাঁহাদের সাজে। কিন্তু তাঁহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, যে বাঙ্গালীর শতকরা ২০ জন দুইবেলা দুই মুঠো খাইতে পায় না,—যে বাঙ্গালীর শতকরা ৭৫ জন ভাল কাপড় কিনিতে পারেনা,— দারিদ্র্য যাহার মজ্জাগত, তাহার কি ব্যয়সাধ্য—প্যান্ট পরা ও টেবিলে খাওয়া বাঞ্ছনীয়? কেবল কলিকাতা লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। যিনি কলিকাতার দৃশ্য দেখিয়া বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লয়েন, তিনি ভ্রান্ত। বঙ্গদেশের লোক যে বিলাসিতা শিখিয়া ফেলিয়াছে, তাহার দৌরাত্ম্য সহ্য করাই তাহার পক্ষে অসম্ভব; ইহার উপর আবার এই সমস্ত সাহেবিআনার উত্তেজক উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যরূপে পাঠ করিয়া সকলে সাহেব হইয়া উঠিলে বঙ্গদেশের অবস্থা ভয়ানক হইয়া উঠিবে। অনেক উপন্যাস ও গল্পে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি খুব শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সকল উপন্যাস ও গল্পে-চিত্রিত উচ্চ শিক্ষিতাদের অনেকেই বিলাসিনী এবং অনেকেরই জীবন প্রহেলিকাময়। লেখকগণ ইহাদের বিলাসিতা ও প্রহেলিকাময় জীবনের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। বস্তুতঃ যে শিক্ষা নারীজীবন বিলাসিতা পূর্ণ ও প্রহেলিকাময় করে, তাহা ইউরোপে উচ্চশিক্ষা কিনা, আমরা অবগত নহি, কিন্তু বঙ্গদেশে তাহা অধম শিক্ষা। আমাদের গরীব দেশ—ইংরেজী কায়দায় অভ্যস্ত পরিবার বা ধনী পরিবারের জীবন যাত্রার চিত্র সম্বলিত উপন্যাস ও গল্পের প্রয়োজন নাই, তাহাতে সমাজের অপকার হয়। আমরা আমাদের দরিদ্র জীবনের কথা বেশী লিখিনা। তাহার কারণ আমাদের লেখকগণ সহরবাসী, তাহারা বাঙ্গালীর পর্ণকুটিরের সুখ দুঃখের খবর কমই রাখেন। ইংরেজী কায়দায় অভ্যস্ত ও ধনী পরিবারের বিলাসিতা লইয়া যে সমস্ত উপন্যাস ও গল্প লিখিত হইতেছে, তাহার বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানা বঙ্গ দেশীয় যুবক যুবতীর চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া এখনই অনেক গৃহ অশান্তির নিকেতন করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং এই শ্রেণীর লেখকগণ সাহিত্য লিখিয়া দেশের অমঙ্গল সাধন করিতেছেন।

গত কয়েক বৎসর হইতে আধুনিক কায়দায় উপন্যাস ও গল্প লিখিত হইতেছে। এই কয়েক বৎসর মধ্যেই এইরূপ রাশি রাশি উপন্যাস ও গল্প লিখিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যকে ভারগ্রস্ত করিয়াছে। অমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করিবার জন্য এই শ্রেণীর নব প্রকাশিত উপন্যাস "উদ্যানলতার" সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। উদ্যানলতার গ্রন্থকর্ত্রীর চরিত্র অঙ্কন চাতুর্য্য দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তিনি বঙ্গ সমাজের যে সমস্ত দোষ দেখাইয়াছেন, তাহার সবগুলিই যে ভ্রান্ত, এমত অবশ্যই বলা যাইতে পারে না; কিন্তু তাঁহার কথাগুলি সবই এমন ভাবে বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানার ভিতর দিয়া গিয়াছে যে, তাহা দেখিলে, ঐ পুস্তকের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা হয়। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহা সাধনজন্য যদি বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানা বর্জ্জিত বঙ্গ সমাজের চিত্র অঙ্কন করা হইত, তবে বড়ই আনন্দিত হইতাম। মনের ও হৃদয়ের প্রবৃত্তির চিত্র অঙ্কনে যাহার এত নিপুনতা আছে, তিনি যদি বঙ্গদেশের সমাজ সুলভ সাদাসিদে ভাবের মধ্যদিয়া আদর্শ নারিচরিত্র ফুটাইয়া

ফুলেন, তবে বুঝিব—বঙ্গদেশে নারী প্রকৃতই উচ্চশিক্ষিতা হইবে। বঙ্গদেশে শিক্ষিতা নারীর যে চিত্র তাঁহারা ফুটাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন, তাহার প্রভাব বিষময় হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, "ইউরোপের হাবভাব মজ্জা-গত করিয়া লইলে তাহার ফল বাঙ্গালীর পক্ষে বিষময় হইবে কেন?" এই প্রশ্ন ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "সেকাল ও একাল", শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সোণার কাটি রূপার কাটি" এবং ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "কঃ পন্থায়" মীমাংসিত হইয়াছে। এই চিন্তাশীল বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ সকলেই বঙ্গদেশে ইউরোপের রীতিনীতির কুফল দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইউরোপের বিলাসিতাপূর্ণ রীতিনীতি আয়ত্ত করিলে বঙ্গ সমাজের ধ্বংসের আর বেশী বিলম্ব হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত সামাজিক উপন্যাস ও গল্প আধুনিক লেখকদের লেখনি হইতে প্রসূত হইতেছে, তৎসমুদয় বঙ্গ সমাজকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিতেছে। এইজন্য এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে যাঁহাদের লিখিবার শক্তি আছে, তাঁহাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, তাঁহাদের লিখিবার শক্তি বঙ্গদেশের প্রকৃত অবস্থার ভিতর দিয়া চালনা করিয়া বঙ্গীয় সমাজকে সংস্কারে প্রবৃত্ত করিয়া বঙ্গদেশের প্রকৃত কল্যাণসাধন করেন। তাহা হইলেই তাঁহাদের লেখনি ধন্য হইবে এবং বঙ্গীয় পাঠক সমাজের অজস্র আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত।

ভগ্ন-মন্দির।

মৌন মুগ্ধ চিত্তে অই ভগ্নজীর্ণ দেহে
সংসারে সন্ন্যাসী সম সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া
অমর প্রেমের জ্যোতি লভিবারে কিহে
পূর্ণাশ্রিত বক্ষে ধরি আছ দাঁড়াইয়া!
কিম্বা যোগাসনে লীন যোগিবর যথা,
উদ্ভ্রান্ত অন্তরে রহে বিশ্বের বাহির;
পশেনা হৃদয়ে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ব্যথা?
অনন্তে মিলাতে চায় শান্ত দেহটীর!
অভ্র ভেদি শুভ্র সৌধ কালের কুচক্রে
দরিদ্র কুটীর, হায় দৈন্য হাহাকার,
ঘোষিছ কি অনিত্যতা? কি জানি কি মন্ত্রে
অলক্ষ্যে টানিয়া লও অন্তর সবার।
আসা যা(ও)য়া এ'শুধু বিধাতার নীতি,
এই আছে, এই নাই,—সবাই অতিথি।

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

সমস্যা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পীরপুরের সামাজিক সমস্যা জগবন্ধুবাবু ধামাচাপা রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। তারিণী মুখুয্যা তর্করত্নকে এবার সহজে ছাড়িবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাই জগবন্ধুবাবু—আপাততঃ কোন সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ড নাই, সুতরাং সামাজিক দলাদলিরও সম্ভাবনা নাই—বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা নাকচ করিবার চেষ্টায় তারিণী নানা ফন্দি আঁটিতে লাগিলেন।

বাস্তবিকই ২।১ মাসের মধ্যে পীরপুরে কোন বড় সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ডের সম্ভাবনা ছিল না। এই দলাদলির গরম ভাব ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, এরূপ সুবিধা আর সহজে আসিবে না ভাবিয়া তারিণী তাঁহার সমাজস্থ রামকান্ত চক্রবর্ত্তীকে ধরিয়া বসিলেন—"দাদা তুমি তোমার দৌহিত্রের অন্নারম্ভ করাও।"

রামকান্ত বলিল—"আর না হইলেও ৫০৲টী টাকা খরচ, দিবে কে?"

তারিণী বলিলেন—"দশ টাকায় কর। সে টাকারও কতক বরং আমিই দিব।"

এইরূপে তারিণী মুখুয্যার সাহায্যে রামকান্ত তাঁহার পৌত্রের অন্নারম্ভ করাইয়া তর্করত্নকে ও রমণ ভাণ্ডারীকে সমাজ চ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্নারম্ভের দিন পীরপুরের বহুধা বিভক্ত সমাজ ভাঙ্গিয়া যেন দুইটী হইয়া গেল। তারিণী যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। তারিণীর দলে ব্রাহ্মণ সমাজের প্রায় অধিকাংশই রহিলেন; কায়স্থ, বৈদ্য এবং শূদ্র কেহই আসিলেন না। এদিকে ব্রাহ্মণ দুইএক ঘরও তর্করত্নকে পরিত্যাগ করিলেন না।

অর্থনাশ হইল, অথচ কার্য্যোদ্ধার হইল না, দেখিয়া তারিণী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের পণ্ডিতগণকে লইয়া চক্রবর্ত্তী বাড়ীতে এক সভা আহ্বান করিলেন। সভায় হিন্দুধর্ম্ম ও জাতি রক্ষার গুরুতর গুরুতর রিজলিউসন্ হইল, কিন্তু ফল অধিক অগ্রসর হইল না। বরং পীরপুর সমাজের কায়স্থ-বৈদ্য-শূদ্র তর্করত্নকে সমর্থন করায় দলিয়

ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইবারই উপায় হইয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া, ব্রাহ্মণ সমাজ ক্ষোভে ও দুঃখে মরিয়া হইয়া উঠিল।

কি উপায়ে লোককে নির্য্যাতন করিতে হয়, গ্রাম্য সমাজ পরিচালকগণের নিকট তাহা অবিদিত নহে।

দলাদলি যখন চরমে উঠিল, তখন উভয় পক্ষই আদালতে নামিল। পনর দিনের মধ্যে মহকুমার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে পীরপুরের শতাধিক মোকদ্দমা দায়ের হইয়া গেল।

জাল তমস্তুক, ধান কাটা, রাস্তাবন্ধ, * * *, স্ত্রীহরণ, মানহানী, মারপিট, তহবিল তছরূপ, নিকাশ, চুরী, ডাকাতি—ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু মোকদ্দমায় গ্রামের নিরীহ লোকদিগকে হয়রাণ করা হইতে লাগিল। শেষ এমন দাঁড়াইল যে এক চুরী মোকদ্দমায় গোপী গাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রীকে সাক্ষী মান্য করিয়া সমন দেওয়া হইল।

সমন পাইয়া গোপী গাঙ্গুলী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দলাদলির ধারাই এই, সলা পরামর্শ খুব খরতর বেগে—রাত নাই দিন নাই, চলিতে থাকে; তাহাতে দলাদলি-প্রবণ লোকগুলি খুব উৎসাহ পায়; দৌড় ধাপে অণুমাত্রও কষ্ট বোধ করে না, অর্থ বৃষ্টিতেও ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু প্রকৃত বিপদ যাহার মাথায় পড়ে, সে যেমন আঘাত পায়, দলের পরম উৎসাহী পাণ্ডারা তেমন পায় না। সকলের মাথায় সমান আঘাত লাগিলে দলাদলি যতদূর বাড়িয়া চলে, নিশ্চয় ততদূর চলিতে পারিত না। কেননা বাড়িবার কারণ নির্ভর করে, সহকারী ব্যক্তির সহিবার শক্তির উপর এবং সহিবার শক্তি নির্ভর করে, আঘাতের গুরুত্বের উপর।

গোপী গাঙ্গুলী যখন সমনের নোটীশের কাগজে কেবলি ধরিয়া ভুল দেখিতেছিলেন, তখন রমানাথ ঘোষ বলিলেন—"গাঙ্গুলী মহাশয়, এটাও একটা ভয় নাকি? এ হইলে আমাদের সংসার চলে না। যদি যাইতে হয়ই, যাবেন;—আজকালতো ঘন ঘন যাচ্ছেই। আমরা কি তখন ঘোমটা দিয়া বসিয়া থাকিব?"

দ্বিজেন গুপ্ত বলিল—"ও একটা কিছুই না, অখণ্ডিত, ঘরে প্রদীপ ছিল, চোরকে চুরী করিতে দেখিয়াছি—সোজা কথা বলিয়া আসিবেন। স্ত্রীলোকের সহজ ত্রুটী হাকিম ক্ষমা করে—এর জন্য আপনি এত চিন্তিত! শত্রু হাসাইবেন না, ছিঃ!"

রমাপ্রসাদ গ্রামের টর্পি—মহকুমায় মামলা মোকদ্দমা লইয়া যায়, তদ্বির করে—সে তাচ্ছল্যভাবে বলিল—"ওই—কে যে বলছিল—কিসের কথা!—আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আজ সন্ধ্যার পরই মা ঠাকুরাণীকে কি কি বলিতে হইবে, আমি গিয়া সব ঠিক করিয়া দিয়া আসিব। এতেই যদি ঘাবড়াইয়া যান, তবে তো পদে পদে নাকাল—"

হিতাকাঙ্ক্ষী আরো অনেক লোক আরো অনেক কথা বলিলেন। পরামর্শে সান্ত্বনা পাইলে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির সহিবার শক্তি বাড়িয়া যায়। গোপী গাঙ্গুলীর এ সকল কথা একেবারেই ভাল লাগিল না। তাঁহার সহ্য করিবার শক্তি ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিল। তিনি সমন খানা হাতে লইয়া জগবন্ধুবাবুর কাছে আসিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

জগবন্ধুবাবু সমনখানা পাঠ করিয়া বলিলেন—"আর সাত দিন আছে, এর মধ্যেই একটা কিছু করিতে হইবে বৈ কি? উদ্দেশ্য ইতরামী—ভদ্রলোকের পরিবারকে অপমান করা। সকলেই মা, বোন, স্ত্রী লইয়া বাস করে; ইহার প্রতিকার অবশ্যই করিতে হইবে। আদালতে হাজির হইতে কখনই হইবে না, হইতে দিব না। আপনি ভয় পাইবেন না। বিকালে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করা যাইবে, শুধু পরামর্শ নয়—গ্রামের দোষিত বায়ু যে প্রকারেই হউক শোধন করিতে হইবে।"

জগবন্ধুবাবুর আশ্বাস বাক্যে বৃদ্ধ গোপী গাঙ্গুলীর বুক হইতে যেন জগদ্দল পাষাণ সরিয়া গেল। গাঙ্গুলী জগবন্ধুবাবুর হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। এ কান্না দুঃখের নহে—কৃতজ্ঞতার।

সান্ত্বনায় গোপী গাঙ্গুলীর সহিবার শক্তি পুনরায় বাড়িয়া চলিল।

ক্রমশঃ [illegible]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজ পীরপুরের স্কুলগৃহে অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটিকার সময় হিন্দু হিতসাধিনী সমিতির এক গ্রাম্য অধিবেশন হইবে। রাজনগরের রাজা সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী সভাপতির আসন অধিকার করিবেন। গ্রামে গ্রামে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন বিলি করা হইয়াছে ও বাজারে বাজারে ঢোলের ঘোষণা দ্বারা তাহা প্রচার করা হইয়াছে। সভাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যতদুর সম্ভব আলোচনা হইবে।

১। কি প্রকারে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করা যাইতে পারে? ২। হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমে কমিয়া যাইতেছে—বৃদ্ধি করিবার উপায় কি? ৩। হিন্দুর বিবাহ ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতির ব্যয় লাঘব করা সম্ভবপর কি না? ৪। হিন্দুর নিম্ন শ্রেণীতে বিধবা বিবাহ প্রচলন সম্ভব কি না? ৫। সাধারণ গ্রাম্য মামলা গ্রাম্য সালিস দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৬। দরিদ্র হিন্দু গৃহস্থকে সাহায্য করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে "কো অপারেটিভ ঋনদান ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা।

৭। গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ও শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য মণ্ডল প্রতিষ্ঠা। ৮। গ্রামে গ্রামে সেবক সমিতি গঠন। ৯। বিবিধ।

৪টা না বাজিতেই সভাস্থল লোকে লোকারণ্য। বসিবার স্থান সঙ্কুলন হইবে না বলিয়া তারিণী মুখুর্য্যা প্রস্তাব করিলেন, "ঘরের সম্মুখের ময়দানে সভা হউক, সকলেই আমরা মাটিতে দূর্ব্বার আসনে বসিয়া যাই-" জগবন্ধু বাবু মুখুর্য্যার কথায় অনুমোদন করিয়া বলিলেন "বেশতো তাই হউক—সভাপতির সম্মুখে সতরঞ্চ ফেলিয়া দেওয়া হউক, যাহার খুসী সেখানে বসিবে, যাহার ইচ্ছা পাছে দাঁড়াইয়া থাকিবে; বেঞ্চগুলিও চারিদিকে দেওয়া যাইবে—এ পরামর্শ মন্দ নহে। দেখুন, সকলে খুসুন।"

সমিতির সম্পাদক সুশীলকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ এম, এইচ, এইচ এম, বলিলেন—"সেই উত্তম—তাহাই হউক।"

অমনি ছেলেরা বেঞ্চ বাহির করিতে লাগিল। দুটী ছেলে দৌড়িয়া সতরঞ্চ আনিতে গেল। দুটা চৌকি বাহির করিয়া সভাপতির মঞ্চ প্রস্তুত করা হইল। ঘরের সাজ শয্যায় যে সকল বালক মনোযোগ দিয়াছিল—তাহারা বিপরীত ব্যবস্থা দেখিয়া দেবদারু পত্র ও খেজুরের ডাল গুলি ফেলিয়া দিয়া কাপড় চাদর লইয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। যাহারা লাল নীল রঙের কাগজ কাটিয়া "Wel-come" প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা ঘরের দরজা হইতে তাহা তুলিয়া আর কোথায় লাগান যায়, তাহার চিন্তা করিতেছিল—অবশেষে ঐ চিন্তায় অন্য কাহারও সহানুভূতি বা উৎসাহ না পাইয়া তাহারাও নিরাশ হইয়া পড়িল।

৫টায় সভা আরম্ভ হইল। রাজা সত্যপ্রসাদকে ও সহরের গণ্য মান্য ব্যক্তিদিগকে দেখিবার জন্যই যে এই লোকারণ্য হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রথমতঃ সমিতির সম্পাদক সুশীল বাবু 'হিন্দু হিতসাধিনী সমিতি' এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার একটা বিবরণ পাঠ করিলেন। তৎপর সমিতির প্রচারক পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর তর্কচূড়ামণি বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রের বহু বচন উদ্ধৃত করতঃ সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া কি প্রকারে এখন তাহা রক্ষা করিতে হইবে, তাহার আলোচনা করেন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

প্রথম প্রস্তাব। পূজনীয় প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের লিখিত শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ একদেশদর্শী, কুসংস্কারাপন্ন রক্ষণশীল, স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের হস্তে পড়িয়া নিজ নিজ অর্থ সম্পদ হারাইয়া ক্রমে কদর্থের পুঞ্জিকৃত স্তূপ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ পুঞ্জিকৃত স্তূপ হইতে প্রকৃত শাস্ত্রার্থ বাহির করিয়া লওয়া কোন এক ভাষাবিদ বা এক ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য নহে। বেদ, কোরাণ, আবেস্তা, বাইবেল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থগুলি যিনি পাঠ করিয়া মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ; সংস্কৃত, আরব্য, পারস্য, পালি, পাস্ত, গ্রিক, লাটিন প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাগুলিতে যাহার সম্যক অধিকার আছে; বিভিন্ন জাতির ভাষা তত্ত্বে, ধর্মতত্ত্বে এবং জাতি ও সমাজ তত্ত্বে যাহার সম্যক

বুৎপত্তি লাভ হইয়াছে—আমাদের বেদ ও উপনিষদগুলি এইরূপ শ্রদ্ধাবান হিন্দু পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই মহৎ কার্য্য সাধন না হইতে পারিবে, ততদিন—প্রচলিত হিন্দুবিধিকে দেশ কাল ও পাত্র ভেদে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া—যাহাতে আমাদের কণ্ঠাগত প্রাণ ধর্ম্মের শেষ নিশ্বাসটী একেবারে বাহির হইয়া না যায়, অথচ পরিবর্ত্তনের সঞ্জীবনী শক্তিতে মৃতপ্রায় ধর্ম্ম ও সমাজ শক্তিশালী হইয়া আমাদের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহা আমাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে।"

পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব পাঠ করিয়া উপবেশন করিলে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব অনুমোদকের নাম পাঠ করিলেন—"বাবু জগবন্ধু রায়।"

জগবন্ধুবাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন—"বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার-যান-চক্র ঘর্ঘর শব্দে বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সময় ঐ সভ্যতার চক্র ধরিয়া আমরা যদি তাহার সমান শক্তিতে ছুটিয়া না চলিতে পারি, তবে হয় চক্রচাপে নিষ্পেষিত হইয়া ধ্বংশপ্রাপ্ত হইব, না হয় বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব। আমরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে আমাদের অবস্থা কিরূপ হইবে, বলিতে যাওয়া চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করা মাত্র। প্রস্তাবিত কর্ম্মটী অত্যন্ত দুরূহ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা না করিলে যে আমাদের কল্যাণ নাই, তাহাও সত্য। সুতরাং আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উত্থাপিত প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছি।"

"সমর্থক—বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়।"

তারিণী দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি মূল প্রস্তাবটীকে দুইভাগে বিভক্ত করিতেছি। ১ম—ধর্ম্মগ্রন্থের বিশিষ্ট অনুবাদ, ২য়—দেশকালপাত্রভেদে ধর্ম্মবিধি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার অনুসরণে সমাজ রক্ষা। দুইটীই অত্যন্ত উপকারী ও সঙ্গত। দ্বিতীয় প্রস্তাবের ভিতর নানা ব্যক্তির নানা মত থাকিতে পারে এবং আছে। সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে যখন আমাদের সমাজে মতভেদ—গুরুতর-মতভেদ রহিয়াছে—"

এই সময় সভাপতি মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন—"দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে কোন্ কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য ও কোন্ কোন্ কার্য্যের সংশোধন প্রয়োজন তাহার মীমাংসা স্থানীয় সব-কমিটি করিবেন। আপনি মূল প্রস্তাব অনুমোদন করুন।"

তারিণী—"বিলাত যাত্রী সম্বন্ধে যে আপত্তি এখানকার সমাজের আছে—"

সভাপতি—"তাহা সব-কমিটিতে হইবে; আপনারাই পরে করিবেন।"

এই সময় রামদাস বিদ্যাভূষণ উঠিয়া বলিলেন—"বিলাত যাত্রীদিগকে দেহাশুদ্ধি নিবন্ধন পর্য্যুদস্ত করিতে হইবে, কিছুতেই সমাজে লওয়া যাইতে পারে না—কখনই নহে।"

তারাপদ সান্যাল বলিলেন—"বিলাতযাত্রীদিগকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায় না—যদি তাহারা কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হয়—সমাজ দুর্ব্বল হইবে।"

এই সময় সকলেই একেবারে উঠিয়া—কেহ—"অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে।" কেহ—"কখনই নহে।" এইরূপ গোলমাল করিতে লাগিলেন।

তখন সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"আপনারা অনর্থক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লইয়া গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ করিয়া সভায় মূল্যবান সময় নষ্ট করিলে নিরুপায় হইব।"

রাজমোহন বিদ্যাবাগীশ বলিলেন—"উপায় নাই মহারাজ—যাচিঙ্গা করিয়া আনিয়া পৈত্রিক জাতি ও ধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় সহায়তা করিতে পারিব না।"

নবকুমার বিদ্যারত্ন উঠিয়া কোমরের কাপড় টানিয়া পরিধান করিয়া কাছা সামলাইতে সামলাইতে বলিলেন—"বিদ্যবাগীশ ঠিক বলিয়াছেন,অত্যাহিত ব্যাপার—বিলাত ফেরতের সংস্কার, অপকর্ষ, জাতিধর্ম্মের বিপর্য্যয়, এরূপ প্রাঞ্জল ব্যাপারে কখনই হিন্দু ধর্ম্মের সৌকর্য্য হইবে না। ভাটপাড়া, নবদ্বীপ প্রভৃতির অনুমতই অম্বিনবেশে সর্ব্বাজিন অনুকরণী বটে।"

একটী কাব্য রসপ্রিয় যুবক আস্তিন গুটাইয়া মুষ্টিবদ্ধ-হস্ত কম্পিত করিয়া বলিল—

"হিন্দু যবে সিন্ধুতরি দখল করে যব দ্বীপ
তখন কোথায় ছিলেন ভট্টপল্লি, কোথায় ছিলেন নবদ্বীপ।"

সকলেই তখন যাহার তাহার মতে গোলমাল করিতে লাগিল। সভাপতি সকলকে স্থিরভ করিয়া বলিলেন—"আপনারা সকলে অকারণ গোল করিবেন না। এই মূল প্রস্তাবে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের কোন ক্ষতিজনক ব্যবস্থা নাই। এই প্রস্তাবের বিষয়টীকে বিশ্লেষণ করিবার সময় হিতাহিতের বিচার আপনারা ক'রতে পারিবেন—তখন যথেষ্ট বাদানুবাদেরও সময় হইবে। তারিণী বাবু, এখন আপনি প্রস্তাবটী সমর্থন করুন। আপনি বরং কাহাকে কাহাকে লইয়া স্থানীয় ষ্টেডিং সব কমিটি গঠিত হইবে, তাহারও একটা প্রস্তাব করিয়া ফেলুন। আর যদি আপনি প্রস্তাব সমর্থনে অসমর্থ হন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঐ কার্য্য করিতে সুযোগ প্রদান করুন।"

তখন তারিণী বাবু প্রস্তাব সমর্থন করিতে যাইয়া বলিলেন—"আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ বিচারের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী সব কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিতেছি। এই সব কমিটী—

সভাপতি মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন—"১ম প্রস্তাব আপনি সমর্থন করিয়াছেন, এখন সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে তাহা গৃহীত হইলে, আপনি এই দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।"

তারিণী একটু বিচলিত হইলেন। মূল প্রস্তাবের সমর্থন কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন যদি সব কমিটীর প্রস্তাবটী উঠাইতে না দেওয়া হয়, তিনি তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট কয়েকজনকে প্রতিবাদ করিতে উপদেশ দিয়া অগত্যা নিজে চুপ করিয়া রহিলেন।

সভাপতি উঠিয়া বলিলেন—"তবে উপস্থিত সভ্যগণ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন ?"

রাজমোহন বিদ্যাবাগীশ—"এমন জাতি নাশা প্রস্তাব কেমন করিয়া গ্রহণ করি মহারাজ!"

তখন পুনরায় গোলমাল উঠিল। কেহ বলিলেন—"কখনই গ্রহণ করিতে পারি না।" কেহ বলিলেন—"নিশ্চয় গ্রহণ করিলাম।"

সভাপতি—"বেশ, আপনারা সকলেই আসনে উপবিষ্ট থাকুন। তারপর যাহারা প্রস্তাবে বিরোধী তাহারা দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করুন।"

বিদ্যাবাগীশের দল তাহাই করিলেন। তারিণী হস্ত উত্তোলন করিলেন না, দেখিয়া তাঁহার দলের কেহ কেহ রাগেই হউক আর না বুঝিয়াই হউক হাত তুলিলেন না।

তখন সম্পাদক সুশীলবাবু মঞ্চে দাঁড়াইয়া এক, দুই, তিন, চার—উত্তোলিত হস্তগুলি গণনা করিতে লাগিলেন।

৬৭ জন প্রতিকূলে মত দিয়াছেন—গণনা হইল। তখন সভাপতি তাহাদিগকে হাত নামাইতে বলিয়া যাহারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাহাদিগকে তাহাদের দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিতে উপদেশ দিলেন।

জীবন চক্রবর্ত্তীর দল দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন, হিতসাধিনী সমিতির সভ্যগণ, এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে আগত দর্শকগণও অনেকেই হস্ত উত্তোলন করিলেন। সম্পাদক একশত পর্য্যন্ত গণনা করিয়া গণনা পরিত্যাগ করিলেন।

সভাপতি উঠিয়া বলিলেন—অধিকাংশ সভ্যের মতে প্রথম প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল। (করতালী)

অতপর সভাপতি, তারিণী বাবুকে তাঁহার সব কমিটি গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে আদেশ করেন।

তারিণীবাবু তাহার নিজ দলের পনরটী সভ্যের নাম পাঠ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা একটী সব কমিটি গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

দ্বিজেন্ গুপ্ত আপত্তি করিয়া বলিলেন—'সকল সমাজ এবং সকল জাতি হইতে যাহাতে সভ্য মনোনীত করা হয় এবং এই সভা বৎসর কাল থাকিয়া এই প্রস্তাবগুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার যত্ন করে, আশা করি সভাপতি মহাশয় এই সভা হইতে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। তবেই স্থায়ী কার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।"

সভাপতির আদেশ অনুসারে সম্পাদক সুশীলবাবু তখন দুইজন ব্রাহ্মণ, দুইজন কায়স্থ, দুইজন বৈদ্য—পীরপুরের এই ছয়জন, হিত সাধন সমিতির ছয় জন ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে তিন জন ভদ্রলোকের নাম লিখিয়া তারিণীবাবুর হস্তে দিলেন। নিরুপায় হইয়া তারিণীবাবু সভাপতি মহাশয়কেই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বলিলেন। তাহাই হইল।

"পীরপুর-হিন্দু হিতসাধিনী ষ্টেডিং কমিটি" নামে পনর জন সভ্য লইয়া একটী পঞ্চায়েতি সভা স্থাপিত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় এইবার তৎপরবর্ত্তী প্রস্তাব উত্থাপন জন্য ব্যারিষ্টার মিঃ ঘোষকে আহ্বান করিলেন।

মিঃ ঘোষ—"বাঙ্গালীর বার্ষিক আয় গড়ে ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকার মধ্যে। অথচ ভগবানের ইচ্ছায় আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই আয় দ্বারা বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আমাদিগকে জীবন যাত্রার ও ক্রিয়া কর্ম্মের ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইবে। আমরা অনাবশ্যক ব্যয় বাহুল্য করিয়া নিজকে সমাজেগণ্য করিবার প্রয়াস করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বদাই নিজকে বিপন্ন করিয়া ফেলিতেছি। এক টাকার ষ্টম্প লিখিয়া দিয়া অথবা এক আনার রসিদ টিকেট দস্তখত করিয়া আমরা বড় নাম কিনিবার জন্য আড়ম্বরের সহিত কন্যার বিবাহ দিতেছি, অথবা পিতার শ্রাদ্ধ করিতেছি। তারপর ৪।৫ বৎসরের মধ্যে যাত্র-হীন হইয়া দ্বারেদ্বারে ঘুরিয়া দুরদৃষ্টের ধিক্কার দিতেছি—কোনটাই আমাদের পৌরুষের কার্য্য নহে * * * ইত্যাদি। অতএব—

আমি প্রস্তাব করিতেছি যে হিন্দুর বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য ব্যয় বাহুল্য কার্য্য যাহাতে যথা সম্ভব স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইতে পারে এবং সমাজে কর্ম্মকর্ত্তাকে তাহার জন্য লোক নিন্দার ভাজন না হইতে হয়, আমাদিগের তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।"

"অনুমোদক—পণ্ডিত যদুনাথ বাচস্পতি।"

"উত্তম প্রস্তাব বটে, অনুমোদন অনাবশ্যক মনে করি।"

সম্পাদক সুশীলবাবু উঠিয়া বাচস্পতি মহাশয়কে বলিলেন—"সভার রীতি অনুসারে আপনাকে—'আমি এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছি' বলিতে হইবে। তাহাই বলুন।"

বাচস্পতি—"হাঁ এই প্রস্তাব আমি অনুমোদন করিতেছি।"

হর্ষনাথ সেন—"সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি হইলে এই প্রস্তাবের আমি একটু amandment কি বলে—সংশোধন পাঠ দিতে চাই।"

সভাপতি—"বলুন আপনার কি অভিপ্রায়।"

"বিবাহে পণ প্রথা রহিতের প্রস্তাবটী আমি এই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে চাই। এটী হিন্দু সমাজের দারিদ্র্য ব্যাধির একটী বিশিষ্ট নিদান"

গোপী গাঙ্গুলী উঠিয়া বলিলেন—"আপনি প্রাণের কথা বলিয়াছেন. পূর্ব্বপক্ষের মেয়েটী লইয়া আমি মহারাজ—"বলিয়া সভাপতির দিকে চাহিয়া গোপী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তারিণী বাবু হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—"এরূপ প্রস্তাব যাহাদের কেবল মেয়ে-সম্বল তাহারা করিলেই চলিবে না—।"

তারিণীর সঙ্গে সঙ্গে যাহারা ছেলের বাপ, সকলেই তাহার মত সমর্থন করিয়া সংশোধনে আপত্তি উত্থাপন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় সকলকে থামাইয়া হর্ষবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আপনার সংশোধিত প্রস্তাবটী আপনি পাঠ করুণ।"

হর্ষ "এই সভা, পণ প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন. এবং যাহাতে এই জঘন্য প্রথা হিন্দু সমাজ হইতে বিলুপ্ত হয়. তাহার জন্য যথা সম্ভব সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে এই সভা ও পীরপুর ষ্টেডিং সব কমিটী যত্নপর থাকিবেন এবং হিন্দুর বিবাহ শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য ব্যয় বাহুল্য কার্য্য যাহাতে যথা সম্ভব অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইতে পারে অথচ সমাজে কর্ম্ম কর্ত্তাকে তাহার জন্য লোক নিন্দার ভাজন হইতে না হয়. ঐ স্থানীয় ষ্টেডিং সব কমিটি তাহারও ব্যবস্থা করিতে যত্নপর থাকিবেন।"

তিন চার জন সভ্য একেবারে উঠিয়া বলিলেন—"আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।"

মিঃ ঘোষ তাহার প্রস্তাবটী একটা গ্রাম্য সভার হাতে পড়িয়া মাঠে মারা গেল দেখিয়া সভাপতির দিকে চাহিয়া অভিমান ভরে বলিয়া উঠিলেন—"তাহা হইলে আমি আমার প্রস্তাব উঠাইয়া নিলাম।"

বাচস্পতি উঠিয়া বলিলেন—"তবে, মহারাজ, এই ব্রাহ্মণের বাক্যটাই কি অরণ্যে হাহাকার করিয়া মরিবে ?"

হর্ষ বাবু বলিলেন—"মিঃ ঘোষ ভুল করিতেছেন, ইহা যে আপনার নিজ ব্যক্তিগত প্রস্তাব নহে। সভার প্রস্তাব; সভ্যরূপে আপনি সভার পক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং তুলিতে পারেন কি করিয়া?"

সভাপতি বলিলেন—"ঠিক কথা।"

বাচস্পতি মনে মনে "কালী" নাম জপ করিতেছিলেন। জন সমাজে ব্রাহ্মণের বাক্য নিরালম্ব থাকিবে! এখন সভাপতির কথায় আশ্বস্ত হইলেন।

তারিণী প্রভৃতি এই প্রস্তাবটীকে আর একটু মোলায়েম করিয়া—"পণপ্রথার" স্থলে "দাবী করিয়া পণ লইবার প্রথা" বাক্যটী বসাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেষ্টা সফল হয় নাই।

প্রায় প্রতি প্রস্তাবই এইরূপ বাকবিতণ্ডার সহিত নিষ্পত্তি হইয়া রাত্রি প্রায় ৮টায় সভার কার্য্য শেষ হইল। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে সম্পাদক সুশীল বাবু উঠিয়া বলিলেন:—

"আমরা বাঙ্গালী ত্রয়োস্পর্শে মরিতে বসিয়াছি এই তিন ব্যাধি—আত্মকৃত, দৈবকৃত, পরকৃত—কেবল এই পীরপুরকে নহে বাঙ্গালা দেশকে জর্জ্জরী ভূত করিয়া ফেলিয়াছে। "হিতসাধিণী সমিতি" বাঙ্গালীকে এই তিন ব্যাধি হইতে কথক পরিমাণেও যদি—অন্তত কিছু কালের জন্যও যদি রক্ষা করিতে পারে, তবে তাহার অনুষ্ঠান সফল হইয়াছে মনে করিব। সভাসমিতি দ্বারা কোন কার্য্য হয় না—যাহারা মনে করেন, তাহারা ভুল করেন। কালী ঘাটে ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশনে এই চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতায় একদিনে ৩৪৭ খানা ছিপ কোষা টাট বিক্রয় হইয়াছিল। (করতালী) আজ তাঁহার বক্তৃতায় যদি পীরপুরের দেওয়ানি ও ফৌজদারী মোকদ্দমা গুলি বিনা তদ্বিরে এক তরফা নিষ্পত্তি হইয়া যায়; পীরপুরের সামাজিক গোল মাল অন্ততঃ ৫।৭।১০ দিনের জন্যও থামিয়া যায় সভার অনুষ্ঠান স্বার্থক জ্ঞান করিব। (করতালী)।

আমাদিগের এই আত্মকৃত ব্যাধি আমাদিগকে অর্থ হীন করে, জ্ঞানহীন করে, কর্ম্মহীন এবং ধর্ম্মহীন করে, আমরা পশুর অধম হই।

দৈবকৃত ব্যাধি ও আমরা পুরুষকার দ্বারা নিবারণ করিতে—অন্ততঃ দূর করিবার চেষ্টা করিতে পারি। গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক গৃহস্থের থাকা উচিত—কেননা মরিবার সময়তো আর রাজা বা ভূম্যধিকারী মরিবেন না; গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীরাই মরিবে; অর্থবান ভূম্যধিকারীরা রাজধানীতে সুখে কাল কাটাইবেন। মরিলে উচ্ছন্ন গেলেও অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া তাহার খাজানা রেহাই হইবে না। অপর ব্যাধির কথা আর বলিবার নহে, প্রয়োজনও নাই। রাত্রি অধিক হইয়াছে। আশাকরি স্থানীয় হিন্দু হিতসাধিনী সব কমিটি অদ্যকার সভার প্রস্তাবগুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তাহার প্রতি যথার্থ যত্ন নিতে চেষ্টা করিবেন। এবং সেই সভার কার্য্য বিবরণ মূল সভায় পাঠাইবেন।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে তিনি গাত্রোত্থান করেন। সভা ভঙ্গ হয়।

ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত।

গত শ্রাবণ মাসের "সৌরভে" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত" লিখিয়াছেন,—পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। অমার্জ্জিত গ্রাম্য ভাষায় রচিত পল্লী কবীর গীতি কবিতা গুলি যে এত দিন পর, সাহিত্য সেবী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে,—ইহা অতুল আনন্দেরই বিষয়। বাস্তবিক, গ্রাম্য ভাষায় রচিত গ্রাম্য কবিদের কবিতাগুলি ধরিয়া না লইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত গুলির রচনা-কৌশল তত সুন্দর না হইলেও,—ভাব—রসের সমাবেশে এক একটি গীত,—এক একটি অমূল্য রত্ন। ত্রিতাপ দগ্ধ মায়া মুগ্ধ দুর্ব্বল জীবের শান্তি ও চৈতন্য লাভের জন্য, ভগবান্ পল্লী কবির মুখ দিয়া এই সকল প্রণারাম সঙ্গীত সুধার প্রস্রবণী খুলিয়া রাখিয়াছেন। ক্ষণকালের জন্য হইলেও,—মোহান্ধ মানবের জ্ঞান চক্ষু ফুটাইবার জন্য, দস্যু—দানবের পাষাণ হৃদয় গলাইবার জন্য,—বিষয়াসক্ত অবিবেকী জনের মনে বৈরাগ্যের দিব্যালোক জ্বালাইয়া দিবার জন্য এই সকল বাউল সঙ্গীত অব্যর্থ মহৌষধি।

ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত গুলিতে রাগ-রাগীণীর বিশেষ একটা আড়ম্বর নাই;—অধিকাংশ গীতই ঔদাস্য-ময় ভাটিয়াল রাগিণীতে গীত হইয়া থাকে। যেমন রাগ-রাগিণীর আড়ম্বর নাই,—তেমনি,—বাদ্য যন্ত্রাদিরও আড়ম্বর নাই। খমক, খঞ্জনী, রাম করতাল, রসমাধুরী, ও একতারাই এই গীতের প্রধান বাদ্য যন্ত্র। সময় সময় সারিন্দার ব্যবহার ও দেখিতে পাওয়া যায়।

বাউল সঙ্গীত, বাউল প্রাণের ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া গ্রথিত। সুতরাং উহা কষ্ট কবি কি শাব্দিক কবির কবিতার ন্যায় নীরস নহে। বাউল সঙ্গীতগুলি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। বাউল যন্ত্র যোগে, বাউল সুরে গীত হয় বলিয়া,—গৌর,—ভজন, গুরু, মনোশিক্ষা, নাম, প্রার্থনা, দেহতত্ব, মান, মাথুর, বিরহ, বংশী,—গোষ্ঠ, ভোর, অভিসার, মিলন, নিবেদন প্রভৃতি বহু লীলা সঙ্গীত বাউল সঙ্গীতের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। রূপ,—জল ভরার তো আর কথাই নাই। এখন বাউল সঙ্গীত বলিতে গেলে গ্রাম্য কবির বাউল সুরে রচিত এই সকল লীলা কীর্ত্তন গুলিকেও বুঝায়।

বাস্তবিক খাটি বাউল,—প্রাণের ভাব-বৈচিত্রের অস্পষ্ট অভিব্যক্তি মাত্র। সকল স্থলে তাহা বুঝিতে ও পারা যায় না। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি লিখিতেছি।

"মড়া মাইনষে আহার করে জীতা মাইনষের পেটে।"

"সমুদ্রেতে রোপীলাম কলা, তারে নিল সুতে। গঙ্গা মৈল জল তিরাষে, ব্রহ্মা মৈল শীতে॥"

"আগেত জন্মিনাম আমি, পাছে জন্মিল্ ভাই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মা জন্মিল, বাপত জন্মিল নাই॥"

"পানীর তলে পাথর মুরশীদ্ তারে খাইল ঘুণে। তুজকে পড়িয়া বন্দা বেস্তের খবরটানে॥" ইত্যাদি।

সচরাচর এই প্রকারের বহু গান শুনিতে পাওয়া যায়।

বাউল তাঁর বাউল প্রাণ লইয়া, কোন্ ভাব সমুদ্রের কোন্ রস—তরঙ্গে ডুবিয়া ভাসিয়া, এইরূপ অসম্ভব উক্তির অবতারণা করিলেন,—মায়িক জগতের মানুষ আমরা তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

লীলা রসাত্মক বাউল সঙ্গীতগুলি একতারা, রস মাধুরী ও খমক খঞ্জনী যোগে গীত হইয়া পল্লীর নর নারীর প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে, মন প্রাণ উদাস করিয়া তোলে। পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক নিম্নে আমি কয়েকটি বাউল সঙ্গীত লিখিয়া দিতেছি।

১। সরল ভাবে এক দিন গুরুর নাম নিলে না,—
কেন রে মন সরল হৈলে না।
কয়বার আইলে, কয়বার গেলে, মনরে!—
গুরুর চরণ একবার ঠিক্ পেলে না॥
গেল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,
মনরে চাইর যুগে এক খান দিন পেলে না।

২। গোসাইজী কোন্ রঙে বেন্ধেছ ঘর খানি,
মিছে কর ধান্ধা বাজী।—(গোসাইজী কোন্ রঙে)
বাল্য না কাল গেল হাসিতে খেলিতে
যৌবন কাল গেল হেলে,—
বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে,
গুরু ভাবব কোন্ কালে। (গোসাইজী কোন্ রঙে)
দেহের মাঝারে ফুলের বাগিচা
ফুটিলে সুগন্ধ করে,—সুজন চাহিয়া কারও পিরীতি,
মৈলে যে জীয়াইতে পারে॥ (গোসাইজী)
দন্ত পড়িল, চুল পাকিল, যৌবনে দিয়াছে ভাটি,—
দিনে না দিনে খসিয়া পড়িছে রঙ্গীলা দলানের মাটী।
(গোসাইজী)

৩। দয়াল গুরু আমার গো!
কোন্ সময়ে কোন্ ভাবেতে কোন্ কথা বলে।
দেহে আছে ছয়টী রিপু—ছয় জন ছয় পথে চলে॥
বৃন্দাবনে আছে তিন রতি,—
কোন্ রতি সাধন করিলে, অন্তে হয় গতি,—
কোন্ রতি সাধন করিলে কোন্ রতি উজান চলে॥

৪। আমার নাও যে গাঙ্গে ডুবে না,—
আরে মাঝি খবরদার।
মহাজনের জিনিস ভরা রে,—
একটুক নিকাশ রাইখো তার।
(আরে মাঝি খবরদার।)
মস্তলেতে কল ঘুরাইয়া আসে পাশে চাইও,—

আপনা দেশের মানুষ পেইলেরে, —তারে মন খুলে দেখাইও
(রে,—আরে মাঝি)

৫। ধর্ ধর্ মন্ ঠিক্ করে ধর।
ওরে,—চেতন গুরুর সঙ্গ কর ॥
চেতন গুরু, কল্পতরু চেতন থাকতে স্মরণ কর,—
রাধার নামে বাদাম দিয়ে কিনারা ভিড়াইয়া ধর।
কাম নদীতে তুফান ভারি দেইখে আমার করে ডর,
গুরুর নামটি স্মরণ করে ঝট্ করে মন বৈঠা ধর ॥

৬। মিছা ধান্ধা বাজী এ সংসার, মন্রে, ভরসা কর কার?
ভেইবে দেখ মনে মনে তুমি বা কার? কেবা তোমার?
(মন্রে ভরসা কর কার?)
এই যে তোমার সাধের বাড়ী ঘর,—
পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় নফর,
সব পড়ে রবে, দিন দুপরে চক্ষে দেখ্বে অন্ধকার ॥
প্রাণান্ত কাল যখন হইবে,—
হরি হরি বলে সবে বাহিরে নিবে,—
দেহ চিতায় তুলে, আগুন জ্বাইলে
পুড়িয়া কর্ব্বে অঙ্গার ॥ (মন্রে ভরসা কর কার?)

৭। দয়াল গুরু ভাসাইলা অকুল সায়রে।
গুরু গো!—কেউরে দিলা ইন্দ্রপদ,—কেউরে কমল কলি।
কেউরে দিলা রাজ সিংহাসন,—
কেউ নামের কাঙ্গালী গো ॥
গুরু গো,—অকুল সমুদ্রের মাঝে
ছাড়িয়া দিলাম তরি,—
গুরু নি হইবা আমার,—ভাঙ্গা নায়ের কাণ্ডারী গো ॥

৮। বড় আজগৈাত্রিকল্ গৌর চান্দের ঘরে,—
ঘরে গো সখি।
প্রেমের ঘরে রসের ভার, দেখতে লাগে চমৎকার,—
প্রেম কি মিলে গায়ের বল জোরে,—
যে ধইরাছে আসল তারে,
ঝর বাতাসে পায়না তারে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়া আছে,—তারে তারে তারে গো সখি।

৯। মন্ তোর্ দ্বিদলে লুকায়ে রৈল কেরে?
প্রেম ডোরে, বন্ধন করে,—তাঁরে রূপের ঘরে নেরে।
চতুর্দ্দল, ষড়দল, দ্বাদশ দশম দল,
দলের উপর দলে শোভা করে,—
উভা নালে ভাটা খেলে মৃণালের উপরে।

* * *

১০। ধর্বেরে অধর, ধর্বে যদি মনের মানুষ,
আগে তোর্ পাটুনী ঠিক্ কর।
ভাইরে ভাই,—দীক্ষা নাই শিক্ষা নাই আগেই কল্লে বিয়া।
বিন্‌মুসারায় চাকর হৈলেরে,—কেবল গাঁইটের পয়সা
দিয়া রে।
ভেল্লা কাষ্টের নৌকাখানি মাইঝ্ খানে তার ছুঁইয়া।
আগাপেকে পাছায় যাইতে রে;
নায়ের গলই পড়ে খইয়া রে ॥
(আগে তোর পাটুনী ঠিক্ কর্।)

১১। দিন গেল, হরি বল, ওরে পাষাণ মন!
কর তাঁর নিরূপণ, হয়ে সুচেতন,
তুমি না বুঝ আবার খুজ ধরে প্রেমের মহাজন ॥
(গৌর উজ্জ্বল প্রেমরে।)
ও মন, সিধ থুইয়ে বুঝ্লি বাঁকা, এলে একা যাবে একা,—
কার সঙ্গে বা হবে দেখা,
নিকাশে মিল্বে যখন,—
তখন ঠেক্বে ঘোর বিপদে, হিসাব লবে পদে পদে,
গুরুর চরণ রাইখে হৃদে, করবে সাধ্য সাধন।
নিতাই হাটের অধিকারী,
শুদ্ধ আদালত করি,
ষোল আনা হিসাব করি, নিক্তিতে কর্ব্বে ওজন—,
যে হবে ওজনে কমা, লাগবেরে চৌরাশি জমা,—
এবার কার খেপেতে সীমা না পাইবে যেই জন ॥
মন,—আসলে আসল রহিল,
নকল বিকায়েগেল,
ফইরা সব পইড়া রৈল,—
গোল ম্যালে ঠেকে এখন,—
যদি থাক রাগের ঘরে,—ছয় জনে কি কর্ত্তে পারে,—
নিত্যানন্দের কৃপা হৈলে মিস্‌বেরে অমূল্য ধন ॥

১২। ঘর বানাইল কেমনে,—
এমন রঙ্গীলা ঘর কোন্ জনে? ভাইরে ভাই,—
এক মারুইলে বান্ধা ঘর আষ্ট গোটা ঠুনি।
দোদ্দ রোওয়ায় চাল বান্ধিয়া চামেড়ায় দিছে ছানি ॥

ভাইরে ভাই,—বিনা বাঁশে বিনা বেতে এই ঘরের বান্।
এক দিকেতে সূর্য্য ঘরের আরেক দিকে চান্॥
হাঁওয়ার ভরে খাড়া।
এই হাঁওয়া ছুটিয়া গেলে
(ঘর) ভাঙ্গ্যা হৈবগুঁড়া॥ ভাইরে ভাই,—
কাম করে কামেলা বেটা কামের জানে সন্ধি।
বানাইয়া রঙ্গের ঘর কাম্‌লা রৈল বন্দী॥

১৩। গৌর রূপ লাগিল নয়নে।
আমি কুক্ষণে চাহিয়াছিলাম গো,—
গৌর চান্দের পানে॥
কলসীতে নাইরে পানী,
আমি গিয়েছিলাম সুরধুনী গো,—
গৌর কেবা না জানি স্বপনে.—
একদিন জলের ঘাটে দেখে তাঁরে,—
মইরাছি পরাণে, গো সই॥
গৌর থাকে রাজ পথে,
তোম্‌রা কেউ যাইওনা জল আনিতে গো,—
দেখ্‌লে তাঁরে মরিবে পরাণে,—
শেষে আমার মত হবে তোরা,—গোপাল দাসে ভনে॥

১৪। গোউর বরণ, রূপের কিরণ, লাগ্‌ল নয়নে॥
আমার গৌর অপরূপ,
কোটি মন্মথ স্বরূপ,
নাগরী কখন চক্ষে হেরি না এরূপ,—
তাঁর বাঁকা নয়ন তেড়া কইরে,—
একদিন চাইয়াছিল আমার পানে।
(লাগ্‌ল নয়নে।)
যদি গৌর কুল পাই,
আমার এই কুলের কাজ নাই,
নাগরী তিন কড়ার মূল কুলে দিলাম ছাই,—
আমি গোউর কুলে কুল মিশায়ে,— সদা মজেরব
তাঁর চরণে। (লাগ্‌ল নয়নে।)
ভেবে জয় মঙ্গলে কয়,—
আমার গউর রসময়, নাগরী,—রসেমাখা
তনু খানি হয়,—
তাঁর রসে ঢুলু ঢুলু আখি,—
সদা পূর্ণ থাকে মদন বাণে॥

১৫। গউর রূপ দেখিয়া হৈলাম পাগলিনী।
আমার প্রাণ লৈয়া লাগ্‌ল টানাটানী
লো প্রাণ সজনী। (রূপ দেখিয়া হইলাম পাগলিনী।)
যে দেখি গৌরাঙ্গ শোভা,
কোটি চন্দ্র জিনি আভা,
মেঘে যেমন ঝল্‌কে সৌদামিনী,—
প্রাণ নাই সই গো,—
মেঘে যেমন ঝল্‌কে সৌদামিনী,—
গোরা তেরছা নয়নে চায়,—
প্রাণ হইরে, লয়ে যায়,—
আমার গেল নয়ন, না আইল
ফিরিয়া লো প্রাণ সজনী।
(রূপ দেখিয়া হৈলাম পাগলিনী।)

* * * * *

আম্‌রা কুলের মুখে দিয়াছাই,—
চল্ গউরার সঙ্গে যাই,
বলে বলুক লোকে কলঙ্কিনী লো প্রাণ সজনী।
(রূপ দেখিয়া হৈলাম পাগলিনী।)

আর কত লিখিব? ময়মনসিংহের পল্লী কবিদের রচিত এই প্রকার কতশত সহস্র গীত আছে। আর কত যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—তাহার সংখ্যা করে কে?

ময়মনসিংহের বিদ্যোৎসাহী রাজা জমীদারগণ কি ধনবান্ ব্যক্তিরা আর্থিক সাহায্য করিলে,—এই সকল গীত রত্ন সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে রাখা যাইতে পারে। গ্রাম্য গীতি কবিতা গুলিকে বাঙ্গালা সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য কেহ দয়া দৃষ্টি করিবেন কি?

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

একটি পয়সা।

কেরাণী গিরি করিয়া বাড়ী ফিরিতে ছিলাম। লাল দীঘির সেই লাল দালানটার আমার আপিস। সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত গাধার খাটুনি খাটিয়া বাড়ী ফিরি, ফিরিবার সময় পথ যেন আর ফুরায় না। দীর্ঘ পথের রেখা ধরিয়া, মোড়ের পর মোড়

ফিরিয়া,—বৌবাজারের জনতা ঠেলিয়া, শিয়ালদহের মোড়ে গাড়ীর ভিড় এড়াইয়া—অনেক কষ্টে পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচাইয়া বাড়ী আসি। বাড়ী ফিরিবার সময় ক্ষুধায় এবং ক্লান্তিতে চোখে শরিষা ফুল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না। এত বড় কলিকাতা সহরটা যেন একটা ধোঁয়ার আকার ধারণ করে। চারিদিকের ইট কাঠ পাথরের নীরসতা, গাড়ীঘোড়া লোকজনের ছুটাছুটিতে মনে হয় যেন কোন এক দৈত্যপুরীতে ভূতের বেগাড় খাটিয়া চলিয়াছি।

এই প্রাণটাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্যইত আমাদের এত প্রয়াস! আমরা কেরাণী, আমাদের একমাত্র কাজ প্রাণটাকে কোনো প্রকারে বাঁচাইয়া রাখা, বাঁচিয়া থাকা নহে। যতটুকু না হইলেই নয়, যে আলো ও যে বাতাস টুকু না হইলে চলে না, আমরা সেই অতিপ্রয়োজনীয়তার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে দিনের পর দিন আহার, নিদ্রা ও চাকুরী করিয়া চলিয়াছি।

নিত্য দিনের মত সেদিনও শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া স্বেদসিক্ত কলেবরে বাড়ী ফিরিতে ছিলাম। মেঘমুক্ত আষাঢ়-সন্ধ্যার-আলোক প্রভা তখন ম্লান হইয়া আসিয়াছে। গ্যাস্‌লাইটগুলি একটি দুটি করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে; বিশ্রাম ভবনের দিকে মানুষের গতিধার চঞ্চলতর হইয়া উঠিয়াছে।——হ্যারিসন্ রোডের মোড় ছাড়াইয়া, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্ ছাড়াইয়া, আপার সার্কুলার রোডের ট্রাম ডিপো ছাড়াইয়া কেশব বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিতেই দেখিলাম, একটি বৃদ্ধ প্রায় অন্ধ হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। আমার জুতার শব্দ শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল, "সারাদিন কিছু খাইনি বাবা, কিছু খেতে দে।" ——চাহিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ মাটিতে যে মলিন নেকড়াটি বিছাইয়া রাখিয়াছে, তাহা একেবারে শূন্য;—কোনো মানুষের একটি পাই পয়সার কৃপাচিহ্নও তাহাতে নাই। অন্ধের ভাবটা দেখিয়া মনে হইল——সমস্ত দিন যেন সে কিছুই খায় নাই; আশা পূর্ণ অপেক্ষায় সমস্তদিন কাটিয়া এখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তাই তাহার মুখে নৈরাশ্য ও বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধের জন্য কি জানি কেমন একটু কষ্ট হইল। হঠাৎ মনে হইল, পকেটেত একটি পয়সা রহিয়াছে। কেরাণী জীবনের ওষ্ঠের পাংশুতাকে তাম্বুল রাগ রঞ্জিত করিবার জন্য পকেটে একটি পয়সা ছিল। কে যেন বলিল, এই পয়সা এই ভিখারীর প্রাপ্য, আমার মনও যেন তাহাতে সায় দিল; ভাবিলাম, অন্ধকে পয়সাটি দিয়া আসি। কিন্তু সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে উঠি উঠি করিয়া যেমন খানিকটা সময় কাটিয়া যায় তেমনি একটা জড়তার মোহ আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল, পকেটে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া পয়সাটি বাহির করিয়া আনিবার মত উদ্যম যেন আমার ছিল না। বাহির করি করি করিয়া ভিখারীর কান্না ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িলাম।

কিছু দূর গিয়া মনে হইল, একজন অসহায় অন্ধকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। একবার ভাবিলাম, ফিরিয়া গিয়া উহাকে পয়সাটি দিয়া আসি কিন্তু শরীর ও মনের ততটা উদ্যম তখন বর্ত্তমান ছিল না, ——বোধ হয় ততখানি মনুষ্যত্বও আমার ছিল না।

মেছোবাজারের মাথাটা ছাড়াইয়া যখন এদিককার ফুটপাথে উঠিয়াছি, তখন ঠিক হইয়া গিয়াছে যে অন্ধকে অন্ধকার মত আর পয়সাটি দেওয়া হইল না। অমনি বিবেকের বৃশ্চিক দংশন আরম্ভ হইল। মনকে শান্ত করিবার জন্য কত কথা ভাবিলাম কিন্তু মন কিছুতেই শান্ত হইল না।——একবার ভাবিলাম, এই কলিকাতার পথে আমরা চিরকালের পথিক, আমরা যদি দান করিতে আরম্ভ করি তাহা হইলে কেরাণীগিরির বদলে লাট্‌গিরি দিলেও আমাদের কুলাইবে না।——ইহার উত্তরে কে যেন বলিল, "মিথ্যা কথা; এই অন্ধকে এই পয়সাটি দিলে তোমার ঝোলে কি নুন কম পড়িত? তাত নয়, সত্য কথা এই যে কলিকাতার পথে চলিয়া তোমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়াছ।" ভাবিলাম, তবেত দোষ এই কলিকাতার পথেরই! কিন্তু নিজেই তাহাতে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলাম না। মনে হইল কলিকাতার পথের মত শিক্ষার স্থান আর কোথায় আছে? মানুষ নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইতে এত ভালবাসে। কিন্তু মূক পথ ইহার ত কোনো উত্তর প্রদান করিল না। সে মৌন সহিষ্ণুতার মত তাহার প্রসস্ত বক্ষ প্রসারিত করিয়া

ল্যাম্পের আলোকে সম্মুখের দিকে অন্তহীন রেখায় চলিয়া গেল মাত্র। আমার মনে হইল সে যেন আমাকে ঠাট্টা করিল।

বাড়ী ফিরিলাম।...বাড়ী বলিতে মানুষ যাহা বুঝে আমার তাহা ছিল না। আমার বাড়ী আমার নিকট দুঃখহরা, তৃপ্তিভরা শান্তিনিকেতন নহে। আমার বাড়ী গড় পাড়ার ক্ষুদ্র একটি ভারাটে কোঠা। তাহা এত ছোট যে মাথা রাখিবার স্থানটুকুও তাহাতে নাই। তবু তাহার ভাড়া পোষাইবার জন্য আমাকে একজন অংশীদার জুটাইতে হইয়াছিল। আমি ২০৲টাকা দিতাম, অংশীদার ভদ্রলোকটি দিতেন ১৫৲ টাকা। সে বাড়ীতে মশা ছিল, মাছি ছিল, ছারপোকা ছিল, অন্ধকার ছিল,—ছিল না কেবল আলোক ও বাতাস।

বাড়ী ঢুকিতেই মেয়ে আমাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল"বাবা!"—কি জানি কেন চোখ দুটি ছলছল্ করিয়া উঠিল, মনে হইল, তবে কেরাণী জীবনের মরু-ভূমিতেও ওয়েসিস্ আছে!...চার বছরের মেয়ে রাণী যেন আমার হৃদ্‌পিণ্ডের একটা টুক্‌রা। সে তাহার এমন রূপ ও এত বুদ্ধি লইয়া এই কেরাণীর গৃহে কোন্ মায়া রচনা করিবার জন্য আসিয়াছে কে জানে?—রাণীকে যখনই দেখি তখনই মনে হয়—ও একটা মায়া,—সংসার জীবনের দুঃখভার মাথা পাতিয়া লইবার জন্য ভগবানের একটি সুন্দর ষড়যন্ত্র।...রাণীকে কখনও ভুলিতে পারি না; আপিসের কর্ম্মকুণ্ডলীর মধ্যেও তাহার মুখ, চোখ ও কণ্ঠস্বর থাকিয়া থাকিয়া যেন মনে পড়ে। যাহোক মানুষ কখনো ভুলিতে পারে না, তাহাকে পাইলে সে সব ভুলিয়া যায়। রাণীর হাত ধরিয়া ঘরে আসিতে আসিতে আমি সব ভুলিয়া গেলাম।

বসিয়া বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতেছিলাম, এমন সময় রাণী বলিল, "বাবা, একটা পয়সা দাও না, চিনে বাদাম খাব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় চিনে বাদাম?" রাণী বলিল, "ঐ যে রাস্তা দিয়ে ডেকে যাচ্ছে।" আমি বলিলাম, "কই আমিত শুন্‌তে পেলুম না।" রাণী জোর করিয়া বলিল, "হাঁ, ডেকে গিয়াছে, আমি শুন্‌তে পেলুম।" তাহাকে নিষেধ করিতে পারিলাম না।......কন্যা পিতার নিকট চিনেবাদাম খাইবার জন্য একটি মাত্র পয়সা চাহিতেছে, পিতা যদি তাহা দিতে না পারে তাহা হইলে পিতৃত্বের মর্য্যাদা থাকে কোথায়? বড়লোক পিতার আদুরে সন্তানগণ তাহাদের পিতার নিকট কত মূল্যবান জিনিষ চাহিয়া আব্দার করে। কেরাণী-কন্যা বেশী কিছু চাহিল না, সে চাহিল চিনেবাদাম খাইবার জন্য একটি মাত্র পয়সা! কেরাণী পিতা ধন-দরিদ্র হইলেও স্নেহ-দরিদ্র নয়; স্নেহজগতে ধনবান পিতা দরিদ্র পিতার অপেক্ষা অধিক ধনী নহেন। আমার কন্যার একপয়সার আবদার যদি আমি রক্ষণ করিতে না পারি তাহা হইলে মনকে প্রবোধ দিব কি বলিয়া?

রাণীকে বলিলাম, "আমার পকেটে পয়সা আছে, নিয়ে যা।"—কিন্তু পকেটেত ঐ একটী পয়সা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। একটীর বেশী পয়সা পকেটে রাখিতাম না, কি জানি ক্লান্ত শরীরটাকে যদি কোনো দিন ইচ্ছার বিরুদ্ধে ট্রামগাড়ীতে টানিয়া তুলি, তাই নিঃসম্বল হইয়া পথ চলিতাম।...পান আমার অত্যন্ত প্রিয়; এত প্রিয় যে গিন্নী আমাকে পান দিয়া বলিতেন, 'নেও তোমার প্রাণ।' আমিও অমনি জিজ্ঞাসা করিতাম, "কোথায় ছিল?" ইহার উত্তরে তিনি মুখ ফিরাইয়া একটুখানি হাসিয়া গর্ব্বভরে চলিয়া যাইতেন। ...সুতরাং পান খাওয়ার জন্য সর্ব্বদাই পকেটে একটি পয়সা থাকিত।

রাণী পয়সা লইয়া চলিয়া গেল, তাহাকে নিষেধ করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে কেমন একটা অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, মন কেবলি বলিতে লাগিল, "ও কি করিলে? অন্ধের পয়সা কন্যাকে দিয়া ফেলিলে? অকল্যান হইবে যে!" বুকটা সহসা ছাঁৎ করিয়া উঠিল কিন্তু বুদ্ধি প্রহরী বলিয়া উঠিল, "পয়সার মধ্যে কি নাম লেখা থাকে? একটা পয়সা দিলেইত হইল!—তবু একটা কুসংস্কার,—মনের মধ্যে একটা খুঁৎ খুঁৎ,—একটা নিঃশঙ্ক নিশ্চিন্ততার অভাব!!

গৃহিণী গৃহমধ্যে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া বলিলেন "হাতমুখ ধুয়ে একটু জল খাও, অমন করে বসে কি

ভাবছ ?”—“কিছু না” বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আমি উঠিয়া গেলাম, গৃহিণী গৃহকার্য্যে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

জলযোগ শেষ করিয়া ক্লান্ত দেহ যখন শয্যার উপর ঢালিয়া দিয়াছি, রাণী তখনও গৃহপ্রান্তে বসিয়া আপন মনে চিনেবাদাম খাইতেছে। সহসা গৃহিণী আসিয়া কতকগুলি চিঠি দিয়া পুনরায় রন্ধন কার্য্যে চলিয়া গেলেন। ...চিঠিগুলি পড়িলাম; চিন্তাচিতায় যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। মনে পড়িল বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা মাতা, বিবাহযোগ্যা ভগ্নী, শিক্ষাপ্রার্থী ভ্রাতা—সকলেই এই তিন কুড়ি টাকার দিকে তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের মত চাহিয়া আছে। একটা সংসারের ভার আমার এই দুর্ব্বল স্কন্ধের উপর, সে গুরুভার যদি আমি বহন করিতে না পারি, তবে সে দোষ কি আমার ?—নিজেকে প্রবোধ দিতে পারি বটে কিন্তু সান্ত্বনা ত দিতে পারি না। আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় যাহারা তাহাদের ম্লান মুখ যে সর্ব্বদাই আমাকে কল্পনা করিতে হয়। মাসে ১৫৲ টাকার বেশী সাহায্য করিতে পারি না, সেই টাকা দিয়া মা কত কষ্টে সংসার চালান। বাবাত হরিনামের ঝোলা লইয়াই ব্যস্ত, এদিকে অর্থের ঝোলা যে শূন্য, সেদিকে তাঁহার নজর নাই। মা বাবাকে ভাবিতে দেন না, তিনি রমণী হইয়া স্বেচ্ছায় সংসারের সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। মা লিখিয়াছেন, “এত দুশ্চিন্তার বোঝা বহন করিয়াও তোমাকে চিন্তামুক্ত করিতে পারিলাম না। তুমিই এখন সংসারের কর্ত্তা সুতরাং আমি না লিখিলেও আপনা হইতে তোমার মনে নানা চিন্তার উদয় হয়। সংসারের অবস্থা তোমাকে লিখিয়া না জানাইলে আর কাহাকেইবা জানাইব ? বিমলা যথেষ্ট বড় হইয়াছে; চিন্তায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না। কি যে করিব বুঝিতে পারিতেছি না। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা জানি না” ইত্যাদি। শুইয়া শুইয়া মাতার চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানি কল্পনা করিতেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি মুখ আসিয়া সেখানে দেখা দিল; সে মুখ আমার বোন বিমলার। বিমলা বড় হইয়াছে, এখন সে সব বুঝে। তাহার জন্য যে আমাদের কত দুশ্চিন্তা তাহা সে বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় মৃয়মাণ হইয়া থাকে। তাহার ভাব দেখিলে মনে হয় সে যেন কতই অপরাধী; নিজেকে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত রাখিয়াও সে সঙ্কোচমুক্ত হইতে পারে না। অথচ তাহার অপরাধ, সে বাংলা দেশে কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বিমলার কথা মনে পড়িয়া মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় রাণী আসিয়া বলিল, “বাবা চিনে বাদাম খাবে ?” আমি বলিলাম, “না”। রাণী বলিল, “কেন খাবে না ? খাওনা।”

ধমক দিয়া বলিলাম, “আঃ বিরক্ত করিস্ না—যা, আমি খাব না।” রাণী মুখ ভার করিয়া বলিল, “আচ্ছা না খেলে।” এই বলিয়া চিনেবাদামের খোসা ভাল করিয়া না ছাড়াইয়াই সে উহা খাইতে লাগিল। আমি বলিলাম “করিস্ কি ?” সে বলিল, “কেন, তুমি খাবে না বলেছ, তাই আমি খাচ্ছি।” আমি বলিলাম, “খোসা শুদ্ধ খাচ্ছিস্ যে!” সে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, “আমি অমন করেই খাই।” সবগুলি চিনে বাদাম সে এই ভাবে খাইয়াছে জানিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলাম ও তাহাকে তিরস্কার করিলাম। রাণী দুঃখিত হইয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল; তাহার সেই দুঃখ ভার দুর করিবার জন্য এবং আমার নিজের ভারাক্রান্ত মনটাকে লঘু করিবার জন্য রাণীর সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম। রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “রাণী তোর বিয়ে হবে ?”

সে বলিল “হবে।”

আমি “কার সঙ্গে ?”

রাণী “কেন, ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে।” তাহার পিতামহের সঙ্গে তাহার বিবাহ যেন ঠিকই হইয়া গিয়াছিল, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটা সে বাহুল্য মনে করিত!

আমি “আচ্ছা বিয়ে হ’লে তুই কি কর্‌বি ?”

রাণী, কেন “ভাত রাঁধিব ঠাকুর্দ্দাকে খাওয়াব।”

বিবাহ হইলে ভাত রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াতে হয়, রাণী তাহা জানিত।

আমি—“আর কি করবি ?”

রাণী “আর কিছু করব না।”

কিছুক্ষণ পর রাণী সহসা বলিয়া উঠিল, “না ঠাকুর্দ্দাকে

আমি বিয়ে করব না।" উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কেনরে?" রাণী বলিল "ঠাকুরর্দ্দা চাকুরী করে না, আপিসে যায় না, কেবল মালাজপ করে।" আমি বলিলাম "তাতে কি?" সে বলিল, "চাকুরী না করলে টাকা পাবে কোথায়?" আমি বলিলাম, "তাইত তোর এত বুদ্ধি!" মনে মনে বলিলাম, বাঙালীর মেয়ের উপযুক্ত বুদ্ধিই বটে। এমন সময় রাণীর মা খাইতে ডাকিলেন, রাণীকে সঙ্গে করিয়া খাইতে গেলাম।

* * * *

বর্ষা রজনীর অন্ধকারে সুর যোজনা করিয়া গভীর রজনীতে অশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। বর্ষাজননীর এই ঘুমপাড়ানী গানে সমস্ত নগরী তখন সুখ নিদ্রায় বিভোর। এমন সময় গৃহিণীর ত্রাসার্ত্ত কণ্ঠস্বরে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম এবং শুনিলাম রাণীর ভেদবমি আরম্ভ হইয়াছে। ঠিক সেই সময় বিজলী চমকিয়া অদূরে একটা বজ্রপাত হইল, মনে হইল উহা আমার মাথায় পড়িলে বেশ হইত।

গৃহিণীর কাতরতা দেখিয়া রাণী অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল, তাই গৃহিণীকে ভৎর্সনা করিলাম। কিন্তু তৎপর মুহূর্ত্তেই তাঁহার বেদনা ক্লিষ্ট বদন দেখিয়া আত্ম গ্লানিতে হৃদয় ভরিয়া গেল।

এত রাত্রিতে, এমন দুর্য্যোগে ডাক্তার ডাকা সম্ভব নয় সুতরাং ঘরে হোমিওপ্যাথির যে বাক্স ছিল তাহা হইতে একটা ওষুধ বাহির করিয়া রাণীকে খাওয়াইয়া দিলাম এবং বসিয়া বসিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। বাহিরে তখন ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, আমার মনে হইতেছিল, এই তন্দ্রানিবিড় রজনীতে যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি।

ভোর হইতে না হইতেই কলেরার সমস্ত লক্ষণ দেখা দিল। ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া চলিল। সমস্ত দিন রোগীর শুশ্রূষা করিলাম; আপিসে না গিয়া কন্যাকে নিয়ে ব্যস্ত রহিলাম কিন্তু একটা কথা সমস্ত দিনই মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল—অন্ধের সেই পয়সা; আর সেই চিনে বাদাম।

ডাক্তার বলিলেন, চিনে বাদামই এই রোগের মুখ্য কারণ কিন্তু আমার মন বলিয়াছে, অন্ধের সেই পয়সাই মুখ্য কারণ, চিনে বাদাম গৌণ কারণ মাত্র।

কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি পাইতে হইলে যতখানি মনের বল প্রয়োজন সাধারণ মানুষের তাহা নাই। মানুষ দুই পাতা পড়িয়াই মনে করে সে সমস্ত অন্ধ কুসংস্কার কাটাইয়া উঠিয়াছে কিন্তু বাস্তব জীবনের পরীক্ষায় পড়িলেই বুঝিতে পারে যে তাহারা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে।

সমস্ত দিন মনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিয়াও মনকে শান্ত করিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে তখন চুপি চুপি বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সেই অন্ধের নিকট গেলাম এবং তাহাকে একটি পয়সা দিয়া চলিয়া আসিলাম, বুক হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল।

রাত্রে রাণীর খেচনী আরম্ভ হইল। রোগ উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তার বোঝা লইয়া রোগীর শিয়রে বসিয়া রহিলাম। সে যে কী কালরাত্রি তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেহ বুঝিবে না।

ভোর বেলা আবার ডাক্তার আসিলেন, রোগীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আশা নাই এমন কথা এখনো বলা যায় না, তবে একটা চোখ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ হইতেছে। তখন মনে হইয়াছিল, একটা চোখ গিয়াও যদি আমার রাণী বাঁচে, তাহা হইলেই ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ দিব।

সেদিন রবিবার। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, তবু রোগীর কোনো ভাল লক্ষণ দেখা গেল না। ভাবিলাম, এ কি হইল? অন্ধকেও তার পয়সা দিয়া আসিয়াছি, তবে রাণী ভাল হইতেছে না কেন? মনে হইল সবই কুসংস্কার। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই কে যেন বলিয়া উঠিল, "সে পয়সাত মেয়েকে চিনে বাদাম খাওয়ার জন্য দিয়াছিলে!"

আবার সন্ধ্যা হইয়া আসিল, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি

পড়িতেছিল। আবার আমি চুপি চুপি বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, ধীরে ধীরে সেই অন্ধের নিকট গেলাম, গিয়া দেখি সে দেয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে, আশা এই—যদি আরো ২।১ টা পয়সা কেহ দেয়। এমন আশার মূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তাহার নিকট আশার আলোকে উজ্জল, নতুবা কি সে দিনের পরদিন এমন ভাবে রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিতে পারিত? এই অভ্রান্ত আশার মূলে ছিল—মানুষের করুণার উপর তাহার সুদৃঢ় বিশ্বাস, মানুষের মনুষ্যত্বের উপর তাহার অটল আস্থা। আর মানুষ যে কত বড় বিশ্বাস ঘাতক আমিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমি অন্ধের নিকট গিয়া বলিলাম, "আর বৃষ্টিতে বসে ভিজ্‌ছ কেন? রাত হয়ে গেছে, এখন কি আর ভিক্ষা মিল্‌বে?" বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল, "তুমি কেগো বাবা, আমি সারা দিন কিছু খাইনি বাবা।' বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল; হয়ত কতজন আমার মতই অবহেলা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাই বেচারা সমস্ত দিন উপবাসী। আমি বলিলাম, "এই নাও, এদিয়ে কিছু খেয়ে বাড়ী যাও।" বৃদ্ধ বলিল "বাবা, এ যে টাকা। ভুল করেছ বুঝি?" আমি বলিলাম "না ভুল্ করিনি, ইচ্ছা করেই দিয়েছি।" বৃদ্ধ—"কেন বাবু, টাকা দিচ্ছ কেন?"

সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া বলিলাম—"আমার অপরাধের দণ্ড দিতে এসেছি, তুমি যদি গ্রহণ না কর, তা হ'লে আমার মেয়ে বাঁচ্‌বে না।" ইহার উত্তরে অন্ধ যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে তাহারা কখনো কাহাকে অভিসম্পাত করে না, তাহাদের অন্তর হইতে সমস্ত নিখিলে এক নিরবচ্ছিন্ন আশীর্ব্বাদ নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে সকলেরই মঙ্গল হয়, কাহারও অকল্যাণ হয় না। অবশেষে বলিল, "বাবু, আল্লা তোমার মেয়েকে ভাল করবেন।" তারপর টাকাটি ফিরাইয়া দিয়া সে আমাকে বলিল, "বাবু টাকা নিয়ে আমি কি করব? আমাকে দুটি পয়সা দাও, কিছু কিনে খাই"। অন্ধকে সঙ্গে করিয়া একটা খাবার দোকানে গেলাম এবং তাহাকে ভোজন করাইলাম। সে যে কি তৃপ্তি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। তারপর তাহাকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়া বিদায় হইলাম, মনে কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, রাণী এ যাত্রা বাঁচিয়া উঠিবে। সে রাত্রে রাণীর অবস্থা উন্নতি লাভ করিল। আমার ভিতরকার সেই অনবরুদ্ধ বাণী বলিয়া উঠিল 'কেমন?'

রাণী সারিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার একটা চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঝড় কাটিয়া গেল। আবার তেমনি ভাবে কেরাণী গিরি করিতে লাগিলাম। সেই অন্ধের সম্মুখ দিয়া প্রত্যহ আপিসে যাতায়াত করি, সে আমাকে দেখিলেই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করে, তাহার একটি চোখ ভাল হইয়া গিয়াছে।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ।

আলফোঁস দোদে।

সাহিত্য-সাধনায় জীবন অতিবাহিত ক'রিলেন ভাবিয়া দোদে প্রথম যখন প্যারীতে আসিলেন তখন তাহার বয়স সতর মাত্র। আত্মশক্তির উপর অটুট বিশ্বাস এবং যৌবন-সুলভ উৎসাহ ছাড়া তাঁহার নিজস্ব কিছুই ছিল না। তিনি ডাক্তার জন্‌সনের চেয়েও দরিদ্র ছিলেন। প্যারীতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাতে একটীও পয়সা নাই; শুধু পকেটে আছে কয়েকটী কবিতা। সৌভাগ্য ক্রমে কবিতাগুলি তখন কার ফরাসীরাজ্ঞীর ভাল লাগিয়াছিল; অল্পদিনের মধ্যেই দোদে Duc de Morny-র সেক্রেটারীর পদে বহাল হইলেন।

নব্য নিযুক্ত সেক্রেটারীর বিশেষ কোন কাজ ছিলনা; অধিকন্তু দেশভ্রমণে এবং লেখনী চালনায় দোদে যথেষ্টই অবসর পাইতেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্যারীর বিখ্যাত পত্র "The Figaro"তে তাঁহার কতকগুলি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম একাঙ্ক নাটিকা "La Derniere Idble" অডিওন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ইহার পরে তিনি আরও কয়েকখানা নাটক লিখিয়াছিলেন; সেগুলি দর্শক-

গণের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। তিনিও আর "প্রাংশুলভ্যে ফলে যথা উদ্বাহুরিব বামনঃ" হন নাই।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই দোদে মনিবের কাজে ইস্তাফা দিয়া সাহিত্যের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। ইতি মধ্যেই নানা পত্রে ছোটগল্প লিখিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন। ক্রমে তিনি বড় আয়তনের উপন্যাসও লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ের লেখা দুইখানি পুস্তক সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে :—"Letters de Mon moulin" এবং "Tartarin de Tarascon." প্রকৃতির প্রতি একটা আন্তরিক টান এবং ফরাসী সুলভ বাকপটুতা ও লঘু বিদ্রূপ পুস্তক দুইখানাকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

কিন্তু দোদের যথার্থ পরিচয় আমরা সর্ব্ব প্রথম পাই "Le Patit Chose" নামক উপন্যাসে। বাস্তব জীবন অঙ্কনের প্রয়াস এই উপন্যাসেই সূচিত হয়। কিন্তু দোদের কল্পনাদেবী তখনও সম্পূর্ণভাবে কাব্য-কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর শক্ত মাটি আঁকড়াইয়া ধরিতে শিখে নাই। "La Petit Chose"-এ—বাস্তব চিত্রের সমাবেশ থাকিলেও ইহারও ভিত্তি যে একটা কল্পনা-প্রধান আদর্শের উপর স্থাপিত, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সে যাহা হউক, বইখানির প্রধান দোষের কথা এই যে ফরাসী লেখকের স্বভাব সুলভ কথা-কুশলতা এবং রচনা নৈপুণ্য দোদে ইহাতে দেখাইতে পারেন নাই। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "Jack" সম্বন্ধেও এই কথা কতক পরিমাণে খাটে। কিন্তু "Jack" লিখিয়াই দোদে ফরাসী সাহিত্যে প্রথমশ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়েন।

"Fromont jeune et Risler aine," "Jack" এর পরেই লিখিত হয়। অনেকে ইহাকে দোদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া—মনে করেন। এই উপন্যাসে তখনকার প্যারীর মধ্যবিত্ত সমাজের একটা জলন্ত ছবি আমরা দেখিতে পাই। কঠিন নির্ম্মম বাস্তবতা, সত্যের নগ্নমূর্ত্তি এবং পাপ ও পুণ্যের বৈষম্য ও বিরুদ্ধতা চক্ষুর সম্মুখে ছবির মতন সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠে।

গল্পের প্লটটা কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে বিশেষ নূতন নহে। কিন্তু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত এবং চরিত্রের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ অভিনব। শুধু নায়ক নহে, উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র পাঠকের মনে এক একটী গভীর চিহ্ন রাখিয়া যায়। গো বেচারা ভাল মানুষ, স্ত্রীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস পরায়ণ, কোমল প্রকৃতি স্বামী Risler; রূপগর্ব্বোন্মত্তা হৃদয়হীনা দুঃশীলা স্ত্রী—Sidonie; আমোদপ্রিয় রসিক, উচ্ছৃঙ্খল George। সে বুদ্ধি বিবেচনার ধার ধারে না—"ভাবনা সাধনা বেদনা বিহীন!" বন্ধুপত্নী Sedonie কে George ভালবাসিয়াছে এবং ভালবাসার প্রতিদানও পাইয়াছে। বেচারা Risler এর মনে সন্দেহের ছায়াও নাই। Georgeএর সৎচরিত্রে বিশ্বাস করিয়াই—Risler বন্ধুকে তাহার ব্যাঙ্কের শরিক করিয়া লইয়াছিল। কালক্রমে Sidonieর বিলাসিতার বন্যায় ব্যাঙ্ক ভাসিয়া গেল, দুইবন্ধু তখন সর্ব্বনাশের মুখে!

অপ্রধান চরিত্রগুলি ততটা ভাল ফুটে নাই। অনেকটা টিকিট মারা পুতুলের মত—হয় ইংরেজি ধরণে হাসে, নয় ফরাসী ধরণে কাশে! এইজন্য অনেকে ডিকেন্সের সহিত দোদের তুলনায় সমালোচনা করিয়া থাকেন।

খুব সম্ভব দোদে ডিকেন্সের উপন্যাস মনোযোগের সহিত পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে উভয়ের মধ্যে মিলের অপেক্ষা গড়-মিলের প্রাধান্যই বেশী। ডিকেন্সের মানবপ্রীতি প্রবল ছিল। তাঁহার রঙ্গ-তামাসা, ব্যঙ্গকৌতুকের মধ্যে হাস্য-রসের পরিমাণ অধিক ছিল। কিন্তু দোদের বেলায় "হিতং মনোহারীচ দুর্লভং বচঃ!" রাখিয়া ঢাকিয়া তিনি কিছু বলিতে জানিতেন না; যাহা বলিতেন—কানের ভিতর দিয়া নিশ্চয়ই মরমে পশিত; কিন্তু মর্ম্ম কশাঘাতে রক্তাক্ত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। মিছরীর ছুরি নয়, তাঁহার হাতে খেলিত ঝকঝকা ইস্পাতের শাণিত তরবারি! মানুষের প্রতি তাঁহার যেন বরাবরের একটা হীন অবজ্ঞার ভাব ছিল। পাপের জয় এবং পুণ্যের পরাজয়ই যেন তিনি দেখাইতে ভালবাসিতেন।

এই সব দোষ 'Le Nabab" উপন্যাসে আরও বেশী

পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। তা ছাড়া আরও একটা নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হয় এই উপন্যাসে ঃ—ব্যক্তিগত নিন্দা। Le Nabab" এ প্যারীর বড় বড় কাউন্ট্ ডিউকের চিত্র ঘোর মসীবর্ণে—অঙ্কিত করা হইয়াছে, এবং চরিত্রগুলির বাহ্যাবরণ এত পাতলা যে অতি অল্পায়াসেই পাঠক বুঝিতে পারে—লেখক কাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু—এরূপ ভাবিলে ভুল করা হইবে যে "Le Nabab" বুঝি "যাচ্ছে তাই" বই। বাস্তবিক তা নয়। ইহার অংশ বিশেষে দোদের মানব চরিত্র অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি এবং লিপি-কলা চমৎকার ফুটিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণটাই উপন্যাস খানার পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। "Les Rois en Exil" নামক উপন্যাসেও এই দোষ তুল্য পরিমাণে বর্ত্তমান।

কলকারখানার কুলি মজুরের জীবন চরিত অঙ্কনে দোদে অগ্রগণ্য এবং সিদ্ধহস্ত। তাঁহার হাতে পড়িয়া ইহারা স্বর্গের দেবতাও হয় নাই, নরকের কীটও হয় নাই। স্বভাব চরিত্রে যেমন ঠিক তেম্নি রহিয়াছে। ইহারা অক্ষরের ফাঁদে পড়িয়াও রক্তমাংসে গড়া তাজা কলকারখানার মানুষই বটে! সত্যকথা ব'লতে দোদে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। কাজেই তাঁহার উপন্যাসে সত্যের এরূপ অনেক কঠোর মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যাহা সচরাচর ইংরেজী সাহিত্যে, এমন কি ফরাসী সাহিত্যেও বড় একটা দেখা যায় না।

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, বাস্তবচিত্র অঙ্কনে দোদে বুঝি Zola র দ্বিতীয় সংস্করণ। জোলার রুচি জঘন্য,—তাঁহার উপন্যাসের আখ্যান বস্তুও জঘন্য। চিত্রাঙ্কনে অবশ্য তিনি যে কোনো প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস লেখকের সমকক্ষ। এই কথাও সত্য যে আমাদের বিদ্যাপতি অথবা ভারতচন্দ্রের অবস্থা বিশেষের বিশদ বর্ণনা জোলাতেও নাই। কিন্তু বস্তুবাদী—ফ্লবেয়ারের শিষ্য—দোদে সুরুচির সীমা কখনও উল্লঙ্ঘন করেন নাই। অবশ্য রুচিবাগীশেরা যদি বলেন যে অবৈধ প্রণয়ের চিত্র লোক সমক্ষে তুলিয়া ধরা কুরুচির পরিচায়ক অথবা দণ্ডার্হ,—তবে আমরা নাচার। কিন্তু মনে রাখা উচিৎ, এই দোষ ধরিলে প্রথমশ্রেণীর অনেক উপন্যাসই বাতিল হইয়া যাইবে। এই কথা অস্বীকার করিবার কোনই অজুহাত নাই যে আধুনিক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি— ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুষ, ইটালী, যাহাই হউক না কেন—অবৈধ প্রণয়ের ভিত্তির উপরেই—গড়িয়া উঠিয়াছে। দোদেও তাহাই—করিয়াছেন। এজন্য আমরা আধুনিক হিসাবে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারি না।

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ।

কোমর-ভাঙ্গা কুকুর।

(১)

ভগ্নকটি পথের কুক্কুর,
পদাঘাত পেতেছে প্রচুর!
চোখে অশ্রুরেখা আঁকা, কত দুখ প্রাণে ঢাকা,
মানবেরা এত কি নিষ্ঠুর!
ভুতহিতে এতই আতুর!

(২)

খায় নাই কেড়ে কারো ভাত,
তবু চাহে করিতে নিপাত!
দূর করে দিলে তারে, আসে ফিরে বারে বারে,
তবে কেন ইচ্ছা প্রাণপাত!
ওরে পাপী, অধম নিষাদ!

(৩)

শ্রেষ্ঠ জীব মানব ধাতার,
তারা করে এত অত্যাচার!
দুই মুঠো ভাত দিলে, বেঁচে থাকে এ নিখিলে,
ধান কিরে ফুরায় গোলার?
তবে কেন হেন ব্যবহার!

(৪)

অতীতের পুণ্যালোক, হায়,
আসিবে কি আবার ধরায়!
"সর্ব্ব ভুতে নারায়ণ, সেবা কর আজীবন,"—
বিবেকের বাণী কি হেথায়,
মর্ম্ম হতে শূণ্যে উড়ে যায়?

(৫)
তা না হ'লে কে করে এমন !
নাশে বৃথা পশুর জীবন !
এরা নাকি—হা ঈশ্বর—, মানুষের বংশধর !—
চতুষ্পদ পশুর মতন,
দ্বিপদেরা ঘোরে অগণন !

(৬)
হারি মানে চড়ুই কুকুর,
মনে ভাবে কত বাহাদুর !
শত শত অপদার্থ, নিয়ত পূজিছে স্বার্থ,
লালসায় প্রাণ ভরপুর ;
তাদেরো কি জীবন মধুর ?

(৭)
দুঃখ দূর কর, ভগবান !
পাঠাও সংযমী দয়াবান্ !
চাহিনা মোটর গাড়ী, প্রকাণ্ড দোতালা বাড়ী,
টাকা কড়ি বিলাসের দান ;
মানুষ পাঠাও, ভগবান্ !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সঙ্কলন ও সংগ্রহ।

কোকিল শাবকের কর্ম্ম।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ চলিত আছে যে কাকের বাসায় কোকিলের ছানার জন্ম হইয়া থাকে, বস্তুতঃ কখন ২ কাকের বাসাতে ও কোকিলের ছানা দেখা যায়। আমাদের দেশে কেহ ইহার বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন কিনা জানিনা, এসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন কেবল তাহারই একটু আভাস দিব। সুবিখ্যাত জেনার সাহেব বলেন যে, কোকিল অনেক পাখীর বাসাতেই ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইউরোপে ইহারা অধিক সময়েই চড়ই জাতীয় একরূপ ছোট পাখীর বাসাতে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, ডিম্ব হইতে বাহির হইয়া ২।১ দিবসের মধ্যেই কোকিল শাবক এক অদ্ভুত কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ইহা "যোগ্যতমই জীবিত থাকিবার" নীতির আংশিক স্ফুরণ মাত্র। জন্মিবার ২।১ দিবস পরেই যে পাখীর বাসায় কোকিল সাবক জন্মে তাহাতে অন্য যে ছোট ছোট শাবক কিম্বা ডিম্ব থাকে তাহা সে ফেলিয়া দেয়। চক্ষু না ফোটার দরুণ তাহার এই কার্য্যে কোনই অসুবিধা হয় না। পালকহীন ডানা দ্বারা তোকাইয়া তোকাইয়া ডিম্ব কিম্বা ছানা তালাস করিয়া বাহির করিয়া লয় ; তৎপর ডিম্ব অথবা ছানা যাহা থাকে, তাহা একটি ২ করিয়া পৃষ্ঠে উঠাইয়া পিছনের দিকে চলিতে থাকে। অবশেষে বাসার কিনারাতে পহুছিলে একটি ঝাকী দিয়া তাহাকে নীচে ফেলিয়া দেয়। তথায় একটু সময় থাকিয়া পক্ষ সঞ্চালন দ্বারা যখন স্থির বুঝিতে পারে যে তাহার বোঝাটী ঠিক পড়িয়া গিয়াছে তখন একলম্ফে বাসার মাঝ খানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে একটি একটী করিয়া সব কয়টী ফেলিয়া দিয়া নিজে সমস্ত বাসাটি অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে এবং মাতা পাখীর দ্বারা আনীত আহার একাই গ্রহণ করে এবং একাই তাহার সমস্ত যত্ন পাইয়া থাকে। ঐসময়ে অপর পাখীর ডিম্বও ঐ বাসাতে রাখিয়া দিলে তাহাও সে পূর্ব্বরূপ উপায়ে ফেলিয়াদেয়। পাখীর ক্ষুদ্র ২ ছানা গুলিকেও ঐরূপে ফেলিয়া দিতে ত্রুটী করেনা। ছানা কিম্বা ডিম্ব লইয়া উঠিবার সময়ে কখন ২ তাহার বোঝাটি পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যায়। তখন সে একটু বিশ্রাম করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে যতক্ষণে বাসার সব কয়টি ছানা ও ডিম্ব ফেলিয়া না দেয় ততক্ষণ বিরাম নাই, পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে থাকে। কোকিলের শাবকের ১০।১২ দিন হওয়া পর্য্যন্ত তাহার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না। ছোট সময়ে কোকিল শাবকের পৃষ্ঠ অনেকটা চওড়া ও একটু নুব্জ থাকে, তাহাতেই ডিম্ব কিম্বা শাবক বসাইয়া লইতে সুবিধা হয়। ১০।১২ দিন অতীত হইলে তাহার এই নুব্জ ভাব আর থাকে না। কোকিল শাবক যে অপর পাখীর ছানা ফেলিয়াই তৃপ্ত হয় তাহা নহে। এক সময়ে একটি বাসাতে দুইটি কোকিল ছানা ও ঐ পাখীর একটি ডিম্ব ও একটি ছানা ছিল, প্রথমতঃ দুই কোকিল শাবকের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ে উভয়কে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একটি আর একটিকে পৃষ্ঠে তুলিয়া ফেলিবার প্রায় উপক্রম করিলে বোঝার ভারে নীচে পড়িয়া যাইতে

লাগিল, তখন অপরটি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পূর্ব্বোক্ত ভাবে পৃষ্ঠে তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে বহু সংগ্রামের পরে বলবানটী জয়লাভ করিল, সে কোকিল শাবকটি সহ অপর শাবকটি ও ডিম্বটি ফেলিয়া দিয়া বাসা অবসর করিয়া লইল। এবং বিমাতা দ্বারা প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

জীবজন্তুর পরমায়ু।

প্রাণী জগতে তিমি মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। ইহারা ১০০০ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। হস্তী, ভাল অবস্থাতে থাকিতে পারিলে, ৪০০ চারিশত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বিড়াল সাধারণতঃ ১৫ পনর বৎসর জীবিত থাকে। সাধারণতঃ কাঠ বিড়াল ৭।৮ বৎসর, খরগোস ৭ বৎসর, ভল্লুক ২০ বিশবৎসর, শৃগাল ১৫।১৬ পনর-ষোল বৎসর এবং সিংহকে ৭০ সত্তর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। শুকর সাধারণতঃ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। ঘোটক কে ৬০ ষাট বৎসর দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ ঘোটক ২৫।৩০ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর জীবিত থাকে। উষ্ট্র প্রায় ১০০ একশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। ঈগল পক্ষী কখন কখন এবং দাঁড় কাক অনেক সময়েই শতায়ু হইয়া থাকে। রাজ হাঁসকে ৩০০ তিনশত বৎসর এবং কূর্ম্মকে ১০৭ এক শত সাত বৎসর জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। ধমনীর স্পন্দনের সহিত দীর্ঘ জীবনের সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এখন ও কোন যুক্তি যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নাই। দেখা গিয়াছে সিংহের ধমনীর স্পন্দন মিনিটে ৪০ চল্লিশবার ব্যাঘ্রের ৯৩ তিরানব্বই বার এবং ঈগল পক্ষী ১৬০ বার হইয়া থাকে। হস্তীর স্পন্দন গণনা করা অসম্ভব।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

জীবন (উপন্যাস) শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম, এ, বি, এল প্রণীত, মূল্য ১৮/০।' এখানি গ্রন্থকারের দ্বিতীয় উপন্যাস। তিনি ইতঃপূর্ব্বে 'প্রহেলিকা' লিখিয়া উপন্যাস সাহিত্যে যথেষ্ঠ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। সমালোচ্য গ্রন্থখানাও তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত যশঃ অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। বীরেন্দ্রবাবুর রচিত উপন্যাসের বিশেষত্ব যাহা তাহা "জীবনেও" সম্যক সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। ঘটনা বাহুল্য ও নায়ক নায়িকার অনাবশ্যক চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনকেই তিনি একমাত্র উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া মনে করেন না। অতীত ও বর্ত্তমানের ব্যূহ ভেদ করিয়া সমাজ সমস্যাগুলি কিরূপে ক্রমবিকশ লাভ করিয়া গড়িয়া উঠে এবং তাহাদের তরঙ্গাভিঘাতে সমাজ শরীর কিপ্রকারে বিপর্য্যস্ত হইয়া সমাজিক ব্যক্তির চরিত্র গঠিত করে সেই সকল মনোরম চিত্র বীরেন্দ্রবাবুর উপন্যাসে আমরা পাইয়া থাকি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-সভ্যতার সংঘর্ষণে আমাদের সমাজের স্তরটী যে আলোড়িত হইয়াছে এবং সেই আলোড়নের ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে যে কতগুলি সমস্যা সমুত্থিত হইয়া চিন্তাশীল সামাজিক গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা আর অস্বীকার করা যায় না। এই "যুগসন্ধির" কতিপয় সমস্যা গ্রন্থকার আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সাধারণতঃ সমস্যামূলক উপন্যাসের গল্পাংশে চিত্তা-কর্ষক ঘটনাবলীর ন্যূনতা দৃষ্টি হইলেও 'জীবন' সেই অপরাধ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারিয়াছে। ইহাতে নায়ক নায়িকার চরিত্র চিত্রনে শিল্প কুশলতার অভাব নাই। সুরেশ, হেম, নলিনী, লীলা, সরোজ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সুরেশ চরিত্রের উপর উপন্যাসের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সুরেশ—বিংশ শতাব্দীর ভাবুক ও কর্ম্মী যুবক। বিদ্যা, অর্থ, যশঃ তাহার কিছুরই অভাব নাই। তথাপি "তাহার সমস্ত দেহ প্রাণ ভরে কি এক মহাক্ষুধা বিরাজ কচ্ছে, শুধু অর্থ প্রাপ্তিতে যা মিটিবে না। এ কিসের ক্ষুধা?" সুরেশ এই মহাক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই "ক্ষ্যাপার" মত জগৎময় "পরশ পাথর" খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। অবশেষে তাহার সেই বুভুক্ষিত জীবনে শান্তি আসিল—ত্যাগের পথে, বহুর ভাবনায় ও স্বদেশের উন্নতি কামনায়। সুরেশের দেশ ভ্রমণের পর্ব্বটী বড়ই চিত্তা-কর্ষক হইয়াছে হেম - বন্ধুবৎসল, যুক্তিবাদী ও উৎসাহী শিক্ষিত যুবক। মনে হয় সুরেশের চরিত্র বিশেষ ভাবে ফুটাইবার জন্যই হেমের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। নলিনী সর্ব্বাংশে হেমের উপযুক্ত গৃহিনী। তাহাদের দাম্পত্য জীবন বড়ই মধুময়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণে ভারত নারীর মূর্ত্তিতে যে অমৃতভাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, নলিনীই সেই অমৃতভাণ্ড। কিন্তু লীলা ঠিক নলিনীর উপাদানে গঠিত নয়। লীলা, কাঠিন্যে, মাধুর্য্যে, সত্যে, ভ্রান্তিতে দয়া ও প্রেমের পরিপূর্ণতায় অনুরূপা। তাহার চরিত্রে মিশেনারী মেমদের চরিত্রের অনেকটা ছাপ পড়িয়াছে। কারণ লীলা মিশেনারী মেমদের হাতের মেয়ে—তাহাদের আবহাওয়ায় লীলার চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই প্রগলভতা ও লজ্জাশীলতায় অভাবটাই তাহার চরিত্রে

বর্ণী পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে মাধুর্য্য ও কমনীয় ভাবের সমাবেশ তেমন হয় নাই। সুরেশ ও লীলার মিলনে লীলার চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সে ভারত নারীর ঈপ্সিত সহধর্ম্মিণী পদকেই জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছিল। দীনবাবু ও ভগবতী দেবীর গার্হস্থ্য জীবন শিক্ষিত বাঙ্গালীর অতি লোভনীয়। এমন পিতা মাতা যে সংসারে সেখানেই সুরেশ ও নলিনীর মত পুত্র-কন্যা সুলভ। সরোজের শোকাবহ চিত্র সুরেশের জীবনে যে শুধু একটা বৈচিত্র্য আনিয়াছে তাহা নহে,— তাহার মর্ম্মন্তুদ জীবন কাহিনীপাঠে পাঠককে অশ্রুপ্লাবিত করে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে ছোটখাট আরো অনেক চরিত্র আছে। গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত। সর্ব্বত্রই ক্রিয়া পদের সুষুতা সাধিত হইয়াছে বাধাঁই মনোরম। পরিশেষে ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে, জীবন বঙ্গের চিন্তাশীল সমাজে একটা ভাবের বৈচিত্র্য ও আদর্শের নবধারা আনিতে চেষ্টা করিয়াছে।

শ্রীমাধবাচার্য্য।

"সাধক কবি ৺রামকুমার নন্দী মজুমদারের জীবন চরিত।"

সজীব উন্নতিশীল সাহিত্যকে স্রোতস্বিনীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। নদীর ন্যায় সাহিত্যের প্রবাহটির ইতিহাস জানিতে হইলেও ইহা সুদূর অতীতের কোন্ হৃদয়-গুহা হইতে উৎসারিত হইয়া, কোন্ কোন্ পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ ও গুপ্ত নির্ঝর ধারায় আত্ম পুষ্টি করিয়া, কোন্ কোন্ উর্ব্বর সমাজ ক্ষেত্রের ভিতরদিয়া আপনার গতি-পথটী করিয়া নিয়া বর্ত্তমানের বিপুলতায় ও লীলাবৈচিত্র্যে পৌঁছিয়াছে, তাহা সন্ধান করিয়া জানিতে হয়। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ প্রাদেশিক কবিদের চিত্ত হইতে নিঃসরিত হইয়া সমাজের চিত্তক্ষেত্রকে সরস করিয়া উক্ত সাহিত্যের মূল ধারাটির প্রকৃতিকে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ও গতিবেগকে বর্দ্ধিত করিয়াছে তাহা সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধিৎসা দ্বারা অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক। এই বহু আয়াস সাধ্য কার্য্য একক কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। বহু সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি দ্বারা প্রাদেশিক কবিদের জীবনী ও কাব্যাদির পরিচয়াত্মক তথ্য সংগৃহীত হইলে পর প্রকৃত সাহিত্যেতিহাসের ভিত্তি পত্তন হইবে। ৺কবি রামকুমার নন্দীর চরিত লেখক উক্ত কবির জীবনী ও গ্রন্থ বিবরণ প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাবয়ব-ইতিহাস রচনার সহায়তা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার পুস্তক হইতে কবি রামকুমারের যে পরিচয় পাই তাহা সংক্ষেপতঃ এই ঃ—রামকুমার ১৮৩১ খৃঃ শ্রীহট্ট জিলায় জন্ম গ্রহণ, এবং ১৯০২ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া, সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন যুগে কোনরূপ শিক্ষার সুযোগ না পাইয়াও তিনি শুধু চরিত্রের দৃঢ়তা, প্রবলজ্ঞান স্পৃহা, সাহিত্যানুরাগ, এবং সহজ কবি-প্রতিভার প্রেরণায় আত্মোন্নতি লাভ করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘজীবনকাল সাহিত্যচর্চ্চায় নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের জীবনে প্রাচীন ও নবীন বাংলা সাহিত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন এবং ঐ উভয় সাহিত্যের প্রভাবই তাঁহার রচনায় স্পষ্ট লক্ষিত হয়। এজন্য আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি ১০ম বৎসর বয়স হইতে গান রচনা আরম্ভ করেন, ১৪ বৎসরের সময় দাতাকর্ণ পালা রচনা করেন, এবং পরে কবির দলের উত্তর প্রত্যুত্তর রচনা, পাঁচালী রচনা, বহু নাটকের পালা রচনা দ্বারা প্রাচীন সমাজের রস-পিপাসা তৃপ্ত করেন। আবার মধুসূদনের অভ্যুদয়ের পর তাঁহার অনুকরণে "বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর" কাব্য অমিত্রচ্ছন্দে রচনা করিয়া যশস্বী হন এবং সেই ছন্দেই "উষোদ্বাহ" নামক কাব্য রচনা দ্বারা প্রতিভার মৌলিকতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু কবির বহুবিচিত্র রচনাবলীর মধ্যে তাঁহার পরমার্থ সঙ্গীতাবলীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মসাধনাই কবি রামকুমারের চরিত্রের মেরুদণ্ড। কবি-যশোলিপ্সায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বহু রচনা করিয়াছেন সত্য কিন্তু সাধকরত্ন রাম প্রসাদের ন্যায় তিনি ধর্ম্ম সঙ্গীত রচনায়ই তদ্গত চিত্ত ছিলেন—"তাঁহার কবিত্ব সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সাধনার রাজ্যে তাঁহাকে বহুদূর লইয়া গিয়াছিল।" বস্তুতঃ ইহা আশ্চর্য্যের কথা যে, এই সেকেলে কবি অশ্লীল কবিতাদি বা একটি প্রণয় সঙ্গীতও রচনা করেন নাই। আর পরিতাপের কথা যে, অর্থাভাব বশতঃ প্রকাশকের এবং যশোগায়কের অভাবে রামকুমারের কাব্য ও ধর্ম্ম-সঙ্গীত বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের অনায়ত্ত থাকিয়া অচিরকাল মধ্যেই বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

"দেবজন্ম"—প্রবর্ত্তক পাব্‌লিসিং হাউস্, চন্দননগর।

ধর্ম্মোপদেশ ত আমরা অনেকের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু অনেক সময়ই তাহা আমাদের এক কানে প্রবেশ করিয়া অপর কান দিয়া বাহির হইয়া যায়, মরমে গিয়া পৌঁছায় না। ইহার কারণ কি? যাহা সত্য, তাহা দ্বারা ত সকলেরই আকৃষ্ট হইবার কথা? ধর্ম্মোপদেশের ব্যর্থতার এক কারণ অবশ্য উপদিষ্টের হৃদয়ের অস্বচ্ছতা,

সত্যকে হৃদয়ে গ্রহণ করিবার অক্ষমতা। কিন্তু ইহার অন্যতম কারণ উপদেষ্টার অযোগ্যতা। যাহার উপদেশ বাক্য আত্মার চিত্তমালিন্য দূর করিয়া তাহাতে সত্যের বীজ বপন করিতে পারিল না, তিনি নিজেও ঐ সত্যকে উপলব্ধি করেন নাই, তিনি কতক গুলি 'বুলি' আওরাইয়া গিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যিনি সত্যকে হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সাধনা দ্বারা তাহাকে জীবনে ফলাইয়া তুলিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সত্য বক্তা, উপদেষ্টা। এইরূপ বক্তার বাক্য গুলি সত্যের অগ্নিকণা গর্ভে ধারণ করিয়া জীবন্ত, জ্বলন্ত হইয়া শ্রোতার অন্তরে সেই অগ্নি সংক্রামিত করিয়া দেয়।

আমাদের আলোচ্য পুস্তিকা খানির উপদেশ গুলির মধ্যে আমরা উপরোক্ত জাতীয় সত্যের সঞ্জীবতার সন্ধান বহুল পরিমাণে পাইয়া পুলকিত হইয়াছি। ইহার কোথাও 'বাঁধি' বুলি নাই—একটি উদ্যমশীল, সাধনশীল সবল আত্মার স্বাধীন চিন্তা ও প্রত্যক্ষীভূত সত্যের স্বাভাবিক প্রকাশ সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। আর এজন্যই লেখকের ভাষাটিও তাঁহার নিজস্ব—তাহা যেমন স্বচ্ছ তেমনি সতেজ, জোরালো। তাহা ক্ষিপ্রশায়কের ন্যায় আমাদের চিত্তে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। প্রবন্ধ গুলিতে যেমন চিন্তাশীলতা, শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রাহিতা সুব্যক্ত, তেমনি সাত্ত্বিকতা, দৃষ্টির প্রসারতা (Wide out look) ও উদারতা সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। প্রাচীনদের গভীর আধ্যাত্মিকতা আধুনিক যুগের বিশ্বমানবতার সঙ্গে সঙ্গত হইয়া মানবের ভবিষ্যৎ সভ্যতাকে কিরূপ গরীয়ান্ করিয়া তুলিবে, মানব জাতিকে দেবত্বের পদবীতে উন্নীত করিবে, সেই পরম আশার বাণীই পূতচরিত লেখক ১২টি প্রবন্ধে নানা রূপে প্রচার করিয়াছেন। "ভোগঃ যোগায়তে" 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য' এবং 'ভারত-প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। "ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য" হইতে একটু নমুনা উদ্ধার করিলাম :—

"ইউরোপে আছে রাষ্ট্রের প্রভুত্ব, অত্যাচার,—ভারতে আছে সমাজের প্রভুত্ব। গোষ্টির এই উভয়বিধ কবল হইতেই মানুষের ব্যক্তিত্বকে উদ্ধার করিতে হইবে। * গোষ্টির আত্মার যে চেতনা তাহা স্বভাবতঃই একটা "অবচেতনা" (Inconscient)—অচেতনা না হইলেও তাহা অন্ধ, মূক, আপনহারা, তাহা প্রাকৃত শক্তির চেতনা; ব্যক্তিরই মধ্যে তাহা জাগ্রত চেতনায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানেই সে ভাষা পাইতেছে, চক্ষুষ্মান্ হইতেছে, নব নব সৃজনের সামর্থ্য পাইতেছে। * নব নব ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবানকে ব্যক্তি বিশেষ হইয়াই আবির্ভূত হইতে হয়,—গোষ্টি সত্তাও সেই রকম আপনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যক্তি সত্তার মধ্যেই বিগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। * * সৃষ্টি বিবর্ত্তনের ইহাই মূলকথা। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে যে বস্তু খর্ব্ব করিতে চায় তাহা সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করিতে চায়। * ভারতে মোক্ষের আদর্শ এই মহাসত্যকেই ধরিয়াছে। * আজকার দিনে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পীড়নে মানুষের আত্মা যখন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে * তখন এ সত্যটির উপর আবার বিশেষরূপে ধ্যান দিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মোক্ষবাদ একান্ত আত্ম সর্ব্বস্ব, প্রত্যেক ব্যক্তিই মনে করে * * তাঁহার মুক্তিটুকু হইলেই সব হইল। * * আর ইউরোপীয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ফল দ্বেষ, সংঘর্ষ—বেশীর ভাগই ইহা প্রতিবাদের তন্ত্র, ** সামঞ্জস্য করা তাহার ধাতুতে নাই। কিন্তু আমরা যে ব্যক্তিত্বের কথা বলিতেছি তাহা হইতেছে ব্যক্তির মধ্যে ভাগবত সত্তা, সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ * * সেই মৌলিক অবলম্ব যাহার উপর ভর করিয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ভাগবত ব্যক্তিত্বের ধর্ম্মই হইতেছে বহুকে একের মধ্যে ধরিয়া রাখা, এককে প্রতিষ্ঠা করিয়া নানাকে ফলাইয়া তুলা, ভেদের মধ্যে সাম্যকে অটুট্ রাখা। * আমাদের লক্ষ্য—মানব জাতিকে এই ভাগবত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে জাগরিত করা। সমাজ হউক, দেশ হউক, রাষ্ট্র হউক বর্ত্তমানে যে গোষ্টিধর্ম্মের প্রয়োজন তাহা আমরা ধ্বংস করিতে চাহিনা, তাহাদের সেবা আমাদের করিতে হইবে, বর্ত্তমানে তাহাতে আমাদের প্রয়োজন আছে। আমরা চাই সমাজকে, রাষ্ট্রকে, নেশনকে নূতন মন্ত্রে, নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে—তাহার মূল কথা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। তবেই না বৈচিত্র্যের নব নব জ্ঞানের শক্তির সহস্র ধারা খুলিয়া যাইবে, যন্ত্রের পরিবর্ত্তে,——পরিবর্ত্তে না হউক যন্ত্রের অন্তরালে যন্ত্রী আসন পাইবে, উহাকে চালাইয়া লইবে, নিয়ন্ত্রিত করিবে প্রয়োজন হইলে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবে।"

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

অষ্টম বর্ষ। ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২৬। চতুর্থ সংখ্যা।

কবি মধুসূদন দত্ত।

মধুপ জাতীর মধ্যে পুরুষেরা নাকি বড়ই আলস্য-পরায়ণ, আর স্ত্রী-মক্ষিকারাই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দ্বারা মধুর ভাঁণ্ডার পূরণ করিয়া নিষ্কর্ম্মা পুরুষ-মক্ষিকাদিগের উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে। কিন্তু পুষ্প-মধুর জন্য মানুষ পুরুষ মক্ষিকার নিকট ঋণী না হইলেও মধুঋতুতে সুমধুর গুঞ্জন দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় ভৃঙ্গকুল মানুষের শ্রুতিমূলে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের সারস্বত কুঞ্জের মধুকর, কবি-সমাজেও উক্তরূপ দুইটি শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একদল কবি আছেন যাঁহারা প্রকৃতির হাত হইতে তাঁহারা যে প্রতিভা-ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছেন তার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বিনা আয়াসে আস্তে সুস্থে আমাদের কর্ণে সঙ্গীত মাধুর্য্য ঢালিয়া দেন। আর অন্য শ্রেণীর কবিগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রতি-ভাঙ্কুরকে সাধনা দ্বারা পূর্ণবিকসিত শতদলে ফুটাইয়া তুলিয়া কলসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাত্মার-তৃপ্তির জন্য সঞ্জীবনী সুধার ভাণ্ড উন্মুক্ত করিয়া দেন। প্রথমোক্ত কবিদের দ্বারা, সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, শুধু আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষণিক তৃপ্তি,—আর শেষোক্ত কবিগণের কাব্য-সৃষ্টি দ্বারা আমাদের অন্তরেন্দ্রিয়ের স্থায়ী স্ফূর্ত্তি। আমাদের অমর কবি মধুসূদন শেষোক্ত সাধক-কবিদের অগ্রণী ছিলেন। আজ বাংলা ভাষা ঐশ্বর্য্য-শালিনী, তাই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা বিলাসিনী রমণীর ন্যায় আজ তাহার ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে, কোন্ কোন্ অনশন-ক্লিষ্ট শ্রমজীবীর হৃদয়ের শোণিত ও হস্তের নিপুণতায় তাহার অদ্যকার এই অম্বরচুম্বী গর্ব্বোন্নত সৌধ-ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে,—কোন্ কোন্ রোদ-বৃষ্টি-পরিক্লিষ্ট কৃষকের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় তাহার এই অতুল বিভবরাশি সঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু কৃতজ্ঞতার খাতিরে অদ্যকার এবং ভবিষ্যতের বঙ্গীয় পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে বঙ্গভাষা-জননীর এই সৌভাগ্যোদয়ের জন্য আমরা মধুসূদনের অসামান্য কবি-প্রতিভা এবং জীবনব্যাপী সাহিত্যিক সাধনার নিকট কি পরিমাণে ঋণী। আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিতে হইবে, মধুসূদন কি অদম্য উৎসাহে ও অবিচলিত সংকল্পে, দারিদ্র্যের পীড়ন সহ্য করিয়া, অদৃষ্টের নিগ্রহ অগ্রাহ্য করিয়া, পারিবারিক জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া, একদিকে বাল্মীকী ব্যাসের এবং অপর দিকে হোমার-ভার্জ্জিল-মিল্টনের মহাকাব্য সমুদ্রে অবগাহন করিয়া মাতৃভাষার জন্য মণি মাণিক্য আহরণ করিয়াছিলেন,—উক্ত মহাকবিগণের অপার-বিস্তার অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ কল্প-লোকে বিচরণ করিয়া তাঁহার সেই সর্ব্বত্রগামিনী, ত্রিলোকবিহারিণী কল্পনা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শুধু ভাষা ও ছন্দের অনন্যসাধারণ গাম্ভীর্য্য ও সুমন্থর গতি বিষয়ে নহে, কিন্তু বাণীর প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের জন্য ক্লান্তিহীন সাধনা এবং অবিশ্রাম তপশ্চর্য্যা বিষয়েও মধুসূদন এবং ইংরাজ কবি মিল্টনের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মিল্টনের 'Industrious and select reading' এর কথা, অর্থাৎ তাঁহার সুবিচারিত অবিশ্রান্ত অধ্যয়নের কথা সকল ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকই অবগত আছেন। তাই প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ড উক্ত কবির

কাব্যগত উৎকর্ষের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"Continually he lived in companionship with high & rare excellence, with the great Hibru poets and prophets, with great Poets of Greece and Rome"—"যাহা কিছু মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম তাহাই মিল্টনের চিরসঙ্গী ছিল, তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রেষ্ঠ হিব্রু কবি ও মহাত্মগণের এবং গ্রীশ দেশীয় ও রোমীয় শ্রেষ্ঠ কবিবৃন্দের মহৎ সংসর্গে বাস করিতেন।" আমাদের মধুসূদনেরও সাহিত্য-সাধনা ন্যূন ছিল না। যখন সুদূর মান্দ্রাজে থাকিয়া মাতৃভাষা চর্চ্চা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, তখন তিনি কোন বন্ধুর নিকট এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন—"ছাত্রজীবনাপেক্ষা আমার জীবন অধিক অবসরহীন ও কর্ম্মময়। আমার দৈনিক কর্ম্মের সময় বিভাগ এইরূপ:—প্রাতে ৬টা হইতে ৮টা হিব্রু ভাষা অধ্যয়ন, ৮টা হইতে ১২টা স্কুলে অধ্যাপনা; ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ২টা গ্রীক্ সাহিত্য অধ্যয়ন; ২টা হইতে ৫টা তেলেগু ও সংস্কৃত অধ্যয়ন; ৫টা হইতে ৭টা ল্যাটিন্, ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা ইংরাজি সাহিত্য অধ্যয়ন। আমি কি আমার পিতৃপিতামহগণের ভাষাকে সমৃদ্ধি শালিনী করিবার জন্য উপযোগিতা লাভ করিতে উপযুক্ত চেষ্টা করিতেছি না?"—আজ কে ইহা অস্বীকার করিতে পারে? তারপর, বঙ্গভারতীর চরণে অঞ্জলি দান করিবার জন্য মধুসূদন য়ুরোপ প্রবাস কালে কি ভাবে অর্ঘ্য-সম্ভার আহরণ করিয়াছিলেন তাহাও এ স্থলে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। য়ুরোপ হইতে তিনি বন্ধু বিশেষকে এই মর্ম্মে লিখেন:—"জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার এরূপ মনের বল ও সংকল্পের দৃঢ়তা আছে যাহাতে এই অদৃষ্টের নিগ্রহের মধ্যেও আমি ইতালীয়, জর্ম্মানীয় এবং ফরাসী এই তিনটি য়ুরোপীয় ভাষার শিক্ষাকার্য্যে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি! যদি ততদিন বাঁচিয়া থাকি, এবং স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারি তবে ভরসা করি আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে ঐ সকল ভাষার ভিতরকার সৌন্দর্য্য-সম্পদের সঙ্গে আমার শিক্ষিত বন্ধুবর্গকে পরিচিত করিতে পারিব।"—আজ "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর" পাঠক জানেন মধুসূদনের সেই অন্তরের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে কি না শুধু তাঁহার সমসাময়িক বন্ধুবর্গ কেন, সকল বঙ্গসাহিত্যসেবী চিরকাল মধুসূদনের সেই সাহিত্যসাধনালব্ধ অমৃত ফল সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি ('সাহিত্যের কথা' এবং 'আমাদের সাহিত্য ও সাহিত্য-চর্চ্চা' প্রবন্ধে *), আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বঙ্গ বাণীর একতারা যন্ত্রের ন্যায় ছিল এবং তাহা হইতে শুধু ধর্ম্মসঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইত, কিন্তু মানবজীবনের ধারাবাহিক সঙ্গীত সে সাহিত্যের কোথাও বাজিয়া উঠে নাই, তাহা যেন সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ-তরঙ্গায়িত জীবন ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন-বিশ্লিষ্ট ছিল। ভারতচন্দ্র প্রভৃতির "অন্নদামঙ্গলে" বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান উপলক্ষে মানব প্রেমের চিত্র সংযোজিত আছে বটে, কিন্তু তাহা রাজ পুত্র রাজপুত্রীর প্রেমের বীভৎস ছবি মাত্র, তাহা সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে ও তাহাদের চিত্তকে মানব-প্রেমের পূতবারি-নিষেকে সঞ্জীবিত করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি কবি মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীবর্ণিত ব্যাধ-দম্পতী কালকেতু ফুল্লরার বা বণিকজাতীয় ধনপতি লহনা খুল্লনার দাম্পত্য প্রেম-চিত্রের কথা ভুলিয়া যাই নাই। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, উক্ত কাব্যের নায়ক নায়িকাগণ দৈব-অভিশাপ-সন্তপ্ত স্বর্গচ্যুত দেবদেবী বা অপ্সর অপ্সরী; এবং তাহারাও কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু নহে চণ্ডী মাহাত্ম্য-প্রচাররূপ দৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধির আনুসঙ্গিক বিষয় মাত্র। আর কবি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের অনুরোধেই সম্ভবতঃ, নায়ক নায়িকার চিত্রগুলিকে স্থানে স্থানে এরূপ ভাবে কলঙ্কিত করিয়াছেন যে তাহাতে যেমন মানবীয়তার প্রতি পাঠকের মনে ধিক্কার জন্মে, তদ্রূপ মানুষের উপাস্য দেবতার প্রতিও কবির অভিপ্রেত শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়না। প্রথমতঃ গুপ্ত কবিকেই আমাদের সাহিত্যে মানবীয় ভাবের আমদানী করিতে দেখি; কিন্তু তাহা কতকাংশে স্বাদেশিকতা এবং মুখ্যতঃ হাস্য-রস বিষয়ে। আর, ঈশ্বর গুপ্তের রসিকতা যে সাধারণতঃ আধুনিক সুরুচি ও শ্লীলতার অনুমোদিত নহে, ইহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রকৃত পক্ষে মাইকেল্ মধুসূদন দত্তই

(এবং কিয়ৎপরিমাণে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) সর্ব্ব প্রথমে আমাদের সাহিত্যের গতিমুখ ফিরাইয়াছিলেন। তিনিই ভগীরথের ন্যায় সাহিত্য মন্দাকিনীর বিমল ধারা বঙ্গীয় সমাজের বক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত করিয়া বাঙ্গালীর চিত্তক্ষেত্রকে পূত ও উন্মুক্ত করিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ মানুষের সুখদুঃখের তীব্র বেদনা, মানুষের স্নেহ-প্রীতি, মানুষের পৌরুষ পর্ব্ব, ধৈর্য্য বীর্য্য, শক্তি-সামর্থ্য, মানুষের অর্জ্জন বর্জ্জন ত্যাগ ও ভোগের মধ্যকার সংগ্রাম কত বিচিত্র, কত মধুর, কত কল্যাণকর,—তাহা মানুষের অন্তিম পরিণতির ও অন্তর্গীন উদ্বর্ত্তনের পক্ষে কত অত্যাবশ্যক, তার প্রমাণ আমাদের সাহিত্যে সর্ব্ব-প্রথমে "মেঘনাদবধ কাব্যে"ই প্রাপ্ত হই। তাই, কবি হেমচন্দ্র—

'অকাল কোকিল, মরুতলতরু
অনীর দেশের বারি

বলিয়া মধুসূদনের কবি প্রতিভার যে স্তুতিগান করিয়াছেন তাহা নিতান্ত কবিজন-সুলভ অত্যুক্তি মনে করিতে পারি না।

কিন্তু, আমরা কবি মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয় যে এ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে লাভ করিয়াছি, তাহাওত মনে হয় না। আমরা ভুলিয়া যাই, কবির প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার কাব্যের ভিতরে শুক্তির গর্ভে মুক্তার ন্যায়, গুপ্ত থাকে। আমরা ভুলিয়া যাই, কবিদের প্রকৃত জীবন তাঁহাদের ব্যবহারিক বাহ্য জীবনের খুঁটি নাটির বহুউর্দ্ধে ও অন্তরালে আত্ম প্রকাশ করে। আমার ত মনে হয়, যদি কোন কবি ঘটনাক্রমে সিদ্ধ পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া না থাকেন, তবে কবিদের বাহিরের জীবন সম্বলিত জীবন-চরিত লেখার প্রথা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। এই জাতীয় কবি-জীবনী কাব্য পাঠের যতটা সহায়তা করে, তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে অন্তরায় জন্মাইয়া থাকে। ইংরাজ কবি শেলী ও আমাদের মধুসূদন সম্পর্কে এ কথাটা বিশেষ ভাবে মনে জাগিয়া থাকে। শেলীর কাব্য পাঠে আমরা কবির যে পরিচয় পাই তাহাতে তাঁহাকে দেবদূতের ন্যায় কমনীয় ও ম[illegible] [illegible] কার কিন্তু প্রফেসার ডাউডেন [illegible] বিস্তৃত জীবনীতে যে শেলীর চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা দেখিয়া কবির কাব্যপাঠে তৎপর হইলে তাঁহার সমস্ত রস যেন ঘোলাইয়া তিতাইয়া যায়। সেইরূপ, মধুসূদন পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগী, য়ুরোপীয় রমণীর পাণিগ্রহণে কলঙ্কিত, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র, হ্যাট্-কোট-পরিহিত বাঙ্গালীর কিম্ভূত কিমাকার বিলাতী সংস্করণ ছিলেন, তিনি হিন্দুর চিরারাধ্য রামচন্দ্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন 'I despise Ram and his rabble' 'আমি রাম ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গগণকে ঘৃণা করি', ইত্যাদি ইত্যাদি কথা স্মৃতিপটে মুদ্রিত করিয়া যখন আমরা তাঁহার কাব্যাধ্যয়নে নিযুক্ত হই, তখন স্বভাবতই একটা বিদ্বেষের ছায়া আসিয়া কবির কাব্যগত আদর্শকে আমাদের নিকট হইতে অপসৃত করিয়া দেয়, অন্ততঃ তাহাকে বিকৃত ও অস্পষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্যই আমরা 'মেঘনাদ বধের' টুক্‌রা টুক্‌রা সৌন্দর্য্য মাত্র উপভোগ করিতে পারি এবং সমগ্র কাব্যের আদর্শটাকে বিকৃত বিজাতীয় ভাবাপন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করি।

এই ভাবে কোন কবির প্রতি পাঠক-হৃদয়ের অনুরাগ বিরাগ দ্বারা তাঁহার কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করাকে ম্যাথু আর্ণল্ড 'False Estimate', ভ্রান্ত বিচার পদ্ধতি বলিয়াছেন। উক্ত মনীষীর মতে কাব্যবিশেষের প্রকৃত মূল্য, তাৎপর্য্য ও সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান ঐ কাব্যের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে,—অন্যত্র তাহার সন্ধান করিতে গেলে কাব্যালোচনা জটিল ও পথভ্রষ্ট হইয়া ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ম্যাথু আর্ণল্ড আরো লক্ষ্য করিয়াছেন যে পূর্ব্বোক্ত Personal estimate (কবিবিশেষের প্রতি পাঠকের প্রীতি বা বিদ্বেষের দ্বারা তাঁহার কাব্যের মূল্য যাচাই করা) ছাড়া আরেকটী কারণে আমাদের কাব্যচর্চ্চা পথভ্রান্ত হয়। ইহাকে তিনি 'Historical Estimate' বলিয়াছেন। সুদূর অতীতের প্রতি মানুষের এমনি একটা অত্যধিক শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ যে বর্ত্তমানের কোন ব্যক্তি যদি অবান্তর বিষয়ে ও প্রাচীনদের আচারিত পন্থা হইতে চুল-পরিমাণে সরিয়া চলাচল করিবার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেন, তবে মানুষ তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে চায় না, এবং সে ব্যক্তির দ্বারা আচরিত অশেষবিধ সহস্র পুণ্যানুষ্ঠান মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হইয়া যায়।

এতদুভয় কারণে মধুসূদন তাঁহার স্বদেশীর নিকট যে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন অন্য কোন কবির ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। তাই দেখিতে পাই, তাহার কাব্যের প্রায় সমুদয় সমালোচকই পরিতাপ করিয়াছেন যে মধুসূদনের প্রধান কাব্য 'মেঘনাদ বধের' আদর্শ আমাদের জাতীয় আদর্শকে উন্মথন করিয়াছে, হিন্দুর চিরপূজার্হ রাম লক্ষ্মণ চরিত্রে কাপুরুষতার কলঙ্ক আরোপিত করিয়া এবং অনার্য্য, মনুষ্যখাদক, পাপাত্মা দশানন-তনয় মেঘনাদকে উজ্জ্বলতর আলোকে চিত্রিত করিয়া, শ্রেষ্ঠতর গুণগ্রামে ভূষিত করিয়া কবি দেবত্বকে ছাড়িয়া পশুত্বের পূজা করিয়াছেন, পুণ্যকে বর্জ্জন করিয়া অকল্যাণকে আদর্শস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

'মেঘনাদবধ কাব্যের' একটু আলোচনা করিয়া দেখিব উক্ত অভিযোগগুলি কতদূর ভিত্তিমূলক। প্রকৃতই কি এইকাব্য মানুষের জন্য কোন মহতী বাণী প্রচার করে নাই?—কুসংস্কার-মুক্তমনে খোসাকে অতিক্রম করিয়া ভিতরকার শস্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, অপ্রাসঙ্গিকতা দ্বারা আমাদের অনুসন্ধেয় বিষয়কে জঞ্জাল-সঙ্কুল না করিলে সর্ব্ব প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, এই কাব্যে কবি অদৃষ্টের দাস দুর্ব্বল বাঙ্গালীর নিকট পুরুষকারের, প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্মের, মানুষের ভিতরকার অনন্তপ্রসারণশীল শক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। যে সকল নৈসর্গিক জড়শক্তির উপদ্রবকে মানুষ এতকাল অপ্রতিবিধেয় দৈব উৎপাত বলিয়া স্বীকার করিয়া নতশিরে সহ্য করিয়া যাইতেছিল, আজ মানুষ আধুনিক বিজ্ঞান লব্ধ নব শক্তির বলে তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় তাহাদের দ্বারা আপনার প্রয়োজন সাধন করিতেছে। তাই আজ মানুষ এই নব শক্তির আস্বাদ পাইয়া দৈবকে মানিতেছে না, নিজেকে প্রকৃতির দাস বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছে না, অপরন্তু মানবীয় শক্তিকে প্রকৃতির শাসক ও নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে,—নিজেকেই নিজের বিধাতা মনে করিতেছে। মানুষের এই নবজাগ্রত আত্ম-শক্তিবোধের আদর্শকেই মধুসূদন তাঁহার কাব্যের নায়ক মেঘনাদ-চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জানি, আপত্তিকারী প্রশ্ন করিবেন, মহর্ষি বাল্মীকী যে সূর্য্যকুলাবতংস রাম লক্ষ্মণকে বীরত্বের পূর্ণ মহিমাজ্যোতিতে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই পূর্ব্বতন মাহাত্ম্য হরণ করিয়া রক্ষোবীর ইন্দ্রজীৎকে বীরের আদর্শরূপে চিত্রিত করিবার এমন কি প্রয়োজন ছিল? স্বীকার করি, যে সকল নামের চতুঃপার্শ্বে যুগযুগান্তরের সংস্কার-শ্রদ্ধা ভক্তি জড়িত হইয়া গিয়াছে তাহাদের উপর কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের ভিতর ভিন্নরূপ অর্থ জুড়িয়া দিবার চেষ্টা বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল। কিন্তু ইহা সহজেই মনে হয় যে মধুসূদনের এতটা বুদ্ধিমত্তা ছিল যদ্দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে রাম লক্ষ্মণকে তাঁহাদের চিরন্তন মহত্বের উচ্চ শেখর হইতে নামাইতে চেষ্টা করা অতীব দুঃসাহসিকের কার্য্য। তাই, তাঁহার কাব্যগত উদ্দেশ্যের অনুরোধে অনিবার্য্য কারণেই যে এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমিত হয়। সে কারণটি কি, সন্ধান করা আবশ্যক।

বীরত্ব জাতি বর্ণ দেশ কাল নির্ব্বিশেষে মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। আর, প্রকৃত বীরত্বের,-শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বীরত্বের মহার্ঘতা ভারতবর্ষ যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিল অন্য কোন দেশ আজ পর্য্যন্ত সেরূপ বুঝিয়াছে কি না সন্দেহস্থল। যে মুক্তি ভারতীয় সাধনার ঐকমাত্র লক্ষ্যস্থল ছিল, ভারতবর্ষ জানিতে পারিয়াছিল, সেই মুক্তি উপার্জ্জনের একমাত্র উপায় প্রকৃত বীরত্ব। তাই প্রাচীন ভারতের ঋষি জলদ-মন্দ্রে ঘোষণা করিয়াছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ',—নির্ব্বীর্য্যের দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার অসম্ভব। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস নিঃসন্দেহ প্রমাণ করিতেছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা যাই হউক, অন্ততঃ বাংলা দেশের বীরত্ব-গৌরব বহুকাল হয় দেশের সীমা ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রতা, আত্মকলহ, পরহিংসা, পারদ্বেষ প্রভৃতি বাঙ্গালী জাতীকে বহুদিন হইতে নানাভাবে দুর্ব্বলতার পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়াছে। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি ত নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের অন্তিম স্ফুলিঙ্গ-দীপ্তি মাত্র। তম্মভূমির

এই হীনতা মধুসূদনের নবভাবোদ্দীপ্ত বীর-হৃদয়ে কি দারুণ আঘাত করিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা "চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলীর" 'আমরা' শীর্ষক কবিতাখণ্ডে প্রাপ্ত হই,—

"আকাশ-পরশী গিরি দমি, গুণবলে
নির্ম্মিল মন্দির যাঁরা সুন্দর ভারতে,
তাঁদের সন্তান কিহে আমরা সকলে?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে।"

এই কবিতায়, স্বদেশের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতায় কবি-হৃদয়ের অসহনীয় আত্মগ্লানি যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ তাহাতে ভারতের গৌরবময় অতীতের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সঙ্গে কবির বাল্যরচনা "King Porus—a legend of old" নামক বীররসোদ্দীপক ইংরাজী কবিতাটিও পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতের প্রতি ও প্রকৃত বীরত্বের প্রতি কবিবরের কি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

সমস্যা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রামের দূষিত বায়ু শোধন জন্য জগবন্ধু বাবু প্রথমেই মহকুমায় যাইয়া মহকুমা মাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহকুমা মাজিষ্ট্রেট সকল কথা অবগত হইয়া প্রচুর সহানুভূতির সহিত তাঁহার মন্তব্য গ্রহণ করেন ও তাঁহাকে হিন্দু হিতসাধিনী সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন।

মহকুমার ১ম মুনসেফ অনাদি বাবু মহকুমার শাখা হিন্দু হিতসাধিনী সমিতির সভাপতি, জগবন্ধু বাবু তাঁহার সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা অবগত করাইলেন এবং হিতসাধিনীর হিত চেষ্টায় কোন রূপ ফল ফলিতে পারে কি না তাহার দিকে দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিলেন।

মুনসেফ বাবু তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ করিয়া হিত সাধিনীর সম্পাদক শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণকে মহকুমায় আসিতে অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ সম্মানিত লোক, অর্থবানও বটেন। ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ানই তাঁহার জীবনের কর্ম্ম। দেশ ও সমাজ-হিতৈষণা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। দেশ ও সমাজের জন্য তিনি জিহ্বা ও লেখনী ব্যয় করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িবার লোক ছিলেন না। স্বার্থপর সমাজদ্রোহীজনগণের অজস্র নিন্দা তাঁহাকে কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না।

তাঁহার চরিত্রে যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ লোকমুখে প্রচার হইয়াছিল, সেগুলি ঃ—তিনি বাল্য বিবাহের বিরোধী হইয়াও নিজের বেলায় গৌরী দানের ফল লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার দীর্ঘ টিকি থাকা সত্ত্বেও তিনি স্থান বিশেষে ইয়োরোপীয় প্রথা অনুসারে আহার করিতেন; বক্তৃতা ও প্রবন্ধে আত্ম কথা প্রচারই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চিন্তা করেন কম, কথা বলেন বেশী কিন্তু যাহা বলেন তাহা মূল্যবান। ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোট কথা, শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ কাজের লোক ছিলেন। যে কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিতেন, তাহা প্রাণপণ যত্নে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময় তিনি কেন্দ্রে কেন্দ্রে শাখা সমিতি স্থাপন করিতেছিলেন। শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ মুনসেফ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ ক্রমে পীরপুরে যাইয়া জগবন্ধু বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে লইয়া রাজনগরের রাজা বাহাদুরের নিকট গমন করেন।

এই প্রচেষ্টার ফল যাহা ফলিয়াছে, তাহা পাঠক পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পাঠ করিয়াছেন। এই অধিবেশনে যে কোন ফল হয় নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না। বক্তৃতার একটা ফল আছেই। এই এক সপ্তাহে পীরপুরের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা অর্দ্ধেক বিনা তদ্বিরে খারিজ হইয়া গিয়াছে, সম্পাদক তাহার তালিকা লইয়া আসিয়াছেন।

আজ পীরপুর ষ্টেডিং সবকমিটির প্রথম অধিবেশন। সদর হইতে প্রাতঃকালেই সম্পাদক সুশীল বাবু ও সহকারী সম্পাদক মাখন বাবু আসিয়া পীরপুর পঁহুছিয়াছেন।

রবিবার। সুতরাং স্কুল গৃহেই অধিবেশনের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাঁহাদের শুভ উদ্দেশ্য সফল হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা পরম উৎসাহী। সুশীল বাবু পাড়ায় পাড়ায় যাইয়া সকলকেই সভাতে যোগদান করিয়া স্বাধীন ভাবে মনের কথা বলিতে ও ধৈর্য্য সহকারে পরের কথা শুনিয়া বিচার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

গ্রামে সাধারণতঃই আহার বিলম্বে হয়, তাহার পর কাহাকেও বিকালে হাটে যাইতে হয়, কাহাকেও আহারের পর নিদ্রা যাইতে হয়। মৌতাতের অগ্রপশ্চাৎ সময় ত্যাগ করা বিধেয়-ইত্যাদি সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ২টায় সভারম্ভের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

সভ্যগণকে ডাকাইয়া লইয়া সভা আরম্ভ করিতে আড়াইটা হইল। সভ্যগণের মধ্য হইতে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞান বৃদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাধর সেন মহাশয়কে সভাপতির আসনে স্থাপন করিয়া সুশীল বাবু একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সুশীল বাবু বলিলেন—"একতাই আমাদিগের শক্তির উৎস। শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা, তাহাকে ক্ষয় করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জন মতের সমন্বয়েই সমাজ শক্তি বিপুলতা লাভ করে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট কথাগুলি নূতন না হইলেও পুনঃ পুনঃ চিন্তার বিষয়। নিম্ন শ্রেণীকে তুচ্ছ করিলে আমাদিগকে শক্তি হারা হইতে হইবে। তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রযত্নে শিক্ষা দ্বারা আমাদিগের উদ্দেশ্য পথে লইয়া যাইতে হইবে। সমাজের মূলশক্তি বিপুল সমাজের সহিত তুলনায় তথা কথিত সংখ্যায় নগণ্য উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য সমাজের ভিতরই নিহিত নহে। আমরা যাহাদের শক্তিতে দাঁড়াইয়া আছি, তাহাদিগকেই সকল শক্তিতে চাপিয়া মারা কখনই উচিত নহে। কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিব, "দুতলা যদি এক তলাকে পিসিয়া মারিতে চায়, তবে একতলা নিষ্পেষিত হইবে বটে কিন্তু তাহাতে দুতলার কল্যান হইবে না।' স্বাস্থ্য ও শিক্ষা জাতিকে গড়িয়া তুলে, অন্ততঃ জীবিত থাকিতে সাহায্য করে, তাহা আমরা ভুলিয়া না যাই। আমাদের জাতির ভবিষ্যত আশার স্থল যুবক বৃন্দকে কর্ত্তব্য পথে লইয়া যাইবার বর্ত্তমান সমাজই পথ প্রদর্শক। যে কার্য্যে আমরা আজ প্রবৃত্ত হইতেছি, আশা করি, সকলে সর্ব্ব প্রকারমতভেদ ও দলাদলি ভুলিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সে সকল কার্য্যে একে অন্যকে সাহায্য ও শক্তিদান করিব।

সুশীল বাবু আসন গ্রহণ করিলে রামদাস বিদ্যাভূষণ বলিলেন—অগ্রে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধেই আলোচনা হউক"

সুশীল বাবু বলিলেন—"আপনিই বরং আপনার বক্তব্য বলুন। তারপর জন-মত বিচার—সভ্য গণ করিবেন।"

তখন বিদ্যাভূষণ দাঁড়াইয়া বলিলেন—"বিলাত যাত্রিগণ ম্লেচ্ছ অন্নগ্রাহী, ম্লেচ্ছ আচার পরায়ণ, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন; তাহাদের সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের এই সকল অভিযোগ স্পষ্ট। যাহা স্পষ্ট সত্য, তাহার সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ অনাবশ্যক সুতরাং ইহারা অবশ্যই হিন্দুসমাজের অনাচরণীয়।

"তা বটেইতো" "ঠিক কথা" ইত্যাদি বলিয়া কয়েক জন হাততালি দিলেন।"

তারাপদ সন্যাল উঠিয়া বলিলেন—"যাঁহারা বিলাতে গিয়াছেন—দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে, বৈদেশিক জ্ঞানের পাসরা বহন করিয়া আনিতে, জাতির কল্যান ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে, তাঁহারা যত অন্যায়ই করুন যাহাদের জন্য জ্ঞান, কল্যান ও সম্পদ সঞ্চয় করিয়া তাঁহারা আনয়ন করেণ তাঁহাদিগকে অবহেলা করা তাহাদের পক্ষে অকৃতজ্ঞের কার্য্য। তারপর দেশে আসিয়াও যদি তাঁহারা ম্লেচ্ছাচার ভুলিয়া যান ম্লেচ্ছভাব ছাড়িয়া দেন, ম্লেচ্ছের সহিত আহার বিহার না করেন ও কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইয়া সমাজকে অবনত মস্তকে মানিয়া চলেন, তবে তাঁহাদিগকে সমাজের মাথায় করিয়া রাখাই উচিত। হিন্দু শাস্ত্র স্বার্থপরের স্বার্থ রক্ষার ছলা কলা নহে। শাস্ত্র বিধান রক্ষা করিতে যাইয়া যদি তাঁহাদিগকে ছাড়িতে হয়, কে ছাড়িবে? যনি ঘরে বসিয়া গোপনে ম্লেচ্ছ অপেক্ষাও ম্লেচ্ছতর আচার অনুষ্ঠান করেন, প্রকাশ্যে ফোটা তিলক কাটিয়া গঙ্গাস্নান করেন, এমন লোকের সমাজ করিবে? আমা-

দের সমাজ কি মানুষের সমষ্টি লইয়া না অবস্ত ইতর জীবের সমষ্টি লইয়া, তাহা অগ্রে বিচার্য্য। যে সমাজের ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-গমন করে; কায়স্থ, বৈদ্য, সমাজের মাথায় পদাঘাত করিয়া উপপত্নী রক্ষা করিয়া সম্মানিত,কৌলিন্যপ্রথা, যে সমাজকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, ভরাংমেয়ের রক্তযে সমাজের জনগণের নাড়িতে প্রবাহিত হইতেছে—"

আঁতে আঘাত লাগায় হলধর চক্রবর্ত্তী কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া বক্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মুখ সামালিয়া কথা বলিও সাণ্ড্যালের পো"!

আর একজন বলিলেন—"দাও শালাকে ঘাড়ে ধরিয়া বাহির করিয়া—"

সান্যাল নিজকে সামলাইয়া বলিলেন—"কে ঘাড়ে ধরিয়া কাহাকে বাহির করে দেখি? যদি নিষ্কলঙ্ক হও, দাঁড়াও—সমাজ অবনত মস্তকে তোমার কথা গ্রাহ্য করিবে। আমাদের এই সমাজের কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিলে—এই সমাজকে কে হিন্দুসমাজ বলিবে? অগ্রে নিজের ভিতর সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, পরে পরের দোষ দেখিবার বিস্তর সময় ঘটিবে। কোন্ ব্যক্তি এখানে আছেন, যিনি নিজকে কলঙ্ক হীন বলিয়া মনে করেন। বাপের বেটা হও, তো বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া কথা বল, তখনই জানা জাইবে কে কাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া বাহির করিতে পারে।"

হলধর তখনও কাঁপিতেছিল। সে যে দোষ করিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না—কেন না, এই বিষয়ে পাড়ায় বা সমাজে কোন কথা রটে নাই; তাই তাহার রাগ ও মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, ইহার পর তাহার পক্ষে বিস্তর লোকও ছিল—ইতি মধ্যে উত্তেজনাও সে যথেষ্ট পাইতেছিল—এই বার সে অগ্রসর হইয়া বলিল—"এই যে সণ্ড্যালের পো, কোন বেটার কি বলিবার আছে—বলুক দেখি! তারপর দেখা যাবে কার ঘাড়ে কত হাড়!"

সান্যাল বসিয়া গিয়াছিলেন, সবেগে দাঁড়াইয়া ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"তোর বাবার বাবা ঠাকুর্দা কেবলরাম চক্কত্তি ভত্তার মেয়ে বিবাহ করিয়াছিল—সে টা ছিল তুলীর মেয়ে, মুশলমান, তোর নাড়ীতে অর্দ্ধেক মুশলমানের রক্ত। আর তোর দলের চাঁই কুলিনের পো মুখুর্য্যের—মামার বাড়ী জন্ম বাবার খোজ—"

আর বলিতে হইল না হলধর আস্তিন গোটাইয়া সান্যালের দিকে অগ্রসর হইতেই মাখন বাবু তাহাকে বাধা দিলেন। তখন সান্যালের উপর একখানা জুতা সজোরে আসিয়া পড়িল। জুতা নিক্ষেপ কারিকেও অতুল ভাণ্ডারী সজোরে লাঠি বসাইল। তখন মার মার ধর ধর রবে স্কুল গৃহ প্রকম্পিত হইতে লাগিল, সভাপতিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া লোক জন বাহির হইয়া পড়িল।

উভয় পক্ষেই যেন লাঠি মারিবার বন্দোবস্ত ছিল। সুশীল বাবু ও মাখন বাবু, স্কুলের যেসকল বালককে সেবক সমিতির সভ্য করিয়াছিলেন, তাহাদের সাহায্যে লাঠিমারা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন।

গোপী চক্রবর্ত্তীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। ছাত্রগণ তাঁহাকে কোলে করিয়া আনিতেছে দেখিয়া নিমেষের মধ্যে মারামারি থামিয়া গেল।

অনেকেই আঘাত পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে গোপী চক্রবর্ত্তী ও সভাপতির আঘাত গুরুতর হইয়াছিল।

অবস্থা দেখিয়া সুশীল বাবু ও মাখন বাবু চিন্তিত হইলেন, তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র নহেন। সকলকে বিদায় দিয়া গ্রামের সভ্য ছয় জনকে লইয়াই অতঃপর কার্য্য শেষ করিয়া যাইবেন বলিয়া পুনরায় বসিলেন।

গোপী চক্রবর্ত্তী ও সভাপতি মহাশয়কে পাল্কির সাহায্যে বালকেরা স্বস্ব বাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিয়া আসিল।

সুশীল বাবু, ছাত্রগণ ও ট্রেণিং কমিটির সভ্যগণের সম্মুখে পীরপুর গ্রামের ভবিষৎ অবস্থার আলোচনা করিয়া আশা ও নিরাশার সহিত সভার কার্য্য শেষ করিলেন।

তাহার শেষ মন্তব্য এই—দলাদলি দোষণীয় নহে; তাহা সকল অবস্থাতেই শক্তি ক্ষয় করে না—শক্তি বৃদ্ধিও করিয়া থাকে। গ্রামের উপকারের দিকে লক্ষ্য—রাখিয়া আপনারা চলিবেন। মত ভেদ সকল সমাজেই আছে—এবং চিরকাল তাহা থাকিবে—বরং তাহা সমাজের চেতনারই প্রমাণ। মামলা মোকদ্দমায় আত্ম

বল ক্ষয় হয়। হাজার দলাদলি করিলেও এটা স্মরণ রাখিবেন। আর, পরকে ধরিয়া ঘরকে শাসন করিবেন না—সময়ে তাহা ভীষণ কুফল প্রসব করিবে। ইত্যাদি।"

দুই সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় অধিবেশনের তারিখ ধার্য্য হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পীরপুরের তারাপদ সন্ন্যাল সম্মানী লোক। তাঁহার পিতামহ রাজা রাজবল্লভের চাকুরী করিয়া বিস্তর ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। সমাজে তাহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা, সম্পর্কবাদেও তাঁহার ঘরের কোন নিন্দা নাই। তারাপদের পিতা স্বাধীন চেতা লোক ছিলেন। তিনি কাহারও চাকুরী করিয়া নিজকে অবনত হইতে দেন নাই। পুত্র ও পিতার অনুসরণে নিজ স্বাধীন মত বজায় রাখিয়াই চলিয়াছেন। তারাপদ বাল্যে পীরপুর স্কুলে বাঙ্গালা ও ইংরেজী পড়িয়া যৌবনে সংস্কৃত অধ্যায়ণ করিয়াছিলেন। তারপর অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন।

তারাপদের পিতা মুক্ত হস্ত ছিলেন; সে জন্য পৌত্রিক সম্পত্তি অধিক বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই—নগদ তহবিলও কিছু কমাইয়া গিয়াছিলেন। তারাপদ কৃপণ, তিনি নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধির দিকে একান্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কোষ পূরণ করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিতেন আপোষে ক্রয় অপেক্ষা দাদনের বিনিময়ে প্রাপ্তিতে লাভ বেশী। তিনি তাহাই করিতেন। পীরপুরের ছোট বড় শত্রুমিত্র সকলেই তারাপদের নিকট অল্পবিস্তর ঋণী ছিলেন। তারাপদর ঋণের তাগাদাও ছিল না, রিয়াৎও ছিল না। তাঁহার দাদনে সুদ ছিল কম, জাবিন ছিল বড়। সম্পত্তি রেহান না রাখিলে তিনি কাহাকেও টাকা ধার দিতেন না।

তারাপদের ৪টী সন্তান—১টী মেয়ে ও তিনটী ছেলে। বড় মেয়ে প্রতিমার বয়স চৌদ্দ। পীরপুর গ্রামে প্রতিমা সুন্দরী বলিয়া প্রসংশিতা। জগবন্ধু বাবুর গৃহিণী প্রতিমাকে দেখিয়া পুত্র বধু করিবার সাধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনের সাধ এখনও লয় পাইয়া যায় নাই। জগবন্ধু বাবু নুতন সম্পত্তি ক্রয় কালে যে পাঁচ হাজার টাকা তারাপদ সন্ন্যাল হইতে ধার করিয়াছিলেন, জগবন্ধু বাবুর ইচ্ছা—তারাপদ কন্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে সে টাকার তমশুক খানাও ছাড়িয়া দেন। কৃপণ—তারাপদ এতগুলি টাকার বিনিময়ে এত বড় পাসকরা ছেলে চায় না; সে চায় পাঁচ সাতশত টাকার মধ্যে যেমন তেমন পাত্র; তাই মেয়ের বয়স চতুর্দ্দশে উঠিয়াছে।

তারাপদ সে জন্য চিন্তিত নহেন। দুই এক বৎসর সবুরে যদি ২।৪ হাজার টাকা বাঁচিয়া যায়, চৌদ্দ বছরে আসিয়া যাইবে কি? সে তো এখন ঘরে ঘরেই আছে।

প্রতিমার ছোট তিনটী ভাই। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স ২১ দিন। তাঁহার মাতা সেই নব প্রসূত শিশুকে লইয়া সুতিকা গৃহে আছেন। তারাপদর বয়স ৪০, দেহ বলিষ্ঠ। তাঁহার বৃদ্ধামাতা এখনও জীবিতা। বেশ সুখের সংসার।

পীরপুরের সামাজিক সমস্যায় তারাপদ জীবন তর্করত্নের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সভার হাঙ্গামায় তারাপদ সসম্মানে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই তাঁহার পৃষ্ঠ দেশেও এক ঘা পড়িয়াছিল; বয়স্ক দিগকে রক্ষা করিতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন বেশী, সেজন্য আত্ম রক্ষার দিকে তাঁহার দৃষ্টি কম ছিল। যাই হউক ব্যাপার লজ্জা জনক হইলেও পীরপুরের পক্ষে তাহা মোটেই অস্বাভাবিক এবং অচিন্তনীয় ছিল না।

সভা ভঙ্গের পর তারাপদ ও জগবন্ধু বাবু একত্রে বাড়ী যান। স্কুলের মাঠ পার হইলেই জগবন্ধু বাবুর বাড়ী, তাহাহইতেও আর একটু দূরে সন্ন্যালদের বাড়ী।

জগবন্ধু ডাকিলেন "এস ভায়া তামাকটা খাইয়া যাও।' বলিয়া তিনি তামাক ডাকিলেন।

"না—আপনার আর, তামাকটা খরচ করিয়া লাভ কি—বাড়ী যাই, হয়ত বক্ষে পাদুকা ঘাত ও পৃষ্ঠে লগুড়াঘাতের সংবাদ পাইয়া গৃহিণীর ধনুষ্টংকার হইয়াছে।" বলিয়া তারাপদ হাসিয়া ফেলিলেন।

জগবন্ধু বলিলেন—"দেখ দিখি কি অমানুষিক কাণ্ড, ভদ্রলোকেরা বলে কি? এ কি ভদ্রলোকের গ্রাম, না চাষা ইতরের গ্রাম?"

তারাপদ বলিল—"ঐ কুলীন পুত্র-তারিণী হারামজাদাই এ নাটাইর শলা; হারামজাদার পিঠেও বেদম পড়িয়াছে। যাক্—এখন পণ প্রথার তো উচ্ছেদ সাধন করিয়া Resolution করিয়া আসিলেন, হইয়া যাউক না—এই বৈশাখেই—"

জগবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—"সেতো ঠিক, কিন্তু যিনি মেয়ের বাপ, তিনি কি মেয়ের চিন্তা কিছুই করিবেন না? ছেলেই কি শুধু তাঁর সন্তান, মেয়ে কি কিছুই নহে?"

"কিছু না, কি হাঁ—সে চিন্তা পিতা মাতার; তাঁরা প্রয়োজন বুঝেন, তাঁদের মেয়ের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু আপনারা যে Resolution করিলেন—তার কি?" বলিয়া তারাপদ হাসিলেন।

জগবন্ধু বলিলেন—"ভাই বিস্তর টাকা ছেলেটার পাছে খরচ করিয়াছি, এখনও শেষ হয় নাই। এই আষাঢ়ে তার Final পরীক্ষা; তারপর তুমি পাইবে পাঁচটী হাজার—শ্বাস ফেলিবার অবসর কোথায়? চোকমুখ বুঁজিয়া ছাড়িয়া দাও ভাই—এ কটা টাকার ক্ষতিতে সান্ন্যাল বাড়ী দেউলিয়া হইবে না। একটী ছেলেকে এরূপ উপযুক্ত করিয়া নিতে কত হাঙ্গামা-হুজ্জত,খরচ-পত্র এক বার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? দুটী ছেলে না আছে, আর একটী হইয়াছে সেদিন—দেখিবে—ভায়া কি পর্য্যন্ত যায়!"

"আমাদের আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে আবশ্যকতা দেখি না, তাই সে বিষয় চিন্তা করিতেও যাই না, বামুনের ছেলের টডাটিডি কিছু বিদ্যা হইলেই হইল; আর বামুনের মেয়ের নিষ্কণ্টক একটী ছেলে হইলেই হইল, তারপর—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। দাদা এখন আসি।" বলিয়া তারাপদ উঠিয়া পড়িলেন।

জগবন্ধুবাবু বাড়ীর ভিতর যাইয়া গৃহিণীকে ও বড় বধুকে ডাকিয়া আনিয়া জানাইলেন—তারাপদ যেন বেশ ইচ্ছুকই দেখা যাইতেছে। আজ সে নিজ হইতেই বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। শৈলেন বৈশাখে আসিতে পারিবে কি না, বৌমা একটু লিখিয়া দেখুন। শৈলেন টাকা লইতে নারাজ; আর আমরাই কোন্ টাকার দাবী করিতেছি! তবে লোকটা যা পাইবে-তা এখন না রেয়াত করিলেও—মেয়ে জামাইকে একদিন রেয়াত করিবেই—আর নিতান্ত না করে, না করিবে। নূতন তালুকটা না হয় তার বাড়ীতেই যাইবে। বৌ মা তা হইলে আজই লিখিয়া জানুন।"

শৈলেনের মা "বৌকে বলিলেন, তাই কর বৌ মা, বৈশাখেই যাহাতে হয়—সেইরূপ ভাবেই লিখ। বড় বৌ কাগজ কলম লইয়া বসিলেন।

* * *

সেই দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে সান্ন্যাল বাড়ীতে এক অভাবনীয় লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়া গেল! এই শোচনীয় ঘটনার উল্লেখ করিতে লেখনী কম্পিত হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে! হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়!

মধ্য রাত্রিতে তারাপদ তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রীর চিৎকারে জাগ্রত হইয়া উঠেন। তারাপদ বড় ঘরে ছিলেন, সে ঘরের পাকা দেওয়াল। দ্বার খুলিতে যাইয়া দেখেন, বাহির হইতে দ্বারের শিকল বন্ধ। বিপদ বুঝিয়া তিনিও ঘর হইতে চিৎকার করিতে থাকেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা বাহিরে চিৎকার করিতেছিলেন। অন্যান্য ঘরে যে লোক জন ছিল, তাহারাও ঘর হইতে বাহির হইতে না পারিয়া চিৎকার করিতেছিল। অবশেষে বাহিরের ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া চাকরেরা বাহির হইয়া আসিয়া তারাপদর ঘরের সিকল খুলিয়া তাঁহাকে বাহির করিল।

তারাপদর স্ত্রী আঙ্গিনায় অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছেন! বৃদ্ধা মাতা ঘরের পিছনে জ্ঞান শূন্য অবস্থায় পতিতা, তারাপদর কন্যা প্রতিমা নাই! তারাপদ মাতা ও স্ত্রীর চিৎকারে বিপদ অনুমান করিয়াছিলেন; ঘরের বাহির হইয়াই উন্মত্তের ন্যায় বাড়ীর পাছ দিয়া জঙ্গল পাড় হইয়া মাঠেরদিকে দৌড়িলেন। লোক জন চারিদিকে ছুটিয়া চলিল।

আমরা এই নিষ্কলঙ্ক কুলের কলঙ্ক কথা আর অধিক লিখিয়া পাঠকের হৃদয় ক্ষুব্ধ করিব না। গ্রাম্য সমাজের পৈশাচিক কার্য্যের পরিচয় প্রদান জন্যই এখানে এ ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধানে কোন ফল হইল না। তারাপদ বাড়ীতে আসিয়া বুক পিটিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন! তাঁহার স্ত্রী মুমূর্ষু, বৃদ্ধা মাতা হতজ্ঞান।

বাড়ীর কর্ম্মচারী থানায় খবর দিয়াছে। সুশীল বাবু স্বয়ং মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব নিকট গিয়া জরুরী তদন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, আত্মীয় স্বজন অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। দেশ যেন অরাজক হইয়াছে; ঘরের স্ত্রী, বধূ, ভগিনী, কন্যা দিনে দ্বিপ্রহরে ঘরের বাহির হইতে শিহরিয়া উঠিতেছে।

মহকুমা হইতে পুলিস সাহেব জরুরী তদন্তে চলিয়া আসিয়াছেন। তিনি এজাহার লইলেন।

"গতকল্য রাত্রে তারাপদ ঘোষালের কন্যা প্রতিমা তাহার পিতামহীর সহিত তাহার অপর দুই ভ্রাতাকে লইয়া নিদ্রিতা ছিল। রাত্রি একটায় তারাপদ ঘোষালের বৃদ্ধা মাতা ঘটিহাতে বাহিরে গেলে সূতিকা গৃহে থাকিয়া হটাৎ তারাপদর স্ত্রী তাঁহার কন্যার চিৎকার শুনিতে পান। তিনি উঠিয়াই বাহিরে অনেক লোক দেখিতে পান, তাহারা তাঁহার শাশুড়ীর ঘর হইতে তাঁহার চৌদ্দ বৎসরের কন্যা প্রতিমাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। মেয়ে একবারের অধিক আর চিৎকার করিতে পারে নাই। তিনি চিৎকার করিয়া যাইয়া মেয়েকে ধরিতে চেষ্টা করেন। এক জন লোক তাঁহাকে সিড়ির উপর ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। এই সময় বৃদ্ধাও ঘরের পাছ হইতে চিৎকার করিয়া দস্যু দলের পশ্চাৎ ধাবিতা হন; তাঁহারা তাহাকেও আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। সম্ভবত মেয়েটীকে ক্লোরফরম করিয়া অজ্ঞান করিয়া নেওয়া হইয়াছিল। তীব্র গন্ধ যুক্ত একটা রুমাল বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে পাওয়া গিয়াছে। (তাহা প্রদর্শিত হইল)। তারাপদ প্রথম চিৎকারেই উঠিয়াছিলেন। কিন্তু দস্যুরা বাহির হইতে প্রতি ঘরের দরজা আটকাইয়া রাখায় তৎক্ষণাৎ কেহ বাহির হইয়া কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। ঘটনার অনুমান ১৫।২০ মিনিট পরে বাহের বাড়ীর লোক তাহাদের ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিয় তারাপদ বাবুর ঘরের সিকল খুলিয়া তাঁহাকে বাহির করে। তখন অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। ঘটনার অপর সাক্ষী নাই। আসামীগণকে কেহ চিনিতে পারে নাই। তাহাদের মাথায় কাপড় বাঁধা ছিল। পূর্ব্ব দিনের হিন্দু হিতসাধনী সভার অধিবেশন হইতেই এই আক্রোশের সৃষ্টি, অনুমান করা যায়। ইতি।

পুলিস সাহেব এজাহার লইয়া তদন্তে চলিয়া গেলেন। আর তারাপদের গৃহ—সে দিন যেন শ্মশানের নগ্ন চিত্র বুকে লইয়া আহাকার করিতে লাগিল। সে কি ভীষণ অবস্থা!

* * * *

তৃতীয় দিন প্রাতে তারাপদ ঘোষাল বুক বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্ত্রীকেও মাকে বলিলেন—'তোমাদের যাহার যত কান্না আছে কাঁদিয়া নাও, আমি আর ভাবিব না, আর কাঁদিব না। আমার কোন কন্যা নাই—মন হইতে তাহা দূর করিয়া দিয়াছি। যে ছিল, সে পরশ্ব রাতে মরিয়া গিয়াছে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াছি। দুই দিন তাহার জন্য কাঁদিয়াছি, আর কত?'

তারাপদ পুলিস সাহেবকেও জানাইলেন—"সাহেব আমাকে আর যন্ত্রণা দিওন—আমার অকলঙ্ক কুলে কালিমা পড়িয়াছে, আর না! এ কন্যা আর আমি পাইব না, পাইতে চাইনা।—আমার মৃত প্রায়, স্ত্রীকে ও বৃদ্ধা মাতাকে—আর নিয়া যন্ত্রণা দিও না—সে যন্ত্রণা আরো কঠোর, তাহা আর সহিতে পারিব না। প্রাণে গভীর দাগ পড়িয়াছে—আর না। আর না।"

পুলিস সাহেব অবশ্যই এ কথায় তদন্ত পরিত্যাগ করিলেন না।

সুশীল বাবুও তাহার "হিত সাধনী" পত্রিকায় এই মোকদ্দমার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে ছাড়িলেন না। ফল কিছুই হইল না।

তারাপদকে শত্রু দমনে পশ্চাৎ পদ দেখিয়া কেহ বলিল—'মেয়ে টা বাহির হইয়া গিয়াছে। এত বয়সেও ঘরে রাখিলে কি—ইত্যাদি।"

কেহ বলিল—"লোকটা হদ্দ কৃপণ—পয়সা খরচ দেখিয়া পাছে হটিয়াছে,—ইত্যাদি।"

কেহ বলিল—চৌদ্দ বছরের মেয়ের কলঙ্ক ঘাড়ে লইয়া জীবন কাটানর চেয়ে এ ভালই হইয়াছে।"

তারাপদের হৃদয়ে কি আগুন জ্বলিতেছে—সে ভুক্তি ভোগী ব্যতীত আর কে বুঝিবে?

———

শ্মশান বন্ধু।

(১)

অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ লোহিত আভাটুকু বক্ষে নিয়া খরস্রোতা পদ্মা নাচিতে নাচিতে কোথায় কোন্ প্রিয়তমের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। পথের কোন বিঘ্নই আজ তাহার মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিতেছে না। বিঘ্ন যত কঠোরই হউক না কেন, বাঞ্ছিতের পদ প্রান্তে তাহাকে পঁহুছিতেই হইবে, তাই তাহার গতি উদ্দাম, একটানা সে কেবলি চলিয়াছে।

শরতের নির্ম্মল আকাশের নীচে গোধুলির শুভক্ষণে পদ্মাতীরে বসিয়া যাদব শূন্য দৃষ্টিতে কি ভাবিতেছে? তাহার মুখ মণ্ডলে চিন্তার রেখাগুলি স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; দেখিলেই চিন্তার গভীরতা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যুবক বাহ্য জ্ঞান শূন্য। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, সম্মুখে অনন্ত জলরাশী, ভিতরে ও অনন্ত চিন্তা তরঙ্গ যুবকের প্রাণের মধ্যে এক বিরাট উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে। জাগতিক সৌন্দর্য্যের কিছুতেই তাহার মন আকৃষ্ট হইতেছে না—অভিসারিকা পদ্মার মতই যাদবের চিন্তা-স্রোত একটানা চলিয়াছে।

যাদবের সহপাঠী জগদীন্দ্র নাথ বন্ধুর তালাসেই নদীর তীরে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছিল। যাদবকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া একেবারে আসিয়া ঘাড়ে ধরিয়া বলিয়া উঠিল "ষ্টুপিড্ এতক্ষণ তোকে খুজিয়া হয়রাণ্, একলাটী বসিয়া বুঝি পদ্মার ঢেউ গণা হইতেছে?" তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের উপর দৃষ্টি পরিতেই জগদীন্দ্র নিতান্ত অপরাধীর মত যাদবের মুখের দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না।

কয়েক মিনিট পরে জগদীন্দ্র পরম আত্মীয়ের মত স্নেহাস্পদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া জড়িত স্বরে বলিল "ভাই তোমার চোখ ছল ছল করিতেছে কেন? এমন ত কোন দিন দেখি নাই—বিষয়টা কি বল দেখি?" যাদব কয়েক মুহুর্ত্ত নিঃশব্দে জগদীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—"কেন এমন হয়? আচ্ছা তুমিই বলনা, কেন এমন হয়?" "ব্যাপার কি সেটা না জানিলে কেমন করিয়া বলিব, কেন হয়? বিষয়টা খুলিয়া বলনা"। বলিয়া জগদীন্দ্র মহা উৎকণ্ঠার সহিত উত্তরের প্রতীক্ষায় এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহুর্ত্ত নীরব থাকিয়া যাদব বলিতে লাগিল—"বলিতে ছিলাম কি, একই ভগবানের সৃষ্টিতে এতটা পার্থক্য হয় কেন? বলবান্ দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন করিতে এত তৎপর কেন? কেনই বা মানুষ স্বাভাবিক শান্তির উপর একটা অশান্তির ছায়া ফেলিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করে? এ হীন প্রয়াশ কেন?" বলিতে বলিতে যাদবের চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বন্ধুর চোখে জল দেখিয়া জগদীন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল। যাদবকে আরও নিকটে টানিয়া লইয়া পরম স্নেহ ভরে সমস্ত বিষয়টা খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করিতে গিয়া তাহার নিজের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আলো ও আঁধারের মহা সান্ধক্ষণে এ কি স্বর্গীয় দৃশ্য। কি স্বর্গীয় সহানুভূতি!

যাদব বলিতে লাগিল "জগদীন্দ্র! তোমার নিকট সমস্তই খুলিয়া বলিব, কারণ তোমার মত সুহৃদ আমার দ্বিতীয়টী নাই। তোমার নিকটই পরামর্শ চাহিতেছি, সৎপরামর্শ দিয়া দারুণ চিন্তা হইতে আমাকে রক্ষা কর। বাবার ইচ্ছা আমরা সপরিবারে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করি। আমার অভিপ্রায় আগামী কল্যই তাঁহাকে জানাইতে হইবে। এখন উপায় কি ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি"।

"কেন? তোমার পিতা খৃষ্টান হবেন কেন?"

"কেন? সে অনেক কথা। জানইত বাবার মত ধর্ম্ম ভীরু লোক আমাদের সমাজে খুব কমই আছে। বুঝিতেই পার, কতটুকু মনের কষ্টে তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। কি গভীর বেদনা যে তাঁহার হৃদয়কে অহরহ বিদ্ধ করিতেছে, সে আমি কতকটা বুঝিতে পারি। কতদূর অবিচারে আজ এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছে, যাহার জন্য পিতৃপুরুষের দারুণ অভিসম্পাতে আমাদিগকে দগ্ধ করিবে। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এক গণ্ডুষ জল পর্য্যন্ত দেওয়ার অধিকার আমাদের থাকিবে না। তথাপি আজ বাবা আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তাহার কারণ কি জান?

—কারণ তোমরা,—তোমাদের নিষ্ঠুর সমাজের তথা কথিত নায়কগণ, আর তোমাদের ঘৃণিত ব্যবহার। আমরা জাতীতে নমশূদ্র—আমরা নাকি আবার একটা মানুষ? কুকুরের চেয়েও হেয় এমনি তোমরা আমাদিগকে ভাব।"

কথাগুলি জগদীন্দ্রের হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সেতো যাদবের নিকট হইতে কোন দিন এমন কথা শুনে নাই। বিশেষতঃ কথাগুলি তাহার প্রাণের নিভৃত-তম প্রদেশ হইতে বাহির হইতেছে। সে অস্থির হইয়া বলিল "কি করিয়াছে আমাদের সমাজ, যাহার জন্য আজ তোমাকে এত অধীর করিয়া তুলিয়াছে?"

"শুন জগদীন্দ্র, সমাজে আমাদের স্থান সর্ব্ব নিম্নে হইলেও আমাদের শরীরও রক্তমাংসে গঠিত, ঠিক তোমাদের মতই সুখ দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আমাদের আছে, গায়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিলে আমাদের দেহ হইতেও তেমনি উষ্ণ লোহিত রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। নয় কি? সকল বিষয়েই ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। তোমাদের অত্যাচার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতা আমার হিন্দু সমাজের কোল হইতে সরিয়া পড়িতে চাহেন। আচ্ছা জগদীন্দ্র! নিম্নশ্রেণী হইলেও ত আমরা ও হিন্দুসমাজের এক একটা অঙ্গ। হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যা আজও যে ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেছে, সে কি কেবল তোমাদের মুষ্টিমেয় উচ্চস্তরের দ্বারা? না আমাদের মতই নমশূদ্র, জেলে প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর দ্বারা? হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ বিশেষ কে দুর্ব্বল রাখিয়া কেবল দেহটা বড় হইবে, এও কি সম্ভব? এ বিরাট হিন্দুসমাজের বিরাটত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে হইলে সমাজের হাত, পা—নিম্ন শ্রেণী গুলিকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে কেন? দুই দিন বাদে যে সেটা একটা মহা জড়ে পরিণত হইবে।"

মন্ত্র মুগ্ধের মত জগদীন্দ্র হা করিয়া সমস্ত শুনিতে ছিল। কথা সমাপ্ত হইলে বলিল "কি করিতে হইবে আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দাও; আমি যথাসাধ্য ইহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিব।"

যাদব পুনরায় বলিল "বাস্তবিক জগদীন্দ্র আমারও অনেক সময় মনে হয়, তোমার মত কতকগুলি মহানুভব উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় সমাজের কণ্টক শীঘ্রই দূর হইতে পারে। অবশ্যই তাহাতে বিপদ এবং নির্য্যাতনের যথেষ্ট ভয় আছে। ঘটনাটা কেন এতদুর গড়াইয়াছে তাহা প্রথমে শোন। সে দিন আমার ছোট ভাই তোমাদের বিদ্যানিধি মহাশয়ের পুকুরে স্নান করিতে গিয়া গায়ে সাবান মাখিতে ছিল। বিদ্যানিধি মহাশয় দেখিতে পাইয়া কত কি যে কটুক্তি করিলেন সেটা অবক্তব্য। জগাই চাঁড়ালের ছেলে—সে বেটা কিন গায়ে সাবান মাখে তাও আবার ভদ্রলোকের পুকুরে বসিয়া। দুপাতা ইংরেজী পড়িয়া আমরা নাকি একেবারে মাথায় উঠিয়া বসিয়াছি, তাঁদের মান সম্মান নাকি নষ্ট হওয়ার যোগাড় ইত্যাদি কত কিছু! এতগুলি কটুক্তির উত্তরে সে কেবল তাহার কি অপরাধ, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের পিতামাতা শুদ্ধ চৌদ্দপুরুষকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। আর তাঁর চাকর দ্বারা কাণে ধরিয়া তাহাকে পুকুর হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। ভাবদেখি, এ কেমন অবিচার? এই যে ঘৃণার ভাব, একি ঠিক? পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে আমার পিতা তাঁহার কোন খৃষ্ট বন্ধুর উপদেশে খৃষ্টান হওয়ার জন্য সামান্য ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেন, এই ঘটনা তাহাতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিয়াছে। আজ যদি বাবা খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজের প্রায় তিন শত লোক এক দিনেই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে এরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ অহরহ ঘটিতেছে। নিম্নশ্রেণীর ভিতরে মিশনারিগণ একটা নূতন প্রেরণা আনিয়া দিয়াছেন, একটা নূতন আলোক সম্মুখে ধরিয়াছেন, খৃষ্ট ধর্ম্মের নিকট, সকলেই সমান, উচ্চনীচ ভেদ নাই, অবজ্ঞা নাই, ঘৃণানাই। নিম্নশ্রেণীর ভিতরে তাহারা যেরূপ ভাবে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতেই মিশনারীদের উপর তাহাদের একটা কৃতজ্ঞতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। তোমাদের সমাজ হইতে তাহারা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পায় নাই—আশাও নাই। চিরদিন কেবল অবজ্ঞাই

পাইয়া আসিতেছে? এমন অবস্থায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কি সম্ভব পর?" যাদব চুপ করিল।

যাদবের সত্যকথাগুলি অন্যের নিকট নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও জগদীন্দ্রের প্রাণের ভিতর সেগুলি আঘাত করিল। সে বলিল "সত্যই যাদব একথাগুলি কেউ চিন্তাও করে না। ঘটনা চক্রে একথা তোমার নিকট হইতে না শুনিলে হয়ত এ চিন্তা আমার ভিতরেও স্থান পাইত না। আজ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে আজ হইতে আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য—এ অন্যায়ের প্রতিকার পক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করা, এখন অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক।"

"কাজ যত সহজ মনেকর, তত সহজ সেটা নয়"। বলিয়া যাদব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল—"দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল যুবকদের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখ, ক্লাশে আমি সমপাঠীদের নিকট হইতে কিরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকি? আমার একমাত্র অপরাধ আমার নীচ বংশে জন্ম। তুমি আমার সঙ্গে বিশেষ ভাবে মিশিতে চাও বলিয়া তাহারা তোমাকে কত ঘৃণা করে, সে আমি বেশই জানি এমন অবস্থায় তুমি কি আশা করিতে পার? আমরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে যে এতটা পশ্চাতে পড়িয়া আছি তাহার কারণ—তোমাদের অবহেলা। তোমাদের কি এটা কর্ত্তব্য নয় যে সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকেও উন্নত করিয়া তুলিতে সাহায্য করা। তাহা না হইলে যে সমাজের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। চেষ্টা করিলে আমরাও যে কতকটা শিক্ষিত হইতে পারি, একথা আমরা বহু দিন যাবৎ ভুলিয়া গিয়াছি অথবা ভুলিতে বাধ্য হইয়াছি। আজ যে কোন উন্নত জাতীর দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, তাহারা সমাজের উচ্চনীচ সকলকে শিক্ষায় সমান অধিকার দিয়াছেন এবং সে পক্ষে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে, শিক্ষা বিস্তারের কতই না চেষ্টা হইতেছে। আর তোমরা ভাব যে আমরা শিক্ষিত হইলে তোমাদের মান সম্মান বজায় থাকিবে না। এমনি স্বার্থপর তোমরা!"

(২)

বেলা প্রায় বারটা। শরতের রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে। বিদ্যানিধি মহাশয় বৈঠক খানার বারান্দায় একখানা ইজি চেয়ারে অৰ্দ্ধশায়িতাবস্থায় গুড়গুড়ের নলে তামাকু সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় জগদীন্দ্রনাথ নিকটস্থ পথদিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল। বিদ্যানিধি মহাশয় জগদীন্দ্রের জ্ঞাতি সম্পর্কে জ্যেষ্ঠতাত। তাহাকে দ্রুত চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে যখন শুনিতে পাইলেন যে পাড়ার রামু চাঁড়ালের স্ত্রীর কলেরা হইয়াছে এবং তাহারই জন্য সে ঔষধ আনিতে যাইতেছে। তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তাইত! এতদিন যাহা শুনিয়া আসিতেছি, তাহাতো সত্যই। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া চণ্ডালের সেবা করিস তুই? ঘোর কলি, অধর্ম্মে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। নিধুর ঘরে একটা কুলাঙ্গার জন্মেছিস তুই ব্রাহ্মণ হইয়া ছোট লোকদের-শূদ্রের মলমূত্র ঘাটিয়া বেড়াস; শূদ্রের দত্ত জিনিষ ভক্ষণ করিস্। ব্রাহ্মণ তিনযুগের দেবতা। হায়! দেশ রসাতলে গেল! তোদের জন্যইত দেশে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে। জানিস্ সমাজে তোকে নিয়া কত আন্দোলন——।" বাধা দিয়াই জগদীন্দ্র বলিয়া উঠিল "জানি জেঠা মহাশয়! আমি সবই জানি, সমাজ যে আমাকে নির্য্যাতন করিতে চায় তাও জানি, কিন্তু উপায় নাই। ওদের কেউ নাই জেঠা মশায়, তাই যত দূর পারি, শুশ্রূষার সাহায্য করি; সেবা করিবার মত ক্ষমতা এখনও আমার হয় নাই। আর আপনি ব্রাহ্মণ বলছেন কাহাকে? আমিতো ব্রাহ্মণ নই, আর আমার মত যাহারা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য পালন করে না, তাহারাও সবাই এক। ক্রিয়া কাণ্ডে আস্থা নাই, বিজাতীয় পোষাকে অঙ্গ ঢাকিয়া চুপে চুপে কালু খানসামার দোকানে ঢুকিয়া চপ্, কাটলেটে রসনা তৃপ্ত করতে বাধা নাই, আর বাধা হইল, দুর্ব্বল ভাইটীকে সাহায্য করবার সময়! কেবল পূর্ব্ব গৌরবের দোহাই দিয়া তাঁহাদের সমান অধিকার পাইতে চাহি! এও কি সম্ভব? আর সমাজের ভয়? সমাজের অস্তিত্ব কোথায়?—আর যে সমাজ দুঃখীর দুখে সহানুভূতি করিতে, দেখিলে কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়াই যে সমাজের আনন্দ, এমন সমাজ আমি চাহিনা, বরং তাহা

ঘৃণা করি। স্নেহের দান গ্রহণে যদি পাপ হয়, তবে কিসে যে পাপ না হয়, তাহা জানি না।"

"কি? আমি বিদ্যানিধি! আমার উপর সমালোচনা করবার অধিকার তোর? জানিস্ তোকে—" বলিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। জগদীন্দ্র মৃদুহাস্যে "আসি তবে" বলিয়া গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল।

যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল "কেন এমনটী হয়? একটু পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য না হয় উহারা একটু সাবান গায় মাখিল, একখানা পরিস্কার কাপড় পড়িল, তাহাতে সমাজের এত মাথাব্যথা কেন? উহারা নোংরা থাকিয়া অকালে ব্যধিগ্রস্ত হইয়া কালের কোলে চলিয়া পড়ুক, আর সমাজ তাহাই আনন্দে নিরীক্ষণ করিবে! কোথায় শিক্ষিত সমাজ তাহাদিগকে আপনাদের কোলে টানিয়া লইবে, তাহাদিগকে অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া সমাজের পুষ্টি সাধন করিবে, না—তাঁহারা আপনাদের অঙ্গেই কুঠারাঘাত করিতেছেন। হায় হিন্দুসমাজ! এত নীচতা না ঢুকিলে তোমার ধ্বংশ হইবে কেমনে?" ভাবিতে ভাবিতে সে দ্রুত চলিয়া গেল। সমাজ নেতা বিদ্যানিধি মহাশয়ের ক্রোধের প্রতি তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই—।

(৩)

তিন দিন কলেরায় ভুগিয়া জগদীন্দ্রের মাতা শেষ রাত্রে দেহ ত্যাগ করিয়া অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা পর্য্যন্ত হয় নাই।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই জগদীন্দ্র সমাজে একঘরে হইয়া আছে। গ্রামের ডাক্তার কবিরাজ কেহই বিদ্যানিধি, তর্কবাগীশ প্রভৃতি নেতৃবর্গের ভয়ে চিকিৎসা করিতে রাজী হন নাই। সুতরাং একপ্রকার বিনা চিকিৎসাতেই তাঁহার শেষ নিশ্বাস বাহির হইল। জগদীন্দ্র গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ীতে গিয়া মায়ের অন্তেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দিবার জন্য নিতান্ত বিনীত ভাবে অনুরোধ করিয়া আসিল, কিন্তু পর দিবস বেলা একপ্রহর পর্য্যন্তও কেহ আসিল না। নিরুপায় দেখিয়া ঘরের দরজা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া সে গ্রামান্তরের একটী ইংরেজী স্কুলের মেসের ছেলেদের শরণাপন্ন হইল। তাহাদের কেহ কেহ জগদীন্দ্রের পরিচিত। এবং প্রায় সকলেই বিভিন্ন স্থানের সুতরাং তাহারা এই সমাজের ধার ধারে না। মহা উৎসাহে এই পরোপকারের জন্য তাহারা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

যথা সময়ে মৃতার দেহ ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। যুবকের দল হরিধ্বনি দিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। আর জগদীন্দ্র? আজ জগতে সম্পূর্ণ অবলম্বন হীন হইয়া সমগ্র সমাজের সহানুভূতি হারাইয়া যে দিকে তাহার দুর্ব্বল চরণ চলিল, সেই দিকে পদ নিক্ষেপ করিল।

শেষ বেলায় সমাজের প্রধান প্রধান পাণ্ডাগণ সভা করিয়া স্থির করিলেন, এ বিপদে জগদীন্দ্রকে ক্ষমা করা যাইতে পারে, অবশ্যই কতকগুলি সর্ত্তের সহিত। সুতরাং তাঁহারা দল বাঁধিয়া জগদীন্দ্রের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিলেন। ততক্ষণে উপেক্ষিত, সমাজ পরিত্যক্ত জগদীন্দ্র অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

(৪)

পরোপকার জনিত আত্ম প্রসাদ যিনি উপভোগ করিয়াছেন, কেবল তিনিই জানেন—তাহাতে কত আনন্দ। যিনি এ সুধার আস্বাদ পান নাই, তিনি হয়ত ভাবিবেন—মানুষ আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া ঘরের পয়সা খরচ করিয়া কেন পরের জন্য ছুটিয়া যায়? এ বোধ হয় মনের একটা খেয়াল মাত্র! মানুষ ভাবিয়া দেখেনা, আজ যদি সে অপরের বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন না করে, আগামী কল্য যখন বিপদ তাহার উপর আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তখন অন্যে তাহাতে কেন উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে না।

আজ বিদ্যানিধি মহাশয় ক্ষুন্ন মনে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। ঘরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৃত্যু শয্যায় শায়িতা, একমাত্র পুত্রটীরও দুই ঘণ্টা যাবৎ ভেদ বমন আরম্ভ হইয়াছে। দাস দাসী ভয়ে কয়েক দিন যাবৎ বাড়ীর সীমানার ভিতরেও আসে না। গ্রামের প্রায় সকলের বাড়ীতেই এইরূপ। কে কাহাকে সাহায্য করিবে? বিশেষত কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগের কাছে সহজে কেহ ঘেঁসিতে চায় না। পিতা স্নেহের বশে

পুত্রকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। কে আজ বিপদ মাথায় করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাহায্যে অগ্রসর হইবে? তিনি স্বয়ং বৃদ্ধ, একা কি করিবেন? ডাক্তার ডাকিতে যাইবেন, না রোগীর পথ্যাদির বন্দোবস্ত করিবেন? এদিকে রোগীর নিকট বসিয়া দুইটা সান্ত্বনার কথাও বলিতে হয়। আজ তাহার মহা বিপদ। ভাবিয়া কোন কুল কিনারা পাইতেছেন না।

বিপদের মধ্যে পড়িয়া আজ তাঁহার জগদীন্দ্রের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে গ্রামে থাকিলে কখনই আমার এ বিপদ উপেক্ষা করিতে পারিত না। সেত গ্রামের ছোট বড় সকলের বিপদেই প্রাণ পাত করিয়া সাহায্য করিত! আমি সমাজের নেতা, অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া তাহাকে দেশত্যাগী করিয়াছি, ভগবান আজ আমার উপযুক্ত সাস্তিই দিয়াছেন।"

ভাবিয়া ভাবিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় নীরবে অশ্রু মোচন করিতেছিলেন। এমন সময় দরজায় পদশব্দ শুনিয়া সেই দিকে চক্ষু ফিরাইয়াই দেখিতে পাইলেন, জগদীন্দ্র নাথ সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি বিস্ময়ে স্বপ্না বিষ্টের মত জগদীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ভাবিলেন এ স্বপ্ন। ক্ষণিক পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, এ প্রকৃতই সত্য, তখন এক লম্ফে উঠিয়া জগদীন্দ্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—এসেছিস্ বাবা? আজ আমার—" আর বলিতে পারিলেন না কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। জগদীন্দ্রের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। জগদীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"আসিবনা? সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমিত সমাজকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ইহার সঙ্গেই যে আমার আশৈশব সম্বন্ধ; এই মাটিতেই যে আমার জন্ম—আমার তীর্থক্ষেত্র! গ্রামের এই দুরবস্থার সংবাদ গ্রামান্তর হইতে শুনিয়াই কতদূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমার কি আর অভিমান করিবার সময় আছে! যাক্ সে সব কথা—সে সমস্তই ভুলিয়া গিয়া আমাকে ক্ষমা করুণ, আপনি যে আমার পিতৃ স্থানীয়।"

মৃত্যু যাহার দ্বারে, কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। জগদীন্দ্রের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্ত্রী অমর লোকে চলিয়া গেলেন। সাধ্বী মৃত্যুর পূর্ব্বে জগদীন্দ্রকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। জগদীন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের একমাত্র পুত্রটী আরোগ্যের পথে দাঁড়াইয়াছে। সে যে মাতৃহারা হইয়াছে একথা তাহাকে জানিতে দেওয়া হইল না।

মৃতার সৎকার এখন মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের কেহই ভয়ে মড়া পুড়াইতে স্বীকৃত হইল না, অধিকন্তু গ্রামস্থ প্রায় সকলের বাড়ীতেই কেহ না কেহ কাতর। এই সব অজুহাতে কেহই আসিল না। জগদীন্দ্র তাঁহার বন্ধু যাদবের এবং নিম্নশ্রেণীর আরও কয়েক জনের সাহায্যে বাঁশ কাঠ প্রভৃতি শ্মশান ঘাটে লইয়া গেল। তৎপরে বিদ্যানিধি মহাশয় এবং জগদীন্দ্র একযোগে মৃত দেহ শ্মশান ঘাটে লইয়া গেলেন।

জগদীন্দ্রনাথ একাকীই সমস্ত আয়োজন করিয়া মৃত দেহ চিতায় তুলিয়া দিল। বিদ্যানিধি মহাশয়ের চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতার উৎস ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া অস্পৃশ্য চণ্ডাল যাদবকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন "বাবা! আজ আমাকে খুব শিক্ষা দিয়াছ, আমার সহধর্ম্মিণীর শ্মশান বন্ধুর কাজ করিলে। সমস্ত দুর্ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া আমাকে ক্ষমা কর। আজ শ্মশান ভূমেই আমাদের মনের মলীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে গেলাম।"

যাদব বিদ্যানিধি মহাশয়ের পদধূলি মস্তকে তুলিয়া নিল। পুনরায় বিদ্যানিধি মহাশয় যাদবকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তকে সহস্র চুম্বনে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন। বাবা তুমি আমারও শ্মশানবন্ধু।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর সরকার।

কাবুলে বাঙ্গালী।

কাবুলীওয়ালা ভ্রমণকারী সওদাগর দেখিয়া আমরা কাবুলের সত্তা অনুভব করি। ফলে কাবুল দেশ নহে, উহা আফগানিস্থানের রাজধানী। এই সে দিন কাবুলের আমীর হবিবুল্লার হত্যায় আমরা ঘরে ঘরে কাবুলের

কথা আলাপ করিয়াছি। কাবুলে কেবল মারামারি ধরাধরি হয় বলিয়া ভারতের লোক প্রায় কেহ কাবুলে যাওয়ার কবুল করে না। আমার ন্যায় শীতল শোণিত বাঙ্গালীও যে কাবুলে যাওয়ার কবুল করিয়াছিল তাহা আর একজন পেশোয়ার প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহস ও সহায়তা পাইয়া। বড় ভয় হইয়াছিল, কেমন করিয়া কাবুল যাইব। এক একটা পালোয়ান দেখিয়া পেটের পীলা পর্যন্ত চমকিয়া উঠে। পেশোয়ারীদের মধ্যে কাবুলী ধাত অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। রাওলপিণ্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতি সামান্ত প্রদেশে আসল কাবুলী দেখিতে পাওয়া যায়। কাবুলের আমীর অনেক কাবুলীকেই এ সকল স্থানে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়া পাঠাইয়া থাকেন। কেমন তাদের গৌর উজ্জ্বল কান্তি, কেমন তাদের প্রকাণ্ড দেহ! আমরা বাঙ্গালায় যে সকল কাবুলী দেখিয়া থাকি তাহাদের অধিকাংশই সীমান্ত প্রদেশবাসী, কাবুল হইতে নির্ব্বাসিত কাবুলী।

সর্ব্ব প্রকার হীন গুণ সম্পন্ন আমা হেন নির্জ্জীব, ক্ষীণ দেহ বাঙ্গালীর কেমন করিয়া কাবুল দেখিবার আগ্রহ হইয়াছিল, সে কথা আমি আজ নিভৃতে চিন্তা করিয়াও ঠিক করিতে পারিতেছি না। ফলে সেই প্রবাসী বাঙ্গালীর উত্তপ্ত উৎসাহই আমাকে সাহস দিয়া কাবুলে পাঠাইয়াছিল, একথা নিশ্চিত। সেই বাঙ্গালী যুবকটীও অবশ্যই আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। আমি পেশোয়ারে যাহার অতিথি ছিলাম, এই যুবক তাঁহারই ভ্রাতষ্পুত্র। যুবক কহিল, "আমি আপনার সঙ্গী হইব, আপনি কি এতদুর আসিয়া ফিরিয়া যাইবেন?" "আমার প্রাণে বল আসিল, আমি বলিলাম "তথাস্তু।"

তখন যাওয়ার কি উপায় করা যায়? যাইবার পূর্ব্বে কি করিতে হয়, আমার গৃহস্বামীর নিকট সে সব জানিয়া লইলাম। সেখানে গিয়া কি করিতে হইবে তাহাও জানিতে বাকী রাখিলাম না। তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র যাইতে চাহিতেছে, এ কথা বলিলেও তিনি বড় বেশী আপত্তি করিলেন না।

চৈত্রমাসটায় বসন্ত কাল আমাদের দেশ হইতে এক বৎসরের জন্ত কার্লো লইয়া বিদায় গ্রহণ করে; কিন্তু সে স্থানে এই সময়ই বসন্ত বাতাস গুডমর্ণিং বলিয়া সকলকে অভিবাদন করিয়া প্রবেশ করে।

পেশোয়ারে আসিয়াই ভ্রমণকারীর তালিকায় লিষ্ট ভুক্ত হইয়াছি।

সীমান্তে বাঙ্গালী যেন হংস মধ্যে বক। যে সকল পঞ্জাবী ও মাড়োয়াড়ি ব্যবসা সূত্রে কাবুল যাতায়াত করে, গৃহস্বামী আমাকে তাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া দিতে লাগলেন। একজন কাবুলীকে পাইলাম, তিনি আসাম-বেঙ্গল রেলের কন্‌ট্রাক্টার, কাবুল বাসী, বেশ ইংরেজী বলিতে পারেন। তিনি বড় ভদ্র মুসলমান। তাহার নিকট বেশ উৎসাহ পাইলাম।

কাবুলের লোক যেমন কলিকাতাকে দেশ মনে করে, আমরাও কাবুলকে তদ্রূপ দেশ মনে করি। সেটা দুরন্ত দেশ হইলেও আমরা কাবুলের নামে নিতান্ত কাবু হইলাম না। আফগানদের বাস বলিয়া সে দেশের নাম আফগান স্থান। যাত্রার আয়োজন করিয়া প্রথমেই পেশোয়ারের কেণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে পাশ আনিলাম। উহা না লইয়াও যাওয়া যায়, তবে তাহার পাস লইয়া গিয়া মারাগেল বৃটিশ প্রজা বলিয়া সে তত্ত্বটা এখানে আসিলে তিনি বাঙ্গালায় আমাদের গৃহে সে তত্ত্বটা জানাইবেন।

পেশোয়ার হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে আমীরের কাছারী, সেখান হইতে পাশ না লইলে যাওয়া যায় না। ব্যবসায়ীদের পাশ লাগে না, অন্তের পাঁচ টাকা করিয়া ফি দিতে হয়।

সত্যই একদিন কবুল যাত্রা করিলাম। আমাদের পরিধানে পঞ্জাবী পোশাক, সাহেবী পোশাক পরিয়া গেলে কাবুলীরা সাহেব মনে করিয়া মারিয়া ফেলিতেও পারে। এক রাশ কাবুলী, পেশোয়ারী ও মাড়োয়ারীর মধ্যে আমরা দুইজন মাত্র বাঙ্গালী। পঞ্জাবী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিত্রতা করিলাম। তারা দু'বেলা রাঁধে, বাড়ে, খায় ও খাওয়ায়। আমরা এমনই হতভাগা তাহাদের ব্রহ্মণের হাতের রাঁধা আমরা খাই, এদিকে তারা কিন্তু আমাদের জল টুকুও খায় না। বাঙ্গালীরা বিদেশে গিয়া আপনার জাতটাকে অন্তর্জলী করে, তাই বিদেশীরা জানে না, বাঙ্গলা দেশেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ আছে।

আমরা খাইবার পাশের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম। শুনিয়াছি, আরো দু'একটা পাশ দিয়াও যাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গে কাবুল গবর্ণমেণ্টের অনেক গুলি রক্ষীসৈন্য ছিল। এই পাশে ডাকাতি হয় বলিয়া গবর্ণমেণ্টের এত সাবধানতা। ঘোড়া, উট অথবা গাধার পৃষ্ঠে চড়িয়া যাওয়া যায়; ভাড়া খুব সামান্য। হাটিয়া যাওয়াও চলে। পথে খাদ্যাদি খুব সুলভ। আমরা দুধ, ঘি খাইতাম বলিয়া সকলে আমাদিগকে ধনী, বড় লোক মনে করিত। ভারত সীমান্ত হইতে কাবুল আশি মাইল। মনে হয়, চার পাঁচ দিনে গিয়া পঁহুছিয়াছিলাম। রাস্তা বড় দুর্গম—অত্যুচ্চ, উচ্চ অনুচ্চ, প্রভৃতি পর্ব্বতে দেশ বেড়া। স্থানে স্থানে পর্ব্বত হইতে ঝরণা আসিয়া নামিয়াছে। তাহাদের জল বড় তরল, স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর। এ জলে লোহার ভাগ বেশী; অন্যান্য ধাতুর ভাগও আছে। এ জল আমাদের দেশের পালসা অপেক্ষাও উপকারী, তাই কাবুলীরা এমন বীর্য্যশালী, ভীমকায়।

কাবুল গিয়া পঁহুছিলাম। পঞ্জাবী ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই বাস স্থির রহিল। উহারা ব্যবসায়ী। ভারত জাত দ্রব্যাদি কাবুলে নেয়। কাবুল জাত বস্তু ভারতে আনে। সেখানে প্রায় ঘরই প্রস্তর নির্ম্মিত, শীত প্রায় লাগে না। সন্ধ্যার পর শীতের সময় প্রতি গৃহেই আগুণ করিতে হয়। বরফ গলিয়া শীত কালে রাস্তাঘাট কর্দ্দমাক্ত হয়। প্রাতঃ সূর্য্য যখন পূর্ব্ব গগণে লোহিতাকার হইয়া উঠে, তখন তাহার কিরণ রাশি চারিদিকে বরফের উপর ছড়াইয়া তাহা স্বর্ণ রজত কণিকা সদৃশ ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে। কি অপূর্ব্ব শোভা, বাঙ্গালায় বসিয়া এমন সৌন্দর্য্য অনুমানও করিতে পারি নাই।

বসন্তাগমে নানাজাতীয় পশু, পক্ষীর আনন্দ কোলাহল ধ্বনি আমাদিগকে আর এক নব ভাবের আনন্দ দান করিত। সেখানে বন কুক্কুটের অভাব নাই। এখানকার হিন্দুরা বন মুরগ খায়। এখানে হিন্দুও আছে, উহারা মুসলমানের পক্ষে মুষ্টিমেয়। এখানকার, হিন্দুরা মাথায় এক একটা টিকি রাখিয়াই খালাস। এখানে একটা কালী বাড়ী আছে। মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী সিপাহী বিদ্রোহের সময় কাশীর পশ্চিম প্রদেশে প্রত্যেক সহরেই বাঙ্গালীদের জন্য এক একটী কালী বাড়ী স্থাপন করিয়াছিলেন তিনি কাবুলেও একটী স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী একটী ব্রহ্মচারী তাঁহার সেবাইত ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর এখন কাবুলী ব্রাহ্মণেরাই তাহার সেবা পূজা করেন। উহার সেবা পূজা আমীর প্রদত্ত জায়গীর বা দেবোত্তর ভূমি দ্বারাই চলে। হিন্দুরা সংখ্যায় কম হইলেও মুসলমানেরা তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করে না। এই কালী দেবীর কাছে ছাগ বলি দেওয়া হয়। মুসলমানেরা শঙ্খ ঘণ্টাদির শব্দে গোলমাল করেন না। সর্ব্বদা পরস্পরে বিবাহাদি উৎসবে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করে। একত্রে বাসলেও যখন মুসলমানের মস্জিদে আজান ও হিন্দু মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হয়। তখন যে যার মত মস্‌জিদে ও মন্দিরে চলিয়া যায়। এখানকার মুসলমানেরা গোবধ করেনা, তাহার প্রমাণ আমীর হবিবুল্লা ভারতে আসিয়া দেখাইয়াছিলেন। গোবধ হইবে শুনিয়া তিনি দিল্লীতে ইদের সময় যাইবেন না বলায় দিল্লী ওয়ালারা গোবধ করিবে না বলিয়া জানাইলে তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন। এখানকার হিন্দুরা শাক্ত, সূর্য্যোপাসক, মহাপ্রভু চৈতন্য দেব এখানে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই বলিয়া তাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা অবগত নহে। এখানে চাতুর্ব্বর্ণ দেখিতে পাইলাম না। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রই দেখিয়াছি। শুনিয়াছি কোন কোন মুসলমান ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

কয়েক দিন বাসের পর আমার একটা খেয়াল চাপিল কেমন করিয়া আমীরের সঙ্গে দেখা করা যায়। আমীরের একটা বাক্স বাহিরে লটকান থাকে, তাহাতে যাহারা পত্র বা আবেদন লিখিয়া দেয় তাহা তাঁহার সম্মুখে খোলা হয়, সে সকল তিনি স্বয়ং পাঠ করেন। আমি তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার প্রার্থনা করিয়া এই পত্র দিলাম। তার পরদিন সাক্ষাতের আদেশ আসিল। তখন আমীর আব্দর রহমান বাঁচিয়া আছেন। আমি সাহেবী পোষাক পরিয়া যথাস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলে আমার দেহ পরীক্ষা হইল। আমার সঙ্গে মারাত্মক অস্ত্র নাই বলিয়া

আমি সাক্ষাতের অনুমতি পাইলাম। একজন কর্ম্মচারী আমাকে আমীর সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন। সেটা ইংরেজী ধরণের বৈঠক খানা। আমীর সাহেব আমার পরিচয় লইলেন। তিনি আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সব কথাই রাজনীতি সংক্রান্ত।

প্রথম যখন ইংরেজেরা সে দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন তখন সেখানকার সর্দ্দারেরা উত্তেজিত হইয়া আমীরের নিকট গিয়া উহাদিগকে দেশত্যাগী করিয়া দিতে প্রার্থনা করিয়াছিল। আমীর সাহেব সকলকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন—"ইংরেজ আমার বন্ধু আমি তাহাদিগকে বাণিজ্য ও খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুমতি দিয়াছি। এখন উহাদিগকে স্থান করা তোমাদের হাতে। তোমরা যদি তাদের ধর্ম্ম বক্তৃতা না শোন আর তাদের দ্রব্যাদি ক্রয় না কর, তবেই আমারও বন্ধুতা রহিল,আর তাহারাও চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে।" তাহাই হইল ইংরেজ ধর্ম্মযাজক ও সওদাগরেরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আমীর সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পর হইতে প্রত্যহ আহারের জন্ম আমি সরকারী সিধা পাইতাম। এক বেলা অন্ন ও অণ্য বেলা লুচি বা রুটী খাইতাম। প্রত্যহ কালীবাড়ী হইতে বলিদেওয়া একটা করিয়া পাঁঠা পাইতাম, প্রচুর দুধ আসিত, আমাদের দুই জনের জন্ম প্রত্যহ দুই সের করিয়া মদ আসিত। এ মদ খাইতে বড় সুসাদু, বেশ তৃপ্তি জনক। মহুয়া ও কদলী দ্বারা প্রস্তুত মদ পাইতাম। সে দেশীয়দের মদ্য পান করিলে দণ্ড হয়। বিদেশীয়েরা মদ্য ক্রয় করিয়া খাইতে পারে।

আমার পোষাক দেখিয়া আমীর শাহেব কহিলেন "এ ত তোমার বিদেশীয় ইংরাজী পোষাক; তোমরা কিরূপ পোষাক ব্যবহার কর?" আমি আমাদের ধুতি চাদরের কথাটা বুঝাইতে পারিলাম না। বলিয়াই পরদিন বাঙ্গালী পোষাকে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের আদেশ করিলেন। আমি পরদিন বাঙ্গালী পোষাক পরিয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে দেখিয়া পথের বালক বালিকা দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমীর সাহেব আমার বাঙ্গালী পোষাক দেখিয়া অনেক প্রশ্ন করিলেন। যখন ঐ সকল কাপড়ও বিলাতি বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন আমাদের হতভাগ্য দেশের জন্ম বড় দুঃখিত হইলেন। দূরদর্শী আমীর সাহেবের রাজনৈতিক কথা শুনিয়া অবাক হইলাম। আমীর সাহেবের নিকট আমার সমাদর দেখিয়া কাবুলীরা আমাকে ইংরেজের গুপ্তচর বলিয়া মনে করিত। প্রকাশ্যে আমাকে খাতির করিত,মনে মনে কি ভাবিত—সে চিন্তা করি নই। আমরা দেশে বসিয়া যে সকল কাবুলী দেখি, উহারা অভদ্র ও ইতর শ্রেণীর। কাবুলী ভদ্রলোকেরা অতি উচ্চ দরের এখানে কয়েকটী ইংরেজী নবিশ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন. তাঁহারা পঞ্জাব প্রবাসীবাঙ্গালী তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা, পরিচ্ছদ সব ভুলিয়া গিয়াছেন বলিলেই হয়। বাঙ্গালায় কখনো আসেন না পঞ্জাবের প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহিত বিবাহাদি করেন।

আমীর আবদর রহমানের দেহ খুব বলিষ্ঠ ছিল। আমি যখন হিমালয়ের গড়োয়াল প্রদেশে দেরাদুন ও হৃষিকেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন কাবুলের পূর্ব্বতন আমীর দোস্ত মামুদ খাঁর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনি আমীর আবদর রহমানের পিতৃব্য, তিনি তখন বন্দী অবস্থায় ছিলেন। দোস্তমামুদকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তিনি হৃষিকেশ অঞ্চলে শিকারে বাহির হইয়াছিলেন, বহু অশ্ব, হস্তী তাঁহার সঙ্গে। কয়েকজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ তাঁহার রক্ষী ছিল; বহুসংখ্যক সৈন্য তাঁহার কারাগার, সাম্রাজ্য রক্ষণ করিত। সেই সময় কাবুল হইতে অনেক লোক ভারতের পেশোয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। এখন সে দোস্ত-মামুদ ও আব্দর রহমান কেহই ধরাধামে নাই। আমি আমীর দোস্ত-মামুদকে তাঁহার প্রাচীন অবস্থায় দেখিয়াছি, উত্তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ রূপরাশি দেখিয়া বাস্তবিকই ভক্তি হইয়াছিল। দোস্ত-মামুদের এই ব্যয়টা কাবুল গবর্ণমেণ্ট হইতে ইংরেজ রাজের হাত দিয়া আসিয়া খরচ হইত।

কাবুলের ভাষা পুস্ত, উহা উর্দ্দু বা হিন্দির সঙ্গে মিলেনা। তবে কাবুলীরা উর্দ্দু ও হিন্দি কিছু কিছু বুঝেন। প্রায় সকল ভদ্রলোকই কিছু হিন্দি জানেন। কাবুলে

নদী, ঝরণা, ঝিল ও কুয়া প্রভৃতির জলই ব্যবহৃত হয়। এখানে পরদানশিন ও বেপরদা উভয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকই দেখিতে পাওয়া যায়। রমণীরা সুন্দরীও অপেক্ষাকৃত লম্বা। প্রকাশ্যে বেশ্যা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না, স্বগৃহেই অনেকে বেশ্যা পোষণ করে। সাধারণতঃ কাবুলে বেশী বৃষ্টি না হইলেও ফসল বেশ হয়। মাটী উর্ব্বরা।

এখানকার আদালতে আমাদের ন্যায় কথায় কথায় কোর্ট ফি দিতে হয় না। কাবুল সহরটী যেন, পুরাণা সহর, সাবেকী ধরণে নির্ম্মিত নূতন সহর ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। বেশ সুন্দর বাড়ী। একদিন আমরা দুর্গ ও সৈন্যাবাস দেখিতে গিয়াছিলাম। Croop co. নির্ম্মিত বড় অস্ত্র ও গোলাগুলি সেখানে রহিয়াছে। কাবুলী সৈন্যদের পোষাক সাধারণ কাবুলীদের মত নহে। তাহারা তুরস্ক দেশীয় সৈন্যের ন্যায় পোষাক পরিয়া থাকে। এ দেশে প্রচুর শীত বলিয়া এক একজন বহু শীতবস্ত্র গৃহে রাখিয়া থাকেন। স্বাস্থ্য বড় ভাল বলিয়া কোন রোগ এ দেশে দেখা যায় না।

এ দেশের গাভীগুলি প্রচুর দুধ দেয়। অন্যান্য পশু পক্ষীও আকারে বৃহৎ হইয়া থাকে। আমাদের দেশী ছাড়া অন্যান্য দেশী লোকেরাও কাবুলে বাণিজ্য করিতে আইসে। এস্থানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, উচ্চ বিদ্যালয় বেশী নাই। কাবুলে তখন একটী মাত্র উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। পুস্ত ব্যতীত অন্য ভাষার বিদ্যালয় নাই। উচ্চ বংশের লোকেরাই উচ্চ রাজকার্য্য পায়। আফিস আদালতগুলি সেকেলে ধরণের হাকিম ফরাসে বসিয়া কাছারী করেন। উকীলেরা হাটু গাড়িয়া বক্তৃতা করে। বাদী, বিবাদী দাঁড়াইয়া থাকে। স্বেচ্ছাচারী রাজা বলিয়া এ দেশে যে অধিক অত্যাচার, অবিচার হয়, এমন মনে হইল না। একমাত্র হেকিমেরাই এস্থানে চিকিৎসা ব্যবসায়ী। আমাদের সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ছিল, অনেককে বিনামূল্যে দিয়াছি, তাই আমি সেখানে ডাক্তার সাহেব বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলাম। আমি কাবুলের পশ্চিম-উত্তর সীমান্ত, রুষিয়ার সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। পশ্চিম সীমান্তে কাবুল গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ আছে। যদি কখনো রুশ বা পারস্য এ দেশ আক্রমণ করেন তজ্জন্যই এই সতর্কতা। সে দেশে আমাদের দেশের মত হাট বাজার আছে। সে সকল বাজারের স্বতন্ত্র নাম নাই, কেবল বারের নামে বাজার পরিচিত।

বাস্তবিক ব্যবহারে সেখানকার কাবুলী হিন্দু, মুসলমান একই রকমের। আমীর হবিবুল্লা যখন ভারতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন কাবুলী হিন্দুও আসিয়াছিল। হিন্দুদিগকে আমীর অত্যাচার অবিচার করেন না। কাবুলী ভদ্রলোকেরা অনেকেই ধর্মভীরু, বিনয়ী। তাহাদের গৃহে পেট পুরিয়া ফলাদি আহার করিয়াছি। অঞ্জলী পূরিয়া আঙ্গুর খাইয়াছি। দুধ, মাংস খুব সস্তা। আমাদের দেশী এক পয়সায় একসের দুধ ও দুইপয়সায় একসের ছাগমাংস পাওয়া যায়। যে কাবুলী কনট্রাক্টারের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তিনি আমাকে অনেক স্থানে লইয়া গিয়া দেখাইয়াছিলেন।

কাবুলে কোন কালে যে হিন্দু বসতি ছিল তাহা সে দেশের গাঁয়ের নাম শুনিলেই বুঝা যায়। নান্দি কোটাল, সমরুদ্, রামকুণ্ড প্রভৃতি গ্রামের নাম শুনিয়া ইহা অনুমান করা সহজ। নন্দী এখানে কতোয়াল ছিলেন বলিয়া নান্দি কোটাল, সমরুদ হইতে সমরুদ্ এবং রাম কুণ্ডও সহজেই বুঝা যায়। আর যদি সেখানে হিন্দু না থাকিবে তবে মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে কাবুলে কেন দেবী কালী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিবেন?

আমি কাবুলে খুব সুস্থ ছিলাম। একদিন একটা হাঁচি পর্য্যন্ত হয় নাই। আমার দেহ ওজনে অনেক বাড়িয়াছিল। অনেকটা ফরসা ও বলিষ্ঠ হইয়াছিলাম। কাবুলে যে আনন্দ ও সুখ অনুভব করিয়াছিলাম এ দেশে এমন হইবার নহে। জীবনে আর তা হইবে না বলিয়া এখনও দুঃখিত আছি।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

কপোতী।

বকুল গাছের উচ্চ শাখে,
সবুজ পাতার আড়ে
খড় কুটা আর শুষ্ক তৃণ
বকুল ফুলের ঝাড়ে
দীর্ঘ দিবার শ্রম-পীড়িত
কপোত কপোতীর
কত আকাশ কুসুম গাঁথা
বাঁধা সুখের নীড়।
ফাগুন মাসের সূর্য্য ডোবা
রক্তিম আকাশ খানা,
ঝির ঝিরিয়ে বইছে বায়ু
কুসুম গন্ধ-ছানা।
শান্ত মধুর সাঁঝের কোলে
দম্পতি যুগল
বসে ছিল মুখো মুখী
শান্ত অচঞ্চল।
বুকের পাশে দুইটী ছানা
যেন আড়াল দিয়ে
বিপদ সীমার যোজন দূরে
রেখেছে লুকিয়ে।
সাফল্যের সে মহানন্দে
পরিপূর্ণ হিয়া।
দৃষ্টি মাঝে পুলক যেন
উঠ্‌ছে উছলিয়া।
ধরা যেন পূর্ণ-সুখের
মহেক অধিকারী,
তাই তরিতের হাস্যে ওঠে
দাবাগ্নি উদ্গারি।
অলক্ষ্যেতে কোথা হ'তে
ব্যাধের তীক্ষ্ণ-শর
পড়্‌লো এসে বজ্র সম
দম্পতির উপর।
আকুল ভয়ে কপোত হেরে
কপোতী সে শরে,
রক্ত রাঙ্গা বকুল তলে,
স্থির দৃষ্টে পড়ে।
কপোতী সে নীরব দৃষ্টি
ক্ষণেক সেথা তুলি
শেষ দেখা তার দেখে নিল
পতি, পুত্রগুলি।
সে দৃষ্টি হায়, প্রকাশিল
কতই কথা তার,
কতই স্নেহ কতই ব্যথা
কতই হাহাকার।
কতই প্রাণের গোপন কথা
ছিল তারি মাঝে,
শেষ কথা সে বলে গেল
প্রিয় পতির কাছে।
বলে ছিল বুঝি কেঁদে
আমার প্রাণের ধন
যাচ্ছি সখে, তোমায় দিয়ে
আজ কি শুভক্ষণ!
বিষের শর এ— সুহৃদ আমার
তোমাদের সব রেখে,
ভাগ্য আমার কাছে এসে
নিল আমায় ডেকে।
ধন্য আমি, এমন মরণ
যদি আবার পাই
আবার ফিরে মিলবো প্রিয়,
আজকে তবে যাই।
ব্যক্ত করি প্রাণের কথা,
নীরব দৃষ্টি ভরে
কপোতী সে ক্লান্ত নয়ন
মুদল চির তরে।

শ্রীবিভাবতী সেন।

প্রাচীন কবিগান।

প্রাচীন কবিগানগুলিকে বাঙ্গলা গীতি সাহিত্যের একটা অঙ্গ বা অংশ বলিলে,—কথাটা বোধ হয় সাহিত্য সেবী সজ্জন গণের অপ্রীতি কর হইবে না।

এই গীত রত্নগুলি সাধারণ ধূলিবৎ অযত্নে উপেক্ষিত হইয়া ধীরে ধীরে সাহিত্য সংসার হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে। দুর্দৈব বশতঃ কেহ দেখিয়াও দেখিতেছেন না,—শুনিয়াও শুনিতেছেন না।

এই প্রকারে যে আমরা অবহেলার বশীভূত হইয়া কত শত সহস্র গীত-রত্ন হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহার সংখ্যা করিবে কে? এই উজ্জ্বল রত্নগুলি কেন যে অদ্যাপিও বাণী ভাণ্ডারে স্থান পাইতেছে না, আমি ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

বর্ত্তমানে যে সকল গীত ভগ্নাবস্থায় অবশিষ্ট থাকিয়া প্রাচীন কবিগানের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়াস পাইতেছে,—কুড়াইয়া লইলে তাহাও অপ্রচুর নহে। এবং যত্ন সহকারে খুঁজিয়া দেখিলে, দুই চা'র টা অমূল্যরত্ন ও যে না মিলিবে,—এমন নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে,—আগ্রহানুসন্ধানের অভাবে ধীরে ধীরে এগুলিও ধ্বংশের দিকেই চলিয়াছে।

অন্যান্য গীত, কবিতা, টপ্পা ও পদাবলীর যেমন মুদ্রিত পুস্তক আছে,— কবি গানের তেমন কোন পুস্তক নাই। সুতরাং ইহার বিনাশ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

অধিকাংশ কবিগানই গ্রাম্য স্বভাব কবির মানস কল্পতরুর বসন্তে জাত অমৃত ফল। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে,—রস-আস্বাদে অতুলনীয়। তবে রুচির তার-তম্যে কাহারও নিকট কটু-কষায় বা তিক্ত ও বোধ হইতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ রসনায় চাকিয়া দেখিলে উহার আস্বাদন যে অতিশয় মধুর, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

নিম্নে সংক্ষিপ্ত সমালোচনার সহিত দুইটী প্রাচীন কবি-গান "সৌরভের, পাঠক গণকে উপহার প্রদান করিলাম।

(সদর।)

চিতান,—রাই শ্যামের নিত্য লীলা নিত্য বৃন্দাবনে।

পরাণ,—নিধু বনোপরে, কুঞ্জভঙ্গ দিয়ে,—

প্রভাতে কানু চলেন ধেনুর সনে॥

লহর,—বিপিনে;—চম্পকের ফুল দেখে আকুল,

শ্যাম চিন্তামণি, মনে ভাব্লেন আপনি,—

এইরূপ আমার চম্পক বরণী,—

তখন মাধুর্য্য ভাব পড়ে মনে, ঐশ্বর্য্য শ্যাম ধরাসনে,

সুবল সখা জেনে মনে, আন্তে যায় কমলিনী।

মিল,—সুবল আপন বেশ রাইকে দিয়ে পাঠায় বনে,—

তাঁরে না চিনে বলেন কৃষ্ণ কেলে সোণা।—

মহড়া,—ওরে সুবল সখা, কেন এলে একা,

প্রাণের প্রিয়া কি দেখা দিবে না?

ধুয়া,—আমি চাঁপার ফুল অঙ্গে পরে, রাধারূপ মনে করে, হলেম অচেতন,—

আমায় চেতন করে, আন্তে তাঁরে কল্লে গমন,—

এখন ভাই বিরস মনে, এলে তুই কি কারণে,

আবার প্রাণের ধন রাধা বিনে প্রাণ বাঁচেনা।—

(ওরে সুবল সখা,—ইত্যাদি)

খাদ,—সুবল প্রিয়সী বিনে আমার প্রাণ রবে না।

লহর,—সুবল রে, সখা ভাবে তোমরা সবে,

সখা ব্রজেতে,—বাঁচাও বিপক্ষের হাতে,—

সুখে থাকো আমার সুখেতে,

ওরে আজকেন তোর মন ঔদাস্য, শশীমুখে নাইরে হাস্য,

মলিন দেখি এ চন্দ্রাস্য নববৎস বক্ষেতে।

মিল,—পূর্ব্ববৎ।

ঝুমুর,—সুবল প্রিয়া কি বলেছে বল বল।

ওরে ভাই সুবল, কথা বল্ সুবল, শুনে প্রাণ করি শীতল॥

তোমারে ভাই পাঠিয়ে দিয়ে, আশা পথ নিরক্ষিয়ে,

প্রাণ আমার ছিল,—যেমন,—বারিশূন্য মীন,

বন পোড়া হরিণ, রাই বিনে ভাই এম্নি হৈল॥

পরচিতান,— * * *

পরচিতানের লহর,— * *

এই গীতটীর চিতান হইতে প্রথম মিলের শেষ,—"তাঁরে না চিনে বলেন কৃষ্ণ কেলে সোণা" পর্য্যন্ত কবির উক্তি চলিয়াছে।

কৃষ্ণ যামিনী যোগে নিধু বনে গিয়া শ্রীমতীর সেবা-সাধ পূর্ণ করতঃ কুঞ্জ ভঙ্গ পূর্ব্বক প্রভাতে রাখাল সঙ্গে

গোচারণ করিতে বনে গমন করিলেন। গীতের চিতান পায়াণে কবি ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

তৎপর চম্পক পুষ্প দর্শনে শ্রীমতীর অঙ্গ কান্তির উদ্দীপনে কৃষ্ণ আত্মহারা হইয়া মাধুর্য্য ভাবের অভিঘাতে অচৈতন্যাবস্থায় ভূপতিত হইলেন। সুবল শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা। মরমের মরমী। সুতরাং ঘটনা বুঝিতে সুবলের বিলম্ব হইল না। সুবল আর কাল বিলম্ব না করিয়া অমনি শ্রীমতীকে আনিতে যাবটে * যাত্রা করিলেন।

ভাবুক কবি, এত গুলি কথা পরাণের পর, লহরে প্রকাশ করিয়া আপন কৃতিত্বের পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন।

সুচতুর সুবল আয়ান ঘোষের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া ভাবিতেছেন, "শ্রীমতীর ন্যায় এমন কিশোরী কন্যাকে দিনের বেলায় কেমন করিয়া পরপুরুষের সঙ্গ করণার্থ কাননে পাঠাইব? ইঁহার তো স্বাধীনতা কিছুই নাই। পরের ঘরের নব বধু। রায় বাঘিণী শাশুড়ী ননদী (ননন্দা) জটিলা, কুটিলা। তায় আবার কৃষ্ণ কলঙ্কিনী বলিয়া গকুলে শ্রীমতীর একটী অপবাদ ও আছে। হঠাৎ কুল কামিনীকে বন গামিনী দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ইনি কি উত্তর করিবেন?"

সুবল এইরূপ ভাবনা তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে "রাইকে রাখাল বেসে বনে পাঠাইবেন" এই রূপ সিদ্ধান্ত তটে উপনীত হইলেন। অগত্যা তাহাই করিলেন।

এখানে কবি মিলের পদে এই ভাবটীই ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা, "সুবল আপন বেশ রাইকে দিয়ে পাঠায় বনে।"

সুবল আপনার রাখাল বেশে শ্রীরাধাকে রাখাল সাজাইয়া বনে পাঠাইলেন, আর নিজে রাধার সাজে রাধা সাজিয়া গৃহে রহিলেন।

বলা বাহুল্য, শ্রীমতী রাধিকা সুবলের সম বয়স্কা ছিলেন। এবং তাঁহার (শ্রীরাধার) মুখের আকৃতি ও অবয়ব গঠন সুবলের সঙ্গে অভিন্ন ছিল। ইহা ঋষিকল্প পণ্ডিত গণ কর্ত্তৃক ভাগবতাদি গ্রন্থের টীকায় নির্ণীত হইয়াছে।

* যাবট, শ্রীবৃন্দাবনের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই গ্রামে রাধার বিবাহ হইয়াছিল।

সুবল বেশ ধারিণী শ্রীমতী রাধিকা বন মধ্যে কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ শ্রীমতীকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, সুবল শ্রীরাধাকে আনিতে না পারিয়া একাকী ফিরিয়া আসিয়াছে।

কবি এই ভাবটী মিলের শেষ পদে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা, "তাঁরে না চিনে বলেন কৃষ্ণ কেলেসোণা।" এই পর্য্যন্ত কবির উক্তি শেষ হ'ল। এখন হইতে গীতের অবশিষ্টাংশ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুবল রূপী শ্রীরাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণ কহিতেছেন,

মহড়া,—(ওরে সুবল সখা, কেন এলে একা, প্রাণের প্রিয়া কি দেখা দিবে না?)

শ্রীকৃষ্ণ রাধা রূপের উদ্দীপনে অচৈতন্যাবস্থায় ভূপতিত হইলে সুবল কৃষ্ণের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াই শ্রীরাধাকে আনিতে গিয়াছিলেন। এই কথাটী পূর্ব্বে লহরে কি মিলে প্রকাশ না করিয়া কবি ভাবিলেন, "কৃষ্ণকে অচৈতন্যাবস্থায় বন মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া সুবলের চলিয়া যাওয়াটা কখনই সঙ্গত নহে। কারণ, সুবল অন্তরঙ্গ প্রাণ সখা। সুবল কৃষ্ণ গত প্রাণ।, কবি এই সৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া দোষ খণ্ডনের জন্য ধুয়ার পদে কৃষ্ণোক্তিতে বলিতেছেন, "আমি চাঁপার ফুল অঙ্গেপরে, রাধা নাম মনে করে, হলেম অচেতন, আমায় চেতন করে আস্তে তাঁরে কল্লে গমন, ইত্যাদি।,

ধুয়ার পদে শ্রীমতী যে শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিয়াছেন, এরূপ ভাবের একটুকু ছায়া পাত আছে। শ্রীমতী সুবল বেশ ধারণ করিয়া যে কেবল গুরুজনের কি সর্ব্ব সাধারণের চক্ষে ধূলি নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন এমন নহে; তিনি কৃষ্ণকেও কিছু কালের জন্য ভুলাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে, বিফল মনোরথ প্রত্যাগত সুবলের বিষণ্ণ ভাবে বদন মণ্ডল ঢাকিয়া লইয়াছিলেন। তাই কৃষ্ণ বলিতেছেন "আবার ভাই বিরস মনে, এলে তুই কি কারণে।"

শ্রীমতী সুবলের বেশ ভূষণ ধারণ করিয়া সুবল সাজিলেন। সাজিলেন বটে, কিন্তু রাখাল সাজে স্তন যুগল ঢাকা যাইতে পারে কি? কবি ধুয়ার পর লহরে তাহার উপায়-কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। "নব বৎস বক্ষেতে।" শ্রীমতী সুবল সাজিয়া দেখিলেন, রাখাল

বেশে স্তনদ্বয় অনাবৃত থাকে। অমনি একটী নববৎস বক্ষে লইয়া বাহির হইলেন। বোধ হয় এই বাছুরটী সুচতুর সুবল ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পূর্ব্বেই সঙ্গে লইয়া ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে চিনিতে না পারিয়া সুবল জ্ঞানে বলিতেছেন, "সুবল, প্রিয়া কি বলিয়াছে, বল, বল। শুনিয়া আমার প্রাণ শীতল করি। তোমাকে পাঠাইয়া দিয়া আমার প্রাণ আশা পথ নিরীক্ষণ করিতেছিল। রাধা বিনে আমার প্রাণ বারি শূন্য মীন বা বন পোড়া হরিণের মত হইয়াছে।" গীতের অন্তরায় (ঝুমুরে) কবি এইরূপ উপমা দ্বারা গীতটিকে অতি সুন্দর করিয়াছেন।

এই সদর গীতটি একদলে গাইলে, বিপক্ষ পক্ষ তাহার উত্তর করিবে। উত্তরটী সুবল রূপধারিণী কমলিনীর উক্তিতে এইরূপ হইবে। যথা,—

"প্রাণেশ্বর! আমি সুবল না। আমি তোমার প্রেমাধিনী পদসেবিকা শ্রীমতী রাধা। সুবল মুখে তোমার অবস্থা শ্রবণ করিয়া সুবল বেশে দিনের বেলায় বনে প্রবেশের সুযোগ করিয়াছি মাত্র।"

এই প্রকার উত্তর হইলে পর শ্রীমতীর প্রতি কৃষ্ণোক্তিতে যে আর একটী গীত হইবে, তাহার নাম সদরের পাল্‌টা বা দোসরা। দোসরা গীতটী এই,—

চিতান,— না চিনে সুবল জ্ঞানে কত বল্লাম তোমায়;
পরাণ – সুবল আছে ব্রজে,—তুমি সুবল সেজে,
এসেছ বিপিন মাঝে, দেখ্‌তে আমায়।
লহর,– শ্রীরাধে! সুবল মুখে শুনে আমার দুঃখের কাহিনী
হয়ে দুঃখের দুঃখিনী (দেখতে এলে আপনি)
বিনোদ বেশে রাই বিনোদিনী,—
তোমার নাম শুনে হই পরম সুখী,
দেখা দিলে চন্দ্রমুখী,
এত দয়া না হৈলে কি, মধুর ভাবের ভাবিনী?
মিল,—তোমার নাম মধুর, প্রেম মধুর,—বাক্য মধুর,—
আমি না জেনে বাঁশীতে কি ঐ গুণ গাই?—
মহড়া,—প্রিয়ে, এ'স এ'স আমার বামে বস,
আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি রাই।
ধুয়া,—বনে তোমার রূপ পড়ে মনে,
অধৈর্য্য হৈলাম প্রাণে, যেমন ম'রেছিলাম,—
তোমার দেখ্‌তে পেয়ে,—তাইতে আবার জীবন পেলাম।
বিলম্বের কাজ কি প্রিয়ে, মন-প্রাণ সমর্পিয়ে,
এ'স শ্রীঅঙ্গে অঙ্গ দিয়ে এ প্রাণ জুড়াই।
খাদ,—তুমি বিনে গো রাধে! আমার আর কেহ নাই।
লহর,— শ্রীরাধে, আমার প্রতি রসবতী যে দয়া তোমার,
আমি মন বুঝেছি তার, এজন্মে কি শোধ্‌ব তোমার ধার,
তোমার ঐ মধুর প্রেম ঋণের দায়ে, জন্মান্তে ভিখারী হয়ে,
করেতে করঙ্গ নিয়ে ভিক্ষা মেগে শোধ্‌ব ধার।
মিল,—পূর্ব্ববৎ।
ঝুমুর,—আমার কাছে এ'স এ'স বিধুমুখী!—
ও প্রাণ রাধিকে, তোমার রূপ দেখে
রূপ সাগরে ডুবে থাকি।
রূপ মাধুর্য্য দরশনে, অধৈর্য্য হয়েছি প্রাণে,
যেমন চাতক পাখী,—
করে মিলন বরিষণ, বাঁচাওহে জীবন,
চক্ষে হেরে বক্ষে রাখি।
পরচিতান,— * * * * *
লহর,— * * * * * *

সদর গীতটী অপেক্ষা পাল্‌টা গীতটী বেশী সুন্দর ও মধুর রসাত্মক হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা দর্শনে রাখালরূপিনী শ্রীরাধা অনেকক্ষণ কপটতার অন্তরালে লুকাইয়া থাকিতে না পারিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে বিস্ময়াভিভূত শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি মধুর হইবারই কথা।

ভাবময়ী শ্রীরাধিকার নিষ্কাম ভালবাসার প্রতিশোধ দিবার জন্য ভবিষ্যতে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) দীনাতিদীন হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবেন,—পাল্‌টার দ্বিতীয় লহরে তাহার পরিস্ফুট-আভাস প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

"তোমার এই মধুর প্রেম-ঋণের দায়ে,—জন্মান্তে ভিখারী হয়ে, করেতে করঙ্গ নিয়ে, ভিক্ষা মেগে শোধ্‌ব ধার।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেম-ঋণ পরিশোধের জন্য যে কলিতে গৌরাঙ্গ হইবেন,—ভাবাবিষ্ট কবি এখানে এই কথাটীর আভাস দিয়া গীতটীকে অতি সুন্দর করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

নিয়তি।

(১)

ওগো রাণি, কুহকিনি, বিস্তারিয়া বিকট বদন
ঘোর বিভীষিকাময়, শতশত বজ্রের স্ফুরণ,
বজ্রাঘাত ঝঞ্ঝাবাত তুচ্ছ করি গ্রাসিতে মানবে
শত বাধা অতিক্রমি ছুটে যাও বিকট আরবে,
কালের কুটিল গতি অতর্কিতে ভেদি অকস্মাৎ
মানবের সাধনার ছবিখানি কর ভস্মসাৎ।
নিবিড় জোছনাময়ী নিশীথিনী তোমার মায়ায়
প্রলয়ের ঘন ঘোর অন্ধ কারে শুক্ক হ'য়ে যায়।

(২)

শত সাধনার বীণা মূরছনা তুলিয়া মধুর
ঢালে যবে শান্তি ধারা উজলিয়া হৃদয় মুকুর—
তন্ময় হৃদয় যবে সুখ সুধা সদা করি পান
শুনে নাই এ সংসারে কভু গো সে দুখের আহ্বান,
অলক্ষিতে দুলারিয়া কোথা হ'তে ভীম বেশে আসি,
পলকে সুখের সুধা নিঃশেষিত কর তুমি হাসি';
কোটী কোটী অনুনয় কাতরতা মাখা অশ্রুজল
পশে না শ্রবণে তব, হে বধিরে, সকলি বিফল!

(৩)

সুখ দুঃখ প্রদানের শক্তি তব বিধাতার দান,
সুখ দানে হে কৃপণে, সুবিরল তোমার আহ্বান।
কালের পেছনে থাকি সদা ফের ছিদ্র অন্বেষিয়া,
দুখের শেলে দাও মানবের হৃদয় পেষিয়া।
কিন্তু যাঁর ধর্ম্মে নিষ্ঠা; প্রাক্তনের শুভ কর্ম্মচয়
পরশি করেছে চিত্ত শুদ্ধ শান্ত পবিত্রতা ময়—
তাঁর কাছে সদা তব প্রকটিত মোহন মূরতি;
তোমার আলোক রাশি সদা তাঁর করিছে আরতি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

গ্রন্থ সমালোচনা

গান—শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত।

ভক্ত কবি প্রাণের আবেগে এই গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গানগুলি হিন্দুমাত্রেরই প্রাণ স্পর্শ করিবে। যেমন রচনার মাধুর্য্য তেমনি ভাবের গাম্ভীর্য্য। আমরা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

তুলি—প্রমোদ চৌধুরী—(কবিতা গ্রন্থ)

কাগজ ছাপা সুন্দর। লেখায় সুন্দর ভাব আছে।

মর্ম্মগাথা—শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ সৌরভের পাঠক পাঠিকার নিকট অপরিচিত নহেন। তাঁহার মর্ম্মগাথা যে তাহার সুনাম বহন করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "আমার চশমা", "আমার চাকরি" ও "চায়ের গান" যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারা মুগ্ধ হইবেন।

পুষ্পহার—শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা।

পুষ্পহারের গ্রন্থকার সমাজের এক একটী সমস্যার পূরণ করিতে যাইয়া এক একটী গল্প লিখিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য মহৎ। লেখক নবীন, চেষ্টা করিলে কালে নিঃসন্দেহ সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। গল্পগুলি সুন্দর হইয়াছে।

মহাভারত—আদিপর্ব্ব ১ম, ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত গিরিধর বিদ্যারত্ন বিরচিত। ৫৩ নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

উত্তম প্রশংসনীয়। মূল মহাভারতের অনুবাদ যাহাতে সকলে বাঙ্গালা কবিতায় পড়িতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া লেখক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ রায় এই চেষ্টা অনেক দিন পূর্ব্বে করিয়াছিলেন। এই চেষ্টা সুসম্পন্ন করিতে পারিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব দূর হইবে সন্দেহ নাই।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, Dacca
and Published by Kedar Nath Mosumder Research House, Mymensingh.

সৌরভ
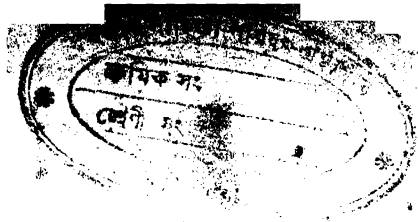
অষ্টম বর্ষ। ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩২৬। পঞ্চম সংখ্যা।

কবি মধুসূদন দত্ত।

(২)

একদিকে স্বদেশের এই শোচনীয় অবস্থা; অপরদিকে মধুসূদন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, প্রাচীন ভারতের সেই জ্ঞান-গরিমা, সেই মনুষ্যত্ব চর্চ্চা বর্ত্তমান ভারত সাগরের উপকূল ত্যাগ করিয়া পশ্চিম দেশকে বরণ করিয়াছে। তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, শৌর্য্যবীর্য্য কর্ম্মশক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান, এ সকলি আজ সেই পাশ্চাত্য জগৎকে মহীয়ান্, গরীয়ান্, ঐশ্বর্য্যবান্ ও অজেয় করিয়াছে, যাঁহাদিগকে এখনো আমরা অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ আখ্যায় অভিহিত করিয়া নিজেদের হীনত্বের পরিচয় দিয়া থাকি।

তবে পতিত বাংলা সমাজে মধুসূদন যে কোন গুণেরই পরিচয় পান নাই, তাহা নহে। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, মানুষের কোমলকান্ত গুণাবলী, মনুষ্য হৃদয়ের স্নেহ-প্রেম, বাৎসল্য, শ্রদ্ধা, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি কোমল হৃদয় গুণ প্রচুর পরিমাণে এ দেশেই বিদ্যমান আছে। কিন্তু কবি ইহাও জানিতেন যে, মানব হৃদয়ের কোমলাংশের সহিত, কঠোর সবলাংশ সম্মিলিত না হইলে,—প্রেমভক্তির মাধবীলতা শৌর্য্যের সহকার তরুকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া না উঠিলে তাহা যে অচিরেই ধূলিবিলুণ্ঠিতা হইবে ইহা অনিবার্য্য। আমার ত মনে হয়—বর্ত্তমান কোমল-প্রাণ, বীর্য্যবিহীন বাঙ্গালীর আদর্শ ভ্রষ্ট বঙ্গীয় সমাজের অবনত আদর্শকেই মধুসূদন তাঁহার কাব্যের রাম-চরিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। আর, যে পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে তিনি স্বদেশের ভবিষ্যৎ সমাজে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহাকেই তাঁহার কাব্যের নায়ক মেঘনাদ-চরিত্রে আঁকিয়াছেন। কারণ, এই চরিত্র কল্পনায় বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠাংশ সকলের সমাবেশ দেখিতে পাই।

কবি দেশের বর্ত্তমান, আংশিকভাবে অবনত আদর্শকে যদি 'রাম' নাম না দিয়া নামান্তর দিতেন, মেঘনাদ-প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মণকে যদি কোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক নামে অভিহিত করিতেন,—এ কাব্যের নায়ক যদি রক্ষকুলোদ্ভব না হইয়া কোন ক্ষত্রিয় কুলপুঙ্গব বীর হইতেন, তবে সম্ভবতঃ আমরা 'মেঘনাদ বধকে' সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম। এই নামের অক্ষকতাই মনে হয়, আমাদের এ কাব্যের রসগ্রহণে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিতেছে। কারণ 'রাম লক্ষ্মণ' নামের চতুর্দ্দিকে আমাদের মনে যে ঋষি বাল্মীকির আদর্শ চরিত্র অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। আবার, আদি কবি রক্ষকুলকে মনুষ্যেতর নরখাদক জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাই, সেই জাতির কোন পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বিশেষে মানবীয় আদর্শ গুণাবলী আরোপ করিতে দেখিলে স্বভাবতই আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। ইহার মূলে অতীতের প্রতি অত্যাসক্তি ও পূর্ব্ব সংস্কারের প্রভাব—এক কথায়, আর্নল্ড কথিত Historical E timate. বস্তুতঃ যে জন্য মধুসূদন তাঁহার স্বদেশীয়গণ হইতে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিতে পারেন নাই, তাহার প্রকৃত কারণ—কবির

জাতিগত আদর্শের হীনতা বা বিজাতীয়তা নহে,—কিন্তু তাহার অব্যবহিত প্রয়োজন সিদ্ধি দ্বারা অস্থায়ী খ্যাতি অর্জনের প্রলোভনাভাব এবং কাব্যের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতি অটল দৃষ্টি।

যাহারা মহৎ আদর্শ দ্বারা প্রেরিত হন, তাঁহারা সুখের, অনায়াস সাধ্যের পথে চলিতে পারেন না। সাধনার পথ বরাবরই সঙ্কটে কণ্টকাকীর্ণ। মধুসূদন তাঁর কাব্যের আসল উদ্দেশ্যের অনুরোধেই—তিনি তাঁহার কাব্যের ভিতরে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য যে আশার বাণী সঞ্চিত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন তাহার প্রেরণায়ই—জানিয়া শুনিয়া বিঘ্নের পথে পা' দিয়াছেন, এবং সে জন্যই তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন নামগুলি পরিহার করিতে পারেন নাই। যে গার্হস্থ্যাশ্রমের আদর্শ মহর্ষি বাল্মীকি রাম-চরিত্রে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বাঙ্গালা সমাজ বহুকাল হয় অনেক নীচে নামাইয়া ফেলিয়াছে—তাই ভীম-কান্ত গুণাবলীর একত্র সমাবেশের মাহাত্ম্য বাঙ্গালী আর ধারণা করিতে পারিতেছিল না। ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ আমাদের প্রচলিত গ্রাম্য সাহিত্য। লোক-সাহিত্যেই সমাজ প্রচলিত আদর্শ সহজে প্রতিফলিত হয়। এ সাহিত্যে কি দেখি?—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক সঙ্গীত, হর গৌরীর গৃহস্থালী ও বাৎসল্য সম্পর্কীয় ছড়া এবং উমা মেনকার সুমধুর সম্বন্ধ জ্ঞাপক আগামনী ও বিজয়ার গান, আর কোন কোন স্থলে বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী। কিন্তু উক্ত সাহিত্যে রাম-লক্ষ্মণ ও রাম-সর্ব্বস্ব মহাবীর হনুমানের বীরত্ব কাহিনীর অস্তি সামান্ত জের ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এমন কি, সুশিক্ষিত শক্তিশালী কবি মুকুন্দরাম কালকেতু চরিত্রে যে বলবীরের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে, তিনি কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারায়, তাঁহার সাময়িক, অবনার-অকল বিলাসী বাঙ্গালীর পৌরুষহীনতার হীন আদর্শই বেশি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রণগমনোদ্যত সমর সাজসজ্জিত পতীকে বীর-পত্নী ফুল্লরা অনুরোধ করিতেছেন—

ফুল্লরার কথা রাখ কিছুকাল জীয়া থাক,
না যাইও রাজার নগরে।

আর অমনি—

ফুল্লরার কথা শুনি, হিতাহিত মনে গণি
লুকাইল বীর ধান্য ঘরে।

এই সকল কারণেই মধুসূদন সর্ব্বজন আদৃত রাম নামের আশ্রয়ে প্রচলিত সমাজের আদর্শকে প্রদর্শিত করিয়াছেন এবং তাহারই পার্শ্বে প্রাচীন উন্নত বীরত্বের আদর্শকে মেঘনাদ চরিত্রের ভিতর দিয়া পুনঃ স্থাপিত করিয়া আমাদের বহুকালসুপ্ত চেতনাকে কঠিন আঘাতে জাগরিত করিতে চাহিয়াছেন—আমরা যে বাল্মীকি বর্ণিত প্রকৃত রামচন্দ্রকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার স্থলে এক নকল রাম-মূর্ত্তিকে বসাইয়া পূজার অর্ঘ্য দান করিতেছি, এই সত্যটি উক্ত উপায়ে কবি আমাদের চিত্তক্ষেত্রে জলন্ত লৌহশলাকা দ্বারা খোদাই করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। আবার, আমাদের সুপ্রাচীন বীরত্বের আদর্শ যে স্বদেশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন দেশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া আমাদের আত্ম-বঞ্চনা দূর করিবার জন্য মধুসূদন রক্ষকুল-শ্রেষ্ঠ মেঘনাদকে আপনার কাব্যের নায়ক স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই এ কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য যখন বাঙ্গালী বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তখন ইহাও বুঝিবে যে মধুসূদন প্রাচ্য আদর্শকে বিসর্জ্জন করেন নাই—তাহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, এ কাব্যের নায়ক মেঘনাদ রামায়ণোক্ত মেঘনাদ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি নরখাদক, পশুবলের অবতার জন্তু বিশেষ নহেন। তাঁহার হৃদয় স্নেহ প্রীতিতে ভরপুর, ইহার আভাস আমরা তাঁহার যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে পত্নীর সঙ্গে মিলন দৃশ্যে দেখিতে পাই। তিনি পিতৃপরায়ণ, মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, ইহার পরিচয় গ্রন্থের সর্ব্বত্রই পাইয়া থাকি। তিনি যে স্বদেশ প্রেমিক প্রকৃত বীরাগ্রগণ্য পুরুষ তাহা মৃত্যুর প্রাক্কালে পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি উক্তিতে এবং পূর্ণ যৌবনের যাবতীয় অপূর্ণ সাধ পায়ে ঠেলিয়া, প্রাণাধিকা গুণবতী রূপসী ভার্য্যা প্রমীলাকে পশ্চাতে ফেলিয়া মাতৃভূমি এবং পিতৃ-সম্মান রক্ষার্থ যুদ্ধ যাত্রার ঐকান্তিক ব্যগ্রতায় সুপরিস্ফুট। আবার, তিনি

ঐশী শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসবান্, তাহা নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের চিত্র অভ্রান্ত রূপে প্রমাণিত করিতেছে।

রামচন্দ্রকে এই কাব্যের নায়ক রূপে গ্রহণ না করিবার আর একটি কারণও দেখিতে পাওয়া যায়। যে মানবীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা এ কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য তাহা রামচন্দ্রকে নায়ক রূপে চিত্রিত করিলে ব্যর্থ হইত। কারণ, রাম ঈশ্বরের অবতার রূপে যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতীয় হিন্দুগণ দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কাব্যের এ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী, সর্ব্ব শক্ত্যাধার দশানন তনয় দেবরাজ-বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ। আর, এই হেতুই মেঘনাদে পৌরুষবীর্য্যকে উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত করিবার জন্য মধুসূদন রাম লক্ষ্মণের বীরত্ব গৌরব হরণ করিয়া রামচন্দ্রকে শুধু ভ্রাতৃবৎসল, পিতৃ-আজ্ঞাবহ, স্বামী-কর্ত্তব্যপরায়ণ, কোমল হৃদয় বাঙ্গালীরূপে আঁকিয়াছেন।

মেঘনাদ চরিত্রের কোমল-কঠোরের বিচিত্র সংমিশ্রণ প্রমীলা চরিত্রে, এবং রামচন্দ্রের কোমলতা ও কারুণ্য সীতা চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া কবি তাঁহার কাব্যগত সামঞ্জস্যটি অতি নিপুণতার সহিত রক্ষা করিয়াছেন। প্রমীলাও পতিপ্রাণা, সীতাদেবীও পতিপরায়ণতার আদর্শ স্থানীয়া। প্রেমময়ী সীতার হৃদয়ে শুধুই কারুণ্য, শত্রু-মিত্র, পশুপক্ষী, তরুলতার প্রতি অপার অনুকম্পা। সীতাদেবীর অন্তর্দ্দেশের আগা গোড়া কেবল মাধুর্য্য, কেবল নির্ব্বাদ প্রীতির ধারা। তাঁহাতে নারী সুলভ ধৈর্য্য আছে, কিন্তু বীরাঙ্গনার কর্ম্মকুশল কাঠিন্য নাই। তাঁহার দুর্গম অরণ্যের নির্ব্বাসন-বাসও পতি ও দেবরের স্নেহ-ভক্তির স্পর্শে মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রমীলার যে বাহু বল্লরী সম্পদ্‌কালে সোহাগ ভরে স্বামীর কণ্ঠে কুসুমের অমিয় স্পর্শ প্রদান করিত, তাহাই আবার স্বামীর শঙ্কটাশঙ্কায় বজ্রের কাঠিন্যে পরিণত হইত। বস্তুতঃ, একদিকে সেই অশোকবনস্থা দীনা-ক্ষীণা সীতা-মূর্ত্তি, সেই দুরন্ত চেড়ীদল বেষ্টিতা, দুঃখভারাবনতা, অবমানিতা, ধৈর্য্য-প্রতিমা সীতামূর্ত্তি, এবং অপর দিকে স্বামী গৌরব গর্ব্বিতা, প্রখর তেজস্বিনী, রণসজ্জিতা, বিদ্যুন্মালা সহগামী সখীবৃন্দ পরিবৃতা প্রমীলার বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি, তার সেই রণাঙ্গনের ভীষণতা ভেদ করিয়া লঙ্কা প্রবেশের বিস্ময়কর দৃশ্যের চিত্র—নারীর এই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ পাঠককে সৌন্দর্য্যে ত্রৈদিব লোকে উপনীত করে, তার তুলনা কোথায়? আমার ত মনে হয়—প্রমীলার সেই নারীদুর্লভ ওজোময়ী বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি যদি সীতা চরিত্রে আরোপিত হইত, এবং অবরুদ্ধা সীতার সেই রমণী-সুলভ ধৈর্য্য-লাবণ্য-আত্ম-বিলীনতা ও নমনীয়তা যদি প্রমীলা-চরিত্রে সন্নিবেশিত হইত, তবে সমস্ত কাব্যের ভিতরকার সঙ্গতি বিনষ্ট হইত, তার সঙ্গীতের একতানে ব্যাঘাত জন্মিত। এ স্থলেও মধুসূদন সুদক্ষ চিত্রকরের নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কিন্তু মানবীয় শক্তির অন্তহীন সম্ভাবনীয়তা প্রদর্শন ব্যতীত, এবং তাহারি অত্যাবশ্যক অঙ্গস্বরূপ, 'মেঘনাদ-বধ কাব্যের' আরেকটি গভীরতর কথা আছে। বীর-কুলর্ষভ মেঘনাদের, ব্যাধহস্তে কুরঙ্গের ন্যায়, শোচনীয় মৃত্যু ঐ কথাটির প্রতিই লক্ষ্য করিতেছে। উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া যে মহৎ মৃত্যু, মেঘনাদের ন্যায় বীর পুঙ্গবগণ সেরূপ মৃত্যুকেই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। তাই স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়, মেঘনাদের সেই বীর বাঞ্ছিত মৃত্যু ঘটিল না কেন? এ কাব্যের অন্যত্র কবি লক্ষ্মণকে প্রকৃত বীর মহিমায় মণ্ডিত করিয়া নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য ভীরু তস্করের ন্যায় চিত্রিত করিলেন কেন? বীরকে হঠাৎ অনাবশ্যক কাপুরুষে পরিণত করিবার মত ভ্রম মধুসূদনের মত কবির পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তবে এই অঘটন সংঘটিত হইবার কারণ কি? যে কারণে গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয়কে শিখণ্ডীর অন্তরালে থাকিয়া নিরস্ত্র ভীষ্মদেবকে শরশয্যাশায়ী করিতে হইয়াছিল, যে কারণে নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে কূটনীতির আশ্রয় নিয়া ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের মৃত্যুর উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল, যে কারণে সত্যবাক্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাভাস দ্বারা পুত্রশোক-কাতর নিরস্ত্র দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু ঘটাইতে হইয়াছিল, যে কারণে বীর-শ্রেষ্ঠ হনুমানকে মিথ্যা বঞ্চনাদ্বারা রাবণের মরণাস্ত্র হস্তগত করিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই বীর লক্ষ্মণকেও

বাহ্য কলাই-কৌশল অবলম্বন করিয়া, মায়াদেবী ও গৃহশত্রু বিভীষণের সহায়তায় মেঘনাদের নিধন ব্যাপার সংঘটন করিতে হইয়াছিল। মেঘনাদ বধের এই ক্ষুদ্র ঘটনা দ্বারা কবি যেমন দেখাইয়াছেন, ভীষ্ম দ্রোণের ন্যায় মেঘনাদ ও দৈব সহায় বিবর্জিত অপর মানবের অজেয় ছিলেন, ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে মানুষ জ্ঞানে, চরিত্রে, শৌর্য্যবীর্য্যে যতই মহৎ হউক, সে যদি কর্ত্তব্য জ্ঞানেও ঐশীশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তাঁর ধ্বংস অনিবার্য্য। অর্থগুণাম্বুজ ভীষ্ম দ্রোণ যেমন অন্নদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ অধর্মের পক্ষগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তেমনি মহাচরিত্র মেঘনাদকেও পুত্রের কর্ত্তব্য ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে পরদারাপহারীর পাপ-পক্ষের সহায়তা করিতে হইয়াছিল। ভীষ্ম দ্রোণ এবং মেঘনাদের মহত্ত্বের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু ছিদ্র ছিল। তাঁহারা অবস্থার বিপাকে সামাজিক বা লৌকিক কর্ত্তব্যের সঙ্গে উচ্চতর কর্ত্তব্যের সংঘর্ষের মধ্যে পড়িয়া ধর্ম্মের সঙ্গে বিরোধ করিয়াছিলেন। তাই আহত ধর্ম্মের নির্ম্মম উদ্যত বজ্র ঐ রন্ধ্রপথে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের মস্তকে নিপাতিত হইল, আপনার পথের যত অন্তরায় এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া ধর্ম্ম আপনাকে চিরবিজয়ী করিল।

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের অন্তিম পরিণাম দেখাইবার অবসর নাই। তবু কাব্যের শেষ সর্গে রাবণের নিদারুণ অবস্থাবিপর্য্যয়ের আভাসব্যঞ্জক চিত্রটি—সেই বেদমানবত্রাস, ভূধরের ন্যায় উর্দ্ধশির সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী দশাননের, বক্ষচ্যুত মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, ধূলি-বিলুণ্ঠিত অবস্থা, অবমানি-পীড়িত, শোকাহত দশাননের, অপমানিত ঐশ্বর্য্যের মুহ্যমানাবস্থা আমাদের কর্ণরন্ধ্রে উর্দ্ধকণ্ঠে ঐ একই কথা ধ্বনিত করিতেছে।

কর্ম্মফল অনতিক্রম্য, ধর্ম্মের বিধান অব্যর্থ অজেয়, ধর্ম্মবলের বিরুদ্ধে বাহুবল বা ক্ষাত্রবল, প্রভঞ্জন মুখে শোণিতবাহী তৃণখণ্ডের মত, নদীবেগের লক্ষ ও দণ্ডায়মান বালুকাস্তূপের মত অসমর্থ। ইহাই এই কাব্যের মর্ম্মবাণী, ইহার অন্তরতম কথা।

আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে মেঘনাদবধ কাব্যের যে সামান্য আলোচনা করিলাম, তাহাতে ভরসা করি অন্ততঃ এ কথাটা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, "মেঘনাদবধ কাব্যে" Aristotle কথিত Higher truth ও Higher Serious-ness এর অসদ্ভাব নাই ;—ইহাও বোধকরি স্বীকৃত হইবে যে, উক্ত কাব্য পাঠের ফলে প্রথমতঃ আমাদের বিবিধ মনোবৃত্তি ও হৃদ্‌বৃত্তিগুলি উদ্বুদ্ধ ও সঞ্চালিত হইয়া, এবং অবশেষে কেন্দ্রীভূত ও সংহত হইয়া এক অখণ্ড, অভাবনীয়, বিষাদনিবিড়, অপার্থিব আনন্দের সৃজন করে, যাহা সত্য ও মঙ্গল হইতে অভিন্ন। ইহাই সমস্ত 'আর্টের' চরম লক্ষ্য, আর, ইহাকেই মনীষী মর্লী "Final and superlative impression" বলিয়াছেন।

আমি বিশ্বাস করি আমরা যতই প্রকৃষ্ট কাব্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মধুসূদনের কাব্য-গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিব, কালের প্রবাহে মধুসূদনের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি, ও বিদ্বেষসম্ভূত সংস্কার ও অবিবেক আমাদের মন হইতে যতই মুছিয়া যাইবে, ততই আমরা কবি-মধুসূদনের প্রকৃত চেহারা দেখিতে পাইব—ততই বঙ্গীয় পাঠকের মনঃ কোকনদে মধুর সুমধুর কাব্য-কুসুম রাশির মধুরভাণ্ডার অধিকতর সঞ্চিত হইয়া তাঁহার পুণ্যময়ী স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প।

আজ কয়েকটী আগ্নেয়গিরির প্রবল উচ্ছ্বাসের কথা বিবৃত করিব। খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দে বিসুভিয়সের যে প্রবল উচ্ছ্বাসে পম্পাই এবং হারকুলেনীয়ম নগরদ্বয় প্রোথিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বিসুভিয়স যেন কতিপয় শতাব্দী নিদ্রিত ছিল। এই ভীষণ অগ্ন্যুদগমের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে মল্ল যোদ্ধা স্পার্টাকাস ৭০ জন সহচর সহ বিসুভিয়সের গহ্বরে (Crater) লুক্কায়িত ছিল। এবং ক্লডিয়াস তথায় তাহাকে অবরোধ করিলে সে সদল বলে পার্ব্বত্য দ্রাক্ষালতা অবলম্বনে তথা হইতে পলাইয়া যায়। সে সময়ে কেহই ইহাকে আগ্নেয়গিরির মুখ বলিয়া মনে করিত না। কেবল মাত্র ঐতিহাসিক ষ্ট্রেবো এবং

ডায়ডোরাস্ সিকুলাস্ প্রভৃতি কতিপয় লোক উহার প্রাচীন দগ্ধচিহ্ন অবলোকন করিয়া উহাকে আগ্নেয়গিরি সন্দেহ করিয়াছিলেন। ইহার মুখের নিকট বহু শস্য শ্যামল পল্লি সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং পর্ব্বতের পাদদেশে সৌধ পরিবেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী হারকুলেনিয়ম ও পম্পাই নগর দ্বয় স্থাপিত হইয়াছিল।

এই সকল স্থানের অধিবাসীবৃন্দ স্বপ্নেও কখন মনে করে নাই যে তাহারা এক অগ্নেয় গিরির উপরে বাস করিতেছিল। কিন্তু তথাপি তাহারা ভীষণ অগ্ন্যুদ্গমের পূর্ব্বে অনেকবার ইহার সারা পাইয়াছে। কারণ ষোল বৎসর যাবৎ এখানে মাঝে মাঝে প্রবল ভূমিকম্প হইত। অতঃপর ৭৯ সনের ২৪শে আগষ্ট জগৎবিখ্যাত ভীষণ অগ্ন্যুদ্গম সংঘটিত হয়। এই অগ্ন্যুদ্গম সম্বন্ধে প্লিনি টেসিটাসের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল।

"গৃহ হইতে বাহির হইয়াও আমরা এক ভীষণ দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। আমরা যে গাড়ীতে যাইতে ছিলাম, তাহা সমতল রাস্তাতেও এরূপ আন্দোলিত হইতে লাগিল যে প্রস্তরের দ্বারা ঠেক দিয়াও আমরা উহা স্থির রাখিতে পারিলাম না। সমুদ্র ভীষণ ভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং সামুদ্রিক জীব তীর দেশে আসিয়া ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। অপর দিকে ভীষণ ধূম ও অগ্নি উদ্গত হইতে লাগিল। ভস্মরাশি আসিয়া আমাদের মস্তকোপরি পতিত হইতে লাগিল। তখনও কিঞ্চিৎ আলো আছে দেখিয়া আমি প্রস্তাব করিলাম যে আমাদের বড় রাস্তার দিকে ফিরিয়া যাওয়া উচিৎ, নচেৎ অন্ধকারে লোকের চাপে প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আমরা কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলাম। সে অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রজনীর অন্ধকার নহে, একটী অন্ধ কুঠরীর দরজা বন্ধ করিলে যেরূপ হয়, এ সেইরূপ অন্ধকার। তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভীষণ আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতি গোচর হইতেছিল না। সে সময়ে কেহ কেহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল এবং কেহ বা মনে করিতেছিল যে শেষ প্রলয়ের দিন উপস্থিত, ইহার পরে একটু আলো দেখা দিল, কিন্তু ইহা দিবালোক নহে, ইহা অগ্নি শিখা মাত্র। সমস্ত জগতের সহিত আমিও বিলীন হইতেছি মনে করিয়া আমার হৃদয়ে কোনরূপ ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। অতঃপর সূর্য্যোদয় হইলে দেখিতে পাইলাম সমস্ত বস্তুই ভস্মাচ্ছাদিত।"

যদিও পম্পিয়াই ও হারকুলিয়াম সে সময়েই ধ্বংস হইয়াছিল, প্লিনি তাহার কোন বর্ণনা দেন নাই। পম্পিয়াই ৬০ ফুট ভস্মের তলে পড়িয়াছিল কিন্তু হারকুলিনিয়াম কর্দ্দমের দ্বারা প্রোথিত হইয়াছিল। ইহারা এরূপ ভাবে আচ্ছাদিত ছিল যে মধ্যযুগে কেহই ইহাদের খবর জানিত না।

ইহার পরেও বিসুভিয়াসের মাঝে মাঝে অগ্ন্যুদ্গম হইত। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে আগ্নেয়গিরি একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। তখন ইহা পশুর বিচরণ স্থান হইয়া পড়ে। ১৬৩১ অব্দে ৬ মাস ভূমিকম্পের পরে ইহার পুনরায় অগ্ন্যুদ্গম আরম্ভ হয়; তখন এক প্রবল বিস্ফোরণে ইহার শিখর দেশ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ধূলিরাশিতে পরিণত হইয়া বহুশত মাইল দূরে ছড়াইয়া পড়ে। আগ্নেয়গিরি হইতে ৭টা গলিত ধারা প্রবাহিত হইয়া গ্রাম সমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলে, তন্মধ্যে রেইসনা গ্রাম যাহা ভূগর্ভস্থ হারকুলিয়ামের উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাও ধ্বংস হয়।

ইহার পরে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে অগ্ন্যুদ্গম হইয়া পর্ব্বতের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। ১৭৯০ সনে একটী স্থান ২৩০৫ ফিট ফাটিয়া তাহা হইতে গলিত ধাতু ইত্যাদি প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। অতঃপর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে প্রায় ৫০ বার অগ্ন্যুদ্গম হয়।

অধুনা এই আগ্নেয় গিরিতে ১৮৭২ এবং ১৯০৬ সনে দুইটী প্রবল অগ্ন্যুদ্গম হয়।

বিসুভিয়স ভিন্ন ভূমধ্য-সাগরে এটনা, ষ্ট্রম্বলি সেণ্টরিনু, প্রভৃতি আরও কতিপয় আগ্নেয় গিরি বর্ত্তমান আছে।

জাপানে কোবেণ্ডেইসান আগ্নেয় গিরি বিসুভিয়সের মত তত প্রবল নয়। সহস্রাধিক বৎসর ইহা নির্ব্বাপিত থাকাতে কৃষকগণ স্বচ্ছন্দ চিত্তে ইহার উপর চাষ বাস করিতেছিল। ১৮৮৮ সনে ইহাতে এক গুরু গম্ভীর

শুদ্ধ হইয়া পরে ২ ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যোদ্গম আরম্ভ হইল। ইহা হইতে উত্তপ্ত কর্দ্দমাদি বাহির হইয়া ২৭বর্গ মাইল ব্যাপ্তি স্থানের গ্রাম সমূহ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। ইশুরু মাকি নামক একজন জাপানি পুরোহিত যিনি কোন রূপে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এই ভীষণ অগ্ন্যোদ্গম সম্বন্ধে তিনি যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। "১৫ই জুলাই সুন্দর প্রভাতে আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। বেলা প্রায় ৮ঘটিকার সময়ে প্রবল ভূমিকম্পে আমরা গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ব্যাপার কি উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই প্রায় ১০মিনিটের মধ্যে পোয়ামাইল দূরবর্ত্তী কোবাণ্ডির দিক হইতে ভীষণ বিদারণ শব্দ শুনা গেল। ইহার পরেই কৃষ্ণবর্ণ ধূম রাশিতে আকাশ আচ্ছাদিত হইল। সে সময়ে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড আসিয়া পড়িতে লাগিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গিরিশৃঙ্গ ও অরণ্য বিধ্বস্ত হইবার ভীষণ শব্দে সকলকে চমকিত করিল। আমি সেই দৃশ্য জীবনে ভুলিব না। আমরা নানাদিকে দৌড়াইয়া পালাইলাম। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই মাটিতে শুইয়া পড়িতে হইল। ঘোর অন্ধকার—তখনও ভূমিকম্প চলিতেছে। কর্দ্দম ও ভস্মে আমাদের নাক মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তখন নড়িবার কি শব্দ করিবার শক্তি রহিল না। আমার মৃত্যু হইয়াছে, কি স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলাম না। সে সময়ে আমার মাথায় একটী পাথর পড়াতে আমার জ্ঞান হইল। মৃত্যু নিকট ভাবিয়া বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিলাম। ইহার পরেই পতিত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আমি কোমরে পৃষ্ঠে এবং উরুদেশে আহত হইলাম। প্রায় ১ঘণ্টা পরে প্রস্তর বৃষ্টি ক্ষান্ত হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইল। ইহাই পালাইবার উত্তম সুযোগ মনে করিয়া আমি দৌড়াইলাম এবং সকলকে আমার অনুসরণ করিতে বলিলাম। কিন্তু চাহিয়া কাহাকে ও দেখিতে পাইলাম না। অর্দ্ধ-মাইল যাইতে না যাইতে পুনরায় ভস্ম ও প্রস্তর বৃষ্টি আরম্ভ হইল।"

এই উদ্গমের পূর্ব্বে প্রবল ঝড় প্রবাহিত হইয়া গৃহাদি সমস্ত ভূতলশায়ী করিয়াছিল। কোবাণ্ডির অগ্ন্যোদ্গমে প্রায় ৪০০জন লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল।

এখন আমরা জগদ্বিখ্যাত ক্রেকেটোয়ার অগ্ন্যুদ্গমের কথা উল্লেখ করিব। ক্রেকেটোয়া জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে সাণ্ডা প্রণালীতে অবস্থিত। এই সাণ্ডা প্রণালী চীন ও ভারত সাগরকে যোগ করিয়াছে। প্রণালীর ভিতর দিয়া প্রতিবৎসর বহু জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে। প্রায় দুই শত বৎসর আগের গিরি নিস্তেজ থাকাতে পর্ব্বতটী শ্যামল বৃক্ষ গুল্মে আচ্ছাদিত হইয়াছিল, অতঃপর ১৮৮০ সনে তথায় ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। ঐ কম্পন নিতান্ত কম নহে, কারণ উহা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর প্রদেশেও অনুভূত হইত। ১৮৮৩ সনের ২০শে মে হইতে অগ্ন্যোদ্গমের সূচনা হয়। তখন পর্ব্বতে যে কামান গর্জ্জনের মত শব্দ হইতেছিল তাহা ১০০ মাইল দূর হইতে শুনা যাইত। ২৬শে মে একদল ভ্রমণকারী ক্রেকেটোয়ার অবস্থা দেখিতে যান এবং দ্বীপটীকে তুষার ধবল ভস্ম রাশিতে আচ্ছাদিত দেখিতে পান, তখন আগ্নেয়গিরির মুখ গহ্বর হইতে যে ধূম পটল উঠিতেছিল তাহা উর্দ্ধে ১০০০০ ফিট উঠিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র ২ প্রস্তর খণ্ড বর্ষিত হইতেছিল, জুন, জুলাই এইরূপ ভাবে চলিয়া ২৬শে এবং ২৭শে আগষ্ট ইহার চূড়ান্ত অভিনয় হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাণ্ডা প্রণালী দিয়া বহু বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াত করিত, কাজেই সে সময়ে এই প্রণালীতে উপস্থিত কতিপয় জাহাজের কাপ্তান ও যাত্রিগণ ইহার বহু সংবাদ দিয়াছেন।

কাপ্তান উলড্রিজ লিখিয়াছেন যে ২৬শে এক ভীষণ দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। পর্ব্বত গাত্রের বিশাল মেঘ পটলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলাতে উহাকে এক বিরাট মহিরুহের মত মনে হইল। সূর্য্যাস্তের পরে মেঘ পটল রক্তবর্ণ এবং তাহার পার্শ্বদেশ নীলাভ, অধিকন্তু তন্মধ্যে বিজলী চমকিতে আরম্ভ করিল।

সে সময়ে গগনে বৈদ্যুতিক প্রবাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। "লণ্ডন" নামক এক খানি জাহাজের বৃহৎ মাস্তুলের বৈদ্যুতিক শলাকায় ৫।৬ বার বজ্রপাত হয়। তখন যে কর্দ্দম বৃষ্টি হয় তাহাও জোনাকীর মত জ্বলিতে থাকে।

২৭শে তারিখে "লণ্ডন," "চার্লস বল" প্রভৃতি জাহাজ

খানা জাহাজ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই অগ্ন্যোদ্‌গমের ভীষণ বিদারণ শব্দ ৩ হাজার মাইল দূর হইতে শুনা গিয়াছিল। এই শব্দে ১০০ মাইল দূরবর্ত্তী দালানের কাচের জানালা ভাঙ্গিয়া দেয়াল ফাটাইয়া এবং গ্যাস্ নির্ব্বাপিত করিয়া এক বিভৎস কাণ্ড করিয়াছিল। শব্দ তরঙ্গ কয়েকবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। পর্ব্বতের যে বিশাল অংশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে যে তরঙ্গ উদ্ভূত হইয়াছিল উহার বেগ ঘণ্টায় ৪০০ মাইল। এই ভীষণ তরঙ্গাঘাতে ৩৬৩৮০ জন লোক সহ বহু নগর ও পল্লি ধ্বংস হইয়াছিল এবং দুইটী আলোক গৃহ উৎপাটিত হইয়াছিল।

উক্ত কারণে এনজের সহরে যে জলপ্লাবন হইয়াছিল তাহাতে যে ২১১ জন লোক রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে পাদরী নিল্ একজন। তিনি সেই প্লাবনের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"আমি ভোর ৬ টার সময়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতেছিলাম। যদিও গত কল্যের অন্ধকার কতক বিদুরিত হইয়াছে কিন্তু তখনও পরিষ্কার আলো হয় নাই। আমি সমুদ্রের দিকে চাহিতেই এক পাহাড়ের মত কাল জিনিষ তীরের দিকে আসিতে দেখিলাম। তখনই আমার মনে হইল যে ঐ দিকে সাণ্ডা প্রণালীতে কোন পাহাড় পর্ব্বত নাই। আমি পুনরায় ঐ দিকে চাহিবা মাত্র বুঝিতে পারিলাম যে উহা এক বিশাল সমুদ্র তরঙ্গ আসিতেছে এবং তীর দেশে আসিয়া ফাটিয়া পড়িবে। তখন প্রাণ ভয়ে দৌড়াইতে লাগিলাম। যদিও তখন আমার দৌড়াইবার বয়স নয়, তথাপি আমি প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম। কিছু সময়ের মধ্যে ঐ তরঙ্গ তীরে আসিয়া পড়ার ভীষণ শব্দ আমার কাণে পৌঁছিল; চাহিয়া দেখি রাশি রাশি গৃহ চূর্ণ করিয়া ঐ তরঙ্গ প্রবল বেগে আমার দিকে আসিতেছে। আমি পুনরায় দৌড়াইতে লাগিলাম। প্রাণের দায়ে দৌড়াইয়া নিকটস্থ এক উচ্চ ভূমিতে উঠিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে তরঙ্গটী তথায় আসিয়া পৌঁছিল। তখন ও ঢেউ টী এত উচ্চ যে তাহা দেখিয়া আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম। জল স্রোত আমাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তখন আমি একরূপ জ্ঞান হীন। হঠাৎ একটা কঠিন পদার্থের সহিত ধাকা লাগাতে আমার জ্ঞান হইল। আমি হাতের নিকটে যে শক্ত পদার্থ প্রাপ্ত হইলাম, তাহা দৃঢ় রূপে ধারণ করিলাম। পরে দেখিতে পাইলাম, যে উহা একটী নারিকেল বৃক্ষ। প্রবল তরঙ্গাঘাত হইতে বহু নারিকেল বৃক্ষের মধ্যে আমার জীবন রক্ষা করিবার জন্যই যেন এইটী রক্ষা পাইয়াছিল। ইতি মধ্যে তরঙ্গটী আমাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। ক্রমে পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া তরঙ্গটীর বেগ কমিল এবং বারি রাশি সমুদ্রের দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আমি সেই ভীষণ দৃশ্য এ জীবনে ভুলিব না। আমি যখন সিক্ত ক্লান্ত অবস্থায় বৃক্ষটী আকড়াইয়া ধরিয়া আছি, তখন দেখি আমার আত্মীয় বন্ধুদের বহু মৃত দেহ জলের সহিত ভাসিয়া সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। গৃহ অট্টালিকা সমস্ত বিধ্বস্ত হইয়া সহরটী এক মৃতস্তূপে পরিণত হইয়াছিল।"

এই অগ্ন্যোদ্‌গমে যে ধূলিকণা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং তাহা এতঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল যে উহাদ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সূর্য্যের উদয় ও অস্তের দৃশ্য এক অভিনব সৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

ক্রেকেটোয়ার অগ্ন্যোদ্‌গম যদিও পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে তথাপি ১৯০২ সনে মণ্ট পিলির অগ্ন্যোদ্‌গমে যে রূপ লোক ক্ষয় হইয়াছিল, ইহাতে তত হয় নাই। প্রশান্ত মহাসাগরের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের মার্টিনিক দ্বীপে মণ্টপলি অবস্থিত। এই দ্বীপটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে একটী স্বর্গ দ্বীপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯০২ সালের পূর্ব্ব হইতে এই দ্বীপে বিপদের সূচনা হয়। ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে পর্ব্বত হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে এবং ২৫শে এপ্রিল কিঞ্চিৎ ভস্ম উদ্গাত হয়। কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য একদল লোক গিয়া দেখে যে, তথায় এক পুরাতন শুষ্ক হ্রদ জল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ৩০শে সামান্য ভূমিকম্প ও বিদারণ হয়। কিন্তু এই সকল বিপদের সঙ্কেতেও লোকের মনে কোন রূপ আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই। এমনকি তথাকার প্রধান সংবাদ পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় যে ৪ ঠা মে তারিখে একদল

ভ্রমণকারী পর্ব্বত দেখিতে যাইবেন। কিন্তু ২রা মে তারিখে প্রবল বিদারণ ও ভীষণ অগ্ন্যুদ্গম হইল এবং তাহাতে লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় স্কুল প্রভৃতি বন্ধ হইল। রাস্তা ঘাট ভস্মে আচ্ছাদিত এবং এক বিষাক্ত গ্যাসের দরুণ বহু পাখী মৃত্যু মুখে পতিত হইল ৮ই মে তারিখে পূর্ব্বোল্লিখিত হ্রদের এক পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। হ্রদ হইতে প্রবল বেগে জল বাহির হইয়া ঘর বাড়ী বৃক্ষ সমস্ত ভাসাইয়া চূড়িয়া সমুদ্রে আনিয়া ফেলিল। এই জলের ধাক্কায় সমুদ্রস্থ দুই খানা জাহাজ জলমগ্ন হইয়া যায়। এই ভীষণ ব্যাপারে লোক প্রাণের ভয়ে দৌড়াইতে লাগিল। ৮ই বেলা ৭ টা ৫০ মিনিটের সময়ে কজ্জ্বল ধূমের সহিত ভীষণ বিদারণ আরম্ভ হইল। অগ্ন্যুদ্গমে সেণ্ট পিয়ারী নগর দগ্ধ হওয়াতে ৩০ হাজার লোক পুড়িয়া মারা যায়। কিছু সময়ের মধ্যে স্বর্গোপম দ্বীপ এক ভস্ম স্তূপে পরিণত হইল। এই ভীষণ ব্যাপারে নগরের মাত্র একটী নিগ্রো কয়েদী অব্যাহতি পাইয়াছিল পুনরায় ২০শে মে দ্বিতীয় বার বিদারণ ও অগ্ন্যুদ্গম হয়। এই ভীষণ অগ্ন্যুদ্গমে কেবল যে স্থল ভাগেই বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; নিকটস্থ সমুদ্রে যে কয় খানা জাহাজ ছিল তাহাও ধ্বংস হইয়াছিল।

কেবল রডেস্ ও রেবেইমা নামক দুই খানা জাহাজ মৃতাবশিষ্ট মাত্র ২৫ জন নাবিক সহ অর্দ্ধ দগ্ধাবস্থাতে ভাসমান ছিল,

হেওয়াই দ্বীপের মউনা লোয়া (Mauna Loa) আগ্নেয়গিরিকে "আগ্নেয় গিরির রাজা" বলা হইয়া থাকে। ইহার দুইটী মুখ। প্রত্যেকটীর পরিধি ৭ মাইলের উপর। ইহা অসাধারণ গলিত স্রাবের জন্য বিখ্যাত। ১৮৪০ সনে যে স্রাব হইয়াছিল, তাহার প্রবাহের পরিসর ৩ মাইল, গভীরতা ১২ হইতে ২০০ ফিট এবং ইহা চারি দিকে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল। এই স্রাবধারা প্রায় তিন সপ্তাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। এবং ফলে অসংখ্য মৎস্য মরিয়া সমুদ্রে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। এই উত্তপ্ত স্রাবের দ্বারা সমুদ্র তীরস্থ ২০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া জল উষ্ণ হইয়াছিল। ধারাটী এরূপ উজ্জ্বল ছিল যে ইহার দ্বারা অতি ক্ষুদ্র অক্ষরও রাত্রিতে পাঠ করা যাইত। ১০০ মাইল দূরবর্ত্তী জাহাজ হইতে এই অদ্ভুত আলো দৃষ্ট হইয়াছিল।

১৮৫৫ সনে ইহার এক প্রবল স্রাব হয়। ইহা ৩ মাইল প্রস্থে প্রবাহিত হইয়া পর্ব্বতের নিম্নে আসিয়া প্রায় ৮ মাইল ব্যাসের একটী গলিত ধাতুর হ্রদ সৃজন করে এবং পরে বহু ক্ষুদ্র ২ শাখায় প্রবাহিত হয়। এই উত্তপ্ত ধারার দ্বারা বন উপবন দগ্ধ হইয়া যে পাইরলিগনাস্ এসিড্ (Pyroligneous acid) বাহির হইয়াছিল, তাহা দ্বারা নিকটস্থ নদীর জল কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়া পানের অনুপযুক্ত হইয়াছিল। প্রায় ১৮ মাস পর্য্যন্ত এই গলিত ধাতু স্রাব প্রবাহিত হইয়াছিল এবং এই ধাতু স্রাবে ৩০০ শত বর্গ মাইল স্থান ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

আগ্নেয় গিরি, ভূমিকম্প ইত্যাদির বহু বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। এখন দেখা যাউক ভূমিকম্প ইত্যাদির কারণ কি। পৃথিবীকে আমরা যে রূপ নিরেট ও শক্ত মনে করি বস্তুতঃ ইহা তাহা নহে। যদিও ইহার উপরি ভাগ শীতল হইয়া শক্ত হইয়াছে কিন্তু ইহার অভ্যন্তর ভীষণ উত্তপ্ত। পৃথিবীর উপরি ভাগের ও নানাবিধ পরিবর্ত্তন চলিতেছে। একদিন যে স্থানে মহাদেশ ছিল তথায় সমুদ্র এবং বিশাল বারিধির স্থলে মহাদেশ উদ্ভূত হইতেছে। ভূপৃষ্ঠের এইরূপ উত্থান পতন ভিন্ন ইহা কারণ বিশেষে হঠাৎ কম্পিত হইয়া উঠে। চন্দ্রের আকর্ষণে দিবসে দুই বার সমুদ্রের যেরূপ উত্থান ও ও পতন হয়, সেই রূপ ভূপৃষ্ঠেরও দুই বার উত্থান ও পতন হইয়া থাকে, বায়ু মণ্ডলের চাপের পরিবর্ত্তনও ভূপৃষ্ঠ অনুভব করিতে পারে। রেল ইঞ্জিন কামান গর্জ্জন ইত্যাদির দ্বারা ভূপৃষ্ঠ রীতি মত কম্পন অনুভূত হয়। যখন মেইনজে ১২৫ মন বারুদ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহার ধাক্কা ১০০ মাইলের অধিক দূরে পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে অতিকায় কামানের গর্জ্জনে ইহা বিশেষ রূপে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে সূক্ষ্ম যন্ত্রের দ্বারা অশ্বখুর তাড়নায় যে কম্প হয়, এমনকি কুকুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীর গতিতে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাও অনুভূত হইয়া থাকে

ভূগর্ভস্থ নৈসর্গিক কারণে যে কম্পন হয়, তাহাকেই

ভূমিকম্প বলা হইয়া থাকে। কখন এই কম্পনের দ্বারা সামান্য দুই সামগ্রী আন্দোলিত হয় এবং কখনও বা অট্টালিকা সমন্বিত নগর বিধ্বস্ত হইয়া থাকে।

ভূমিকম্পের কারণ নির্দ্দেশ করা বস্তুতঃই দুরূহ। সকল দেশেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইহার কারণ বর্ণিত হইয়াছে, আমাদের দেশের বাসুকীর শির-কম্পন ঐ রূপ কারণের একটী উদাহরণ। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে২ ইহার ২।৩ টী কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আগ্নেয়গিরি কিম্বা ভূগর্ভস্থ গহ্বরে প্রস্তর ধসিয়া পড়াতে সামান্য ভূমিকম্পের উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রবল ভূমিকম্প পৃথিবীর উপরিস্থ শক্ত আবরণ ফাটিয়া কিম্বা ভূগর্ভস্থ বিশাল স্তর ধসিয়া পড়াতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ভূগর্ভে বিশাল ফাটল পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান আছে, যখন কোন কারণে উহার পার ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখনই ভূকম্পের উদ্ভব হয়। এইরূপ ফাটলের পার ধসিয়া যে ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়, তাহার ব্যাপ্তি স্থান অনেকটা লম্বালম্বি। ১৮৯৪ সালে কনষ্টেন্টিনোপলে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহা ১০৯ মাইল দীর্ঘ ও ২৪ মাইল প্রস্থ স্থানে অনুভূত হইয়াছিল। অনেক সময়ে এইরূপ ভূমিকম্পের আন্দোলনের সহজে বিরাম হয় না। জাপানের গিফুতে (Gifu) যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে ২ বৎসরে ক্রমান্বয়ে ৩৩৬৫টী কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। অনেক সময়ে কম্পনের গতি দ্বারা ফাটলের স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। কখন কখন ফাটলের একদিক ফাটলের বহির্দ্দেশের নিম্নে প্রবল বেগে প্রবেশ করিয়া থাকে। ১৮৯৭ সনের আসামের প্রবল ভূমিকম্প এই কারণে উদ্ভূত হইয়াছিল।

সাধারণত গিরিশ্রেণীর সমস্তরাল কিম্বা লম্ব ভাবে এইরূপ ফাটল ধসিয়া পড়ে। পৃথিবীর বহিরাবরণ যে খানে অত্যন্ত উচু নীচু সে স্থলেই এইরূপ ধসিয়া পড়া স্বাভাবিক। যদি ও ধস খাইয়া পড়াতে প্রবল ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়, তথাপি সকল ধস খাওয়াতেই প্রবল ভূমিকম্প হয় না। এই কম্পন নির্দ্দেশ করিবার জন্য সূক্ষ্ম যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার নাম সিসমোগ্রাফস্ (Sciesmographs)। এই যন্ত্র দ্বারা দেখাগিয়াছে যে কম্পন তিন প্রকারের হইয়া থাকে। সাধারণ কম্পন মৃদু হইতে ক্রমে প্রবল হইয়া থাকে। আর এক শ্রেণীর কম্পন যুগ্ম ভাবে হইয়া থাকে, অর্থাৎ একটীর সঙ্গে সঙ্গেই আর একটী কম্পন হয়, তৃতীয় শ্রেণীর কম্পনকে মিশ্র কম্পন বলা যায়; উহার গতি নানারূপ। প্রথমোক্ত কম্পন ৪ হইতে ৮ সেকেণ্ড স্থায়ী, দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পনের স্থিতি ইহার দ্বিগুণ এবং মিশ্র-কম্পন কতিপয় মিনিট স্থায়ী হইতে পারে। কোন২ ভূমিকম্পে পদতলস্থ ভূমি যেন একবার উপরে উঠিতেছে এবং একবার নীচে নামিতেছে, এরূপ বোধ হয়; যদি ও প্রচুর ক্ষতি হইতে পারে, তথাপি এইরূপ কম্পনের মাত্রা অতি সামান্য। কোন কোন ভূমিকম্পে মনে হয় ভূমি পাশা পাশি টানিতেছে; ইহার সাধারণ মাত্রা ১ ইঞ্চির ও কম, কিন্তু কখন২ ইহার মাত্রা ১০।১২ ইঞ্চিও দেখা গিয়াছে। রায়বেম্বাতে (Risbamba) এক ভূমিকম্পে ১৭৪৭টী মৃত দেহ কবর হইতে উপরে উঠাইয়া ফেলিয়াছিল। কথিত আছে ১৭৯৭ সালে কুইটো (Quito) তে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে কোন কোন লোককে ১০০ ফুট উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিল। পোর্ট রয়েলের ভূমিকম্পে বাজারের সকল লোককে সমুদ্রতীরে আনিয়া ফেলিয়াছিল। এই কম্পনের বেগের গতি সেকেণ্ডে কয়েক শত ফিট হইতে কতিপয় সহস্র ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মৃত্তিকার প্রকৃতির উপরে এই কম্পনের ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে। নরম ভূমিতে কম্পনের ফল অতি ভয়ানক হইয়া থাকে কিন্তু প্রস্তর ময় ভূমিতে তত হয় না। এই ভূমিকম্পে ভূপৃষ্ঠ ফাটিয়া যায়, কখন কখন গৃহ অট্টালিকা প্রোথিত হইয়া পড়ে। কখন কখন এই ভূমিকম্পের পূর্ব্বে একরূপ গুরু গম্ভীর শব্দ হইয়া থাকে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

———

সমস্যা।

দশম পরিচ্ছেদ।

শৈলেন প্রাতে কলেজে গিয়াছিল, কলেজ হইতে ফিরিয়া ডাকের চিঠি পাইল। চিঠি খানা তাহার বৌ-দিদির হাতের লেখা। সার্ট খুলিয়া রাখিয়া হাত পাখার বাতাস দিতে দিতে চিঠি খানা পড়িয়া ফেলিল। বৌদিদি লিখিয়াছেন।

পীরপুর।

৭ চৈত্র, রবিবার।

প্রিয় ঠাকুর পো।

তোমার চিঠি খানা অনেক দিন পাইয়াছি। অসুস্থতা হেতু উত্তর দিতে পারি নাই। সেজন্য ক্ষমা অবশ্যই করিতে হইবে। না করিলেও উপায় নাই।

তুমি যে বাবার উপর সকল ভার ন্যস্ত করিয়া দিয়াছ, কিন্তু ভাই বড়ই বুদ্ধিমানের কাজ হইয়াছে। পুত্র আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে পিতার যেমন গৌরব, সেই পুত্র যদি পিতাকে অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে পিতার তেমনি অগৌরব। তুমি বলিবে এসব কথা কেন? আমি বলি, তুমি যে আমাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছ, তাহা যে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, সে জন্য। ইহা—ধন্যবাদ, উপদেশ নহে।

তুমি পণ লইবার পক্ষপাতি নও, বেশ কথা। পাঁচ হাজার টাকা ঋণ যদি মাথায় লইতে সাহস পাও, আমাদের কি আপত্তি?

সজ্জাল মহাশয় আজ নিজেই আসিয়া বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন। টাকা না লইতে হইলে বৈশাখে বিবাহ হওয়া মা'র মত। এখন তুমি বৈশাখে আসিতে পারিলেই হয়।

প্রতিমা—ঠিক প্রতিমা খানার মতই নিখুঁত সুন্দর। দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। গত রবিবার কোন প্রকারে আনাইয়াছিলাম। কি সুন্দর! ধন্য তোমার দৃষ্টি শক্তির। সাতাল বাবু যে একেবারে কিছুই দিবেন না, এও কিন্তু আমার মনে হয় না। যাক্, তুমি যখন চাও না, তখন তাহা আমাদের ভাগেই থাকিবে। ত্যাগ মহতের লক্ষণ। অযুত, সর্ব্ব ত্যাগ—পাগলের।

বৈশাখ মাসেই বিবাহ হওয়ার মত স্থির করিয়া উত্তর লিখিবা। আমরা উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিলাম। মা ও বাবা ভাল আছেন; ছেলে মেয়েরা একরকম কুশলেই আছে। তোমার কুশল চাই। ইতি—

তোমার স্নেহের বৌদি।

চিঠি খানা টেবিলের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া শৈলেন দুর্গাদাস বাবুর পুস্তকের প্রুফটা টানিয়া লইয়া বসিল। কাল রাত্রে প্রুফ দেখা শেষ হয় নাই।

যে তিন পৃষ্ঠা বাকী ছিল, তাহা দেখিয়া উঠিয়া সে বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে ছিল, এমন সময় পণ্টু আসিয়া "বাবু, ছাপাখানাকা কাগজ।" বলিয়া হাজির হইল।

পণ্টু দুর্গাদাস বাবুর দারোয়ান। পণ্টুর হাতে এক খানা টুকরা কাগজ ছিল; শৈলেন তাহাকে প্রুফের কাগজগুলি দিয়া ঐ টুকরা খানা লক্ষ্য করিয়া বলিল— "ও ক্যা হায় রে?"

"চিঠি হায়।" বলিয়া তাহা তাহার সম্মুখে ধরিল।

শৈলেন্ দেখিল, দুর্গাদাস বাবু নগেনকে বিকালে ৫½ টায় সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছেন।

সে কাগজ খানা দারোয়ানের হাতে ফেরত দিয়া বলিল "ওনকা পাত্তা পচান্তে হো?"

"সাসট বউবাজার, ও পুছকে চেলে যায়গা।"

"বহুত আচ্ছা।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

"এইযে, Good morning নগেন বাবু।"

"আসুন, আসুন, আসিতে আজ্ঞা হউক।" বলিয়া নগেন বিধু বাবুকে তাহার মেসের দ্বার হইতে লইয়া তাহাদের মেসে প্রবেশ করিল।

নগেন জিজ্ঞাসা করিল "তারপর এ দিকে কোথায়? আমাদের মেসে আপনার জানা কেহ আছে নাকি?"

"আমি যে আপনার খুজে ফির্ছি -মশায়, আপনার সাথে একটা Private talk ছিল, তা আবার সময় হয়তো আপনার খোজ পাইনে, আপনি থাকেন তো আমি নেই।" বলিয়া বিধু বাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

নগেন তাহার কোঠায় যাইয়া বিধু বাবুকে লইয়া বসিল। "আমার সঙ্গে Private talk! বলুন দেখি কি?"

"একটু Rest নিন না বল্‌ছি।"

"আপনার Policy কি রকম সংগ্রহ হইতেছে?"

বিধুবাবু তাহার কথায় মনোযোগ প্রদান না করিয়া বলিলেন "দেখুন নগেন বাবু, জীবনকে রূপে রসে গন্ধে নন্দিত করে আনন্দের অভিমুখে চালিয়ে নেওয়াই যদি তাহাকে সার্থকতা দান করবার একমাত্র উপায় হয় তো তার দিকে লক্ষ্য রেখে চলাই যে মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য, যে বিষয়ে বোধ হয় কারো সন্দে থাক্‌বার অবকাশ নেই!—"

নগেনও গম্ভীর হইয়া বলিল—'আপনার কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল তাহাতে করিয়া আমার উচ্চলচ্ছিকরত্যচ্ছনির্ঝরান্তঃকর্ণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, এ বিষয়ে বোধ হয় গুরুতর সন্দেহ আপনার থাকিতে পারে; কিন্তু আমি এ বিষয়ে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়।"

বিধু হাসিয়া বলিল—"কিছুই যে বুঝে উঠ্‌তে পাল্লুম্ না নগেন বাবু!"

নগেনও হাসিয়া বলিল—"আপনি সাহিত্যিক হইয়া বুঝিতে পারিলেন না, আশ্চর্য্য! এ যে অষ্টাদশ আর বিংশ শতাব্দীর—মৃত্যুঞ্জয়ী ও রবিয়ানা সংযোগ।"

বিধু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"যাক্ আপনি আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবেন্ না একটু ধৈর্য্য ধরে শুনুন—প্লিজ।"

নগেন—"এরূপ ধৈর্য্যের পথে কাঁটা নিয়া উপস্থিত হইলে কিরূপে ধৈর্য্যটাকে ধরিয়া রাখিব বলুন, সে বেচারির দোষ কি।"

বিধু বলিল—"আচ্ছা বিনি মুখবন্ধে সংক্ষেপেই বল্‌ছি, অনুগ্রহ করে শুনুন—আপনি আমাদের সায়েন্টিফিক্ এসোসিয়েসনের কথা অবিশ্যি জানেন,—এবার সায়েন্টিফিক্ এসোসিয়েসন পঁচিশ জন যুবককে শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জারমেনি, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠাচ্ছেন। পাঁচ জনের [illegible] বহন করবেন, কতক জনের পার্ট এক্সপেন্স বহন করবেন, আর কতক জনের অন্‌লি ট্রেভেলিং এক্সপেন্স দেবেন। আপনি যদি এ গরীবের জন্য একটু চেষ্টা করেন্, তাহলে এ মরার জীবনটাকে কোন মতে নন্দিত করে, করিয়ে কর্ম্মিয়ে নেবার মতন করে তুল্‌তে পারি।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"আমাকে উকীল ধরিতে চান, কোর্ট কোথায়? কার কাছে বক্তৃতা করিব? মোকদ্দমাটাইবা কি? সবই ভাঙ্গিয়া বলুন এবং সরল ভাষায় বলুন তবে।"

"দুর্গাদাস বাবুর নিকট বল্লেই হবে; তিনি এসোসিয়েসনের একজন সভ্য।"

"তা বেশ! কিন্তু উকীল যখন ধরিয়াছেন, তখন সব কথাই পরিস্কার করিয়া বলিতে হইবে, যেন বক্তৃতা করিতে যাইয়া ভুল না করি, বেকুব না হই। আপনি কি বিদেশে যাইতে চান?"

"ঠিক ধরেচেন মসায়! এবার এদিকে সরে আসুন, আমিই যেতে চাই।"

"কেবল যাইতে চাহিলেইতো হইবে না। আপনাকে এসোসিয়েসন কেন খরচ দিবে? আমি কাগজে দেখিয়াছি যে, কোন বিষয়ের Specialist দিগকেই শুধু এসোসিয়েসন খরচ দিবেন। আপনার এডুকেশনেল কুয়ালিফিকেসন কি ও কোন বিষয়ে আপনি বিশেষজ্ঞ তাহা আমাকে বলুন!"

"আমি কোন বিষয়ের স্পিসিয়ালিষ্ট নই, কুয়ালিফিকেসনও বিশেষ কিছু নেই—আই এ ৩ বার ফেল্ করেচি—আমি অবশ্যি এসোসিয়েসনের সম্পূর্ণ ব্যয়ই পেতে দাবী করিনে। আমি চাচ্চি কি জানেন! আমি দুর্গাদাস বাবুর কনট্রিবিউসনটা চাচ্চি; সেইটে আপনি করিয়ে দিন।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"আরও একটু মন খুলিয়া বলুন। দুর্গাদাস বাবুর কি কনট্রিবিউসন, আমাকেই বা কি করিতে হইবে?"

"দুর্গাদাস বাবুর দুটো টাইপেণ্ড আছে, তার একটা আপনি আমাকে লইয়ে দিন।"

"তিনি কেন দিবেন, আপনিইবা কি সর্ত্তে চান, তাওতো বলিতে হয়।"

বিধু বলিলেন—"ঠিক্ বলেচেন। ইউ আর কোরাইট রাইট—ঠিক্ বলেচেন। তিনি দুটী ছেলেকে খরচ দিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে এনে, বুঝলেন, তাদের হাতেই তার মেয়ে দুটীকে বে দেবেন, এই হচ্চে তাঁর ইচ্ছে।" বিধু চুপিচুপি শেষ কথা কয়টী বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

"বটে, আপনি তাহা হইলে দুর্গাদাস বাবুর জামাই হবার কেণ্ডিডেট।" বলিয়া নগেনও উচ্চ হাস্য করিল।

বিধু—"ঠিক ধরেচেন কিন্তু; আপনি সেই টে করে দিন। জীবন টাকে নন্দিত করে আনন্দের—তাঁর রাতুল চরণের পানে ধাবিত করবার উপায় করে দিন।"

নগেন—"থামুন না,। দুর্গাদাস বাবু দুইজন কে পড়াইবেন? আর এক জন কে?"

"যতীন্ ভোস—ঐ যে ছোক্‌রা, নেহাৎ অরসিক, বৈজ্ঞানিক, আমাদের সঙ্গে চা খায়—সোনার চসমা—মেয়েদের প্রাইভেট টিউটার—।"

যতীন তো এম্, এস সি, খুব ভুখার ছেলে, Presidencyতে রিছার্স স্কলার ছিল, ওকে তো দেওয়া উচিতই। আপনাকে দুর্গাদাস বাবু দিবেন কেন? সাহিত্যিক বলিয়া কি?

"ওর নিকট দিন না, ওতে আমার একেবারেই আপত্তির কারন নেই কিন্তু দেখুন, বোধ হয় ও হচ্চে না। ওকে মেয়েরা মোটেই পছন্দ করে না। বিদ্বান হ'লে কি হয় বাবা? ও চিন্তা করে, কিসে কোল্ কয়লার ধোঁয়ার প্রভাব হ'তে করোগেটেট আয়রনকে রক্ষা করা যেতে পারে? কলের চিমনি কি হ'লে ধুম ছড়াতে না পারে। ওর ভেতর কি রসের চাষ আছে? না প্রেমের বীজ আছে? রসহীন বিদ্যেটা যে বন্ধ্যা নারীর মত নিস্ফলা। তাই, তিনিতো এক জনকেই নেবেন, আমি আর এক জন কেণ্ডিডেট।" বলিয়া বিধু খুব হাস্য করিলেন।

নগেন গম্ভীর ভাবে বলিল—'ব্রাহ্ম সমাজে উপযুক্ত পাত্রের অভাব নাই। এত উপযুক্ত লোক থাকিতে দুর্গাদাস বাবু আপনার নিকট মেয়ে বিবাহ দিবেন?"

বিধু রাগ দেখাইয়া বলিল—"ভুল আপনার, ব্রাহ্মসমাজে ছেলে উপযুক্ত আছে—এ ভ্রম আপনাদের এক রকম Quite. [illegible] নেই। গড়ে এখন গ্রেজুয়েটের সংখ্যা বোধ হয় ছেলে অপেক্ষা মেয়েই বেশী হচ্ছে।

"আপনার এরূপ মন্তব্যের কারণ কি?" বলিয়া নগেন হাসিয়া বিধু বাবুর মুখের দিকে চাহিল।

"জানেন—তার এক মাত্র কারণ ব্রাহ্ম সমাজ তার সম্পূর্ণ এনার্জি ঐ স্ত্রীশিক্ষার ভেতর প্রয়োগ করেচেন। সমাজে যান—কেবলি শুনবেন স্ত্রীশিক্ষা! স্ত্রী শিক্ষা! ছেলে শিক্ষার দিকে এটেন্‌সন্ ওদের একেবারে নেই বলিতে, কিছুই নেই। ফলে, ছেলে গুলো হচ্চে সব বাজে মার্কার। একি আপনারা দেখচেন না?"

নগেন একটু ধীরে ধীরে বলিল—"দেখিতেছি বটে, কিন্তু দুর্গাদাস বাবু যে যারতার হাতেই মেয়ে তুলিয়া দিবেন, তাও কিন্তু আমার মনে হয় না।"

বিধু হটাৎ রাগ করিয়া বলিল—"তবে তিনি কাকে দেবেন? কে তাঁর মেয়েকে বে করবে?

নগেন্ "কেন, ব্রাহ্ম সমাজে তাঁর যেরূপ প্রতিপত্তি, তাঁর মেয়েকে কে না আদর করিয়া নিবে?"

বিধু—"তবে আপনি ব্রাহ্ম সমাজের কিছুই জানেন না, কি—ছুই—জানেন না. বলে দিলাম—ভারি aristocratic feeling ও সমাজে কিন্তু; যাক, ও বিষয়ে আপনার চিন্তা নিস্প্রয়োজন।"

নগেন আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "aristocratic feeling টার মানে বুঝিতে আমার গোল হইতেছে আপনাদের ভিতর কি জাতি ভেদ আছে?"

বিধু হাসিয়া বলিল—"খুব খু-ব। কোন ব্রাহ্ম কায়স্থ কি দুর্গাদাস বাবুর মেয়ে বে করবে? কখনো নয়। ব্রাহ্ম সমাজকে আপনারা বের থেকে দেখচেন।"

"দুর্গাদাস বাবু কি জাতি, আপনিই বা কি আমরাতো জানিতাম, ব্রাহ্ম সমাজে সকলি এক।"

বিধু হাসিয়া বলিল—"দুর্গাদাস বাবু শূদ্র, তাঁহার স্ত্রী ব্রাহ্মণ; আমি নমঃব্রাহ্মণ। আমাকে তিনি পেলে বাপেঠাকুর বলে লুফিয়ে নেবেন।" বলিয়া বিধু খুব গর্ব্বের সহিত নগেনের মুখের দিকে তাকাইয়া [illegible]

নগেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আপনাদের ভিতর যে এত তাতো আমি জানি না! তা যাক্। এখন কথা—কোন্ মেয়েকে আপনি বিবাহ করিতে চান?"

বিধু বলিল—"তা যাকে তাঁরা ইচ্ছে করেন। সেটা তাদের Selection এর উপরই নির্ভর কর্‌বে।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"তথাপি তো আপনার ও একটা Choice আছে। বলুন, বলিয়া ফেলুন, সব কথাই শুনা যাউক। উকিলকে সব কথাই খুলিয়া বলিতে হয়।"

বিধু হাসিয়া বলিল—"পারুলকে যতীনই বে করবে, বকুলকেই আমি নেব বরং।"

নগেন—"সেটা মন্দ হবে না, সেও একটু সাহিত্যিক, বেশ গান রচনা করে কিন্তু।"

"সেও কিন্তু আমারই শিক্ষা"। বলিয়া বিধু সহাস্যে নিজ পকেট হইতে একখানা নোটবুক বাহির করিয়া বলিলেন—"রাখুন, পরে দেখে যাবেন্ আপনি, এখন কথা শেষ হয়ে যাক।"

নগেন নোটবুকের কয়েক খানা পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—"বেশ গান! আপনার লেখা?"

বিধু—"হা, এর মাঝেই পড়েই ফেল্লেন! আশ্চর্য্য লোক আপনিতো?"

নগেন—"কবিতায় ছন্দ পতন কেন হয় আপনার এত?"

বিধু—"ও তে আজ কাল দোষ নেই, ও "যেমন তেমন ছন্দ" রবিবাবুরও ওরূপ ছন্দ ভঙ্গ হয়। ও তে দোষ নেই।"

নগেন—"আপনার কোন উপাধি নাই?"

বিধু—"না।"

নগেন—"দুটাকা দিলেই তো হয়, নিন না? একটা বিদ্যাসাগর, কি কবি সম্রাট—।"

বিধু ঊর্দ্ধদিকে প্রণাম করিয়া জিহ্বায় কামর দিয়া বলিলেন—"বিদ্যাসাগর!—সে একজনই ছিলেন।"

নগেন হাসিয়া বলিল—আপনি যখন বাঙ্গালা ভাষার [illegible] উত্তম উপাধি হওয়া উচিত আপনার বলো-[illegible]। তাই হউক—আজ হইতে আপনি বিধুভূষণ [illegible]

যাউক, বলুন আপনি কি Subject নিয়া কোথায় যাইতে চান?"

বিধু খুব একদম হাসিয়া তারপর বলিল—"আমি সাবান শিখতে জাপান যেতে চাই। খরচ [illegible] লাভও বেশী।"

নগেন বলিল—"আমি কিন্তু তাহা হইলে আপনার ফেক্টোরির ম্যানেজার হইব।"

বিধু একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"আপ্‌নি আমার উকিল হবেন। ম্যানেজার হ'লে চলবে না।" আপনার সহিত আমার প্রতি কথায় মতভেদ হয়ে যায়!"

নগেন হাসিয়া বলিল—"আপনার সরলতাকে ধন্যবাদ।"

এই সময় পল্টু চিঠি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। পল্টুকে বিদায় দিয়া নগেন বিধুকে বলিল—"বায়না চাই। প্রথম উকালতি, বায়না ছাড়া হইতে পারে না।"

"সেতো অবশ্যি।" বলিয়া বিধু চলিয়া গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা ঠোঙ্গা ভরিয়া মিষ্টি লইয়া আসিল। বিধু বলিল—"বায়না আপাতত এই, কাজ গুছিয়ে উঠলে Full payment হবে।"

নগেন গরীবের দণ্ড করিয়া মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইল। মুখে বলিল—"আপনার মন ভাল, কাজ হইয়া যাইবে। সাবান শিখিতে এক বৎসরের অধিক থাকিতে হয় না। তারপর কিন্তু আপনার বাড়ীতে আমার বাসা হইবে। সেখানে থাকিয়াই বি, এল্ দিব। দেখুন বড় কষ্টে আছি—প্রাতে বিকালে ছেলে পড়াইতে হয়—"

বিধু আগ্রহের সহিত বলিল—"সে কথা আর বলতে! তবে, সেটা Law College থেকে অনেকটা দূরে হ'বে যে।"

নগেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"সে কি, ভবিষ্যতের বাসাও ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন নাকি?"

বিধু—"সে কি আপনি জানেন না? বালি-গঞ্জে যে দুর্গাদাস বাবু মেয়েদের জন্যে বাসা বাড়ী প্রস্তুত করে রেখেছেন, সে বাড়ী গুলো যে এখন তাদেরই আছে!"

নগেন একটু আশ্চর্য্যই হইল। বলিল—"আমি তো সে সব কিছুই জানি না। প্রার্থনা করি, দুর্গাদাস [illegible]

...পূরণায় মনস্কামনা পূর্ণ করুন। বলি—দুর্গাদাস বাবুর ... এতই টাকা!"

"দুই লক্ষ টাকা তার স্ত্রীর নামে * * * বেঙ্কে ...—দুই মেয়ের নামে দশ হাজার করে দিয়েচেন, ...টাকার কুমীর। লোকটা টাকার কুমীর!"

নগেন—"দুর্গাদাস বাবু তো খুব খরচ পত্র করেন. ...তো টাকা হলো কেমন করিয়া?"

বিধু—"কোথায় তাঁর খরচ পত্র? এই যে চা ... সন্দেশ, এইতো?—এ হচ্ছে ফাঁদ! ফাঁদ! ...লোকটা বেজায় মাইজার। তার কাছে গরীব দুঃখী ..., ভিজিট ষোল টাকা—একটা পয়সা কম—...বাপের বাড়! যা হোক, করেচে লোকটা এক জীবনে ...। না হলে আমার মত লোকও তার বাড়ী যেতে—"

নগেন—"ব্রাহ্ম সমাজের সকলেরই বেশ অবস্থা ...। অবস্থা ভাল করবার একমাত্র উপায় খরচ ... শৃঙ্খলা—এটী ব্রাহ্ম সমাজে বেশ দেখিতে পাওয়া ...। অপব্যয় ও অন্যায় ব্যয় তাহারা খুব কম করেন। বোধ হয় মেয়েদের শিক্ষাই তাহার কারণ।"

"অপব্যয় কর্‌লে উপায় নেই, তাই। ব্রাহ্ম সমাজে ...য়ের ভাত নেই—কেউ জিজ্ঞাসা করে না।"

নগেন—"সহানুভূতির প্রথাটা ব্রাহ্ম সমাজে খুব ... বলিয়াই মনে করি। হিন্দু সমাজের খাওয়া ...ই মারামারির ভাবটা সেখানে নাই।"

বিধু—"ব্রাহ্ম সমাজে বার রাজপুতের তের চুলা। ..., আপনি আজ বিকেলেইতো যাচ্চেন। আজই ...টা শেষ করে আস্‌বেন। আমি সন্ধ্যের পর ...খানে যাব, ততক্ষণ অপেক্ষা কর্‌বেন।"

নগেন দেখিল স্নান আহারের সময় যাইতেছে, সে ...—"তবে আপনি এখন আসুন—আমার কলেজ ...। সেখানেই দেখা হইবে।"

বিধু বলিল—"আর এতই কি time হয়েচে?"

নগেন নিজ watchটী দেখাইয়া বলিল—"এই যে ...টা, আপনার কি ঘড়ি নাই?"

বিধু—"ওতে attentionএর বেজায় বাজে খরচ ...। আমি রাখি না—।"

নগেন—"সে কেমন?"

বিধু—"He that keeps a watch has two things to do
To pocket his watch and watch his pocket too."

—আচ্ছা, গুড্ বাই।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিধু ... তাহার ছাতাটী ও এজোশর ব্যাগটী লইয়া উঠিয়া ...

"জলকে"।

(১)

আয় আয় রাই জল আনিতে যাই,
হেলায় বাড়িবে বেলা,
মেদুর সমীরে লহরে লহরে
করিব লো জল খেলা।
তরুণ অরুণে কনক বরণে
যমুনার কলতান,
চল্ চল্ ধ্বনি রাই বিনোদিনী
সে তানে মিলাব গান।

(২)

উচ্ছল ছল ছল লাল যমুনা জল,—
পাগল ঘেরল রাই দেহ,
হাসিছে খল খল, চঞ্চলা সখিদল
সিঞ্চত নয়নে জল কেহ।
গাহে পাপিয়া পিক মধুকর নিকর
ঝঙ্কারে কমলবন ভুলে,
সরম ভরম নাহি আকুলা কিশোরীকুল
কূলে না চাহিল আঁখি তুলে।
ধীর সমীর বহে কুসুম সুরভি সহ
কানন জাগিল প্রেম গানে
উচ্ছল ছল ছল নীল যমুনা জল
গাওল ললিত কল তানে।

(৩)

কমল মুকুল ভুলে দুকূল তামসী খুলে
ঝাঁপল অরুণ নীল জলে.
রঙ্গিনী সখিদল বীচিমালা চঞ্চল
শত রবি হাসে খল খলে।
মুকুতার পাঁতি কি রে দশনে মাগিছে রবি
মধুয়া খুঁজিয়া মরে মধু
কঙ্কন কণ কণ মঙ্গল গীতি গানে
নন্দিত করত প্রাণ বধূ।
নবীন নীরদ জালে থিরা দামিনীঘেরি
জল কেলি করে অবসান
মৃণালে বাঁধিয়া গলে কলসী ভরিল যে

ধীর সমীর বহে কুসুম সুরভি সহ
কানন জাগিল প্রেম গানে,
উচ্ছল ছল ছল নীল যমুনা জল
গাওল ললিত কল তানে।

(৪)

গাগরী সলিলে ভরি ব্রজবালা কিশোরী
বসাওল যমুনার কূলে,
পীত বসন পর মোহন চূড়া শিরে
বনমালী নীপ তরু মূলে—,
আড় নয়নে চাহে ; নিরখিল সখিগণ
কহে তাহে 'ছি ছি একি রঙ্গ',
কাঁখে গাগরী তুলি চঞ্চল চরণে চলে
সিক্ত বসনে ঝাঁপি অঙ্গ।
রূপ সাগরে মরি কি শোভা ধরিল রে
বসনে বসান দিল তাহে,
থির বিজুরি ধারা পরাযে চলিল রে
কানুগাইয়া অনিমিখে চাহে।

(৫)

রক্ত কমল মুখ কম্পিত কমল বুক
কোকনদ চরণ তলে,
কণ্ঠ চাপিল কেবা হৃদয়ে পাষাণ দিয়া,
চলিতে চরণ নাহি চলে।
আনমন রঙ্গিনী উলটি চাহিল পুনঃ
কলসী পড়িল ভূমিতলে,
"সখি! কি বাজিল পায়—নয়নে পড়িল কিবা
গাগরী তুলিয়া ধীরে চলে॥
ঝঙ্কারে মধুকর গায়িছে পাপিয়া পিক
বনপথে কুসুমের রাশি :
সহসা মুখর করি মধুরে কুঞ্জবন
ফুকারিল মোহন বাঁশী।
নীরব বিহগকুল মধুকর গুঞ্জন ;—
পলকে চরণ পথে বাধে,
ধীর সমীরে বহে যমুনা মথিয়া কিরে,
সুর সুধা "জয় জয় রাধে।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গলার পাখী।

(২) বুলবুল।

ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই বুলবুল নামে এক প্রকার পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। বুলবুল দেখিতে বড়ই সুন্দর ; মাথায় ঝুঁটী ও পুচ্ছের নিম্নভাগে সূত্রবৎ লাল পালকে আবৃত। ইহাদের পরস্পরের যুদ্ধ দেখিবার জন্যই সৌখিন লোকেরা ইহা প্রতিপালন করিয়া থাকে। লক্ষৌ, দিল্লী, বারানসী, প্রয়াগ প্রভৃতি এবং এদিকে ঢাকা সেরপুর প্রভৃতি নানাস্থানে যুদ্ধার্থ বহুলপরিমাণে এই পাখী প্রতিপালিত হইত। তজ্জন্য ইহাদের মূল্যও অল্প ছিল না। সে কালে পৌষ সংক্রান্তির দিন বিশেষ ভাবে বুলবুলের লড়াই দেখিবার জন্য নানাস্থানে প্রচুর দর্শক সমবেত হইত। পৌষ সংক্রান্তির মেলার মধ্যে বুলবুলের লড়াই অন্যতম আমোদ জনক ব্যাপার বলিয়া মধ্যে একটী বলিয়া গণ্য হইত। এখনও মেলা প্রভৃতি যদিও পূর্ব্ব প্রথামত বসিয়া থাকে, তথাপি পূর্ব্বের ন্যায় জমকাল হয় না এবং পশুপাখীর ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্যও লোকের আর উৎসাহ নাই। কাজেই উৎসবের এই অঙ্গটী একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বুলবুল ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহাদের সন্তান উৎপাদনের সময়। গুল্ম জাতীয় ছোট ছোট বৃক্ষে ইহারা কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহারা গাছের ছোট ছোট ডাল সূত্রবৎ পদার্থ দ্বারা জড়াইয়া জড়াইয়া ঠিক বাটীর আকার গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং বৎসরে দুই তিন বার সন্তান উৎপাদন করে। প্রতিদিন এক একটী করিয়া ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচটী পর্য্যন্ত অণ্ড প্রসব করিয়া ১৮ দিন তা দেওয়ার পর ইহাদের শাবক জন্মিয়া থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যেই ইহাদের পক্ষোদ্গম হইয়া থাকে। প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যে উহারা উড়িয়া বেড়াইতে পারে। মাতার পুনঃ গর্ভধারণের সময় নিকটবর্ত্তী না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা মাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ইহারা আহারান্বেষণ ও আত্ম-রক্ষার উপায় শিক্ষা করিতে থাকে। ইহারা কীট পতঙ্গ

...র কোনও অংশ আহার করিয়া জীবন ধারণ ...

...কালই এই পাখীর যুদ্ধ দেখিবার প্রকৃত সময়। ...মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ইহাদের ক্রীড়া ...নের ঠিক সময় বলা যাইতে পারে। নানাউপায়েই ...পাখী অরণ্য হইতে ধৃত হইয়া থাকে। বট জাতীয় ...র রস অগ্নির উত্তাপে গাঢ় করিয়া বৃক্ষের ডালে ...ইয়া রাখিলে ঐ ডালে পাখী বসিলেই পা ও ...কে তাহা লাগিয়া যায়, তখন শিকারী যাইয়া উহাকে ...য়া আনে। এই উপায়ে পাখী ধরিলে অনেক ...ই পালক ছিড়িয়া যায় এবং যুদ্ধকালে নূতন ...োদগম হইলে তাহাতে অন্যপক্ষী আঘাত করিলে ...ত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে ও তজ্জন্য যুদ্ধে বিরত হইয়া ...লায়ন করে। ঐ পাখী ধরার অন্য উপায় এই যে, যখন ...ত্রিতে উহা বৃক্ষে বসিয়া থাকে, তখন দুইটী বংশ দণ্ডে ...ল বাঁধিয়া বৃক্ষের চারিদিকে এইরূপ চারিখানা জাল ...া ঘেরিয়া একটী লম্বা বাস দিয়া পাখীকে উড়াইয়া ...লে সে অন্ধকারে জাল দেখিতে না পাইয়া গিয়া ছুটে ...লে পড়ে; তখন দুই দিকের দুইটী বংশ দণ্ড একত্র ...রিয়া তাহা ভূপাতিত করিলেই পাখী হস্তগত হইতে ...ারে। এই ভাবে পাখী ধরিলে প্রায়ই পক্ষাদির অনিষ্ট ...য় না। পাখী মনুষ্য হস্তে পড়িবা মাত্রই ভীতিজনিত ...পাসায় ইহাদের আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়; সুতরাং ধৃত ...পাখীকে তৎক্ষণাৎ জলপান করিতে দেওয়া সঙ্গত।

...যুদ্ধের জন্য বয়স্ক পাখীই অধিক উপযোগী। শীতের ...হইলে পাখীগুলি শীত নিবারণের জন্য উচ্চ বৃক্ষ ...হতে নামিয়া সন্ধ্যার সময় পত্র বহুল গুল্মে ও ঝোপে ...শ্রয় করে। এক একটী ঝোপে বা গুল্মে অনেকগুলি ...খী একত্রে বাস করে। পুংজাতীয় পাখীই যুদ্ধার্থে ...ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুং পাখীগুলির মস্তক বড়, মাথায় ...টিও বড় এবং পশ্চাতের সূত্রবৎ লাল পালক দীর্ঘ ও ...। প্রতিপালকগণ ইহাদিগকে তিনপ্রকার জাতিতে ...করিয়া থাকে—ছেয়া, তোয়থা ও সফেদী প্রভৃতি। ...ব বুলবুল বঙ্গদেশে জন্মে না। ইহাদের ...রে প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশীয় পাখীকে বর্ণ ও আকারে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ খয়েরের রঙের মত এবং আকারেও ছোট। ছেয়া ও সফেদী বঙ্গদেশে অনেক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যে পাখীর পৃষ্ঠের অঙ্কিত রেখা গুলি শুভ্রাভ তাহাকে সফেদী বলে। তিন বৎসর বয়স অতীত হইলে ইহাদের পায়ের নালা উচ্চ ও ডানার দুই একটী ক্ষুদ্র পক্ষ ঈষৎ লালাভ হইয়া থাকে। ইহারা বৃদ্ধ বয়সেও ১০।১২ দিন মাত্র প্রতিপালিত হইলে আর সহসা মনুষ্য আবাস ছাড়িয়া যাইতে চায় না এবং ছাড়িয়া দিলেও আর পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে না।

অরণ্য হইতে আনিয়াই পাখীগুলিকে পেট্টী বাঁধিয়া নিতে হয়। কোমল সূত্র পক্ষদ্বয়ের নীচে দিয়া আনিয়া বুকের উচ্চ অস্থির উপর দুইটী গিরা দিয়া, দুই দিকের সূত্র পাকাইয়া নিয়া তিন, চারি অঙ্গুলী লম্বা করিয়া তাহা একত্রে পাকাইয়া পুনর্ব্বার গিরা দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। তৎপর ঐ গিরা দেওয়া স্থানে সূক্ষ্ম ও লম্বা সূত্রদ্বারা বাঁধিয়া পিতল বা লৌহ নির্ম্মিত চকলা বাঁধিয়া রাখিতে হয় এবং অল্পে অল্পে পাখীকে বসে আনিয়া খাদ্যাদির অভ্যাস করিতে হয়। নবধৃত পাখীগুলিকে অতি সাবধানে রাখা প্রয়োজন। যাহাতে তাহাদের পাখা ছিঁড়িয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইহাদের ক্ষুধা অপেক্ষা পিপাসা সাধারণতঃ প্রবল ও সহজে অসহনীয় হইয়া উঠে। সুতরাং খাদ্য এরূপভাবে নির্ম্মিত হওয়া কর্ত্তব্য যে তাহা বেশ তরল থাকে। অর্থাৎ বুটের সাতুর সহিত জল ও কমলার রস, দুধ, আমের রস বা কাঠাল ইত্যাদি ফলের রস মিশাইয়া তরল করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখের নিকট ধরিলে ক্রমে স্বাদ পাইয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করে। যতই অধিক পরিমাণে খাইতে আরম্ভ করিবে, ততই খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া ও তাহা ক্রমে গাঢ় করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। তারপর ক্রমে কেবল সাতু মাত্র খাদ্যরূপে পরিণত করা আবশ্যক।

পোষা বুলবুল মনুষ্য সংসর্গে থাকিতে ভালবাসে। তখন উহারা মানুষ দেখিয়া আর ভয় পায় না। এবং আহার দাতাকেও বন্ধু বলিয়া নির্ভয়ে মানুষের সম্মুখে

নিশ্চিন্তে উপবেশন ও আহার গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন কি তখন হস্তাদি দ্বারা অঙ্গস্পর্শ করিলেও আর উড়িয়া পালাইতে চেষ্টা করে না। এই সময় হইতে অল্প অল্প করিয়া ইহাদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিতে হয়।

দারুণ জঠরানলই পৃথিবীর অনেক অনর্থের মূল। মনুষ্যের স্বার্থপরতার মূলেও অনুসন্ধান করিলে সেই ক্ষুন্নিবৃত্তির বীজ নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই মানবগণ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন হইতে স্খলিত হইয়া নানা রূপ দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদের ব্যবহার পরিদর্শন করিলেই অনায়াসে জঠরানলের প্রভাব জনিত কুকার্য্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অনুভব করা সহজ সাধ্য হইবে। পশু পক্ষীদের মধ্যেও এই জঠরানলের জন্য নানা অনর্থ ঘটিতে দেখা যায়। বুলবুল জাতীয় পাখী সাধারণতঃ একটী অন্যটীকে দেখিয়া প্রীতিভাবই অবলম্বন করে অর্থাৎ অন্য পাখী দেখিয়া জিহ্বা নাড়িয়া পাখা সঞ্চালন করিয়া বন্ধুত্বের পূর্ণ পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু বুবুক্ষিত অবস্থায় একটী অন্যটীকে দেখিলে তাহাকে আক্রমণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না।

একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অল্প পরিমাণে কোনও খাদ্য—চিনি বা মিশ্রি পানা প্রতিদিন দিলে সেখানে সহসা অন্য পাখী দেখিলেই একে অন্যকে আক্রমণ করে। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধ শিক্ষা দিলে পাখী প্রায় অন্যস্থানে গেলেই ভীত ও হীনসাহস হইয়া পড়ে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়াকে 'টাহি' বলে। নানা স্থানে প্রতিদিন আহার দিলে আর পাখী তেমন ভীত বা চকিত হয় না। প্রথম দুই দিকে দুইটী পাখীকে এরূপ ভাবে সূত্রের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে হয় যে যেন একটী পাখী আক্রমণ করিলেও অন্যটীর অঙ্গস্পর্শ না করিতে পারে। এইরূপ ভাবে মধ্যস্থলে খাদ্য রাখিয়া দিলে বুবুক্ষিত পাখী একটী অন্যটীকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করে, এইরূপে ক্রমে লড়াই করিবার অভ্যাস কিছু দিন শিক্ষা দিয়া যখন পাখী দেখিলেই—আক্রমণ করিতে চাহিবে, তখন আহারীয় দ্রব্য এইরূপ পাতলা [illegible] রাখিতে হয় যে, আহার্য্য পদার্থ দেখিতে পাইতেছে অথচ খাইতে পারিতেছেনা, তখন দুই পাখী ছাড়িয়া দিলে পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। [illegible] যুদ্ধে অক্ষম হইয়া পলায়ন করিলে বিজয়ী পাখীটী [illegible] তিন চারিটী পাখীকে হারাইয়া দিতে পারে; [illegible] তখন তাহার সাহস বৃদ্ধি হইয়া যায়।

যুদ্ধার্থী পাখীদিগের খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ [illegible] লইতে হয়। আহার পূর্ণভাবে গ্রহণ [illegible] আরম্ভ করিলে তিন চারিবার খাদ্যের [illegible] করিয়া যখন দেখা যায় পাখীটী বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তখন খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস [illegible] আবশ্যক; ক্রমে প্রাতে অর্দ্ধপরিমাণ আহার [illegible] বৈকালে পূর্ণমাত্রায় খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। [illegible] আহারে শরীর বিশেষ পুষ্ট থাকিলে যুদ্ধকার্য্যে তত [illegible] দর্শিতা লাভ করিতে পারে না। এই খাদ্য হ্রাসের [illegible] সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ স্নান ও জলপান করিতে দিয়া [illegible]সের অধিকাংশ সময় পাখীকে রৌদ্রে রাখিয়া [illegible] প্রয়োজন।

আমাদের দেশে অনেকেই পশু পাখী পোষণ [illegible] বার আন্তরিক অভিলাষ সত্বেও উহাদের পোষণ [illegible] লীন অভিজ্ঞতার অভাবে নিয়তই অকৃতকার্য্য [illegible] ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। এই সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় [illegible] উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে [illegible] না। তবে যাহাদের এতৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা [illegible] তাহারা যদি সাধারণের অবগতির জন্য [illegible] সাময়িক পত্রে লিখেন, তবে বোধকরি আমাদের [illegible] অভাব দূর হইতে পারে।

শ্রীশিবকৃষ্ণ সিং[illegible]

দিদি মা।

জমিদার গিরীশ বাবুর দিদি মা অর্দ্ধোদয় [illegible] কলিকাতা আসিয়া একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে[illegible] গঙ্গায় স্নান করিয়া ত্রিকোটী কুল উদ্ধার করিবার [illegible] দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা এই পুণ্য লোভাতুরা দিদি [illegible] এতদিন মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, তাঁহার [illegible] আকাঙ্ক্ষা কলিকাতার বাসায় তুলসীতলা ও গোময় [illegible]

[illegible] স্নানের পর মুহূর্ত হইতেই একেবারে নিবৃত্ত হইয়া গেল। এখন তাঁহার প্রাণ কলিকাতার আকাশ, বাতাস, কোলাহল-গণ্ডগোল হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

দুই এক দিন অপেক্ষা করিয়াই তিনি গিরীশকে বলিলেন—"মণি, আমার যে আর এখানে কুলায় নারে [illegible], একটু গোবর নাই, একটু মাটী নাই, একটা তুলসী গাছ নাই, উঠানের বংশ নাই—সিড়ি আর ছাদ, দলান [illegible]—আমাকে আজই পাঠাইয়া দাও, দাদা আমার।"

গিরীশ বলিল—"সে কি হয় দিদ মা? আসাটা যেমন আলাপ করিবা মাত্রই হয় নাই, যাওয়াটাও তেমনি [illegible] হইবা মাত্রই হওয়া দুষ্কর। বিশেষ এখন যাত্রীর [illegible] ভিড়, যাইতেতো পারিবেনই না, মাঝথেকে একটা [illegible] বাঁধিয়া উঠিবে; তখন টাকাও ব্যয় হইবে, [illegible] বুদ্ধিরও দোষ দিবে—দুটারই অপব্যয় হইবে। [illegible] বাদেই বড় দিনের আমোদ, তারপর সকলে এক [illegible] চলিয়া যাইব। "উঠ মেয়ে তোর বিয়ে"—ও [illegible]। এই—আর কটা দিন মাত্র।"

দিদিমা সন্তুষ্ট হইলেন না। একদিন তাঁহার জেদ [illegible] উঠিল। তিনি বলিলেন "সচীন্‌কে লইয়া [illegible] একাই যাইতে পারিব; তোমাদের জমিদারী [illegible] আমাদের গরীব ব্রাহ্মণের ঝির কুলাইবে না, [illegible] আজই চলিয়া যাইব। সংক্রান্তির পূর্ব্বে আমাকে [illegible] হইবে। আমার সংক্রান্তির ব্রত পালি কি [illegible] বায়গায় থাকিয়া পণ্ড করিতে পারি? [illegible] একটা পূজার বামুন, না আছে দুটা ফুল বেল [illegible]।"

গিরীশ বাবু অগত্যা স্বীকৃত হইতে বাধ্য হইলেন। [illegible] মা সচীন্দ্র ভাণ্ডারীকে লইয়া আজই রাত্রি দশটার [illegible] গাড়ীতে বাড়ী রওনা হইবেন।

কালীঘাটে যাইয়া কালীমাতা দর্শনের আয়োজন [illegible]। [illegible] শত পূজা দেওয়া হইল, তারপর পাথর [illegible] পরিত্যক্ত হইল না। স্নান পূজার পর [illegible] দোকানে দোকানে যাইয়া থালা পাথর, [illegible] নাতিন নাতিনীদের জন্য খেলানা ইত্যাদি—যা কিছু তাঁহার চখে পড়িল—ক্রয় করিয়া গাড়ী বোঝাই করিলেন।

যিনি এক সময় শ্রীক্ষেত্র, কাশী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে হাটিয়া গিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, কালীঘাটের পুণ্য সঞ্চয় ও বেসাতি ক্রয় তাহার নিকট তো অতি নগণ্য।

(২)

জমিদারী চালের রীতি যাহা, দিদিমার যাত্রার বন্দোবস্ত ঠিক সেইরূপই চলিয়াছিল। ফলে, দিদিমাকে শিয়ালদহে লইয়া যাইয়া পঁহুছাইতে ও টিকিট খরিদ করিয়া গাড়ীতে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিতে সঙ্গীয় কর্ম্মচারী দুটী হইতে আরম্ভ করিয়া ভাড়াটীয়া গাড়ীর কোচমানের পর্য্যন্ত গলদঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল। এবং এই বিরাট হৈ চৈর পরিণামে যাহা সাধারণতঃ হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে তাহাই হইল, শেষে দিদিমাকে একলাটীই রেল যাত্রী হইয়া গোয়ালন্দ পানে ছুটিতে হইল।

সচীন্‌ বহু কসরত করিয়াও কোন গাড়ীতেই স্থান করিয়া লইতে পারিল না। কর্ম্মচারী দ্বয় একে অন্যকে ডাকিয়া ডাকিয়া হতাশ হইতেছিলেন। তাহাদের দায়িত্ব দিদি মাকে গাড়ীস্থ করা, তাহা যখন হইয়া গিয়াছিল, তখনই তাহাদের মাথার বোঝা নামিয়াছিল। গাড়ী প্লেট ফরম ছাড়িয়া গেলে যখন পাড়েজী বলিল 'এ বক্সি বাবু, সচীন্‌ তো উঠনে সেকা নেহি, ক্যা করেগা হামতো উনকা লটক পটক গাড়ীমে ভর দিয়া—।"

বক্সি মহাশয় ও মুন্সী মহাশয় শুনিয়া বিপদ গণিলেন। তখন সচীনও আসিয়া নিজের অকৃতকার্য্যতার কারণ স্বরূপ নিজ দেহে আছার খাইয়া পড়ার দাগ দেখাইয়া সেই ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল।

সচীন্দ্রের পাছেই ছিল, রেল পুলিসের ষ্টেসন গার্ড। সে বলিল—"তোমাকে ষ্টেসন মাষ্টার ধরিয়া নিতে বলিয়াছেন, জল্‌দি চল।"

শাস্ত্রে বলে * * ধনক্ষয় হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। তারপর কর্ত্তব্য? মুন্সি ও বক্সি পরামর্শ করিয়া দিদিমাকে নারায়ণগঞ্জ হইতে ফিরে আসিয়া লইয়া যাইবার জন্য বাসাবাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারীকে এক সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন।

(৩)

শীতের রাত! রাত থাকিতে আসিয়া মেল ট্রেন গোয়ালন্দ পঁহুছিল। মেয়ে গাড়ীর যাত্রীদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব অভিভাবকগণ আসিয়া নামাইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। দিদিমা নিশ্চিন্ত মনে সচীনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন মেয়েগাড়ীর সকল স্ত্রীলোকই নামিয়া গেল, তবু সচীন ভাণ্ডারীর আবির্ভাবের কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন দিদিমা গরদের ঘোমটা পরা তাঁহার উল্কি চিত্রিত মুখ ও রুদ্রাক্ষ বেষ্টিত গ্রীবা খানা জানালা দিয়া বাহির করিয়া দিয়া সচীনের অস্তিত্বের প্রমাণ লইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোথায় সচীন্?

জমিদার বাড়ীর চাকর বাকরের স্বভাব দিদিমার নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিল। দিদিমা যখন নিশ্চিত বুঝিলেন, সচীন, বাসাবাড়ীর পালঙ্কে শুইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া কোনও কোঠার উপরের তাকে নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছে, তখন তিনি তাঁহার নিজের জপ মালার পেটিকাটী সযত্নে হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িলেন এবং সাহসে ভর করিয়া একটী একটী করিয়া কোঠা দেখিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন।

এক দিকের সকলগুলি কোঠা বিশেষ করিয়া দেখিয়াও যখন শচীনের কোন সন্ধানই পাইলেন না, তখন দিদিমা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; ষ্টিমারের দিকে তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলেন। ষ্টিমারে যাইবার সময়ও পুনরায় তিনি গাড়ীগুলি দেখিয়া শচীনকে ডাকিয়া ডাকিয়া চলিলেন।

টীকেট কালেক্টার চাহিল—"টিকেট?"

দিদিমা বলিলেন—"আমার সঙ্গের লোককে পাইতেছি না, তাহার নিকট আমার টিকেট।"

সম্ভ্রান্ত মহিলা দেখিয়া টিকেট কালেক্টার টিকেট সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন—

"কোথায় যাইবেন আপনি?"

দিদিমা বলিলেন—"ময়মনসিংহ।"

টিকেট কালেক্টার নারায়ণগঞ্জের ষ্টিমার দেখাইয়া

(৪)

দিদিমা আমাদের আজকালকার মোমে গড়া মেয়ে ছেলের মত সূর্য্যতাপে গলিয়া যাইবার মেয়ে ছিলেন না। তাঁহার ঘরে চোরে চুরী করিতে যাইতে পর্য্যন্ত ভয় পাইত। একবার তিনি এক চোরকে বাহুবলে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার হস্ত হইতে স্বীয় কণ্ঠহার ছিনাইয়া লইয়াছিলেন।

এ হেন দিদিমা ষ্টিমারে আসিয়া যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াও যখন সচীন্ ভাণ্ডারীর কোন অনুসন্ধানই পাইলেন না, তখন তাহার জন্য তাঁহার যে ভয় ও আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা মহা বিরক্তি ও রাগে পরিণত হইল। দিদিমা রাগ করিয়া বলিলেন—"যাউক, হতভাগা, যাক বাড়ীতে, তারপর দেখা যাইবে।"

দিদিমা মেয়ে-কামরায় গিয়া খুব ভিড় করিয়া জমকাইয়া জমাইয়া লইলেন। কথা প্রসঙ্গে নারায়ণগঞ্জ প্রবাসী এক ডাক্তার গৃহিনীর সহিত তাঁহার খুব আলাপ হইল। ডাক্তারের ছোট ছেলেটীকে দিয়া তাহার বাবাকে ডাকাইয়া আনিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে স্বস্থানে পঁহুছিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।

ডাক্তার দিদিমার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পায় পড়িয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। এবং তাহার বাসায়ও দিদিমাকে পদধূলি দান করিতে অনুরোধ করিলেন।

দিদিমা বলিলেন "দেখি।"

বেলা বারটায় নারায়ণগঞ্জের ঘাটে ষ্টিমার লাগিল। ডাক্তারের অনুরোধ দিদিমা এড়াইতে পারিলেন না। ময়মনসিংহের গাড়ী যাইবে সন্ধ্যা চারিটায়। সুতরাং ডাক্তার দিদিমাকে নিজ বাসায় লইয়া গিয়া আহার করাইয়া যথাসময়েই আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

ডাক্তার দিদিমার সঙ্গে নিজ কম্পাউণ্ডারকে দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃপণ স্বভাবা দিদিমা ডাক্তারের সে সাগ্রহ ইচ্ছা ব্যর্থ করিয়া দিয়া নিজের সাহস-শক্তির পরিচয় দিলেন।

ডাক্তারও দিদিমা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া বাসা বাড়ীর ঠিকানায় একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া নিজ কর্ত্তব্য ও সাধু চেষ্টার পরাকাষ্ঠা প্রদান করিলেন।

গিরীশ্ বাবুর প্রধান কর্ম্মচারী নারায়ণগঞ্জ পঁহুছিবার পূর্ব্বেই দিদিমাকে লইয়া নারায়ণগঞ্জের গাড়ী ময়মনসিংহ যাত্রা করিল।

(৫)

ডাক্তারবাবুর ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃই হউক অথবা টেলিগ্রাফ আফিসের ভুলেই হউক টেলিগ্রাফটী ছিল মাত্র দুটী কথায় নিবদ্ধ "Didima gone" অর্থাৎ দিদিমা চলিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তারের এই টেলিগ্রাম যখন গিরীশ্ বাবুর ইংরেজী নবীশ কর্ম্মচারী তর্জ্জমা করিয়া গিরীশ্ বাবুর স্ত্রীকে শুনাইলেন, তখন বাড়ীতে মহা আর্ত্তনাদ পড়িয়া গেল।

গিরীশ্ বাবুর স্ত্রী স্নেহশীলা দিদি শাশুড়ীর জন্য ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্যামা ঝির উচ্চ চীৎকার তাহারও উপরে চড়িয়া বাসাবাড়ীর গৃহকে এক নিরবচ্ছিন্ন শোক পুরীতে পরিণত করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ সরকার মহাশয় নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা ফেলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিলেন—"দিদিমার অধোগতি হইল, গঙ্গার তীর ছাড়িয়া আসিয়া নারায়ণগঞ্জের ডাক্তার খানায় মরিলেন। দিনটা ছিল তিথিদগ্ধা দোষে দুষ্ট। অন্তিমে অন্যায় কালটাই হইল- সঙ্গহীন—আশ্রয় হীন হইয়া মরিলেন।"

ইংরেজী নবীশ কেরাণীটী বলিল—"ও কিছু নয়, যার মরণ যেখানে, নাও করিয়া যায় সেখানে' বৃদ্ধ সরকার বলিল—'সকলি অদৃষ্ট, নতুবা আমাদের কিসের অভাব? আর দিদি মাকে হয়ত পুড়িল কিনা ডোমে! প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশেষ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এমন মৃত্যু যার তুকেও স্থান নাই, তৃপ্তি নাই। তাহার কাছে যমেরও রক্ষা নাই। ব্রহ্মদৈত্য হইয়া থাকা ছাড়া স্বর্গলোক লাভের মোটেই সম্ভাবনা থাকে না।"

ঝি কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়াছিল। বৃদ্ধ সরকারের মন্তব্য শুনিয়া সে আরো উচ্চ স্বরে চীৎকার করিয়া যাইয়া—দিদিমাকে ডোমে স্পর্শ করায় তাহার ব্রহ্মদৈত্য হইবার সংবাদ বাড়ীর ভিতর প্রদান করিল। মেয়েরা তখন আরো ভয়ার্ত্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া উঠিলেন।

(৬)

শোকে মুহ্যমান হইয়া যে যে স্থানে পড়িয়া ছিলেন, সে সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন। রান্না ঘরে আর আগুন জ্বলিল না। এমন শোচনীয় দুর্ঘটনার পর কি আর সে দিকে কাহারও দৃষ্টি থাকে? শিশুগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। শোকের পুরী শ্মশানের ন্যায় নীরবতা বক্ষে লইয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

রাত্রি সাড়ে দশটায় দিদি মা ষ্টেসনে নামিয়া নিজেই গাড়ী ভাড়া করিলেন। এ তাহার পরিচিত সহর, আপন স্থান। ইঙ্গিত মত গাড়োয়ান তাঁহাকে আনিয়া গিরীশ্ বাবুর বাসাবাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিল।

দিদিমা দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন—"দরজা খোল শ্যামা।"

শ্যামা ঝির চ'খে নিদ্রা ছিল না। শ্যামা তখন দিদিমার শোচনীয় ভবিতব্যতা ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছিল। হায়, হায়! দিদি মা যদি নিতান্তই ডোমে ছোয়া ব্রহ্মদৈত্য হইয়াই যান, আর পথে ঘাটে শ্যামার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, আর সে দিনকারধ গড়ার প্রতিশোধটাই লইতে উদ্যত হন—শ্যামা শিহরিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময় রাত্রির হিমে-আওয়াজ ধরা গলায় চিঁচি করিয়া দিদিমা ডাকিলেন "ওঁ শ্যামা দরজা খোল।"

"ও মা—গ্নো" বলিয়া শ্যামা চীৎকার করিয়া যাইয়া গিরীশ্ বাবুর স্ত্রীর চৌকিতে পড়িল। তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, অকস্মাৎ এ আবার কি ঘটিল, বুঝিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার ছেলে মেয়েকে বুকে লইয়া ষাট্ ষাট্ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও ঝি, কি হইয়াছে, হইয়াছে কি?"

ঝি কাঁপিতেছিল, বলিল—'রাম নাম লও, বউ ঠাকুরাণ, রাম রাম রাম—দুর্গা দুর্গা দুর্গা—

কপাটে, পুনরায় করাঘাত করিয়া দিদিমা ডাকিলেন —ও "শ্যামা।"

ঝি চীৎকার করিয়া বলিল—"ওইগো দিদি মার ব্রহ্মদৈত্যি! ওমা, কৈ যাবু? রাম রাম রাম—দুর্গা দুর্গা দুর্গা।"

তখন গৃহিণীরও ভয়ের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিল। তিনিও—রাম রাম—দুর্গা দুর্গা—নাম জপ করিতে করিতে কাঁপিতে লাগিলেন।

গৃহিণীর ভয়ে দাঁতে দাঁতে শব্দ হইতেছিল। অবস্থা বুঝিয়া ঝি সাহস করিল। সে পাশের কোঠার দরজা খুলিয়া বৃদ্ধ সরকার মহাশয়কে যাইয়া ঠেলিয়া তুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দিদিমার ভৌতিক আবির্ভাবের সংবাদ প্রদান করিল।

বৃদ্ধ সরকার মহাশয় ভয় পাইয়াও সাহস দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি ঘন ঘন নাম জপ করিতে করিতে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"রাম রাম রাম—দিদি মা আপনার কোন চিন্তা নাই। দুর্গা দুর্গা দুর্গা—বাবু আমাদের তেমন প্রকৃতির লোকই নহেন। হরে রাম, হরে রাম—তিনি প্রতি দিন আপনার জন্য যথাযোগ্য পুরক নিবেদন করিবেন—রাম রাম, হরে হরে—গঙ্গায় সুশ্রাদ্ধ করিবেন, গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিয়া খাপরা শ্রাদ্ধ করিবেন, আপনার অধোগতি হইবে না—কখনও হইবে না। দুর্গা দুর্গা দুর্গা—আমরা তাহা হইতে দিব না। রাম রাম—বৌমা—ভয় পাইতেছেন—ছেলে মেয়ের অকল্যাণ করিবেন না; আপনি এখন চলিয়া যান। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—দুর্গা দুর্গা রাম রাম—"

দিদিমা চীৎকার করিয়া বলিলেন—"খোল দরজা"

শ্যামা কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গিয়া কাপড় নষ্ট করিল। সরকার মহাশয়ের মুখেও রাম নাম আসিতেছিল না—তিনি গৃহিণীকে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "বউমা কড়ি আছে? দশ গণ্ডা কড়ি অন্ততঃ বৈতরণীর জন্য না দিলে, হইবে না—দুর্গা দুর্গা দুর্গা, দেখুন দেখি—দিতে পারেন কি না? রাম—রাম—রাম।"

গৃহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"ছেলে মেয়ে রাখিয়া উঠিব কি করিয়া?"

সরকার বলিলেন—"দিদি মা—রাম রাম—হরে রাম—আজ আপনি যান, কালই আমরা ভোরে পুরোহিত ডাকিয়া আপনার পারপারের কড়ি পুরকের ও কাক বলির সঙ্গে দিব—শ্রীরাম—কমলাপতি—দুর্গা—দুর্গা—একটা ছাতা দিব. আর যাহা যাহা বলেন—তাহা সবই দিব। শিশু-বংশধরদিগের অকল্যাণ করিবেন না—বৌমা ভয়ে জড়সড়—শ্যামার ভয়ে মৃগী ব্যারাম উঠিয়াছে, দুর্গা দুর্গা দুর্গা—শিশুদের অকল্যাণ হইলে আপনাদের যে স্বর্গের পথও বন্ধ হইয়া যাইবে। দুর্গা দুর্গা দুর্গা—রাম রাম রাম—হরে হরে—।"

গাড়ীওয়ালা ডাকিল—"বাবু দরজা খোল, ভাড়া দেও।"

দিদিমার উপদ্রবে ও গাড়ীওয়ালার ডাকে বাড়ীর সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। যাহারা নিজকে বেজায় সাহসী বলিয়া মনে করিতেন, তাহারা দিদিমার প্রেতযোনির আবির্ভাবে এইবার শয্যা ছাড়িতে বা মুখে কথাটী বলিতেও সাহস করিতেছিলেন না।

খাজাঞ্চি মহাশয় বহুমূত্র রোগে ভোগিতেছিলেন। তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি রামদিন তেওয়ারিকে ডাকিয়া লইয়া বাহির হইলেন। এবং তাহাকে গাড়ীটা ভৌতিক গাড়ী, না সত্যিকার গাড়ী, পরীক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া নিজে কাছা খুলিয়া ঘরের সম্মুখেই বসিয়া পড়িলেন।

তেওয়ারী ভৌতিক আলোচনার বিষয় অবগত ছিল না, সে গাড়ী পরীক্ষা করিয়া গাড়োয়ানকে প্রাতঃকালে আসিতে বলিয়া বিদায় দিল। দিদিমার দিকে সে রাত্রে আর কেহ অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না।

দিদিমা ভয়, ধমক দেখাইয়াও যখন দরজা খোলাইতে পারিলেন না, তখন অগত্যা সরকার মহাশয়কে বারেন্দার কোঠাটাই খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।

সরকার দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে সে কোঠার শিকল খুলিয়া দিয়া দ্রুত পদে ভিতরে গিয়া ভিতরের শিকল আটিয়া দিলেন। সে দিনের জন্য সে কোঠায় ভূতের আশ্রয় দিলেন বলিয়া পরদিন প্রভাতেই পুরোহিত ডাকিয়া স্বস্ত্যয়ন ও শিব পূজা করাইয়া লইবেন, স্থির করিলেন।

সে রাত্রে আর কাহারও ঘুম হইল না। প্রাতঃকালের গাড়ীতে প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় নারায়ণগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, দিদি মা ব্রহ্মপুত্র হইতে প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া উচ্চৈস্বরে মন্ত্রজপ করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

ভূতের মুখে গুরু মন্ত্র শুনিয়া ক্রমে সকলেরই সাহস দেখা দিল।

জামা এখন বুঝিল—দিদিমা ভূত হইলেও ছিল জ্যান্ত, এযে এখন জীবন্ত প্রতিশোধ।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ

ব্রহ্মগুপ্ত।

ব্রহ্মগুপ্ত একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। কথিতআছে যে ব্রহ্মগুপ্ত ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং বিজ্ঞজনেরা অনুমান করেন যে ইনি খৃষ্টীয় ৬৬০ অব্দে জীবিত ছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি করিয়া ইনি অশেষ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করেন নাই। ইনি মনে করিতেন যে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহাদি অহোরাত্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ব্রহ্মগুপ্ত ৬২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বা ব্রহ্ম-স্ফুট সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা সংস্কৃত পদ্যে লিখিত। এই জ্যোতিষ গ্রন্থের দুই অধ্যায়ে পাটীগণিত, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির আলোচনা করা হইয়াছে। কোলব্রুক সাহেব (H. T. Colebrooke) এই দুইটী অধ্যায় ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহার পাটীগণিতে ত্রৈরাশিকের সাহায্যেই অধিকাংশ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। ইহাতে সরল রেখা (অর্থাৎ শুদ্ধকথা) সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে।

তাঁহার বীজগণিতে সমান্তর শ্রেণী (Arithmetical progression), গুণোত্তর শ্রেণী (Geometrical progression), ও বর্গীয় (অর্থাৎ দ্বিতীয় মানের) সমীকরণ (Quadratic equation) প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু সমীকরণে তিনি যে যে রাশির মূল নিষ্কাশন করিয়াছেন তাহাদের কেবল ধনাত্মক মূল (Positive root) গ্রহণ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত প্রশ্নটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

একটী পাহাড়ের উচ্চতার—উ; ইহার উপরে দুইটী ময়ূর অবস্থিত ছিল। ইহাদের একটী পাহাড় হইতে নামিয়া গ উ দূরস্থিত একটী গ্রামে গেল, এবং অন্যটী ঠিক খাড়া ভাবে ক উচ্চে উঠিয়া আবার সরল রেখায় সরাসর ঐ গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু উভয়েই সমান দূরে গেল। ক, এর দূরত্ব বাহির কর।

এই পাহাড় ও গ্রামের দূরত্বের নক্সা অঙ্কিত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে একটী সমকোণী ত্রিভুজ অন্য একটী সমকোণী ত্রিভুজের গর্ভে রহিয়াছে। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম খণ্ডের ৪৭ প্রতিজ্ঞার সাহায্যে অতি সহজে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারা যায় *। ব্রহ্মগুপ্তের মূল প্রশ্নে উ এর মূল্য ১০০ ও গ এর মূল্য ২ ধারা হইয়াছে। কথা প্রসঙ্গে তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে সুধী জনেরা ঋণাত্মক (negative) মূল্য পছন্দ করেন না।

কোন কোন উচ্চ অঙ্গের সমীকরণ (indeterminate equation) এরূপে সমাধান করিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়েও তাহা হইতে ভাল প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। $গক^2+১=খ^2$, † তিনি এই সমীকরণের সমাধান করিয়াছেন $ক=\frac{২ট}{ট^2-গ}$; $খ=\frac{ট^2+গ}{ট^2-গ}$ কিন্তু

---

* $\sqrt{(গউ)^2+(উ+ক)^2}+ক=গউ+উ$

$\sqrt{(গউ)^2+(উ+ক)^2}=\{গউ+(উ-ক)\}$

$(গউ)^2+(উ+ক)^2=\{গউ+(উ-ক)\}^2$

$গ^2উ^2+উ^2+ক^2+২উক=গ^2উ^2+(উ^2+ক^2-২উক)+২গউ^2-২গউক$

$২উক=২উক+২গউ^2-২গউক$

$২ক=-২ক+২গউ+২গক$

$৪ক+২গক=২গউ$—

$২ক+গক=গউ$

$ক(২+গ)=গউ$

$ক=\frac{গউ}{গ+২}$

† $nx^2+1=y^2$; $\left(x=\frac{2t}{t^2-n};\ y=\frac{t^2+n}{t^2-n}\right)$

কিরূপে এই সমীকরণ সমাধান করিতে হয়, তাহার প্রণালী তিনি লিখেন নাই। তবে এইমাত্র বলিয়াছেন যে এইরূপ একটী সমীকরণের সমাধান বাহির করিতে পারিলেই অন্যান্য সকলগুলিরই সমাধান বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে ফারমেণ্ট (Ferment) নামক পণ্ডিত ওয়ালিশ (Wallis) ও লর্ড ব্রঙ্কারকে (Lord Brouncker) ঠিক এই সমীকরণই সমাধান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ব্রঙ্কারও ১৭শ শতাব্দীতে ঠিক ব্রহ্মগুপ্তের সমাধানের মত একটি সমাধান বাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত ইহাও বলিয়াছেন যে প কে দুইটি অখণ্ড সংখ্যার বর্গের যোগফল দ্বারা প্রকাশ করিতে না পারিলে ক ও খ এর মূল্য অখণ্ড সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। ব্রহ্মগুপ্ত ভিন্ন প্রাচীন গ্রীক, হিন্দু, আরব অথবা রোমাণ গণিতবিৎ পণ্ডিতগণের কেহই সাধারণ সমীকরণ হইতে উল্লিখিত সমীকরণ সমূহের কোন প্রভেদ দেখিতেন না।

ব্রহ্মগুপ্তের মতে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলির পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে $ক^2 + খ^2 = গ^2$। পিথাগোরাস এবং ইউক্লিডের মতেও তাহাই। ব্রহ্মগুপ্ত কোন বৃত্তের মধ্যস্থিত ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার সূত্র (Formula) নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতেও কোন বৃত্তের ক্ষেত্রফল = ব্যাসার্দ্ধ × বৃত্তার্দ্ধ

$= \text{ব্যাসার্দ্ধ} \times \frac{\text{বৃত্তের পরিধি}}{\text{বৃত্তের ব্যাস}} \times \frac{\text{ব্যাসার্দ্ধ}}{২}$ কিন্তু বৃত্তের পরিধি নির্ণয়ে তিনি ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহার মতে ফাই * (গ্রীক ফাই) এর মূল $\sqrt{১০}$

তিনি দেউল প্রভৃতিরও ঘন পরিমাণ এবং তলপরিমাণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাহার ত্রিকোণমিতির অন্যান্য অংশ এত জটিল যে সূক্ষ্মবুদ্ধি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারেন নাই। তাহাতে বৃত্তান্তর্বর্ত্তি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

* ফাই। $\frac{\text{বৃত্তের পরিধি}}{\text{বৃত্তের ব্যাস}}$ = ৩·১৪১৫৯৩.........।

কোন বিষয়েরই মীমাংসা তিনি ধারা বাহিক মতে করেন নাই। একই বিষয় বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত সকলগুলিই মৌলিক নহে। আর্য্যভট্টের গ্রন্থে যে ভুজজ্যা ও কোটী জ্যার (Sine ও cosine) সারণী দেওয়া আছে, তিনি প্রায়ই তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণের ধারণা এই যে আর্য্যভট্টের অব্যবহিত পর হইতে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল; তাহাদের গ্রন্থ বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ব্রহ্মগুপ্ত ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। * কিন্তু তাঁহার বীজগণিত ও পাটীগণিত যে মৌলিক, তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন নাই। অনেকে অনুমান করেন যে মিশরের ডায়োফেণ্টাস্ ও হেরোর (Diophantus and Hero) গ্রন্থ আর্য্য ভট্ট অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীতে যে একটী মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে, ব্রহ্মগুপ্ত তাহারই অধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রীচাপবংশীয় শ্রীব্যাগারমুখ নামক রাজার রাজত্ব কালে অবন্তীনগরে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সত্য।

সন্ধ্যা আঁধারে
মন্দ পবনে,
ফুটিল কুসুম কলি।
গন্ধ রাজের
সন্ধান পেয়ে,
ছুটিয়া চলিল অলি।
তিমির পুঞ্জ
কুঞ্জ কুটীরে,
জোনাকী জালিছে দীপ।

---

* অধ্যাপক Rose Ball বলেন—"It is likely also that some progress in mathematics had been made by Arya-Bhatta's immediate successors and that Brahma Gupta was acquainted with their work." (ব্রহ্মগুপ্তের সারণী হইতে আর্য্য ভট্টের সারণীর একটু প্রভেদ আছে। তাহা দুষ্টেই ঐ মন্তব্যের অবতারণা করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা।)

কুলায়ে পাপিয়া
উঠিল গাহিয়া
পুলক আকুল নীপ।
ঝিল্লি গণের
মেঘ মল্লারে,
মুখর বল্লী বিতান
শষ্প শয়নে
স্বপ্ন মগন,
বাহুটী মোর সিথান।
সুপ্ত আঁখির
কোমল পাতায়,
কমল দুইটী ঢাকা,
কুহক মন্ত্রে
চন্দ্র আলোকে,
শত আলিঙ্গন আঁকা।
বিদায় লইয়া
গেল সে চলিয়া,
ফিরে চাহি বার বার।
নিশির শিশিরে
নয়ন আসারে
হয়ে গেল একাকার।
বরষ বরষ
গিয়াছে কাটিয়া
দরশ হবে না আর।
বক্ষ মাঝারে
বহিতেছে শুধু
লক্ষ স্মৃতির ভার।
গহন কানন,
নীরব নিশিথ,
নিবিড় তিমির মত।
স্বপনের মত
আজি সে রজনী,
বেদনার মত সত্য।

শ্রীঅনুপমচন্দ্র রায়।

শোক সংবাদ।

৺অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ, বি, এল্।

অমূল্যকৃষ্ণের পরলোক গমনে আমরা সত্যসত্যই আমাদের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক হারাইলাম। অমূল্যকৃষ্ণ যৌবনে, কিঞ্চিদধিক ২৫ বৎসর বয়সে যেরূপ অক্লান্তভাবে সাহিত্যচর্চ্চার আয়োজন করিতেছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তিনি ছাত্রাবস্থায়ই—“প্রীতি” নামক একখানি মাসিক পত্রের পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে না করিতেই অমূল্যের মুকুল জীবন অকালে কালের কোলে ঝরিয়া পড়িল। বিগত ৩রা মার্চ্চ রাত্রি ১২½ ঘটিকার সময় কলিকাতা নগরীতে দুরন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া রোগে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পৈতৃক-বাসভবন কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত বালিগাঁও গ্রামে। আজিও তাঁহার বৃদ্ধ জনক জননী এই দারুণ শোকের শেলাঘাত সহ্য করিবার জন্য বর্ত্তমান আছেন। শান্তিদাতা ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের গভীর শোকে সান্ত্বনা দান করুণ।

মৌলবী সেখ আব্দুল জব্বার

মৌলবী আবদুল জব্বারের মৃত্যু সংবাদও এই একই সময়ে আমাদিগকে শুনিতে হইল। তিনিও তাঁহার নবীন বয়সে যেরূপ উৎসাহ ও অনুসন্ধানের সহিত ইতিহাসের চর্চ্চা করিতেছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার রচিত “মক্কাশরীফের ইতিহাস” “মদিনাশরীফের ইতিহাস”, “বয়তুল মোকাদ্দসের ইতিহাস” প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী সোমবার তিনি ইহধাম হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক চরিত্র হিন্দু মুসলমান সকল-কেই মুগ্ধ করিত। আমরা এই তরুণ সাহিত্যিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছি।

আবদুল জব্বার (ময়মনসিংহ) গফরগাঁও এর নিকটবর্ত্তী বনগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

অষ্টম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩২৬। { ষষ্ঠ সংখ্যা।

কামন্দকীয় নীতিসার।

প্রাচীন কালে ভারতের আর্য্য সন্তানগণ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তদানীন্তন, এমন কি বর্ত্তমান যুগের সকল সভ্যজাতি অপেক্ষা উচ্চসোপানে আরূঢ় ছিলেন, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সত্য বটে, "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" ইত্যাদি মহাসত্যের আবিষ্কার করিয়া সংসারের ক্লেশ ও দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় 'পরম জ্ঞান' লাভের জন্য তাঁহারা দর্শনাদি নানা-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করিয়া পরমার্থ বিদ্যায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা বৈষয়িক বিষয়ের দিকটা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এমন কথা আমাদের বলা চলে না। রামায়ণ মহাভারতের কথা ছাড়িয়া দিলেও এখনও আর্য্যজাতির ধর্ম্ম পুস্তক ব্যতিরেকেও নীতিশাস্ত্র ও চতুঃষষ্ঠি কলা বিদ্যা * সম্বন্ধে এত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে এবং এত গ্রন্থের উল্লেখ আছে যে তাহা জানিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অর্থ নীতি শাস্ত্র সম্বন্ধে এখনও কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্র, কামন্দকীয় নীতিসার, শুক্র নীতিসার, নীতি ব্যবহার ময়ূখ নীতিপ্রকাশিকা, নীতি বাক্যামৃত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ আর্য্যজ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে।

মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বে) একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়ে অর্থশাস্ত্রের উৎপত্তি এবং ক্রমে ক্রমে ঐ গ্রন্থ কি ভাবে সংক্ষিপ্ত হইয়া জন সমাজে প্রচলিত হইল, তাহার ইতিহাস বিবৃত রহিয়াছে। তাহা এইরূপঃ—"ভগবান্ কমলযোনি সুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দেবগণ, তোমরা ভীত হইও না। আমি অচিরাৎ উপায় চিন্তা করিতেছি।" প্রজাপতি এই কথা বলিয়া বুদ্ধি বলে একখানা লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। ঐ নীতি শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, দণ্ড নীতি, অমাত্য ইত্যাদি এবং কৃষি বাণিজ্যাদি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা এবং যে যে উপায় দ্বারা লোক সকল স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিত থাকে তাহার বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।" মহাত্মা কমলযোনি এইরূপে সেই লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিলে বহুরূপধারী বিশালাক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি প্রথমে উহা গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাবর্গের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতিশাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশসহস্র অধ্যায়ে পর্য্যবসিত করিলে সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপরে ভগবান ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চ সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া বাহুদন্তক নাম প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বৃহস্পতি বাহুদন্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে কীর্ত্তন পূর্ব্বক বার্হস্পত্য নাম প্রদান করিলেন। অবশেষে যোগাচার্য্য ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ঐ শাস্ত্রকে একসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মারা এইরূপে মর্ত্ত্যদিগের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া লোকানুরোধে সেই নীতিশাস্ত্র আরও সংক্ষিপ্ত করিলেন।" ইহা হইতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মহাভারত গ্রন্থ যখন বিরচিত হইয়াছিল তৎ পূর্ব্বেই অর্থশাস্ত্র অনেক পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

---

* স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ, মহোদয়ের "প্রাচীন ভারতে চতুঃষষ্ঠী কলাবিদ্যা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (সাহিত্য সংহিতা ১৩২১ সাল, শ্রাবণ সংখ্যা)।

নীতিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুক্রনীতিসারে এইরূপ উল্লেখ আছে যথাঃ "অসুরগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের গুরু ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্য নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রথমে বলেন, তৎপর স্বয়ম্ভু ভগবান ব্রহ্মা শতলক্ষ শ্লোকে উহা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং আমরা লোকহিতার্থে এই তর্ক বহুল শাস্ত্র মানবের আয়ুর অল্পতা হেতু সারাংশ গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি।" এতদ্ব্যতিরেকে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বাহুদন্তীপুত্র, ভরদ্বাজ, ঘটমুখ, কাত্যায়ন পরাশর, পীশুন প্রভৃতি প্রায় বিংশতি নীতিশাস্ত্র প্রণেতার উল্লেখ দেখিতে পাই। অনেক দিন কৌটিল্যের সময় কাল পর্য্যন্ত (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) ঐসকল মহাপুরুষগণের প্রণীত ভারতের গৌরব বর্দ্ধক গ্রন্থমালায় বিরাজিত ছিল এবং আর্য্য ঋষিগণের প্রদত্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্যোতিঃ বিতরণ করিয়া রাজসভা এবং মন্ত্রণাগৃহকে সমুজ্জ্বল করিত। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সকল অমূল্য গ্রন্থ বিলুপ্ত; কিন্তু যাহা আছে, তাহাতে ও ভারতের কীর্ত্তি গৌরব ঘোষণা করিবার যথেষ্ট রহিয়াছে। এই নীতিশাস্ত্র যে কেবল নৃপতিগণেরই জন্য এমন নহে পরন্তু:--

দণ্ডনীতি র্যস্য মূলং জ্যোতিঃ শাস্ত্রং প্রকাণ্ডকম্ ।
বৃষ্ট্যর্থা ইতর বিদ্যাঃ শাখা পুষ্পম্ তথেতরাঃ ॥
অপাদৃষ্টং ফলং যস্য রস তস্যামৃতং সতাম্
সোঽয়ং কল্পতরু র্যোগঃ উপাস্যা ভূপ মন্ত্রিণাম্ ॥
সংশ্রিত্যামুং কল্পবৃক্ষ মণ্যশাস্ত্রাণ্যবীক্ষ্য চ ।
রাজন্ত মন্ত্রাভামর্থোযঃ শাস্ত্রার্থান্তমো ভু ব ॥
অয়মিষ্টতমো ভূপৈর্জ্ঞেয়ো হিতফল প্রদঃ ।
অন্যেষাঞ্চ ভবেদিষ্টঃ প্রিয়স্বেষাস্পদাত্যপি ॥
ইতি "যুক্তিকল্পতরু"।

"দণ্ডনীতি যাহার মূল, জ্যোতিঃশাস্ত্র যাহার প্রকাণ্ড, অন্যান্য ছন্দ শাস্ত্র সমূহ (ধনুর্ব্বেদ আয়ুর্ব্বেদ) যাহার শাখা এবং অন্যান্য নিরন্তর শাস্ত্র যাহার পুষ্প—অদৃষ্টফল যে তাহার রস, সেই রসই সজ্জনগণের অমৃত, হে সাধুগণ, এমন (গুণ যুক্ত) কল্পতরু ভূপাল ও মন্ত্রিগণের আলোচ্য। এই কল্পবৃক্ষ এবং অন্যান্য শাস্ত্র বিচার করিয়া যাহা উত্তম শাস্ত্র সম্মত অর্থ তাহাই রাজা কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়। "যুক্তিকল্প বৃক্ষ এবং ইহাই এই যুক্তিকল্পতরু নৃপতিগণের আকাঙ্ক্ষা ("যুক্তিকল্পতরু") রাজা অন্য সর্ব্বসাধারণেরও ইষ্টপ্রদ ও সুখপ্রদ।" নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিয়া অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় বিরত রহিলাম। একটী প্রশ্ন সহজে উত্থিত হইতে পারে যে, যে অর্থশাস্ত্র ভারতবর্ষে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং যে শাস্ত্রের আলোচনায় এত অধিক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল ক্রমেক্রমে সেই শাস্ত্রের আলোচনা বিরল হইল কেন? অর্থাৎ 'কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র' প্রচারের পর হইতেই ঐ শাস্ত্রের আলোচনা এবং তৎসম্বন্ধে গ্রন্থাদি অধিক লিখিত হয় নাই কেন? সাহিত্যক্ষেত্রে অবনতিই যে ইহার কারণ তাহা কখনও বলা যাইতে পারেনা; কারণ আমরা অর্থশাস্ত্র ব্যতিরেকে সাহিত্যের প্রায় কোনও শাখাতেই অবনতি কিংবা হীনাবস্থা দেখিতে পাই না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের এবং বৌদ্ধ ভাবুকতার প্রসিদ্ধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ শাস্ত্রের অনাদর হইয়াছিল, এইরূপ কথাও বলা চলে না। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে জৈনধর্ম্মাবলম্বী সোমদেব নীতিবাক্যামৃত" গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। যদি জৈনগণ অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করিতে পারেন, তবে বৌদ্ধগণ সেই পথ অনুসরণ কেন করিলেন না, তাহার উপযুক্ত উত্তর দেওয়া চলে না। পরন্তু কোনও কোনও প্রত্নতত্বানুধায়ী মনীষী মহোদয় কামন্দককেও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া থাকেন। হয়ত অনেকে ইহাও বলিতে পারেন যে ক্ষত্রিয় রাজত্বের অবসানের পর হইতেই অর্থাৎ শূদ্ররাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রাদুর্ভাব কমিয়া আসিয়াছে; কিন্তু "শুক্রনীতিসারের" কাল যদি আমরা খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনুমান করি, তবে তাহাও বলা চলে না। এখন প্রশ্ন হইবে যে তবে এই অর্থশাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় অবনতি লক্ষিত হয় কেন? আমাদের মনে হয় তন্ত্রসাহিত্য এবং পৌরাণিক সাহিত্য যখন হইতে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল তখন হইতেই অর্থ শাস্ত্রের পৃথক ভাবে আলোচনা কমিয়া আইসে। স্বনামখ্যাত অধ্যাপক কে, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মহোদয় এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই সমীচীন ও সুধীসম্মত মনে হয়। তাঁহার মতে—যখন শূদ্ররাজগণের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যবর্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর আধিপত্য করিবার অভিলাষ ত্যাগ করিয়া সুবৃহৎ ও সার্ব্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা

করিতে লাগিলেন, তখন অর্থশাস্ত্রের আদরও কমিয়া আসিয়াছিল এবং প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ কাল মগধাধিপত্য সুবিস্তৃত রাজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় চাণক্য কিংবা তাহার পূর্ববর্তী অর্থশাস্ত্রবিদগণ সুবৃহৎ রাজ্যস্থাপন করে যে সকল নীতিবিষয়ে বিতর্কাদি করিয়া তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের এবং অদ্ভুত মেধার পরিচয় দিয়াছিলেন ক্রমে ক্রমে তাহার প্রয়োজনও কমিয়া আসিতেছিল। অধিকন্তু অর্থশাস্ত্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি সূত্রচ্ছন্দে লিখিত বলিয়া উহা ঐ বিষয়ে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরই অধিগম্য ছিল, পরন্তু সাধারণে উহা গ্রহণ করিতেই পারে নাই; সুতরাং উহার আলোচনাও কমিয়া আসিতেছিল।

যদিও কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্র, কামন্দকী-নীতিসার ও শুক্র-নীতিসার ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি বাঙ্গালা ভাষায় কোনটিরই অনুবাদ হয় নাই। মাদৃশ অল্পজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে নীতিশাস্ত্রের যে কোনও গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিবার চেষ্টা ধৃষ্টতা হইলেও, আশা করি এই কার্য্যে একবার অবতীর্ণ হইলে সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং ভবিষ্যতে এই সকল গ্রন্থের সুন্দর অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষায় গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।

কামন্দকী নীতিসার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিতে অভিলাষী হইয়া অদ্য এই প্রবন্ধে কামন্দক ও তাহার গ্রন্থসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিব।

গ্রন্থারম্ভেই কামন্দক নিজকে "নন্দবংশ ধ্বংশকারী" বিষ্ণুগুপ্তের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষেও "অর্থশাস্ত্র" ও "কামন্দকী নীতিসার" এক সঙ্গে পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে কামন্দক সামান্য দুই চারিটি বিষয় ব্যতিরেকে সর্ব্বত্রই তাঁহার আচার্য্যের মতানুসরণ করিয়াছেন; এমন কি অনেক স্থলে উভয় গ্রন্থের ভাষায় সৌসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক বর্ত্তমান যুগে নানারূপ গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" খৃঃ পূঃ ৩০০ সন মধ্যে যে কোনও সময়ে বিরচিত হইয়াছিল। সুতরাং কামন্দককে খৃঃ পূঃ ৩০০ শতাব্দীর পূর্ব্বের বলা যাইতেই পারে না। পণ্ডিত প্রবর আর, শ্যামশাস্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় কামন্দক নীতিসার গ্রন্থের

ধর্ম্মাত্মৈ যবনো রাজা চিরায় যুযুধে ভুবং।
অশ্বং চৈব নহবা প্রতিপেদে সনাতনং॥

শ্লোকটি উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে কামন্দক এই শ্লোকে যবন শব্দ প্রয়োগ দ্বারা কোনও যবন রাজাকে বুঝাইয়াছেন এবং খুব সম্ভবতঃ ঐ যবন রাজাই কনিষ্ক নৃপতি কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পণ্ডিত প্রবর শ্যামশাস্ত্রী মহোদয়ের অনুমান স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে কামন্দক কনিষ্কের সমসাময়িক কিংবা তাঁহার পরবর্ত্তী কালের লোক ছিলেন; কিন্তু উদ্ধৃত শ্লোকের "যবন" শব্দ পৃথক ভাবে 'যৈ' এবং 'বন' পাঠ না করিয়া একত্রে "যৈবন" পাঠ করিলে সগরবংশ সম্ভূত যাবনক নৃপাঙ্ক যৈবন কও বুঝাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত ব্যতিরেকে পৌরাণিক যুগের নৃপতিগণের মধ্যে অন্য রাজগণের নামোল্লেখ দেখিতে পাই না। সুতরাং শ্রীযুক্ত আর, শ্যামশাস্ত্রী মহোদয়ের ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না।

ডাক্তার ফ্রেডরিক্ মহোদয় লিখিয়াছেন যে বালী দ্বীপে "কামন্দকীয়া নীতিসার" সর্ব্বাপেক্ষা আদৃত ও লোকপ্রিয় গ্রন্থ। স্যর রেফ্লস এবং ক্রফোর্ড সাহেবের মত এই যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল উত্তেজনার সময় যবদ্বীপ অধিবাসী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ বাধ্য হইয়া খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীতে তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ ও দেব মূর্ত্তি সকল সঙ্গে লইয়া বালীদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহা হইতে অনুমিত হইবে যে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে কোনও সময়ে "কামন্দকীয় নীতিসার" বিরচিত হইয়াছিল। এবং কোনও কোনও মনীষী অনুমান করেন যে হিন্দুগণ যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময়ে যখন ভারত হইতে যাত্রা করেন তখন এই গ্রন্থখানাও ভারতবর্ষ হইতে সঙ্গে নিয়াছিলেন। বালীদ্বীপে চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রন্থখানির যেরূপ সমাদর ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহাতে স্বতঃই মনে উদিত হয় যে ঐ গ্রন্থখানা ন্যূন পক্ষে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীরও একশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের একশত ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আমরা মহর্ষি কামন্দকের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। তথায় আঙ্গরিষ্ঠ ও মহর্ষি কামন্দক ধর্ম্ম-বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। এই মহর্ষি কামন্দক যে আমাদের অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কামন্দক নহেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। কারণ তাহা হইলে আমরা মহাভারতের বর্ত্তমান অবস্থার রচনা কাল খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীতে ফেলিতে বাধ্য হইব; কিন্তু তাহা অসম্ভব ও প্রমাণ বিরুদ্ধ। অধিকন্তু অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থকর্ত্তা কামন্দকের অদ্ভুত মতাবলীর সহিত মহাভারতের মহর্ষি কামন্দকের মতাবলীর কোনও সাদৃশ্য নাই।

কামন্দকের 'নীতিসার' গ্রন্থখানি ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেক সর্গই শ্লোকবদ্ধ ছন্দে লিখিত; কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা শ্লোকে লিখিত হইলেও ইহাতে কবিত্ব—মাধুর্য্য খুব অল্পই অনুভূত হয়। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শ্লোকগুলিতে গাম্ভীর্য্য এবং সংক্ষিপ্তভাবে ভাব প্রকাশের চেষ্টা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সর্গে রাজা ও রাজন্যবর্গের প্রতি উপদেশ এবং ইন্দ্রিয় বিজয় ইত্যাদি বিষয়ে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গে বিদ্যাবিভাগ, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা এবং দণ্ড মাহাত্ম্য, তৃতীয় সর্গে রাজাপ্রজা সম্বন্ধে এবং সুবিচার ও অবিচারের ফলাফল, চতুর্থ সর্গে স্বামী, অমাত্য, দুর্গ, কোষ, জনপদ এবং মিত্র ও রাষ্ট্র—রাজ্যের এই সপ্তাঙ্গ বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চম সর্গে স্বামী এবং অনুজীবীবর্গ সম্বন্ধে এবং ষষ্ঠ সর্গে রাজ্যের কণ্টক শোধন ব্যবস্থা নিহিত আছে। সপ্তম সর্গে পুত্র ও অমাত্যাদি রক্ষণ, বিষ প্রয়োগাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়, এবং অষ্টম সর্গে মণ্ডল গঠন বিষয়ে ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই অষ্টম সর্গটি অত্যন্ত জটিল হইলেও রাজনীতি হিসাবে অত্যন্ত আবশ্যক। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে এই মণ্ডল পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবেই আলোচিত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে কামন্দকও তাঁহার গুরুর অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু শুক্রনীতিসারে এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহে আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই না। ইহার কারণ মনে হয় যে রাজ্য সংস্থাপনের প্রথমাবস্থায় মণ্ডল-গঠনের প্রয়োজন থাকিলেও পরবর্ত্তীকালে যখন সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল তখন মণ্ডল প্রক্রিয়ার যুক্তিতর্কের অবতারণা ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে উহার আবশ্যকতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সর্গে সন্ধি, বিগ্রহ, মন্ত্রণা ও দূত প্রচার সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ সর্গে রাজব্যসনাদি এবং তাহার প্রতিকার, চতুর্দ্দশ সর্গে সপ্ত-ব্যসনাদি এবং পঞ্চদশ সর্গে যাত্রাভিযোগ দর্শন বিষয়ে বিবৃত আছে। ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশতি সর্গে সৈন্যসজ্জা, যুদ্ধ প্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা আছে।

শুক্রনীতিসার গ্রন্থে যেমন সমাজ নীতি এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে এই গ্রন্থে তাহার অভাব লক্ষিত হয়। অনেকে বলিয়া থাকেন যে এই কামন্দক নীতিসার গ্রন্থের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রভৃতি সর্গ নৈতিক হিসাবে অত্যন্ত বিগর্হিত ও কূটভাবাপন্ন। এই সম্বন্ধে পাঠকগণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজ নিজ মতাবলম্বন করিতে পারেন, তবে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে যেখানে কূটরাজ নীতির আশ্রয় লইবার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, সেই স্থলেই কেবল কূটনীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে; নতুবা সাধারণতঃ দেখা যাইবে যে এই গ্রন্থের প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে উচ্চ আদর্শের নৈতিক শিক্ষার ও নৈতিক পন্থা-বলম্বনের জন্য নিয়মাবলী সন্নিহিত আছে।

এই গ্রন্থের প্রত্যেক সর্গের সমাপ্তিকেই সেই সর্গের আলোচ্য বিষয় সন্নিবেশিত আছে। কৌটিল্য ও কামন্দকের উভয় গ্রন্থের মধ্যে কামন্দক যে যে বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহারই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। আমরা প্রথমতঃ যদিও দেখিতে পাই যে কামন্দক তাঁহার নীতিসারে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেরই সারাংশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি কার্য্যকালে দেখি "অর্থ শাস্ত্রের" পঞ্চদশ অধ্যায়ের মধ্যে "রাজ্যশাসন পরিদর্শন" "ব্যবহারনীতি" প্রভৃতি চারিটি অধ্যায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহাতে যে গ্রন্থের আয়তনই কেবল মাত্র সংক্ষিপ্ত

হইয়াছে, এমন নহে; পরন্তু রাজনীতি গ্রন্থ হিসাবে উহার আদর এবং মূল্যও তৎপরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। কৌটিল্যের রাজ নৈতিক মতাবলীর সহিত কামন্দকের কতটুকু পার্থক্য কিংবা সামঞ্জস্য আছে, তাহা বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

অর্থনীতি শাস্ত্রের গ্রন্থকারগণ গ্রন্থারম্ভে সর্ব্বপ্রথমেই দেব উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কিংবা দেবনাম স্মরণ করিয়া তৎপরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণকে অভিবাদন করিয়াছেন। কৌটিল্য সর্ব্বপ্রথমে "ওঁ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; 'শুক্রনীতি সারে'

"প্রণম্য জগদাধারং সর্গস্থিত্যন্তকারণম্।

সংপূজ্য ভার্গবঃ পৃষ্টো বন্দিতঃ পূজিত স্তুতঃ" ॥ ইত্যাদি এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন। "যুক্তিকল্পতরু"র প্রারম্ভেও আমরা—

"বিশ্বসর্গবিধোবেধা স্তুৎ পালয়তি যো বিভুঃ।
তদত্যয় বিধাবীশ স্তং বন্দে পরমেশ্বরম্ ॥
কংসানন্দমকুর্ব্বাণঃ কং সানন্দং করোতি যঃ।
তং দেববৃন্দৈরারাধ্যম নারাধ্যমহন্তজে ॥" এইরূপ

দেখিতে পাই; কিন্তু কামন্দকের গ্রন্থারম্ভে দেবাদির আরাধনা নাই। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে কেহ কেহ অনুমান করেন যে কামন্দক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত প্লেটো, ফ্লোরেন্স নগরবাসী মেকিয়াভেলী, ইংলেণ্ডাধিবাসী রজার এসাম্ কিংবা জার্ম্মানীর বিসমার্ক যেমন প্রতীচ্য দেশের "রাজগুরু" বলিয়া খ্যাত, তেমনই চাণক্য, শুক্রাচার্য্য, কামন্দক প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রবীদ্ মনীষীগণ প্রাচ্য দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া এবং রাজন্যবর্গকে মন্ত্রণাদ্বারা রাজ্যশাসন, দেশজয় বিজ্ঞানে অভিজ্ঞাত করাইয়া, প্রজাশাসন এবং রাজধর্ম্ম বিষয়ে উদার নীতি সকল বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারাও "রাজগুরু" পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে এবং প্রকৃত পক্ষে ইহা একটা সত্যই অভিমানের বিষয় যে প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৪২৯ হইতে ৩৪৭ অব্দ), এবং এরিস্টোটল্ (খৃঃ পূঃ ৩৮৪ হইতে ৩২২ অব্দ), প্রভৃতি অতি প্রাচীন প্রতীচ্য দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রাদুর্ভাব হইবার বহু শতাব্দ পূর্ব্ব হইতেই এই ভারতবর্ষে অর্থশাস্ত্রবিদ্ সুপণ্ডিত জ্ঞানী মহাপুরুষগণ জন্মলাভ করিয়া অর্থশাস্ত্র আলোচনার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

আমাদের আলোচ্য নীতিসার গ্রন্থ কোনও বিশেষ রাজ সভায় কিংবা কোনও বিশিষ্ট নৃপতির জন্য লিখিত হইয়াছিল কি না তাহা এখন পর্য্যন্ত জানিবার উপায় নাই কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, প্রচীন আর্য্য সমাজে রাজনীতি ক্ষেত্রে মহারথীগণ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কালের কুটিল গতিকে প্রতিহত করিয়া যে কয়েকখানি গ্রন্থ বিদ্যমান্ আছে, তন্মধ্যে ইহা একটি অত্যুৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান্ গ্রন্থ। এবং আমরাও এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া "বামনের চন্দ্র লাভের আশার ন্যায়" কামন্দকীয় নীতিসারের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিতে সাহসী হইয়াছি। যতটুকু সম্ভব যথাযথভাবে মূল শব্দানুযায়ী অনুবাদ করিতে যাইয়া অনেকস্থলে ভাষার সৌন্দর্য্য হানি হইলেও উহাই সুধীসম্মত পন্থা বিবেচনায় আমরা সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছি। মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে যে মাধুর্য্য ও আন্তরিক আনন্দানুভব করা যায়, তাহা অনুবাদ পাঠে আশা করা বৃথা।

শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ।
(সুসঙ্গ)

সমস্যা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নগেনের মন আজ খুব সুস্থ নহে। বিধু বাবু চলিয়া যাইবার পর হইতে প্রায় সমস্ত দিন তাহার মনে নানা রকম চিন্তা তরঙ্গ তুলিয়া খেলিতেছিল। দুর্গাদাস বাবু এ পর্য্যন্ত কখনও তাহাকে ডাকেন নাই—সে তাঁহার নিকট কোন বিষয়ের জন্য কোন অনুরোধও করে নাই; তবে কেন তিনি জরুরী চিঠি দিয়া তাহাকে ডাকাইলেন? প্রুফ দেখিতে কি? মেডিকেল পুস্তকের প্রুফ—সে তো শৈলেনই রীতিমত দেখিতেছে। ছেলে দুটীকে পড়াইতে? সে ও তো যতীন্ বাবুই আছেন। বোধ হয় বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে খাওয়া দাওয়া আছে; সে জন্যতিনি নিজে না লিখিলেও তো পারিতেন। মেয়ে দশ জনে অবাধ মিসামিসিতে কোন রকম অশিষ্ট

ব্যবহারে, অপ্রিয় কথা লইয়া কিছু অসম্ভব নহে! তেমন তো কিছু হইয়াছে, মনে হয় না!

কিছুই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না; কোন সান্ত্বনাই তাহার মনকে আজ শান্তি দিতে পারিতেছিল না বলিতে কি, আশঙ্কা অপেক্ষা দুশ্চিন্তাই তাহার মনে জাগিতেছিল বেশী। এই কাগজের টুকরা খানা আজ তাহাকে এত দুশ্চিন্তায় না ফেলিলে বিধুর মরণ কথা তুলিয়া লইয়া নগেন আজ বন্ধু সমাজে কত রহস্যই না করিত! কত হাসিই না হাসিত!

শৈলেন দুর্গাদাস বাবুর বাড়ীর অনুসন্ধান পাইয়াছে কি না, জানিবার জন্য নগেন পাঁচটা না বাজিতেই বাহির হইয়া পড়িল।

শৈলেন তখনও কলেজ হইতে আইসে নাই। নগেন আরও কিছু অপেক্ষা করিল। শেষে পাঁচটা বাজিলে উঠিয়া পড়িল।

দুর্গাদাস বাবুর বাড়ীর ভিতরে যাইতে এখন আর শৈলেন ও নগেনের মনে কোন আটক লাগে না। নগেন ভিতরে প্রবেশ করিতেই সিঁড়ির মাথায় তাহার সহিত পারুলের সাক্ষাৎ হইল। নগেনের মুখে হাসি নাই। পারুল তাহাকে দেখিয়াই হাসিয়া বলিল—"এই যে আপনাকে কাল দেখি নাই, আসুন।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"প্রতিদিনই কি দেখিতে হইবে?"

"আপত্তি কি?"

নগেনের মনের ভাব একটু যেন পাতলা হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বাবা কোথায়?"

"কলে' গিয়াছেন। এখনি আসিবেন"।

নগেন দাঁড়াইল দেখিয়া পারুল বলিল "তিনি উপস্থিত নাই বলিয়া কি আর কারু সাথে আলাপ করিতে নাই? আসুন না।"

"একটু কাজ সারিয়া আসি—" বলিয়া নগেন যাইতে উদ্যত হইল।

পারুল অভিমান ভরে বলিল—"আমরা বুঝি আর মনুষ্যের মধ্যেই গণ্য হইলাম না!"

"সেটা কেমন"? বলিয়া নগেন ফিরিয়া আসিয়া বৈঠক খানার কোঠায় বসিল।

পারুল একখানা পাখা আনিয়া তাহার হাতে দিল। তারপর সে'দিনকার দৈনিক কাগজ খানা আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"এই নিন আজকার পত্র, কথা বলিবার মত লোক না থাকে এ নিয়েই বসুন।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"আগেতো মুখ দিয়া কথাই বাহির হইত না—এখন দেখিতেছি—খৈ ফোটে।"

পারুল লজ্জিত হইল। নগেনও কথা বলিয়া লজ্জিত হইল। দুশ্চিন্তায় তাহার মনের ভাব ঠিক ছিল না। সে হাসিয়া বলিল—"আমার কথায় কি রাগ করিলে পারুল?"

পারুল বলিল "করিয়াছি বৈ কি?"

নগেন—"আমার মনটা আজ ভাল নহে। অনর্থক তোমার মনে কষ্ট দিলাম।"

পারুল হাসিয়া বলিল—"আমার মনেতো কোন কষ্ট পাই নাই। সে চিন্তা করিয়া আপনিই বরং অধিক কষ্ট পাইলেন।"

নগেন "তোমার রাগ হইয়াছে।"

পারুল হাসিয়া বলিল—"রাগ হইলেই কি কষ্ট হয়? মানুষ কথায় কথায় রাগ করিতে পারে—তাতেই কি মনে কষ্ট হয়। আপনার অসুখ কি?"

পারুল বকুলকে ডাকিয়া হাজির করিল। তারপর নিজেই প্রশ্ন করিল—"আপনার আজ কিসের অসুখ—না বলিলে পুনরায় রাগ করিব।" বলিয়া পারুল হাসিল।

এই সময় দুর্গাদাস বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগেনের মনও দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—"ব'সো, আমি আসিতেছি।"

পোষাক ছাড়িয়া ভিতরের বারান্দায় একখানা ইজি চেয়ারে বসিয়া দুর্গাদাস বাবু ডাকিলেন—"নগেন ভিতরেই এস, ব'স। বড় গরম বাহিরে, এ জায়গাটায় বাতাস বেশ।"

নগেন উঠিয়া ভিতরে গেল। বকুল একখানা চেয়ার দিয়া তাহাকে বসিতে দিল।

ভিতরের বারান্দার নীচেই একটা ছোট আঙ্গিনা। আঙ্গিনাটি অতি পরিষ্কার। চারিদিকে টবে নানা জাতীয় বৃক্ষ লতা সাজান—এক দিকে রান্না ঘর, অপরদিকে একটু দূরে পায়খানা। বাড়ীর হাবভাবে

আশা, তাতাও আর দুটী ছেলে বেড্ মিনটন খেলিতেছিল। উপরের বারান্দায় বসিয়া গৃহিণী তরকারী কুটিতেছিলেন।

নগেনকে দেখিয়া গৃহিণীও বলিলেন "বসো বাবা।"

পাকুন দুর্গাদাস বাবুর উপর পাখার বাতাস দিতেছিল। সে বাতাস নগেনকেও স্পর্শ করিতেছিল।

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন "বড় গরম পড়িয়াছে। চারিদিকে কলেরাও ভয়ানক টাইপে দেখা দিয়াছে।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—"কলেরা কেসে কল্ ছিল নাকি?"

দুর্গাদাস বাবু—"না আমি কলেরায় যাই না, তাঁরাও যাইতে দেন না। ও বড় কন্টেজিয়াস ডিজিস। একটা মফঃস্বলের কেস্ আসিয়াছিল—হার্ট ডিজিস।" দয়াল! দয়াল।"

নগেনের মন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। সে আর কোন কথা উত্থাপন করিল না, সংবাদ পত্রের উপর চক্ষু রাখিয়া বসিয়া রহিল।

দুর্গাদাস বাবু বিশ্রাম করিয়া গাড়ুর জলে হাত মুখ ধুইয়া শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'নগেন ওকালতিই তবে করিতে হইবে, এই ঠিক?"

নগেন কুণ্ঠিত ভাবে বলিল "পাস হইলে তো! পাস যে হইতে পারব, তাহার সম্ভাবনা খুব কম দু বেলা 'টিউসন' করিতে হয়। ইহার পর ল ক্লাস ও এম, এ, ক্লাস পড়ার সময় একেবারেই থাকে না।"

"কেন ল ক্লাসটা ছাড়িয়া দিলে হয় না?"

"ছাড়িয়া দিলেই বা লাভ কি? বি, এ, পাস করিয়া বি, এল, পড়ার খরচের জন্য দুই বৎসর চাকুরির উমেদারীতে কাটাইয়াছি; একটা ৩০৲ টাকার মাষ্টারীর যোগাড় হইল না। এখন কি কেবল বি, এ, র আর সম্মান আছে? আর দেশের জন্যও একটু খাটিতে ইচ্ছা হয়, তাই উকিল হওয়ার ইচ্ছা। স্বাধীন বৃত্তি, তা হবে না, বোধ হয়।" বলিয়া নগেন থামিয়া গেল।

দুর্গাদাস বাবু—"উকিল হইয়া দেশের উপকার করার মানে—গাছের মূল কাটিয়া আগায় জল দেওয়া—নয় কি? ভাইয়ের বক্ষে ভাইকে ছুরি মারিতে উপদেশ দিয়া, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে বিবাদের পরামর্শ দিয়া, পিতার বিরুদ্ধে পুত্রকে উত্তেজিত করিয়া—গরীব দেশের উপায়হীন নরনারী বৃন্দকে ততোধিক উপায়হীন করিয়া দেশের শক্তি ও রক্ত অপহরণ করিয়া—দেশের উপকার?"

নগেন কোন উত্তর করিল না।

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—"উত্তর দাও!"

নগেন ধীরে ধীরে বলিল—"উকিলের যতখানি দোষ বলা হইল, আমি ততখানি স্বীকার করিতে পারিতেছি না যে আইনের আলোচনায় রোমের একটা অত্যুচ্চ সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই রোমান লইয়া ইয়োরোপের বর্ত্তমান উন্নত সভ্যতার জন্মদান করিয়াছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে? যাহা হউক দেশের জন্য খাটিবার ইচ্ছা থাকিলে অন্য কোন কাজে থাকিয়া তাহা করিবার সুযোগ আছে কি? চাকুরী করিতে গেলে তো সে পথে পদ বাড়াইবারও অধিকার থাকিবে না।"

দুর্গাদাস বাবু হাসিয়া বলিলেন—"ওই ওকালতি, আর ওই চাকুরী—এই দুইটা ছাড়া কি তোমাদের চিন্তা অন্য কোথাও যায় না? সভ্যতা কি এইরূপেই গড়িয়া উঠিবে? লম্বা বক্তৃতা করিলে আর চাঁদা আদায় করিলে, লোককে উত্তেজনা করিলে, আর সংবাদ পত্রে article, লিখিলেই কি দেশের জন্য খাটা হয়? দেখিতেছি, আদালত ও ল আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগের ধী শক্তি সমাধিস্থল হইয়া উঠিল!"

নগেন মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল "বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে একেবারে যে কিছু হয় না, তাহা কি বলা যাইতে পারে? রাজনীতি চর্চ্চার জন্যও কি লোকের প্রয়োজন নাই?"

দুর্গাদাস—"আমরা পরাধীন জাতি, আমাদের অন্ন সমস্যা সর্ব্ব প্রধান। পরাধীন জাতির আবার পলিটিক্স কিছুই নাই, থাকিলেও আগে অর্থ নীতির সমাধান, তার পর রাজকীয় নীতির সমালোচনা। আমরা অন্ন বস্ত্র হীন মুমূর্ষু জাতি— শ্মশান যাত্রী, শ্মশান যাত্রীর কাণে—হরিনাম আর রাজনীতির কোলাহল তুল্য।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"আমরা তো শ্মশান যাত্রীর কাণে হরিনাম দিয়াই তাঁহার পুণ্যপথ যাত্রায় সহায়তা করিয়া থাকি। রাজনীতির উত্তেজনাও সেইরূপ অসার প্রাণে টনিক্কের কাজ করে।"

দুর্গাদাস—"মৃতের পুণ্য পথ যাত্রায় সহায়তা করা ও অসার প্রাণে বল সঞ্চার করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা শরীর যাহাতে রুগ্ন না হইতে পারে তাহার চেষ্টা কি সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য নহে? আমাদের জাতির জীবনে পুষ্টিকর সংস্থান চাই, অন্নসমস্যা আমাদের বর্ত্তমান প্রধান সমস্যা। যে দেশের মহাপ্রাণ লইয়া সগে' মর্ত্তে, যমে মানবে অহরহ দ্বন্দ, সেখানে অর্থের প্রয়োজন অধিক। উদরকে প্রবোধ দিয়া জাতিকে জীবিত রাখিতে পারিলে তো সে জাতির রাজনীতি! নতুবা তোমার কথা কে শুনিবে? কাহাকে শুনাইবে?„

নগেন বলিল—'আপনি কি বলিতে চান যে আমরা আমাদের সকল কর্ম্ম ফেলিয়া অর্থ অর্থ করিয়া অর্থসর্ব্বস্ব জাতিই হই! ইহাতে কি জাতির মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে?"

দুর্গাদাসবাবু হাসিয়া বলিলেন—"জগতে টিকিতে পারিলেতো জাতি, তারপরে তো জতির মনুষ্যত্ব! আমাদিকে প্রথমে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার সংস্থান করিতে হইবে। শুধু রাজনীতি চর্চ্চায় কেন? জাতি বলিয়া জগতে দাঁড়াইতে হইলে, তাহার সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেই অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ দেশের জন সমুদ্রের শোণীত শোষণ করিয়া নহে—দেশের ধুল মুঠাকে স্বর্ণ মুষ্টীতে পরিণত করিয়া করিতে হইবে শস্য শামলা বঙ্গভুমির বুকে স্বর্ণ রেণু লুকাইত আছে, আমাদগের শতকরা ৮০জনকেই যদি চাষ করিয়া খাইতে হইল, তবে এ সনাতন প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কৃষি সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে দেশের মৃত্তিকাতে সুবর্ণকণা ফেলিলে তাহা অঙ্গার কণায় পরিণত হয়, সে দেশের সেই ভুমিতে এখন সোনা ফলিতেছে। আমাদিগকে প্রথমেই অন্ন সংস্থান করিতে হইবে। তার-পর অর্থ।" "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ।" চক্ষের সম্মুখেই দেখিতেছি,একমাত্র ঘটি সম্বল মারওয়ারি দীন হীন বেশে আসিয়া দুই মন কাপড়ের বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেছে; তারপর হঠাৎ সে একখানা দোকান করিয়া বসিল। তারপর একটু স্থান করিল। দশ বৎসরের মধ্যে সেই স্থানে একতালা দুতালা করিয়া সূর্য্য পথ রোধ করিয়া পাঁচ তলা উঠিয়া পড়িল। টুপি সম্বল বণিক এখানে আসিয়া মাছের তেলে মাছ ভাজিয়া আমাদের বুদ্ধির তহবিল ভাঙ্গিয়া মানুষ হইতেছে, মটর হাঁকাইতেছে—জুড়ি গাড়ী দৌড়াইতেছে। আমরা তাহারই হাউসের বড় বাবু হইয়া অদৃষ্টের তহবিল তাকাইয়া বসিয়া আছি। আমাদের গৃহ কোণের আবর্জ্জনা ঘাটীয়া বিভিন্ন দেশের বণিকগণ তাহা কনক পিণ্ডে পরিণত করিয়া লইতেছে। তাহাদের কাঁচখণ্ড আনিয়া আমাদের চক্ষে তাক লাগাইতেছে—আমাদের শোণিত সম অর্থ তাহার বিনিময়ে শোষণ করিতেছে। আর আমরা কেরাণীগিরী ও ওকালতি, মাষ্টারী ও হাকিমি সম্বল করিয়া কোন মতে পরিবার প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করিতেছি—মনুষ্যত্ব কোথায়?"

দুর্গাদাস বাবু থামিলেন। নগেন্ মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই বক্তৃতা শুনাইবার জন্যই কি জরুরী আহ্বান? অনেকেরই এইরূপ রোগ আছে, প্রবন্ধ লিখিয়া পরকে শোনান, বক্তৃতা করিয়া মনের ঝাল মিটান। তাই সম্ভব।

বক্তৃতার সূচনায়ই নগেনের মনের ভার একেবারে হাল্কা হইয়া পড়িয়াছিল। সে ধীরে ধীরে বলিল "উপায় নাই। অল্প অভিজ্ঞতাতেই যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আমার মনে হয়, আমরা নিতান্ত আত্ম-প্রবঞ্চক জাতি, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার সম্পুর্ণ অনুপযুক্ত। আমরা মাথার উপর কর্ত্তা রাখিয়া বেশ চলিতে পারি; তখন আমাদের মনুষ্যত্বের, বুদ্ধির ও লেখনীর তেজে রাজ্য চলে, ব্যবসায় চলে, বাণিজ্য চলে, সব চলে। কিন্তু আমাদিগের দ্বারা কর্ত্তৃত্ব চলে না। প্রভু হইলে এ জাতি মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়া প্রভুত্বের অপব্যবহার করে। যৌথ কারবারের কর্ত্তা হইলে, মুলধন আত্মসাৎ করিয়া বসে। এ জাতির বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব পরের জন্য।"

দুর্গদাস বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—“তাই ভাবিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে ?”

নগেন্ বলিল—“জাতি প্রস্তুত করিতে হইলে সকল রকমই দরকার। ভারতবর্ষকে অখণ্ড ধরিয়া ভারতীয় জাতি গঠিত হউক। তাহার কর্ম্ম বিভাগ থাকুক। যে প্রদেশ যে বিষয়ের আলোচনায় অভ্যস্ত, সেই প্রদেশ সেই বিষয়ে অগ্রসর হউক। ভারতীয় জাতি গঠিত হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালী, মারহাট্টী, পাঞ্জাবী ক্ষুদ্র গণ্ডীর কি প্রয়োজন ? পঞ্জাব শক্তির চর্চ্চা করুক, বোম্বাই ধনের চর্চ্চা করিতেছে করুক, মাদ্রাজ শিল্প বিজ্ঞানের চর্চ্চা করুক, পশ্চিমারা মজুরী করুক, কৃষিকর্ম্ম কেরাণীগিরী ও বক্তৃতা করুক বাঙ্গালী, জাতি গঠিত হইতে সকল বিভাগইতো প্রয়োজন।

দুর্গাদাস বাবু হাসিয়া বলিলেন “ছেলেমি কথা—বাঙ্গালীর ধনের প্রয়োজন নাই ! আর বোম্বাইর লোকের আহার্য্য সামগ্রীর জন্য বা কেরাণীর দরকার হইলে বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া থাকবে ! ছেলেমি কথা !”

নগেন বলিল—“ঠিক তা নয়, কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্যে বা শিল্প বিজ্ঞানে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন, বাঙ্গালীর জীবন যাত্রায় সে ধৈর্য্য ধারণের সময় কোথায়, সংস্থানই বা কোথায় ? আমার সম্বন্ধেই আমি বলিতে পারি, অর্থাভাবে পড়া হইতেছে না, এ দিকে বাড়ী হইতেও অর্থেরই প্রচণ্ড তাড়া। নিতান্ত বেহায়া বলিয়া দুই বেলা দুটা টুইসন্ করিয়া কলেজে যাইতেছি মাত্র। বি, এ, পাস করিয়াছি, বাড়ীর লোকের কত আশা। আমার পক্ষে কি শিল্প বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেণ্টের সময় আছে, না তার মত অর্থ আছে ?’

দুর্গদাস বাবু রাগ করিয়া বলিলেন—“তবে দাসত্বই কর ! নূতন পন্থার নাম শুনিলেই যখন শরীর শিহরিয়া উঠে—দাসত্ব চিন্তার বাহিরে যখন আর চিন্তা যায় না, সেই চিন্তায় মনুষ্যত্ব হারাইয়া গড্ডলিকা প্রবাহের মত এক পথে এক চিন্তা রোমন্থন করিতেই যখন অভ্যস্ত, তখন আর এ জাতির গতি নাই। ওকালতি, কেরাণীগিরি, হা কৃষি আর মাষ্টারী”—

দুর্গাদাস বাবু উঠিয়া গেলেন। নগেন বসিয়া রহিল। তারপর চেয়ার খানা টানিয়া একটু সম্মুখে যাইয়া নীচের আঙ্গিনায় ভাতা ও আশাদের খেলা দেখিতে লাগিল।

দুর্গাদাস বাবু একখানা ছাপার কাগজ আনিয়া নগেনের হাতে দিয়া বলিলেন- “দেখ—পড়—তোমাকে এ পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে ! আমি জোর করিয়া তোমাকে পাঠাইব। তোমার উকীল হইবার আর দু বৎসর বাকী ; সে খান হইতে আসিয়াও বি, এল, এর জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে।”

নগেন—“এ সায়েণ্টিফিক এসোসিএসনের প্রস্পেক্টাস—আমি দেখিয়াছি। আমার পক্ষে এ আবুহোসেনের স্বপ্ন—গরীবের ঘোড়া রোগ।”

দুর্গাদাস বাবু হাসিয়া বলিলেন—“তবে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। দয়াল—দয়াল। আমেরিকা যাইতে হইবে ; খরচ পত্রের চিন্তা তোমায় করিতে হইবে না। কোন্ সাবজেক্ট তুমি নিবে, সেইটাই চিন্তা কর।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“ইহারও কি পরিণাম—সেই কেরাণী গরিই নহে ? আমরা কি কেপিটেল দিয়া ব্যবসায় করিতে পারিব ?”

দুর্গাদাস—“জ্ঞান হইলে, ধন হইলে, ক্রমে করিব।”

নগেন—“ত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে এই দশজন, আর পাঁচ জন, শিল্প বিজ্ঞান শিখিয়া দেশের কি মহৎ উপকার করিবে ?”

দুর্গাদাস—“আদিশূর কাণ্যকুব্জ হইতে মাত্র পাঁচটী ব্রাহ্মণই আনিয়াছিলেন—আজ তাহা হইতে লক্ষ লক্ষ জনের উৎপত্তি হইয়াছে। বীজ অঙ্কুরিত হইলে, ফলের অভাব থাকে না। যাই হউক, সে জন্য আমি দায়ী। আমাদের সম্মুখে বাঙ্গালার অর্থনীতির সমস্যা উপস্থিত, তাহাই আমাদিগকে এখন সর্ব্বশক্তি প্রযুক্ত করিয়া সমাধান করিতে হইবে।”

পারুল চা লইয়া আসিল।

* * *

বাহিরের ছাদে তখন বিধু বাবু ও গৃহ শিক্ষক যতীন বাবু বসিয়া গল্প করিতেছিল। বাহিরের বারান্দায় বিধুকে দেখিয়া নগেনের পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। নগেন্ তাহাকে চক্ষু টিপিয়া আশ্বাস দিল।

নগেন চলিয়া যাইতেছে, দেখিয়া বিধুও তাহার

...আলাপ করিতে উদ্যত হইল। নগেন বলিল—"কিছু মনে করিবেন না—চা খান; আমি প্রয়োজনীয় কার্য্যে যাইতেছি, তারপর পড়াইতে যাইব। এখন আপনার সঙ্গে আলাপে আমার মজুরী পোষাইবে না। কাল সকালেই সাক্ষাৎ হইবে, তখন সব বলিব।"

নগেন চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নগেন ছেলে পড়াইয়া আসিয়া রাত্রি ৮ টায় শৈলেনকে হোটেলে ধরিল এবং তাহার নিকট একে একে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। বিধুর প্রস্তাবের ভিতর যে গূঢ় তত্ত্ব ছিল, তাহাও গোপন করিল না। সমস্ত কথা বলিয়া নগেন্ জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কর্ত্তব্য?"

শৈলেন বলিল—"এ অতি উত্তম প্রস্তাব। সুবর্ণ সুযোগ, এ সুযোগ অবহেলা করিতে নাই।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"সুযোগ যে সুবর্ণ অথবা তাহা না হইলেও রজত সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নাই,—তবে বিধুর কথিত উদ্দেশ্য যদি সত্য হয়, তবে সেটাই আলোচনা ও বিবেচনার বিষয়। বাবার মত কিছুতেই হইবে না।"

শৈলেন—"তোমার বাবার মত কোনটাতেই হইবে না। বিলাত ফেরত লইয়া গ্রামে যে দলা দলি আরম্ভ হয়েছে—ইহার পর তিনি কিছুতেই এরূপ প্রস্তাবে মত দিবেন না; দিতে পারেন না।"

নগেন—"তারপর দেখ বিপদ কত, সান্যালদের সঙ্গে তারা নালিস করিয়া প্রায় সাড়ে চারি হাজার টাকা ডিক্রি করাইয়াছেন। রেহানী সম্পত্তি—বাড়ীঘর ও জমিটুকু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায় নাই, বাবা ঋণ করিয়া সংসার চালাইতেছেন। ভরসা আমার বিবাহ। পণ লইয়া বিবাহ করিব না, বিবাহ করিব না—এরূপ ভারত উদ্ধারি কথা মনের ভিতর জাগিয়া ছিল। বি, এ, পাস করিয়া যে কি একটা কিছু হইব, তাহা পূর্ব্বে কল্পনাই করিতে পারি নাই। এখন হইয়াছি, গ্রেজুয়েটের মূল্য কত, তাহাতো দুই বৎসর উমেদারী করিয়াই দেখিয়াছি। ইহারপর আরটাকা লইয়া বিবাহ করিব না—বাবাকে এ কথা লিখিতে সাহস পাই নাই। উপার্জ্জনের সুবন্দোবস্ত না করিয়া বিবাহ করিব না—ইহাই লিখিয়াছি,মুখেও বলিয়াছি। এখন বাড়ী ঘর ও জমিটুকু রাখিবার উপায় কি? পরিবারকে এই রূপ বিপদে ফেলিয়া, সেই পরিবারের এক মাত্র ভরসার স্থল—যদি পৃষ্ঠ ভঙ্গদিয়া—এমন একটা কাজ করিয়া বসি, যাহাতে বাবারও সমাজে মুখ না থাকে, তবে সেটাই বা কেমন হয়? এ বিষয়ের সৎ পরামর্শ কি?" বলিয়া নগেন একটা বালিস টানিয়া লইয়া চিৎ হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

শৈলেন বলিল—"ঋণ সম্বন্ধে তোমার আমার সকলেরই সমান সমস্যা। বিবাহ সম্বন্ধে এবং ভারত উদ্ধারি কথাবার্ত্তা সম্বন্ধেও কলেজের ছেলেদের বোধ হয় পনর আনারই একমত। সংসারের প্রকৃত পন্থা এক, আর আমাদিগের পরস্পর পদি ব্যবস্থা—জল্পনা কল্পনা ঠিক তার বিপরীত। সুতরাং কল্পনা বায়ু গ্রস্ত আমাদিগের মত কলেজিয়ানদিগের পরামর্শে—এ সকল ব্যাপারে বিশেষ কোন উপকার দর্শিবে না। শিল্প বিজ্ঞান সমিতি লোক পাঠাইবেন—আগামী আগষ্ট মাসে। তুমি দুর্গাদাস বাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিও না, এখন তোমার বাড়ীতেও এসম্বন্ধে লিখিও না, কাহাকে কিছু জানিতেও দিও না। কলেজ বন্ধের আর মাত্র দেড় মাস আছে, বাড়ীতে যাইয়া সকল সমস্যারই সমাধান করা যাইবে। তোমার বাবাকে—সাড়ে চারি হাজার টাকা লইয়া যদি তোমাকে কোথাও পাত্রস্থ করিতে পারেন, তাহার—সম্মতি দান কর। বিবাহ করিব, সম্মতি দান করিলেই বিবাহ করা হয় না। অনর্থক পিতার বিরাগ ভাজন হওয়া কদাপি সঙ্গত নহে।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"দুর্গাদাস বাবুর মেয়ে বিবাহ করা কি তুমি পরামর্শ দাও?"

শৈলেন—"দুর্গাদাস বাবু ব্রাহ্ম, তুমি হিন্দু; তুমি কেন তাঁর মেয়ে বিবাহ করিবে?"

নগেন—"তবে তার প্রস্তাবে সম্মতি দেই কেন?"

শৈলেন—"তিনি কি কোন কমিসন দিয়াছেন? তেমন তো দেন নাই, দিতে পারেনও না।"

নগেন—"দেন নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিধুর কথা ঠিক,—সে সব খবর রাখে।"

শৈলেন "তেমন হইলে—দশ হাজার নগদ, একখানা বাগান বাড়ী সহ একটী well accomplished * * —কে না তাহা, গ্রহণ করিতে উপদেশ দিবে? আমাদের সমাজের জাত ধনীর বাক্সের ভিতর সর্ব্বদাই।" বলিয়া শৈলেন উচ্চ হাস্য করিল।

আজ শৈলেনের মনে বেশ একটু স্ফূর্ত্তি ছিল। সে পকেট হইতে তার বৌদির চিঠিখানা খুলিয়া নগেনকে পড়িতে দিল।

নগেন চিঠি পড়িয়া বলিল—"আজই পাইয়াছ? উত্তর দিয়াছ কি? কি উত্তর দিলে?

শৈলেন হাসিয়া উত্তর করিল—হাঁ—না—কিছুই না।"

"সে কেমন?"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"তিন প্রশ্নের উত্তর।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি বৈশাখেই?"

শৈলেন—"কোন অসুবিধা ছিল না, কলেজ এখন প্রায় নাই, কিন্তু জুলাইতেই পরীক্ষা; মনে হয়, পরীক্ষার পরে হইলেই বিশেষ সুবিধা হয়। তখন তোমাদেরও পরীক্ষা হইয়া যাইবে। সে কথাই লিখিয়া দিব। ঐ সময় বাড়ীতে সকল পরামর্শই হইবে। সমাজ সমস্যারও মীমাংসা করা যাইবে।

ময়মনসিংহের কবি কাহিনী।

কবি হারাইল বিশ্বাস।

ময়মনসিংহের নেত্রকোণা বিভাগে, চাইরগাতিয়ার বিশ্বাস বংশে কবি হারাইল বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বাস মহাশয় কোন টোলে বা স্কুলে গিয়া বিদ্যাভ্যাস না করিলেও একজন সুশিক্ষিত লোক ছিলেন। কবিত্ব শক্তি ছিল তাঁহার স্বাভাবিক সম্পত্তি। তিনি কবি গান, ঘাটু গান, বাউল গান ভিন্ন কোন পদ্য পুস্তক রচনা করিয়া যান নাই। বিশ্বাস মহাশয়ের রচিত গীতাবলীই তাঁহার কবিত্ব প্রতিভার পরিচায়ক। ভাবোচ্ছ্বাস পূর্ণ সেই রসাল গীতি কবিতাগুলি একত্র করিলে একখানা বৃহদাকারের পুস্তক হইতে পারে।

আমরা নিম্নে কবি হারাইল বিশ্বাসের রচিত কয়েকটী গান উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

গীত—মালসী।

চিতান,—কর্ম্ম ক্রমে এসে এই জন্ম ভূমেতে।

পারান,—পেয়ে দারাপুত্র পরিবার, মনে করে অহঙ্কার,

তাঁদের কর্ত্তা হয়ে ভুলে আছি মা,—তব মায়াতে।

লহর,—জানি সংসারেতে কর্ত্তা হওয়া,

স্বপ্নে যেমন রাজ্য পাওয়া,

মাগো,—মায়া নিদ্রা ভাঙ্গল না,—তারা মা, মা,

মাগো,—আমার পুত্র আমার দারা,—

তাই ভেবে প্রাণ হৈল সারা—

"তারা,, বলে একদিন তারা,—ডাকতে পাল্লাম না।

মিল,—তারা দিন কতককাল সুখে ভুলে আছি নিশিদিন।

—যখন আসবে শমন, কর্ব্বে দমন,—

এ সুখের দিন কোথায় রবে?

মহড়া, তারা মাগো,—আমায় বল শুনি মা,

সে দিন আমার কি সুখে যাবে?

ধুয়া,—সময় অন্ত হবে যখন, দারাপুত্র এসে তখন,

কর্ব্বে নিরীক্ষণ,—

বলবে,—ছিলে কর্ত্তা, চল্লে কোথা?

রেখে যাও কি ধন?

করিয়ে ধনের উদ্দেশ, দায়া মায়া কাঁদিয়া শেষে,

আমায় সাজায়ে সন্ন্যাসীর বেশে,

শ্মশান ভূমে ফেলে দিবে।

খাদ—ভোজের বাজী এ সংসার জানি গো শিবে।

লহর,—জানি বন্ধুবর্গ আছে যারা,

দিনে দিনে সবেই তারা,—কর্ব্বে তারা, ধনের প্রার্থনা—

তারা মা, মাগো, সবে বলবে সে সময়ে,

দিয়ে কি ধন যাওহে দিয়ে,

আমি যাব যে ধন লয়ে, কেউ তাহা বলবে না।

মিল,—পূর্ব্ববৎ।

এই গীতটির পরচিতান, ঝুমুরাদি অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেল না।

(২)

চিতান,—শ্যামসি, শ্যামসি তারা, শাস্ত্রে শুন্তে পাই।

পারান,—তারা গো,—দয়াময়ী ব্রহ্মময়ী, তোমা বই আর অন্য গতি নাই।

হ ,—কালী কালী বলে কালী,—ভেবে অঙ্গ হৈল কালি,
—তবু তো এলে না কালী হৃদয় পদ্মেতে,—
এমা শ্মশান কালী,—ওগো পাষাণ কালী,—
বুঝি আমার কপালেতে কেবলি কালি,—
কালী তোরে না খাইলে, যাবে কি কালি অন্তর হইতে ॥
মিল,—আমার পিতা যেমন পাগলা ভোলা,—
পাগলী মা তোর তেমনি খেলা,—আমিও পাগ্‌লা,—
এবার তিন পাগলে করে মেলা, ভব জ্বালা সব ঘুচাব।
মহড়া,—দেখ্‌ব কেমন পাষাণের বেটী পাষাণ হয়ে রও,—
এবার—পাষাণ ঝাড়া মন্ত্রে তারা,—তোমারে গলাব!
,—আরোহিয়া পূণ্য রথে,—
জ্ঞান অশ্ব জুড়ে তাতে,—
দাঁড়াব মা ভক্তি পথে,—করেছি মনন,—
এমা শ্মশান কালী, ও মা পাষাণ কালী,—
করতে শমন দমন,—
মা হৃদ্‌পদ্মে পাদ পদ্ম ধরি,—
মন্‌কে রক্ত জবা করি,
মানস অঞ্জলি পূরি পূজিব চরণ।

এই গীতটি একবারে অসম্পূর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছি। [illegible] কোন নিয়মিত রূপ নাই। কবির ভাব ও রচনা [illegible] সুন্দর ছিল, সন্দেহ নাই।

(৩)

চিতান,—সুখের নবমী গত,—বিজয়ার প্রবেশ।
পরাণ,—নিয়ে গৌরী,—সর্ব্ব শূন্য করি,—
কৈলাসেতে চলিলেন মহেশ ॥
ফুকার,—তাই দেখে সব পুরবাসী,
বলে নয়ন জলে ভাসি,—
কৈ গো পাষাণ গৃহিণি,—
কি সুখে রয়েছ বসে,—উমা তোমার কৈলাসে,
বারান্ন কালে একবার এসে,—হের ঈশানী।
[illegible],—যেমন বন হারা হরিণীর প্রায় গিরিরাণী,—বলে,—
এমা উমা খানিক দাঁড়া করি কোলে।

মহড়া,—আমার প্রাণ কুমারী,—
মর্ম্ম পুরী আঁধার করি,—কেন মা যাইতেছ চলে।
ধুয়া,—আমি সংবৎসরে, আহ্লাদ করে,—আন্‌লাম তোরে,
মনের এই সাধ, প্রাণ জুড়াব বক্ষে ধরে,—
হায়! হায়!! হায়!!! হায় অকস্মাৎ,
শিবে দিয়ে বজ্রাঘাত,—
মা, কি আনন্দে নিরানন্দ করে গেলে ॥
খাদ,—কাল কিছু খাইলেনা মা,—ঘুমে ছিলে।
লহর,—আমার এই সাধ রৈল অন্তরে,—
ক্ষীর ননী রৈল পড়ে,—
খেলে না মা তায়,—কাল নিদ্রায়, হায় হায় রে!
কার লাগি করিয়া যতন,
কল্লেম তোরে প্রতিপালন,
কারে সঁপে দিলাম এখন, কেবা লয়ে যায় ॥
মিল,—আমার মনোসাধ না মিটিল মায়ায় ভুলে,—
বলি ও উমা,—আর একবার আয় তোর মার কোলে।

(৪)

চিতান,—ভারতের অন্তর্গত, কুমারী গ্রাম সুবিখ্যাত,
নীলকমল শর্ম্মা আছেন তায়
পারাণ,—তাঁহার কন্যা এলোকেশী, ষোড়শী রূপসী,
দেখে তার বদন শশী, উর্ব্বসী পলায়।
লহর,—তা'কে বিভা কল্লেন নবীন দ্বিজবর,
* * * মরি হায় রে,
থাকে কল্‌কাতা সহরে, কম্পোজের কার্য্য করে,—
নারী তার পিতৃ গৃহে থাকে নিরন্তর।
মিল,—তাকে ছলে বলে ভ্রষ্টা কল্লে দুষ্টপাপী দুরাশয়।
মহড়,—ধন্য মহন্ত রাজা, ধ্বজা উড়াইলে মন্দ নয়।
ধুয়া,—তুমি জাঙ্গ্যা পরে, মরছ ঘুরে কেন মহাশয়,—
তোমার যেম্‌নি মজা, তেম্‌নি সাজা লোকে কয়,—
থাকতে রঙ্‌মহলে, এখন জেলে—তৈলের গাছ ঘুরাতে হয়।
খাদ,—এত দিনে মহন্ত তোর পাইলাম পরিচয়।
লহর,—তোমার ভুঁড়ি পেটের কি হবে উপায়,

মরি হায় রে,— * * থাকতে যে বালাখানায়,—
জল খাইতে মাথন ছানায়,—
এখন এই জেল খানায়, ডাইল খেয়ে প্রাণ যায়।
মিল,—তোমার উচিত শাস্তি দিয়াছে সাহেব,—
বানাইয়াছে রাম ছাগলের পাঁঠা,—
করে নারী চুরী বুকের পাটা বাড়ছে তোমার অতিশয়।
অন্তরা,- নবীন যে তেজীর ছেলে, নারীকে সাঙ্গ কৈলে —
তাতেই টের পাইলে শাস্তিরাম,—
লাভের মধ্যে এই করিলে, ধনপ্রাণ হারাইলে,
দেশ বিদেশেরাষ্ট্র কৈলে,—লুকন্দরা, নাম।
কৈ তোমার সিফাই সাজন,
কৈ তোমার,— অঙ্গের ভূষণ,—
মুখ খানি কাঁচ্ কলার মতন, দেখে বড় দুঃখ হয়।
মনে শুধু বলে, * * * ইচ্ছা হয়।

হারাইল বিশ্বাস মহাশয়ের রচিত যে কয়টি গীত লেখা হইল,—তন্মধ্যে এলোকেশীর রূপ বর্ণনার স্থলে অতি সুন্দর কবিত্বের ঝঙ্কার পরিস্ফুট হইয়াছে। “ —— কন্যা এলোকেশী, ষোড়শী রূপসী, দেখে তার বদন শশী, উর্ব্বসী পলায়।„ কি সুন্দর!

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

শক্তি পূজা।

বিশ্ব সংসারে সর্ব্বদাই যেন এক সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামের ফলে প্রবল দুর্ব্বলকে নিষ্পেষিত করিয়া নিজের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখিতেছে। এই জন্যই দুর্ব্বল প্রবলকে ভয় করে, প্রজা রাজাকে ভয় করে। মূর্খ জ্ঞানীকে ভয় করে, গরীব ধনীকে ভয় করে। কারণ ধনী, জ্ঞানী, রাজা সকলেই শক্তিমান। যখন দুই রাজায় সংগ্রাম আরম্ভ হয় তখন ধন বল, জন বল, জ্ঞান বল প্রভৃতি নানাবিধ বলের পরীক্ষা হইয়া থাকে। অবশেষে ইহাদের সমবায়ে যাহার বল অধিক হয়, সেই জয় লাভ করিয়া থাকে। বল কিম্বা শক্তি বুঝিতে হইলেই আমাদিগকে এক মল্ল যুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বস্তুতঃ পক্ষে শারীরিক [illegible] যাহা দেখিতে পাই, স্থূল ভাবে বলিতে গেলে উহা[illegible] শক্তির সরল অভিব্যক্তি।

আমরা বিশাল অট্টালিকা, সুদৃঢ় দুর্গ, প্রকাণ্ড [illegible] দেখিয়া অনেক সময়ে সসম্ভ্রমে উহাদের দিকে তাকাই[illegible] থাকি, উহাদিগকে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু কিম্বা বজ্রপাতে বিচূর্ণি[illegible] হইতে দেখিলে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না[illegible] কারণ আমরা যাহাদিগকে মহাশক্তিশালী বিবেচনা[illegible] করিয়াছিলাম, তাহা হইতেও প্রবলতর শক্তির ক্রি[illegible] এখানে দেখিতে পাইলাম।

উন্নত গিরিশৃঙ্গ কিম্বা বিশাল বারিধি—যাহা দেখিলে[illegible] ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহা যখন আগ্নেয়গিরির ভীষণ[illegible] উচ্ছ্বাস কিম্বা প্রবল ভূমিকম্প অথবা অন্য কোনরূপ[illegible] নৈসর্গিক কারণে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন আমরা [illegible] শক্তিকে মনে২ পূজা না করিয়া পারি না।

যখন জাহাজে চড়িয়া নদী পথে গমন করি, তখন[illegible] নদীবক্ষে ভাসমান তরণী সকল দেখিয়া জাহাজের তুলনায়[illegible] উহাদিগকে কত ক্ষুদ্রই না মনে হয়। আবার যখন[illegible] ঝঞ্ঝাবাতে সেই বৃহৎ জাহাজকে আন্দোলিত করিয়া জল[illegible] মগ্ন করিয়া থাকে তখন ঝড়ের শক্তির নিকট জাহাজ যে[illegible] কত তুচ্ছ তাহা বুঝিতে পারি।

ঝড় বৃষ্টির সময়ে সুদৃঢ় অট্টালিকায় বসিয়া নিকটস্থ[illegible] কুটীর কিম্বা বৃক্ষরাজ বিকম্পিত হইতে দেখিলে মনে[illegible] হয় আমরা প্রবল শক্তিশালী অট্টালিকার আশ্রয়ে কিরূপ[illegible] নিরাপদে রহিয়াছি। কিন্তু যখন ঐ অট্টালিকাটী একটী[illegible] কামানের গোলায় ভূমিসাৎ হইতে দেখি, তখনই উপলব্ধি[illegible] হইয়া থাকে আমাদের কামানের শক্তির নিকট[illegible] অট্টালিকার শক্তি কত নগণ্য।

শিশুকালে আমাদের গ্রাম্য স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়কে[illegible] বড়ই পরাক্রমশালী মনে হইত, কিন্তু স্কুল পরিদর্শনের[illegible] জন্য সব-ইন্সপেক্টার বাবু আসিতেছেন শুনিলে পণ্ডিত[illegible] মহাশয়ের তেজও হীন প্রভ হইয়া পড়িত। প্রবল[illegible] শক্তির সম্মুখে দুর্ব্বল শক্তি সর্ব্বদাই এইরূপ মস্তক[illegible] অবনত করিয়া থাকে।

এখন আমরা রাজশক্তি কি? সে সম্বন্ধে একটু[illegible]

আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে সমবেত ব্যক্তিগত শক্তির সমষ্টিকেই রাজশক্তি বলা যায়। আদিম অবস্থায় মানব জাতির মধ্যে যে অপরকে পরাজিত করিয়া বশীভূত রাখিতে পারিত, সেই রাজা হইত। ইতর প্রাণীর মধ্যে এখনও এই প্রথা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বানর কিম্বা হস্তীযূথের মধ্যে বলবত্তমই সেই দলের রাজা হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা নিজেদের মধ্য হইতে এক-জনকে রাজা নির্ব্বাচন করিয়া লয়। এই রাজা কোন ২ দেশে বংশানুক্রমে চলিতে থাকে এবং আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কতিপয় বৎসরের জন্য একজন নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তাহাকে রাজা না বলিয়া প্রেসিডেন্ট বলা হয়। এইরূপ নির্ব্বাচনের অর্থ কি? লোকের ব্যক্তি-গত শক্তিকে রক্ষা করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করার জন্যই এই রাজ নির্ব্বাচন। রাজা দেশের ধন বল, জন বল, ও জ্ঞান বল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন অথবা অন্য কথায় বলিতে গেলে দেশের বল দ্বারা সমাজের বল এবং সমাজের বল দ্বারা লোকের ব্যক্তিগত বল বৃদ্ধি করেন। এই সকল বল বৃদ্ধি করিতে কৃষি বাণিজ্য শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি করার প্রয়োজন। কৃষিজাত দ্রব্যের দ্বারা ব্যক্তিগত শক্তি রক্ষিত হইয়া থাকে, অর্থ বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কৃষির দ্বারা উৎপন্ন বস্তু আহার করিয়া লোকে জীবন ধারণ ও শারীরিক পুষ্টি সাধন করে, কৃষিজাত তুলা প্রভৃতি দ্বারা বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় এবং তাহা দ্বারা মানুষ শীতাতপ হইতে আত্ম রক্ষা করিয়া থাকে। এই লোক বল রক্ষাই সমাজ অথবা দেশের বল রক্ষা। সেইরূপ বাণিজ্যের দ্বারা দেশে অর্থ ও খাদ্যাদি নানাবিধ দ্রব্যের আমদানি হইয়া থাকে।

স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি দুর্লভ ধাতু বিশেষের প্রতি সভ্য জগ-তের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই মূল্য বান ধাতু সম্পদই অর্থ বল। কারণ এই সকল ধাতু যাহার যত অধিক, সে অপরকে তাহার পরিবর্ত্তে নানা রূপ কার্য্যে খাটাইয়া লইতে পারে অথবা উহার পরিবর্ত্তে বল সঞ্চয়কারী অপর জিনিস গ্রহণ করিতে পারে। কোন ২ অসভ্য জাতির মধ্যে এই স্বর্ণ রৌপ্যের প্রতি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না এবং তাহারা অনেক সময়ে স্বর্ণ রৌপ্যের বিশেষ মূল্য বুঝিতে পারে না। আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে যখন ইউরোপের লোক প্রথম পদার্পণ করেন, তখন ঐ সকল দেশের প্রাচীন অধিবাসী বৃন্দ প্রচুর স্বর্ণাদির পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র তাহাদের জীবন ধারণোপযোগী বস্তু গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত।

যুদ্ধের সময়ে এই অর্থ বলটী বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যায়। যে রাজার অর্থবল অধিক, তিনি যুদ্ধের সময়ে অর্থ দ্বারা অধিক সৈন্য নিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু সে সময়ে দেশে জন বলেরও প্রয়োজন হয়। রাজার সৈন্য কিম্বা জনবল সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করার জন্য প্রচুর খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজন এবং তাহাতে অর্থ কিম্বা কৃষি বাণিজ্যের প্রয়োজন। অস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং শক্তিশালী যন্ত্রাদি আবিষ্কারের জন্য অর্থ ও জ্ঞানের প্রয়োজন।

এইরূপে যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে এক দেশ অপর দেশের শক্তির হিসাব করিয়া থাকে। শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা কত, কামান কত, বন্দুক কত, যুদ্ধ জাহাজ কোন জাতীয় কয় খানা, বিমান পোত কয় খানা, খাদ্য সম্ভার বারুদ গোলা ইত্যাদি নানা রূপ শক্তির হিসাব করিয়া মোট শক্তি নির্ণয় করা হয়। এই শক্তি যদি ফুট টন (Foot-ton) কিম্বা অশ্ব বল (Horse Power) দ্বারা স্থির করা সম্ভব হইত তবে তাহাই করা হইত। ইহাকেই বলে রাজশক্তি। এই শক্তিদ্বারা প্রজা শাসিত ও পালিত হইয়া থাকে। রাজার অধীনে যে সকল বড় ২ প্রজা বা জমি-দার থাকেন, তাহাদের বলও ঐ প্রকারে নির্ণিত হয়। যাঁহার যত ধন সম্পত্তি তিনি তত বলিয়ান। অর্থাৎ প্রয়োজন হইলে তিনি ধন ও সম্পত্তির দ্বারা শক্তি ক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু যত দিন তাঁহাদের ধন সম্পত্তি রাজশক্তি দ্বারা সংরক্ষিত তত দিনই তাঁহাদের বল থাকে।

দ্রুতগামী রেল গাড়ীর যে শক্তি, অতিকায় কামা-নের যে শক্তি, কিম্বা বিশাল বিদ্যুৎভাণ্ডারে ডিনামোর যে শক্তি এই রাজ শক্তিও ঠিক সেইরূপ।

ধন সম্পত্তির শক্তি তত দিনই বর্ত্তমান থাকে যতদিন

আমরা উহাদের বিনিময়ে অপরের শক্তি ক্রয় করিতে পারি। যদি এই পৃথিবীতে আমি একটী মাত্র প্রাণী বর্ত্তমান থাকি এবং আমার পর্ব্বত প্রমাণ ধন রত্ন থাকে কিম্বা আমি সমস্ত পৃথিবীর রাজা হই, তখন আমার শারীরিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত হইবে না।

জীব জগতে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা এক মাত্র শক্তির কার্য্য দেখিয়া থাকি, কেহ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, কেহ বা অপরের শক্তি ধ্বংস করিতেছে।

শক্তি প্রতিহত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা উহা উপলব্ধি করিতে পারি না। যখন একটী প্রস্তর খণ্ডকে ভগ্ন করিতে প্রচুর শক্তি প্রয়োগ করি তখনই আমরা ঐ প্রস্তরকে শক্ত বলিয়া থাকি

শক্তির পরিণতি উত্তাপ। যখন একটী প্রস্তর খণ্ডের উপরে লৌহ দণ্ড দ্বারা আঘাত করি তখনই উত্তাপের উদ্ভব হয় এবং উভয়ের সংঘর্ষ গুরুতর হইলে তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়।

প্রস্তর খণ্ড শক্ত বলিলে আমরা ইহাই বুঝি যে প্রস্তর খণ্ডের অণুসকল এরূপ প্রবল আকর্ষণে একত্র যে উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রবলতর শক্তির প্রয়োজন।

শক্তি ও উত্তাপ এক বস্তু না হইলে আমরা শক্তিকে উত্তাপে পরিণত করিতে পারিতাম না। এক বস্তু অবস্থা বিশেষে নানারূপ আকার ধারণ করে, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। জল, বাষ্প ও বরফ এক জলেরই অভিব্যক্তি।

জগতের বহির্দ্দেশেও শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। দেখা যাক পণ্ডিতগণ পৃথিবী সৃষ্টি সম্বন্ধে কি বলেন। এই সৌরজগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে দুইটী অভিমত আছে। অনন্ত আকাশে আমরা সৌরজগতের গ্রহ ভিন্ন অগণিত নক্ষত্র দেখিতে পাই, এই এক একটী নক্ষত্রকে এক একটী সৌরজগৎ কল্পনা করা হইয়া থাকে; ইহাদের প্রত্যেকটী আমাদের সূর্য্য মণ্ডলের মত তেজপিণ্ড বিশেষ এবং ইহাদেরও গ্রহ উপগ্রহ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা সকলেই তেজ বিকীরণ করিতেছে। এই তেজেরও একটা সীমা আছে। কোটি ২ বৎসর পরে হয়ত কোন কোনটী শীতল হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িবে এবং কতকগুলি হয়ত নিস্তেজ হইয়া এক শীতল জড়পিণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে। পণ্ডিতগণ আশঙ্কা করেন, আমাদের সৌরজগৎও একদিন ঐরূপ শীতল পিণ্ডে পরিণত হইবে। সৌরজগতের মত নক্ষত্রেরও একটী গতি আছে। এই গতিশীল দুইটী জড়পিণ্ড অর্থাৎ নির্ব্বাপিত সূর্য্য যদি পরস্পর সংঘর্ষে আসে তাহা হইলে সেই প্রবল আবর্ত্তের ফলে উভয়টী প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে নব সৌরজগৎ উদ্ভাসিত হইবে। সংঘর্ষের ফলে ক্ষুদ্র ২ অংশ সকল যাহা বিক্ষিপ্ত হইবে তাহাই গ্রহ উপগ্রহে পরিণত হইবে। হয়ত এইরূপ সংঘর্ষের দ্বারাই আমাদের সৌরজগতের উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমে ক্ষুদ্র খণ্ড শীতল হওয়াতে আমাদের পৃথিবী বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহাতে উদ্ভিদ ও জীব সম্ভূত হইয়াছে। অগ্নিময় পৃথিবী যখন শীতল হইয়া জল, স্থল ও বায়ুতে পরিণত হইল, তখন হয়ত কোন নৈসর্গিক কারণে জল রাশির উপরে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদাণুর সৃজন হইয়াছিল—ইহাই পণ্ডিতদের মত। এই উদ্ভিদাণু হইতে উদ্ভিদ জগৎ এবং তৎপরে জীব জগতের সৃষ্টি হয়। জীবগণের খাদ্যাদির দ্বারা জীবন ধারণের সমস্ত উপাদানই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদ প্রদান করিয়া থাকে। কাজেই জীবনধারণের উপাদানের পরেই জীবের সৃষ্টি সম্ভব। উদ্ভিদ জীবন সম্পূর্ণ রূপে সূর্য্যের উপরে নির্ভর করে। কাজেই বলিতে হইবে উদ্ভিদ ও জীব-জগৎ সর্ব্বতোভাবে সূর্য্যের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের যে তেজের দ্বারা ইহাদের উৎপত্তি, আবার সেই তেজেই উহারা পরিণত হইতে পারে। অপর কথায় বলিতে গেলে তেজ বা শক্তিতে যাহার উৎপত্তি আবার সেই শক্তিতেই উহা পরিণত হইতে পারে।

আর একটী অভিমত এই যে অনন্ত নীহারিকাপুঞ্জ হইতে এই সৌরজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তেজোময় ঘূর্ণ্যমান নীহারিকাপুঞ্জ কোন কারণে শীতল হইয়া মঙ্গল বুধ শুক্র প্রভৃতি গ্রহাদি সমন্বিত সৌরজগতের উদ্ভব করিয়াছে। এবং সূর্য্যের শক্তি হইতে পৃথিবীর উদ্ভিদ ও জীব উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা কেবল মাত্র জড় জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি এবং আমাদের আলোচনা তাহাতেই সন্নিবিষ্ট থাকিবে। হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন পঞ্চভূতের দ্বারাই এই জড় জগৎ গঠিত, এবং পঞ্চভূতেই তাহা বিলীন হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বহুবিধ মূল পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে এবং বিজ্ঞান বিদ্‌গণ বলেন এই বহুবিধ মূল পদার্থ হইতে পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট। এখন কোনটী যে সত্য তাহা কে বলিবে? পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি সাপেক্ষ পঞ্চভূত, ইহা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। আভিধানিক শব্দের দ্বারা ক্ষিতি অপ্‌, তেজ না বুঝিয়া শব্দ স্পর্শ দ্বারা বুঝিলে ভাল হয়। যাহা হউক পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য উভয় মতেই কোন না কোন রূপ মূল্য পদার্থের উল্লেখ আছে। ইহা বিজ্ঞান সম্মত যে এক একটী মূল পদার্থে এক জাতীয় অনু সন্নিবিষ্ট। রসায়ণ শাস্ত্রে এই অনুরও বর্ণনা রহিয়াছে।

ইহাও রসায়ণ শাস্ত্রের একটী স্থূল সত্য—যখন দুই কি ততোধিক বস্তু রাসায়ণিক ভাবে সংমিশ্রিত হয় তখনই তাপের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং আবার উহা বিচ্ছিন্ন হইতেও তাপ উৎপন্ন হয়। কাজেই রাসায়ণিক পদার্থ মাত্রেই তাপ বা শক্তি নিহিত আছে—ইহা একরূপ অবধারিত।

পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তু সকলকে অনুরাশির সমষ্টি বলা যাইতে পারে। অথবা অনুরাশি একরূপ শক্তি বলে পরস্পর মিলিত বা সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া একটী বস্তুর সৃষ্টি করে। কাজেই একটী বস্তু গঠিত হইতে ও শক্তির প্রয়োজন, আবার উহার অনুসকল বিচ্ছিন্ন করিতেও শক্তির প্রয়োজন। অতএব বলিতে পারা যায়, আমরা পৃথিবীতে কেবল শক্তির ক্রিয়াই দেখিতেছি।

এযাবৎ পরমাণুর সমষ্টিকেই অনু বলা হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে পরমাণু হইতেও সূক্ষ্মতর ইলেকট্রনের আবিষ্কার হইয়াছে। ভাষায় বুঝাইতে হইলে ইলেকট্রণকে ইলেক্‌ট্রিসিটীর অনু বলা যাইতে পারে। আমরা সৌরজগতে যে রূপ গ্রহগণকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূর হইতে সূর্য্যকে প্রবল বেগে অবিরত প্রদক্ষিণ করিতে দেখি সেইরূপ একটী পরমাণুকে একটী সৌরজগতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কারণ একটী পরমাণুর মধ্যকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বে লক্ষ ২ ইলেকট্রণ নক্ষত্র বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই ভ্রাম্যমান ইলেকট্রণ সমষ্টিকে আমরা একটী পরমাণু বলিয়া থাকি; ইহাতে যাহা কিছু আরোপ করা যায় সমস্তই বস্তু সংজ্ঞার বহির্ভূত। তাহাদিগকে ধরিবার ছুইবার যো নাই। ইলেকট্রনকে আমরা পূর্ব্বেই ইলেকট্রিসিটীর অনু বলিয়াছি এবং এই বিদ্যুৎ কোন রূপ জড় পদার্থ নহে। আজ পর্য্যন্ত যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় বস্তু সকলের অনু বিদ্যুৎ-সম্ভূত, এবং বিদ্যুৎ একরূপ শক্তি মাত্র। আমরা বস্তু জগতের দিকে প্রবেশ করিলেও অনন্তের দিকে ধাবিত হই; পরিদৃশ্যমান বস্তু জগৎ ক্রমে অদৃশ্য হইয়া শক্তিতে পরিণত হয়। অনু কিছু সময়ের জন্য অস্তিত্ব বিকাশ করে কিন্তু পুনরায় উহা শক্তিতে পরিণত হইয়া উহার অস্তিত্বের লোপ পায়। বস্তু যাহা দেখা যায়, তাহা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যাহা অদৃশ্য তাহা অনন্ত। জগতের বহির্দ্দেশে কি অভ্যন্তর, দেশে যে খানেই প্রবেশ করি, আমরা এক অসীম অনন্ত শক্তির সত্তা উপলব্ধি করি। সেই শক্তি হইতে সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং এই শক্তিকেই আমরা অনন্ত প্রসবিনী মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি বলিতে পারি। হিন্দুগণ শক্তিলাভের জন্য এই আদ্যাশক্তিরই পূজা করিয়া থাকেন। আমাদের দৃশ্য জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সর্ব্বত্রই শক্তির কাজ দেখিতে পাই। কেবল মাত্র ইহা রূপভেদে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। মানুষ কেহ স্থূল জড় শক্তির জন্য লালায়িত, কেহবা চৈতন্য রূপিণী সূক্ষ্ম মহাশক্তির আরাধনা করিতেছেন। এ যাবৎ যতদূর বুঝা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, একমাত্র শক্তিতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা শক্তিতেই বিলীন হইবে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

অশ্রু-মালা।

বাঙ্গালী

ফিন্‌ফিনে বাস, কর্ম্মে কাবু,
হাড় ক'খানি, খাদ্য সাবু,
ডিগ্রী-পাগল, চাকুরি-জীবী,
চাইরে আবার দধীচ্ শিবি।

মাড়োয়ারী

হস্তে লোটা, মস্ত জোয়ান,
মান অপমান সবই সমান,
লক্ষপতি, অল্প পড়া,
যাবজ্জীবন ব্যবসা-করা।

সহুরে কেরাণী

ছোট্ট বাসা, অনেক লোক,
খুব খাটুনি, দুঃখ শোক!
চিংড়ি মাছ, নানান্ শাক,
ঠিক তিরিশে যমের ডাক!

চাষা

পাটের টাকা, খাটুর নাচ,
পাত্‌লা ধুতি, মাংস মাছ,
পোষ্য বহু, হাস্য মুখ,
শক্ত দেহ, চওড়া বুক।

অতীত

প্রচুর খোরাক, শান্তি গভীর,
উদার প্রীতি, পুণ্য সমীর,
সবাই ত্যাগী, ধর্ম্ম-জীবন,
নিখুঁৎ মানুষ, জগৎ পাবন!

বর্ত্তমান

ভাতের অভাব, জুলুম জবর,
প্লীহা কাটা দিন দুপহর!
'ধর্ম্মাবতার, চরণ চুমি?'
হায়রে আমার জন্মভূমি॥

ডাক্তার

'মা'র কলেরা'—'ভিজিট্ কই?'
'গেলেই দেবো'—'বাদ্‌শা নই!'
'ভাত জোটেনা'—'যাক্ না ম'রে'।
'ডাক্তার বাবু—!'—'দাঁড়াও স'রে।'

নব্যা কিশোরী

পৃষ্ঠে বেণী, সেমিজ শাড়ী,
পুষ্পিত বুক, দেমাক্ ভারী,
পায় পাদুকা, চাউনি মিঠে,
জুঁইয়ের কুঁড়ি, রূপের ছিটে।

নব্যা বিধবা

লম্বা টেড়ি, চটুল কথা,
উপন্যাসে বিহ্বলতা!
দিন যামিনী স্বপ্ন দেখা,
সুর-সাধনা একা একা।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গবেষণা।

যার যাহা প্রাপ্য নয় তাকে সেই জিনিষ দান করা বাজে খরচ হ'তে পারে কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চ সম্মানের পদে বসানো টা যে সেই ব্যক্তিকেই প্রকারান্তরে অপদস্থ করা, সে কথা বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সংসারে এমন লোকেরও অভাব হয় না, যিনি নিজের অযোগ্যতা অস্বীকার করে সেই সম্মানের আসনকেই প্রাপ্য অধিকার বলে গৌরব করতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না।

আমাদের প্রফেসার চ্যাটার্জ্জির স্বভাবটা ছিল ঠিক এই প্রকার। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে তিনি কিছু কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করে লোকের প্ররোচনায় সেবার নোবেল পুরস্কারের জন্য চেষ্টা কোরে 'পাই পাই' করে পেলেন না বটে কিন্তু দেশের লোক তাঁর মস্তকে যে সম্মান-লাজাঞ্জলী বর্ষণ করল তাতে তিনি খুসীই হলেন এবং এমন একটা ভাব প্রকাশ করলেন, যাতে করে বোঝা গেল যে তাঁর কৃতিত্ব বুঝ্‌তে পারে তেমন যোগ্য লোক ইউরোপে খুব কমই আছে।

তিনি বিপত্নীক। বৌবাজারের এক ছোট গলিতে তাঁর দ্বিতল বাড়ী, সেই বাড়ীরই এক অংশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ছোট একটী ল্যাবরেটরী স্থাপন করে তারই ভিতর তিনি রাতদিন বসে বসে মাথা ঘামিয়ে থাকেন।

সেবার মাঘ মাসে ভয়ানক শীত পড়েছিল। ১১ই সকাল বেলা প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি একখানা কম্বল মুড়ি দিয়ে বৈঠকখানা ঘরে বসে একটা দৈনিকের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ডাকপিয়ন এসে তাঁর হাতে একটা পার্শেল দিয়ে গেল। পার্শেলটা দেখতে খুবই ছোট এবং হাল্কা ছিল। কিন্তু যখন পোষ্টাফিসের ছাপের উপর নজর পড়ল তখন তিনি কিছুতেই আর অবাক না হ'য়ে থাকতে পারলেন না। দেখলেন পার্শেলের উপর তাঁর বাড়ীর পাশেই যে পোষ্টাফিস রয়েছে তারই ছাপ মারা, কিন্তু কোথা হ'তে কে পাঠিয়েছে তার কোনো নাম গন্ধই নেই। দেখে তিনি কৌতুকান্বিত হয়ে ভাবতে বসে গেলেন—"এই ত বৌবাজারের সিল দেখতে পাচ্ছি, পোষ্টাফিস আমার বাড়ী থেকেত বেশী দূরে নয়—মোটে পাঁচমিনিটের পথ, তবে এই এত কাছে থেকে পার্শেলটা ডাকে ফেলবার কি দরকার ছিল? যিনি এটা পাঠিয়েছেন, তিনি এই পথটুকু হেটে এসে নিজেইত আমার বাড়ীতে এটা দিয়ে যেতে পারতেন?"

সুতরাং ভেবে ভেবে তাঁর মনে ভারি খট্কা লেগে গেল, ভ্রূকুঞ্চিত করে পার্শেলটা চোখের নিকটে এনে খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে মোড়ক খানা খুলতে আরম্ভ করলেন। যখন কাগজখানা খোলা হয়ে গেল তখন প্রফেসার অবাক হ'য়ে দেখলেন—ছোট একটী বাক্স—রূপোর তৈরি বলেই মনে হয়, কিন্তু তেমন ভারি নয়—অতি হাল্কা। দেখে তিনি কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলেন না; সঙ্গে কোন কাগজ পত্রও ছিল না, সুতরাং কে পাঠিয়েছে এবং কি উদ্দেশ্যেই যে পাঠিয়েছে, তা তাঁর উর্ব্বর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক কিছুতেই নির্ণয় করতে পারল না। তিনি তখন অতি সন্তর্পণে বাক্সখানা তাঁর ল্যাবরেটরীতে নিয়ে গিয়ে একখানা ভালো ম্যাগনিফায়ার দ্বারা পরীক্ষা করতে বসে গেলেন। প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ল—বাক্সের ডালায় যেন অস্পষ্ট কি লেখা রয়েছে, সবটুকু পড়া যায় না। অনেক চেষ্টার পর এই ক'টা অক্ষর শুধু ধরতে পরলেন—"২৭২ ম ধ অা স ক"—তখনি তাঁর মাথায় চট্ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল, কল্পনার চোখে একটা নতুন আবিস্কারের পথ দেখতে পেয়ে আশার আলোকে তাঁহার মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠল; তিনি ঐ লেখা থেকে এই পাঠোদ্ধার করলেন যে—এই জিনিষটী সেই অতীত যোগের অশোকের আমলের নিশ্চয়—কালের প্রভাবে অনেক লেখা মুছে গিয়ে থাকবে কিন্তু তারিখটা যে একেবারে মিলে গিয়েছে—২৭২ সাল। তারপর ও যে টুকু পড়া যাচ্ছে তাতে "মগধ" এবং "আশোক" কথা দুটি স্পষ্ট ধরা পড়েছে। প্রফেসার চ্যাটার্জ্জির মুখে তখনি একটা আনন্দের হিল্লোল খেলে গেল, এমন একটা বাক্স এমন অদ্ভুত ভাবে তার কাছে এসে পৌঁচেছে এবং ক্ষুদ্র হ'লে ও যে সেটা পৌরাণিক হিসাবে সামান্য নয়, সে কথা ভেবে আপাদমস্তক তাঁর পুলকানন্দে নৃত্য করে উঠল।

তখন তিনি ঐ বাক্সের নীচের দিক থেকে খানিকটা জায়গা কেটে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসে গেলেন। বিশ্লেষণের ফলে দেখতে পেলেন, উহার ভিতর যে সব জিনিষ রয়েছে তা অতি আশ্চর্য্য জনক—মাটির মত জিনিষ অথচ আমাদের এই চোখের সামনে যে মাটি রয়েছে এ ঠিক তার মত নয়, এ মাটিতে চূণের ভাগই বেশী এবং আস্বাদন করে দেখলেন, তাতে মিষ্টস্বাদও কিছু কিছু আছে।

প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি একবার পাটনা গিয়েছিলেন, সেখান থেকে পাটালিপুত্রের নূতন আবিস্কৃত নগরের ভাঙ্গা দেয়ালের খানিকটা মাটি তিনি একটা কৌটায় করে নিয়ে এসেছিলেন। দেখলেন—সেই মাটির সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। তখন তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মে গেল যে, এ বাক্সটা নিশ্চয় সেই অশোকের আমলের না হয়েই পারে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই—বাক্সটা প্রফেসার চ্যাটার্জ্জির ঘরে আসা মাত্র তার সঙ্গে সঙ্গে নানা অশান্তি উপদ্রবও

যেন এসে তাঁর ঘরে ঢুকল। পার্শেল-বাঁধা ছেঁড়া কাগজ ও সুতাগুলি যখন তিনি টেবিল থেকে ফেলে দিতে যাবেন তখন হাতে লেগে একটা ওষুধের শিশি পড়ে ভেঙ্গে গেল। সেই শিশিতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে যা তৈরি করেছিলেন তা'তে তাঁর পূরা দুমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল— কিন্তু এক মুহূর্তে আজ সেই সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেই বক্সটা অতি সন্তর্পণে তুলে নিয়ে তিনি শয়ন ঘরের দিকে রওনা হ'লেন কিন্তু দরজার কাছে গিয়েই হুচোট্ খেয়ে এমন ভাবে পড়ে গেলেন যে হাতের কব্জিটায় ভয়ানক আঘাত পেলেন। পতন শব্দে বাড়ী ঘর কেঁপে উঠলো দেখে ভয় খেয়ে ভৃত্য রামসিং তাড়াতাড়ি ছুটে এল। তার হাতে কতকগুলি চাএর বাসন ছিল, সেগুলি হাতে করেই সে ছুটে এসেছিল, দরজা পর্য্যন্ত যেতেই প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি কপাট খুলে টল্‌তে টল্‌তে একেবারে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়লেন। রামসিং সে চোট্ সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে তার হাতের বাসনগুলি পড়ে গিয়ে একেবারে চুরমার হয়ে গেল।

যা হোক—এই পতন ও ভাঙ্গনের পালা শেষ হলে পর ডাক্তার এসে প্রফেসার চ্যাটার্জ্জির হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেল। চ্যাটার্জ্জি তখন তাঁর কয়েক জন বৈজ্ঞানিক বন্ধুর নিকট এই অদ্ভূত বাক্সের কথা উল্লেখ করে চিঠি লিখ্‌তে বসে গেলেন এবং পরদিন বিকাল বেলা তাঁর বাড়ী এসে সেই বাক্স দেখ্‌তে এবং পরীক্ষা করে মতামত জানিয়া যেতে আহ্বান করে পাঠালেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা প্রফেসার চ্যাটার্জ্জির বাড়ীতে বৈজ্ঞানিকদের এক প্রকাণ্ড বৈঠক বসে গেল এবং নানা পরীক্ষা ও কল্পনা জল্পনায় রাত দশটা বেজে গেল। বৈজ্ঞানিকগণ আসল জিনিষটি যে অতি খেলো তা টের পেলে ও যাবার সময় সকলেই একবাক্যে রহস্য করে এই মত প্রকাশ করে গেলেন যে—এ বাক্সখানা বাস্তবিকই সেই অতীত যুগের—সেই রাজা অশোকের আমলের জিনিষ এবং পৌরাণিক হিসাবে সত্যি সত্যি এ অতি অমূল্য সামগ্রী।

সে রাত্রেই কলিকাতার উপর দিয়ে ভীষণ ঝড় বয়ে গেল, শীতকালে এমন বৃষ্টিঝড় কেউ কখনো দেখেনি। বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়েছে—গোলার ঘর আর একটীও দেখা যাচ্ছে না—অনেক পুরোনো দালান পর্য্যন্ত ধসে পড়েছে। সকাল বেলা দেখা গেল, প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি ইট সুড়কীর ভিতর থেকে বেড়িয়ে আস্‌ছেন—তাঁর শোবার ঘরের একটা দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছিল। অনেক বেলা হয়ে গেল—ক্ষুধায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন; কিন্তু খাবার নিয়ে কেউ এলনা দেখে নিজেই রান্না ঘরে গিয়ে দেখ্‌লেন রামসিং পালিয়েছে। ফিরে এসে ভাঙ্গা আলমারীর ভিতর থেকে সেই বাক্সখানা সাবধানে বাইরে এনে হাতে নিয়ে যখন দেখলেন, উহা ঠিকই আছে, কোন অংশই একটুও নষ্ট হয়নি, তখন তাঁর মুখে এই অতি কষ্টের সময়ও একটা স্বস্তির হাসি ফুটে উঠ্‌ল এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা যে কখন কোথায় অন্তর্দ্ধান করল তা টেরও পাওয়া গেল না।

সেদিনই তিনি সহরের সবগুলি দৈনিকে ঐ বাক্স সম্বন্ধে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দিলেন। ক দিন পরই এক সাহেব, প্রফেসার চ্যাটার্জ্জির লাবরেটারীতে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—"ক্যালকাটা হেরল্ডে আপনার বাক্সের কথা পড়ে আমি সেটা কিনে নিয়ে যেতে এসেছি। রেঙ্গুন গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়মের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আমাকে ঐ বাক্সখানা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে টেলি পাঠিয়েছেন।" প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি তখন গম্ভীর ভাব ধারণ করে বললেন—"কিন্তু আমার ত ঐ বাক্স বিক্রী করবার তেমন কোন তাড়া নেই।" আগন্তুক চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন—"আমরা প্রচুর অর্থ এর জন্য দিতে প্রস্তুত আছি। বিজ্ঞাপনে যে রকম দেখলাম—আমাদের কাছেও ঠিক তেম্‌নি আরেকখানা বাক্স আছে—মাণ্ডালয়ের এক বহু পুরোণো মন্দির থেকে আমরা সেটা সংগ্রহ করেছিলাম। আশ্চর্য্য এই, আজ পর্য্যন্তও কেউ সেখানার ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় করে উঠ্‌তে পারল না—কেউ না। আমি খুব আশা করে এসেছি, আপনি নিশ্চয় আমাদের নিরাশ করবেন না। আমরা দুটো বাক্স মিলিয়ে দেখ্‌তে চাই।

তা ছাড়া গভর্ণমেন্ট থেকে আপনার এই বাক্সখানার জন্য এক হাজার টাকা মঞ্জুর হয়ে গেছে। মনে রাখবেন—এক হাজার টাকা!"

প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি সেকথা শুনে প্রথম তাঁর কানদুটোকে বিশ্বাসই করতে পারলেন না; খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে আমতা আমতা করে বললেন—"হাঁ- তা—এই দেখুন—বাক্সটা বিক্রী করবার আমার তেমন ইচ্ছা নেই—আর তা ছাড়া দেখুন—জিনিষটা ঠিক আমার নিজেরও নয়—পার্শেলে এসেছে—কে পাঠিয়েছে, তা ও জানিনে—হয়তো কেউ এসে এটা দাবী করতে পারে। তা—হাঁ—অপেনি নিজেও কেন একবার ভেবে দেখুন না।"

আগন্তুক একটু ভেবে নিয়ে বল্‌লেন—"তা বেশ ত, আপনি এক কাজ করুন; সব কাগজে আজই একটা নোটিশ দিয়ে দিন—দুদিনের ভিতর যদি কেউ এসে দাবী না করে, তা'হলে আপনি আমাদের কাছে সেটা বিক্রী করে ফেল্‌বেন।"

প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি খুসী হয়ে বল্লেন—"আচ্ছা তাই করা যাবে। আর দেখুন—আপনাদের যখন ওরকম আরো একখানা বাক্স রয়েছে—বৈজ্ঞানিক এবং পৌরাণিক কৌতুহলের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে এ বাক্সখানাও আপনাদের হাতেই পৌঁছা দরকার। তা হ'লে দেখুন—দুদিন পর আপনি এসে খবর নেবেন।"

আগন্তুক খুসী হয়ে বল্লেন—"আচ্ছা তাই হবে।"

বিজ্ঞাপন ছাপা হ'ল—দুদিন কেটেও গেল, কিন্তু কোথা হ'তে কেউ কোন দাবী দাওয়া করে পাঠাল না। বাক্সটা তখন বাংলা মুলুক ছেড়ে মগের মুলুকে চলে গেল।

দু দিন পর প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি তাঁর ছোট ভাই সতীশের বাড়ী থেকে এক নিমন্ত্রণ পেলেন—সে দিন রাত্রে তাঁকে সেখানে আহার করতে হবে। সতীশ বাবু হাইকোর্টের উকিল। সন্ধ্যাবেলা কোর্ট থেকে ফিরে এসে জামা ছাড়ছেন, এমন সময় প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন—"কেমন হে সতীশ, তুমি আজো শুন্‌তে পাও নি? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগত আজ যা নিয়ে তোল পাড় করছে, তা'র কোন খবরই রাখ না?" তারপর সেই বাক্সটার কথা উল্লেখ করে—কেমন ভাবে সেটা তাঁর কাছে এল—সে যে কি রহস্যময় ব্যাপার! পরীক্ষা করেই বা কি অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কার করলেন এবং শেষটায় এক হাজার টাকায় সেটা কোথায় কা'র কাছে বিকিয়ে গেল, সে সব কথা একদমে গড়গড় করে বলে যেতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর সাত বছরের ভাইপো ঝুনু হঠাৎ ঘরে ঢুকেই বলে উঠ্‌ল—"জ্যাঠামশাই, আজ যে আমার জন্ম দিন!" প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি একেবারে যেন স্বপ্ন থেকে উঠেছেন এমনি ভাব প্রকাশ করে বল্‌লেন—"আজ তোমার জন্মদিন! ওঃ—আমি ত সে কথা একদম ভুলে গিয়েছিলুম। আচ্ছা, যাহোক আমি কাল নিশ্চয়—" কথা আর শেষ হ'ল না, ঝুনু তা'র জ্যাঠামশাইর শূন্য হাত ও পকেটের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল।

কান্না শুনে তার দিদি লতিকা এসে কান্না থামাবার চেষ্টা করে বল্‌ল—"ছিঃ—আজ জন্মদিনে বুঝি অমন কর্‌তে আছে? জ্যাঠামশাই কাল তোমাকে নিশ্চয় জন্মদিনের উপহার এনে দেবেন।" ঝুনু তবু থামে না। সুর করে সে বল্‌ল—"কেন জ্যাঠামশাই ভুলে গেলেন?" লতিকা বলল—"তাঁকে যে আরো ঢের ঢের কাজের কথা ভাবতে হয়—তোমার জন্মদিনটি শুধু মনে করে রাখলে তো আর তাঁর চলে না!"

তবু ঝুনু জোর করেই বলতে লাগল—"না না, তাঁর নিশ্চয় মনে হওয়া উচিত ছিল।" লতিকা হেসে বলল—"আরে পাগল! তুই খাতা করে লিখে দিলেই তাঁর মনে হবে নাকি?" ঝুনু তখন কান্না থামিয়ে বলল—"কেন হবে না। আমি তো তারিখই লিখে দিয়েছিলুম—তবু কেন তিনি ভুলে গেলেন?"

প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি সে কথা শুনে চিন্তিত ও বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লেন—কখন যে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা কিছুই তাঁর মনে পড়ল না। শেষে ভয়ে ভয়ে তিনি ঝুনুকে প্রশ্ন করলেন—"কি বল্‌ছ? মনে করিয়ে দিয়েছিলে? কিছুই যে আমার মনে পড়ছে না?" ঝুনু তখন এক নিঃশ্বাসে বলে ফেল্‌ল—"কেন?

আমরা যে একটা পার্শেল পাঠিয়েছিলুম—ঘড়ির একটা পুরোণো বাক্স ছিল—তাঁর উপর বাবা যে চুরুট খান তারই রূপালি কাগজ, চুণ ময়দা চিনি দিয়ে আঠা তৈরি করে দিদি লাগিয়ে দিয়েছিল, আমি তার উপর লিখে দিয়েছিলুম—"১৭ই মাঘ" তবু কেন ভুলে গেলেন?"

প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি তখন যেন একেবারে আকাশ থেকে ধপাস করে এই পৃথিবীতে এসে পড়লেন—তাঁর সব কথাই তখন মনে পড়ল এবং মনে পড়ল—ঝুমুর এই খেলার বাক্সটা নিয়ে কি কাণ্ডই তিনি করে বসেছেন! এতক্ষণ পরে যেন তাঁর স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল—মাথাটা নেড়ে খুব জোরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"ওঃ—আমি যে ঐ বাক্সট বহুদুরে পাঠিয়ে দিয়েছি—

তখন তাঁর ভয় হতে লাগল, যদি এই রহস্যটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে আর কেলেঙ্কারীর সীমা থাকবে না—তাঁর সব সুখ্যাতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সব যশ যে একদিনে বাষ্পের ন্যায় বাতাসে মিলিয়ে যাবে, তাঁর এতদিনকার গৌরবের স্বর্ণাসন এক মুহূর্ত্তে যে ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে পড়বে! তিনি তাড়াতাড়ি ঝুমুকে কাছে টেনে এনে তা'র পিঠে ও মাথায় হাত বুলিয়ে চুপিচুপি বল্লেন—"হাঁ হাঁ—সব কথা আমার মনে পড়েছে—কিন্তু তুমি সে বাক্সের কথা আর কিছু বোলো না—কিছু না, কারো কাছেই না। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি তোমার জন্য খেলনা কিনে আনতে—কি আনব বল? কি চাই তোমার?"

আনন্দে ঝুমুর চোখ্ ঝল সে উঠ্‌ল—নেচে উঠে সে বল্ল—"জ্যাঠামশাই, খুব বড় দেখে একটা কাঠের ঘোড়া—দুটো বেলুন আর সুন্দর দেখে একখানা ছবির বই আমায় এনে দিন।"

প্রফেসার চ্যাটার্জ্জি তৎক্ষণাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন—মাথাটা তাঁর ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগ্‌ল। পথের দুধারে গ্যাসের আলো জল্‌ছিল—সেই আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে যেতে যেতে তাঁর মনে হ'তে লাগল—পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়েই প্রচুর সূক্ষ্ম গবেষণা থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন। সেই গবেষণার অভাবেই আজ এ পৃথিবীটা তাহার নিকট স্বপ্নময় ধাঁধাঁর মত বোধ হচ্চে এবং সেই ধাঁধাঁর ভিতর তিনি যেন আজ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ

ভাস্করাচার্য্য।

ভাস্করাচার্য্য একজন বিখ্যাত ভারতীয় গণিতবেত্তা ও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন ইহার পিতার নাম ছিল মহেশ দৈবজ্ঞ। দাক্ষিণাত্যের সহ্য পর্ব্বতের পাদদেশে বিজ্জরবিড় নামক গ্রামে ১০৩৬ শকে অর্থাৎ ১১১৪ খৃষ্টাব্দে ভাস্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ হইতে তাঁহার একটু বিশেষত্ব ছিল। ব্রহ্মগুপ্তের ন্যায় তিনিও উজ্জয়িনীর মান মন্দিরের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের চারিটি অধ্যায় ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের লীলাবতী নামক প্রথম অধ্যায়ে পাটীগণিত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বীজগণিত, গ্রহগণিতাধ্যায় নামক তৃতীয় অধ্যায়ে জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় নামক চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ত্তুলমিতি আলোচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটী অধ্যায়ে গণিত আলোচিত হইয়াছে। ইহার পুত্রের নাম লক্ষ্মীধর ও কন্যার নাম লীলাবতী। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে তদীয় প্রিয়তমা কন্যা লীলাবতীর নামানুসারেই তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রথম ভাগের বা পাটীগণিতের নামাকরণ করিয়াছেন। ভারতে সূর্য্য সিদ্ধান্তের পরেই সিদ্ধান্ত শিরোমণির স্থান।

জ্যোতিস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থখানা লিখিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইহার খ্যাতি আরব দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য্যের আবিষ্ক্রিয়া সমূহ সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আরবগণ প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই ঐ সুপ্রসিদ্ধ ও স্বনামখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদকে অনুসরণ করিতেন। ভাস্করের আবিষ্ক্রিয়া ও প্রণালী সমূহ এইরূপে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী অতীত হওয়ায় পূর্ব্বেই ইউরোপে প্রবেশ লাভ করিয়া সুপরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মূল গ্রন্থ আধুনিক যুগেই তথায় নীত হইয়াছে।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডননগর হইতে প্রকাশিত "পেনি

সাইক্লোপেডিয়াতে" বীজগণিতের (Vija Ganita) আলোচনা করা হইয়াছে। কোলব্রুক ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লীলাবতী ও বীজগণিতের (Lilavati and Vija-Ganita) অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে উইলকিন্‌সন্ (L. Wilkinson) সাহেব কলিকাতা হইতে জ্যোতিষ ও বর্ত্তুলমিতির অনুবাদ ইংরেজিতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

পুস্তকখানা সংস্কৃত ছন্দে লিখিত। কিন্তু গদ্যে ইহাদের ভাষ্য লিখিত আছে। জ্যোতিষ ও গণিত সম্বন্ধে ভাস্করের যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল তাহা মৌলিক কি অপরের নিকট হইতে গৃহীত, তৎসম্বন্ধে অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতের সন্দেহ আছে। তাঁহারা অনুমান করেন যে ভাস্করাচার্য্য আবরীয় ও মিশরীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিত শাস্ত্রে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বীজগণিত যে আরব গণের এমন কি ব্রহ্ম গুপ্তের বীজগণিত হইতেও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ইঁহার ত্রিকোণমিতি ব্রহ্মগুপ্তের ত্রিকোণমিতি হইতে উৎকৃষ্টতর।

জ্ঞান দেবতা সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া ভাস্কর লীলাবতী আরম্ভ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত সূচীপত্র হইতে ভাস্কর কৃত গ্রন্থের বিষয়-নিচয়ের আভাষ পাওয়া যায়। প্রথমে বিভিন্ন ওজন ও পরিমাপের ধারা, সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দশমিক প্রণালী। তৎপর যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগহার, বর্গ ও ঘনপরিমাণ, এবং বর্গমূল ও ঘনমূল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার পর দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করণ, ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ, মিশ্র সংখ্যা, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আট নিয়ম যেরূপে ভগ্নাংশে প্রয়োগ করিতে হয় তাহার উদাহরণ, $ক+০=ক$, $০^{২}=০$, $\sqrt{০}=০$, $\frac{ক}{০}=£$ দুই বা ততোধিক সমীকরণের যুগপৎ সমাধান (simultaneous equation of first order) ও তাহাদের প্রয়োগ বিধি ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। তৎপর দ্বিতীয় মানের সমীকরণ (quadratic equation) সমাধান, ত্রৈরাশিক ও বহুরাশিক, সুদকষা ডিস্কাউণ্ট, ও যৌথ কারবারের প্রণালী, চৌবাচ্চা ও নলের অঙ্ক, বিনিময়, সমান্তরশ্রেণী ও সমগুণ শ্রেণীর যোগফল (Arithmetical ও Geometrical progression), ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণের অঙ্কন, কতকগুলি ত্রিকোণমিতির সূত্র (formula), ঘনপরিমাণ ও দল নির্ব্বাচন (combination) ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

আমরা ভাস্করের গ্রন্থেই দশমিক প্রণালীর সুশৃঙ্খলমতে বিকাশ ও সৌষ্ঠব সর্ব্ব প্রথমে দেখিতে পাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ আর্য্য ভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য উভয়েই দশমিক প্রণালী জানিতেন। তবে ভাস্করের জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট ছিল। তাঁহার গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে ০শূন্যকে ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত অঙ্ক শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

সংক্ষেপতঃ—বলিতে গেলে আমরা বর্ত্তমানে পাটীগণিতের যে যে নিয়ম ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার সমুদয়ই লীলাবতীতে সুশৃঙ্খলরূপে লিপিবদ্ধ আছে। তাহার প্রশ্নাবলী প্রায়ই দশমিকে প্রকাশিত।

আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ ও গণিতবিৎ পণ্ডিতগণের গ্রন্থাবলী হইতে তৎ সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমরা একটী কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্নের উল্লেখ করিতেছি। দাস দাসীর মূল্য সম্বন্ধে ভাস্কর কয়েকটী প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক দাসীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্যবান। ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর ইহাদের মূল্য বয়সের অনুপাত অনুসারে কমিয়া যায়। যেমন ১৬ বৎসর বয়সের সময় একটী দাসীর মূল্য ৩২ নিষ্ক হইলে ২০ বৎসর বয়সের সময় ইহার মূল্য কত হইবে? $\frac{১৬}{২০}=\frac{কত}{৩২}$ $\therefore ক=$

$$\frac{১৬\times৩২}{২০}=\frac{৪\times৩২}{৫}=\frac{১২৮}{৫}=২৫\frac{৩}{৫}.$$

তাহার সময়ে দুই বৎসর কার্য্য করিয়াছে এইরূপ আটটী ষাঁড় দ্বারায় ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক একটী দাসী খরিদ করিতে পারা যাইত। তখন টাকার সুদ প্রতি মাসে শতকরা ৩৷৷০ হইতে ৫৲ টাকা হারে চলিত।

ভাস্করের বীজগণিত এরূপ একটী বাক্য (শ্লোক) দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে যে তাহা দ্বারা ধর্ম্মনীতি, দর্শন ও গণিত এই তিন শাস্ত্রেরই এক একটী সত্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইহাতে বাহাদুরী আছে বটে! এই গ্রন্থে বিশ্লেষণের সাধারণ নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে। কোন শব্দের প্রথম অক্ষর সংক্ষেপতঃ ঐ শব্দের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাস্কর যোগ ও বিয়োগের সূচক সংক্ষিপ্ত চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু তাহার পুস্তকে গুণন, সমান ও অসমান প্রভৃতির চিহ্ন নাই। এগুলি চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ না করিয়া অক্ষর দ্বারায় লিখিত হইয়াছে। কোন ভগ্নাংশের লব ও হরের মধ্যস্থিত অংশ জ্ঞাপক রেখা নাই। অজানিত সংখ্যা সমূহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। বিভিন্ন রঙের প্রথম বর্ণ দ্বারাই অজ্ঞাত সংখ্যা (যেমন ইংরেজী x) জ্ঞাপন করিয়াছেন। সমীকরণের বাম ও দক্ষিণ দিক পরস্পর উর্দ্ধাধঃ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, শূন্য সিদ্ধান্ত (Rules of cipher), সমীকরণ, ও মূল সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত (Operations of surds=মৌলিক) প্রভৃতি প্রায় সমুদয় প্রশ্নেই সুন্দরী যুবতী ও বীর পুরুষের অবতারণা করিয়া বিষয়টী সহজে আয়ত্বে আনিবার উপযুক্ত করিয়াছেন।

এখানে আর একটী কৌতুহলপ্রদ বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নিউটন ও জার্ম্মনীর লিব্নিটজ্ আপনাদিগকে যে সূক্ষ্মমানগণিত ও সমাহার গণিতের (Differential and integral calculus) আবিষ্কর্ত্তা মনে করিয়া ৯ বৎসর পরস্পর ঝগড়া করিয়াছিলেন, সেই সূক্ষ্ম মানগণিতের আভাষ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাস্কর তাহার গ্রন্থে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাহার ত্রিকোণমিতির একটী সূত্র আমাদের নিম্ন লিখিত Formulaর সমান; যথা, $d(\sin Q) = \cos Q\, dQ$।

আরবগণ আর্য্যভট্ট ব্রহ্মগুপ্ত এবং তাহার পরবর্ত্তী শ্রীধর (আচার্য্য) ও পদ্মনাভ প্রভৃতি গণিত ও জ্যোতিষ বিশারদ পণ্ডিতগণের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাস্করের এই উন্নততম গ্রন্থের সদ্ব্যবহার তাঁহারা করিতে জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

বৈদেশীক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, যে সময়ে ভারতের সঙ্গে আরবের প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যের আদান প্রদান চলিতেছিল তখন (প্রায় ৩০০ খৃষ্টাব্দে) আরবগণ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ভারতীয় বণিকগণ তাহাদের কাগজ পত্রে সংখ্যা ব্যবহার করিতেছেন। সুতরাং ঐ সময়েই আরবীয়েরাও ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭৭৩ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি সারণী (Astronomical Tables) বোগ্দাদে নীত হইয়াছিল। তখন হইতেই আরবগণ দশমিক প্রণালী ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সঙ্কলন ও সংগ্রহ

বিমান মার্গে ট্রাম।

কালিপোর্নিয়ার লবণপূর্ণ উপত্যকায় বিমান মার্গে তার দ্বারা যে ট্রামওয়ে স্থাপিত হইয়াছে উহাই পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট ট্রামওয়ে। জনমানব শূন্য স্থানে ঐ লবণ উপত্যকা বর্ত্তমান। ট্রাম হইবার পূর্ব্বে রেলের মালগাড়ীর দ্বারা ত্রিশ দিবসে বহু কষ্টে লবণ আনা হইত। কিন্তু এখন ৭০০ পৌণ্ড লবণ ধরে এমন বালতিতে লবণ আনা হয়। ঐ বালতি গুলি পরস্পর শিকল দ্বারা রেলের গাড়ীর ন্যায় সংযুক্ত হইয়া শূন্য দিয়া আইসে। ৬০০০,৭০০০ ফিট উচ্চস্থিত তারের উপর দিয়া বৈদ্যুতিক কলে এই বালতীগুলি চালান হয়। এই শূন্য মার্গটি ১২২ মাইল দীর্ঘ দুই ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে বৈদ্যুতিক বলে লবণ উপত্যকা হইতে কালিফোর্নিয়ায় পৌঁছান যায়। তারটি যেখানে খুব উর্দ্ধে উত্থিত, সেই স্থানটি উপত্যকা হইতে ৪৪০০ ফিট দূর।

কুম্ভীরের কার্য্য।

আমাদের দেশে রাস্তার নর্দ্দমা পরিষ্কার করিবার কার্য্য মেথর বালক দ্বারা সম্পন্ন করান হয়। নর্দ্দমা হইতে

কার্বনাদি অম্ল বাষ্প ও অন্যান্য দোষিত বাষ্প উত্থিত হয়, সেই বিষাক্ত বাষ্পে অনেক বালকের প্রাণ নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকায় বালকের পরিবর্তে কুম্ভীরের দ্বারা ঐ কার্য্য সংসাধিত হয়। কুম্ভীর শীকার জন্য বেতন করা শীকারী আমেরিকার পূর্ত্ত বিভাগে নিযুক্ত আছে। তাহারা কুম্ভীর ধরিয়া জলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ পাত্রে রাখিয়া দেয়। প্রয়োজন মত কুম্ভীরকে নর্দ্দমা মধ্যে ছাড়িয়া দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে নলদ্বারা নর্দ্দমায় প্রচুর পরিমাণে জল দিতে থাকে। কুম্ভীর নর্দ্দমার কর্দ্দম বহন করিয়া লইয়া যা।

মোটর বাঁশী।

জাপানের কিউটো পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্যালয়ে ১২টার সময়ে তোপ দাগিবার পরিবর্তে মোটরের বাঁশী ব্যবহার করা হয়। উহা ৭৩ ফুট দীর্ঘ ও পিতল নির্ম্মিত। উহাই জগতে দীর্ঘতম বাঁশী। উহা কোয়াসকি বন্দরের কারখানায় প্রস্তুত। বাঁশীটি কিউটো নাগরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে স্থাপিত। দ্বাদশ ঘোটকের শক্তি বিশিষ্ট একটি বৈদ্যুতিক মোটার দ্বারা পরিচালিত হয়। কার্য্যালয় হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সাহায্যে ১২ টার সময়ে সঙ্কেত করা হইলেই পাইপ দ্বারা ঐ বাঁশীর মধ্যে বায়ু চালিত করা হয়; তখন শত বজ্র পতনের ন্যায় শব্দ শুনা যায়।

মধুমক্ষীর দৌত্য।

যুদ্ধে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য পূর্ব্বে অনেক স্থানে পারাবতের ব্যবহার ছিল। এখন পারাবতের পরিবর্তে মধুমক্ষিকার দ্বারা ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। মধুমক্ষিকাকে মধুচক্রের মধ্যে রাখিয়া লালিত পালিত করে। এবং যেখানে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে তথায় ঐ মধু চক্রের কিয়দংশ ও উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট পুষ্প রাখা হয়। মধুমক্ষিকার পক্ষে অণু বীক্ষণিক যন্ত্র সাহায্যে সঙ্কেতিক সংবাদ লিখিয়া মক্ষিকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মক্ষিকা সেই স্থানে গেলে অনুবীক্ষণ সাহায্যে সংবাদ পাঠ করা হইয়া থাকে।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

মিলনের ব্যথা।

দূরেতে রহিলে হিয়া মাগে দরশন;
মিলনে চাহিয়া থাকি, নাহি মিটে সাধ।
সহসা বিরহ নিয়ে দুঃখ-শিহরণ
প্রণয়ের তটে তটে গাঁথে শিলা বাঁধ।
প্রাণ ত হয়নি খোলা তৃষা অগ্নি-গিরি।
পুড়িছে অন্তর নিত্য অনল উগারি।

শ্রীদীননাথ মজুমদার, এম্, এ।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ও করতোয়া—শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু প্রণীত, মূল্য একটাকা। গ্রন্থ খানা পৌণ্ড্র বর্দ্ধন এবং করতোয়া—এই দুইটি অংশে বিভক্ত এবং এক এক অংশে চারিটী করিয়া অধ্যায়। পৌণ্ড্র বর্দ্ধনের আদি কথা ও অবস্থান, পৌণ্ড্রদেশের বিবরণ, ধর্ম্মেতিহাস ও ঐশ্বর্য্যাদি এবং পৌণ্ড্র বর্দ্ধন বা মহাস্থানের আধুনিক অবস্থার ইতিহাস—প্রথম অংশে, এবং করতোয়ার প্রাচীনতত্ব ও গঙ্গার সহিত করতোয়ার সম্বন্ধ, পুরাণে করতোয়া, করতোয়া মাহাত্ম্য, করতোয়ার গতি, বাণিজ্য, করতোয়ার ক্ষুদ্রত্বের কারণ, অধুনা করতোয়া ও দেশের অবস্থা—দ্বিতীয় অংশে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার শাস্ত্র গ্রন্থাদি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিয়া এই গ্রন্থখানা লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুসন্ধানের প্রসংশা করিতেছি। এইরূপ গ্রন্থ যত অধিক প্রকাশিত হইবে, ততই সাহিত্যের সম্পদ ও দেশের গৌরব বৃদ্ধির কারণ হইবে।

সাবিত্রী—শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী প্রণীত, মূল্য একটাকা। কবি-গ্রন্থকর্ত্রীর রুক্মিণী পড়িয়া একদিন যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহার সাবিত্রী পড়িয়াও আজ সেইরূপ মুগ্ধ হইয়াছি। পাঁচটী সর্গে এই কাব্যগ্রন্থ রচিত, পাঁচটী সর্গই কাব্য মাধুর্য্যে ও লিপি কৌশলে অলঙ্কৃত। ছাপা, কাগজ, বাঁধাইও সুন্দর।
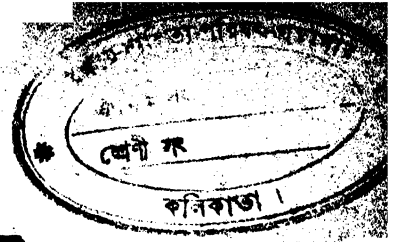
অষ্টম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩২৭। { সপ্তম সংখ্যা।

নববর্ষ।

নববর্ষের প্রভাত-রবির প্রথম-অভ্যুদয় ছায়াঘন-অরণ্যের শিরে আসন্ন হইয়া আসিল। সমস্ত-অন্ধকার ভেদ্ করা এই নব অভ্যুদয় কি উদার! কি গরিমাময়!

দেখিতে দেখিতে সমস্ত গগন পরিপূর্ণ করিয়া দিব্য জ্যোতিপুঞ্জ বিশ্ব-পৃথিবীর উপরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল— একটী মহোজ্জ্বল আলোক বিশ্বের হৃদয়কে স্পর্শ করিল, একটী সুদূরাগত আহ্বান তুষার-শীতল পর্ব্বতের শিখরে শিখরে, গহন-বনানীর শিরে শিরে, বিকাশোন্মুখ কুসুম বীথিকার শীর্ষে শীর্ষে, তৃণে তৃণে, শষ্পে শষ্পে, দিকে দিগন্তে গুঞ্জিত হইতে লাগিল—এই আহ্বান বাণী—সেই চিরনবীন বাণী—নববর্ষের জাগ্রত-দেবতার সানন্দ অভিবাদন!

এই বাণীত ব্যর্থ হইবার নয়; তাইত আজ ইহারই প্রেরণায় সমস্ত জগত জাগ্রত হইয়া উঠিল—বিশ্বের নিগূঢ় মর্ম্মকোষের সমস্ত সুপ্ত সঙ্গীত সকরুণ মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—সেই সুদূরাগত ধ্বনির প্রতিধ্বনি!

তাইত আজ এই কোয়েল দয়েলের কণ্ঠে কণ্ঠে সুললিত কল-সঙ্গীত, পুষ্পবল্লরীর স্তবকে স্তবকে অজস্র লাবণ্য-বিকাশ, কুহু-কুহরিত আম্রবনে মঞ্জরিত মুকুলের আমোদিনী-সুরভি!

ঠিক্ তেমনি একটী জ্যোতির্ম্ময় আহ্বান, একটী অব্যক্ত বেদনা, অনন্ত আকাশ হইতে, বিশ্বমানবের অবরুদ্ধ হৃদয়-দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিয়া বলিতেছে,—

"খোল্ রে, দুয়ার খোল্!"

এ যেন প্রতিদিবসের জরাজীর্ণ পুরাতন মর্ত্তালোকের পুরোভাগে স্বর্গের চিরনবীন অপূর্ব্ব দিব্যবাণী—

"খোল্ রে, দুয়ার খোল্।"

বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ, চলিয়া যাইতেছে; তবুও ত মানব হৃদয়ের—রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত হইল না! যুগযুগান্তর ধরিয়া তাই সমস্ত আকাশ একটী অনবচ্ছিন্ন ক্রন্দন নিনাদে মুখরিত হইতেছে—

"হায় বিশ্ব-মানব আজো জাগিল না!"

বিশ্বপ্রকৃতি জাগিয়াছে; মাঠে মাঠে কত শষ্প, কত তৃণ হরিৎশোভায় বিশ্বলোক উদ্ভাসিত করিতেছে, অরণ্যে অরণ্যে কত সবুজপত্র পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে, কাননে কাননে কত সুগন্ধ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু হায়, বিশ্ব-মানবের হৃদয়-কুসুম আজো ফুটিল না। হায় ফুটিল না!

কিন্তু মানব হৃদয়ের বিকাশ কি পুষ্পবিকাশের মত এতই সহজ, এতই সরল! তাহার সার্থকতার বাধা কি একটি? তাহার কীট কি একটী? তাই ত কতশত সুকুমার-হৃদয় কত স্বার্থের, কত প্রবৃত্তি-কীটের দারুণতম দংশনে তাহার সমস্ত অবিকশিত লাবণ্য লইয়া ব্যর্থতার কঙ্করাকীর্ণ ধূলিতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। শত শত মানবাত্মার অন্তরতম মহত্ত, প্রবৃত্তিবেগের দুর্ব্বিসহ তাড়নায় শোচনীয়তম নিস্ফলতায় পর্য্যবসিত হইতেছে!

কিন্তু তথাপি আমরা কি কখনো দেখিনাই শতসহস্র বাধা ও প্রতিকূলতার পাষাণপ্রাকার বিদীর্ণ করিয়া মানব-হৃদয়ের অন্তরতম উৎস কি দুর্ণিবার আবেগে সমুৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে—দেখি নাই কি মানুষ তাহার সমস্ত বন্ধন

[illegible]র্ণ করিয়া কি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধিতার সহিত মুক্তির আনন্দে আপনাকে উৎসৃষ্ট করিয়া দিয়াছে, দেখিনাই কি —মানুষ অপরাজিত বীর্য্যে ও অপ্রতিহত প্রতাপে তাহার [illegible]দার প্রবৃত্তির উদ্ধত আন্দোলনকে চিরতরে নিরস্ত করিয়া দিয়াছে—দেখি নাই কি মানুষ সমস্ত স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, অর্থ—সম্পদ্ তুচ্ছ করিয়া অকুণ্ঠিত কণ্ঠে এই অমৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে,—

"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

আমি জানি, মানবত্বের বিকাশের পথে পদে পদে কত সঙ্কট, কত বিপত্তি ; কিন্তু তার চেয়েও আরো বেশী জানি,—যে মানুষ সমস্ত বাধার উপর দিয়া, তাহার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। আমি জানি মানুষের অহঙ্কার তাহাকে তুচ্ছতম সুখ দুঃখের পথে অহরহঃ পরিচালিত করিয়া তাহার উচ্চতম আশা ও সংকল্পকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে ; কিন্তু তার চেয়েও আরো বেশী জানি, যে মানুষের রিপু যতই প্রবল হউক্, সে তাহার মহিমাকে কিছুতেই ব্যর্থ করিতে পারিল না,—মানুষ কঠোরতম দুঃখে ও তীব্রতম প্রায়শ্চিত্তে আপনার দুর্দ্দমনীয় রিপুকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া মহত্ত্বের মহনীয় শিখরাভিমুখে আপনার যাত্রাপথ প্রশস্ত করিতেছে। আমি জানি যে মানুষের মাথার উপর দিয়া শত দুঃখের, ঝটিকা বহিয়া যাইতেছে—শত বিপদ শত মৃত্যুর সুবিপুল গর্জ্জনে তাহার কর্ণরন্ধ্র বধির হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু তার চেয়েও আরো বেশী জানি, যে মানুষ আপনার মানুষত্বের আনন্দেই মৃত্যুকে, দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে, শত বিপদ্ ঝঞ্ঝার প্রলয়রোলের ভিতর দিয়া, শত উন্মত্ত বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষের ভিতর দিয়া তাহার চরমতম দুঃখের পরমতম আনন্দাভিসার যাত্রা যুগ হইতে যুগান্তর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ করিয়া চলিয়াছে।

আজ সেই মনুষ্যত্বের ক্ষুরধারনিশিত দুঃখদুর্গম পন্থায় যাত্রার বাহির হইবার জন্য এই নবরৌদ্রবিভাসিত আকাশে [illegible] পবনে আহ্বান আসিল—সে আহ্বান সমুদয় মর্ম্মগ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের অন্তরে আসিয়া পৌঁছিল।

ওরে যাত্রী ! আর কত কাল সুখের লালসায় আলস শয্যায় সুষুপ্ত রহিবি ! বাহির হইতে আহ্বান আসিয়াছে "উত্তিষ্ঠত ! জাগ্রত !" আর ত মোহতন্দ্রায় মগ্ন থাকিবার দিন নাই। বাহিরের চিরপ্রতিধ্বনিত বেদনা সমস্ত বক্ষের পঞ্জরে আসিয়া আঘাত করিতেছে।

ওরে যাত্রী ! ঐ শোন্ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত গ্রহে, নক্ষত্রে, তারকায় অনন্ত যাত্রার বিজয়-সঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছে, আকাশের প্রতি রন্ধ্র পরিপূর্ণ করিয়া তার অধীর মূর্চ্ছনা ঝঙ্কারিয়া উঠিতেছে ;—

নিখিল চরাচরের সেই যাত্রা কোন্ অনাদি অতীতের তোরণ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া কত নব নব বিকাশের সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের সুদূর দিগন্তের অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছে :—তাহারি তালে তালে তাল মিশাইয়া যাত্রা করিবার দিন আজ আসিয়াছে। সমস্ত আকাশ তোর অভিমুখে তাকাইয়া আজ রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহারি প্রতীক্ষা করিতেছে।

ওরে যাত্রী ! অদ্যকার এই নববর্ষের নবপ্রভাত সেই যাত্রার উদ্বোধন সঙ্কার করুক। অনতিকাল পরে দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যে বিদ্যুদ্বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, সেই দারুণ দাবদাহের বক্ষ ভেদ করিয়া তোর যাত্রা-পথ চলিয়া গিয়াছে। আজ যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে সেই যাত্রায় যোগদান করিতে পারি।

আজ যেন অতীত জীবনের সমস্ত অহঙ্কার ও প্রবৃত্তির অতিতুচ্ছ কোলাহল সম্পূর্ণ উপেক্ষার সহিত বিস্মৃত হইয়া উন্নত মস্তকে, ও উন্মুক্ত হৃদয়ে নববর্ষের এই নব জাগ্রত আলোকটীকে বরণ করিয়া আমার হৃদয় মন্দিরে আবাহন করিয়া লইতে পারি এবং বিশ্বনিখিলের সহিত কণ্ঠে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, হৃদয়ে, সম্মিলিত হইয়া এই আগমনী গান গাহিতে গাহিতে আমাদের আনন্দ যাত্রা আরম্ভ করিতে পারি :—

"ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক্ জয়।
হে বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে,
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক্ ক্ষয়।
তোমারি হউক্ জয়।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।
১লা বৈশাখ, ১৩২৭।

কাব্যের শিক্ষা।

কেহ কেহ হয়ত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিতে পারেন, কাব্যের আবার শিক্ষা কি? কারণ, কয়েক বৎসর হয় আমাদের সাহিত্যিক মহলে দুইটি বিভিন্ন মতাবলম্বী সমালোচক শ্রেণী দেখা যাইতেছে। একদলকে একান্ত সৌন্দর্য্যবাদী এবং অপরদলকে অতি-নীতিবাদী সমালোচক বলা যাইতে পারে। এক পক্ষের মত—সুকুমার সাহিত্যের একমাত্র কার্য্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও তদ্দ্বারা পাঠকের আনন্দবিধান, অপর পক্ষের মতে, কাব্যকারের একমাত্র কর্ত্তব্য শিক্ষাদান। একপক্ষ বলেন—কাব্য শুধু শিল্পচাতুরি, অপর পক্ষের মতে তাহা নিরেট্ গুরুগিরি। এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব আমাদের দেশে নূতন আমদানি হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা তত নূতন নহে। রবার্ট ব্রাউনিংএর The Ring and the Book নামক কাব্য প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজ সাহিত্যিক সমাজে এই প্রশ্নটাই উঠিয়াছিল। অতি-নীতিবাদীর দল ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যেহেতু উক্ত কাব্য পাঠক সমাজের জন্য দৃষ্টতঃ কোন শিক্ষা বহন করিয়া আনে নাই, অতএব তাহা কাব্য নামবাচ্য নহে। মোট কথা একপক্ষ ভুলিয়া যান যে কাব্য-রচনা একটা Art বা ললিতকলা,—অন্য পক্ষ মনে রাখেন না যে প্রকৃত আর্ট, বিলাসবাসনার, ইন্দ্রিয়সেবার যন্ত্রস্বরূপ নহে, পক্ষান্তরে তাহা মানব সভ্যতা ও সাধনার এক শ্রেষ্ঠ উপাদান,—মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের নিদান। কাব্যের বা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অব্যবহিত উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টিদ্বারা আনন্দ বিধান বটে, কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মূলেই আরেকটা গূঢ়তর অভিসন্ধি নিহিত থাকে, যদিও ঐ সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা উক্ত অভিসন্ধির অস্তিত্ব বিষয়ে দর্শক বা শ্রোতাকে সর্ব্বদা সতর্ক রাখিয়া তাহার রসসম্ভোগের ব্যাঘাত জন্মান না। সুবিখ্যাত রসজ্ঞেরা কাব্য সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিরোধের এই মীমাংসারই উপনীত হই।

গ্রীক্ মনীষী Aristotle ইতিহাস অপেক্ষা কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন উপলক্ষে কাব্যান্তর্গত যে 'Higher Truth', 'Higher Seriousness'এর কথা বলিয়াছেন তাহাই শ্রেষ্ঠকাব্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য। আপাতচঞ্চল মানবজীবনের অন্তরতম ধ্রুব সত্যটির সন্ধান—মানুষের জন্ম মৃত্যু-কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যকার গূঢ় রহস্যটির সুসঙ্গত সমাধান প্রকৃত কাব্যই আমাদের চিত্তফলকে অনায়াসে মুদ্রিত করিয়া দেয়।

কবি শেলীর মতে—Poetry is what redeems from decay the visitations of the divinity in man, and is the record of the best and happiest moments of the best and happiest minds—যাহা মানব-হৃদয়ের দৈব প্রেরণাগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া সঞ্জীবিত রাখে তাহাই কবিতা। সানন্দচিত্ত, নির্দ্বন্দ্ব, মনীষাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও ভাবরাশির লিপিবদ্ধ ইতিহাসই কাব্য। ফরাসী ভাবুক Amiel বলেন—The true poetry is that which raises you towards Heaven, and fills you with divine emotions, which sings of love and death, of hope and sacrifice, and awakens the sense of the infinite.—প্রকৃত কাব্য মানুষকে স্বর্গের অভিমুখে উন্নীত করে, মনুষ্য হৃদয়কে পবিত্র ভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত করে; প্রকৃত কবিতা প্রেম, মৃত্যু-আশা ও আত্মত্যাগের সুমহান্ সঙ্গীত, তাহা আমাদের অন্তরে অনন্তের অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। মার্কিন দেশীয় কবিদার্শনিক এমার্শন "Poetry and Imagination" (কবিতা ও কবি-কল্পনা) নামক প্রবন্ধে বলেন:—

Poetry is faith...must be affirmative. It is the piety of the intellect. "Thus saith the Lord," should begin the song. The poet who shall use nature as his hieroglyphic must have an adequate message to convey thereby. He is the true Orpheus who writes his ode, not in syllables, but in man. * * The poet must let humanity sit with the muse in his head... should rejoice if he has taught us to despise his song; if he has so moved us as to lift us—

to open the eye of the intellect to see further and better.—কবিতা আধ্যাত্মিকতা হইতে অভিন্ন—তাহা নাস্তিকমুখী নহে, কিন্তু আস্তিক্য বুদ্ধির জনয়িত্রী হইবে। কাব্য মানব-মনীষার পুণ্যজ্যোতিঃ—মানস-কাননের অমৃতময় আধ্যাত্মিক ফল। "ভাগবতী কথা এই করুন শ্রবণ" এই বলিয়া কবি তাঁর সঙ্গীতের মুখবন্ধ করিলেন। ধর্ম্মবিদ্‌গণ যেমন একপ্রকার সাঙ্কেতিক বর্ণমালার সাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেন, যে কবি সেইরূপে প্রকৃতিকে রহস্যময় বর্ণমালা-স্বরূপ ব্যবহার করিতে চান, তাঁহার পক্ষে মানবজাতির জন্য উপযুক্ত কল্যাণ-বাণী বহন করিয়া আনা অত্যাবশ্যক। প্রাচীন অর্ফিয়াসের ন্যায় যে কবি সঙ্গীত প্রভাবে জড় অ-জড়, স্থাবর জঙ্গমকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে চাহেন তাঁহার কবিতা শুধু পদাংশের সমষ্টি বা বাক্যাড়ম্বর মাত্র হইলে চলিবে না, তাহা মনুষ্য হৃদয়ের জীবন্ত অক্ষরে ও ছন্দে গ্রথিত হইবে। কবির মানসপদ্মে কাব্য-লক্ষ্মীর পার্শ্বদেশে বিশ্বমানবকে স্থান দিতে হইবে। কোন কবি যদি (তাঁহার সঙ্গীত প্রভাবে) আমাদের চিত্তকে এরূপভাবে স্পর্শ করিয়া থাকেন যাহাতে আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-আত্মা এক ঊর্দ্ধতর লোকে উন্নীত হয়,—আমাদের মানস-লোকের দৃষ্টি সর্ব্বআবরণমুক্ত হইয়া, সান্ত জগতের সীমা ছাড়াইয়া অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়, তবে তাহাতে তাঁহার আত্ম-প্রসাদ অনুভব করা কর্ত্তব্য, যদ্যপি তাঁহারি কাব্যের মহৎ শিক্ষার ফলে তাঁহার সমুদয় কাব্যকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার না করি।

আবার, আমাদের রবীন্দ্রনাথের মুখেও কাব্যের আসল তাৎপর্য্যের কথা উক্ত রূপই শুনি। যথা—

> "কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
> সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,—
> তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
> সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে।
> কবি আপনার গানে যত কথা কহে,
> নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি;
> তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্থ খানি।"

তবে, আমরা প্রায়শঃ ভুলিয়া যাই কাব্যের ভিতরকার এই যে আনন্দঘন শিক্ষা তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি, তাহার প্রণালী দর্শন-শাস্ত্রের, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কিম্বা ব্যবসায়ী শিক্ষক মহাশয়দের শিক্ষাপদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শেষোক্ত প্রণালী হৃদ্যতাবিহীন ভিষকের মত বিধি নিষেধ ও শাসনের তাড়নায় দুর্ভাগ্য শিক্ষার্থীর হৃদয়-পদার্থটিকে পীড়িত করিয়া সুতীক্ষ্ণ শলাকামুখে সুনীতির বীজাম্বু আমাদের মানস স্নায়ুমণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে চাহে। পক্ষান্তরে, কাব্য-লক্ষ্মী সেবাপরায়ণা, সহৃদয়া ভার্য্যার ন্যায়, অথবা স্নেহময়ী জননীর ন্যায় স্নেহকোমল স্পর্শে আমাদের বাসনাদগ্ধ হৃদয়ে অমিয় প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া ভব-বেদনার উপশম করিতে চান।

কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, কাব্যের যে পরম শিক্ষার কথা বলা হইল তাহা কাব্যাধ্যয়নের শেষ পরিণাম—তাহা কাব্য-পাঠজাত রস-সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ও তাহারি ফলস্বরূপে, পাঠকের অজ্ঞাতসারে শারদীয় শিশির বিন্দুর ন্যায় নীরবে ঝরিয়া ঝরিয়া তাহার হৃদয়ের তলদেশে সঞ্চিত হইতে থাকে। সাহিত্য-রথী মর্লী প্রকৃত কাব্য-পাঠের এই পরিণামকে "Unity of impression" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—"Unity of impression * * * * is the highest aim of all dramatic art, perhaps of all arts to produce. * * The Sculptor, the painter, the musician have each their special means of producing this final and superlative impression."—রসের একত্ব, অখণ্ডত্ব, অর্থাৎ সমুদয় রসবৈচিত্র্যের সম্মিলনসঞ্জাত এক অখণ্ড পরম রসের উদ্ভাবনাই সকল নাট্যকলার, সম্ভবতঃ সকল ললিত কলারই প্রধান লক্ষ্য। ভাস্কর্য্য-শিল্পীই বল, চিত্র শিল্পীই বল, কিম্বা সঙ্গীতপটু সুগায়কের কথাই বল ইঁহারা সকলেই এই একই সর্ব্বোত্তম চরম রস-সৃষ্টির জন্য তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি ধর্ম্মসঙ্গীত আর কবিতায় কোন প্রভেদ নাই? এ প্রশ্নের উত্তর উপরে কাব্যের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে তাহা হইতেই পাওয়া যাইবে। ধর্ম্ম সঙ্গীত মাত্রই কাব্য নহে। যে সঙ্গীতের এক

মাত্র অথবা অব্যবহিত লক্ষ্য বৈরাগ্যের শিক্ষা দান,—সংসার অনিত্য, দেহ অনিত্য, ঐহিক জীবনের সকল কর্ম্ম-চেষ্টা, আশা, আকাঙ্ক্ষা মৃগতৃষ্ণিকাবৎ অলীক মায়া—তাহা মানব হৃদয়ে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করে, আনন্দের উদ্রেক করে না, এই সুখ-দুঃখ কর্ম্মময় জীবনের অন্তহীন ব্যাপ্তি, ও আনন্দময় পরিণতির আশা জাগাইয়া দেয় না। কিন্তু যাহা কবিতা তাহা মুখ্যতঃ আনন্দ দান করে। আনন্দের আবার শ্রেণী ভেদ আছে। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হইতে মানসিক বৃত্তির তৃপ্তিসঞ্জাত আনন্দ শ্রেষ্ঠ, আবার মানস সুখ অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় আত্মার প্রসন্নতা শ্রেষ্ঠ। যে কাব্য অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া মানবাত্মাকে অনাবিল আনন্দের অমরাবতীতে উন্নীত করে তাহাই একাধারে শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সঙ্গীত। কারণ, এই যে আনন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষা তাহা মানুষ সমস্ত দেহ-মন আত্মা দ্বারা সমস্ত জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের যে বিধানবেধাত্মক শিক্ষা তাহা মানুষের উপর জোর জুলুম করে, এবং সেই জন্য অনেক স্থলেই কার্য্যকরী হয় না। এজন্য "গীতার" একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ বর্ণনা, Bibleএর Psalms of David, St. Francis এর পরমার্থ সঙ্গীত, Thomas A. Kempis এর "Imitation of Christ,' বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির বৈষ্ণব পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য" "গীতাঞ্জলি," "গীতিমাল্য" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কাব্য অথচ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সাহিত্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

প্রভাত।

(১)

হে উজ্জ্বল! হে দীপ্ত প্রভাত!
বিদারিয়া রজনীর নিষ্ঠুর নীরন্ধ্র অন্ধকার,
বিকীর্ণ কিরণ তব তন্দ্রালস শিয়রে সবার—
হ'ল আকস্মাৎ;
হে উজ্জ্বল! হে দীপ্তপ্রভাত!

(২)

নবোদিত তোমার আলোকে—
ভাঙ্গি' গেল গৃহে গৃহে গাঢ় অন্ধ মোহতন্দ্রাবেশ,
জাগিল বিস্ময় স্তব্ধ ঊর্দ্ধপানে চাহি নির্নিমেষ
প্রতি লোকে লোকে,
নবোদিত তোমার আলোকে।

(৩)

জাগিয়াছে বিশ্বচরাচর,—
ধরণীর প্রান্তে প্রান্তে তাই কি অশ্রান্ত কলরোল
গগনের কোণে কোণে সঞ্চারিল জাগরণ বোল
বিহঙ্গ নিকর—
জাগিয়াছে বিশ্ব চরাচর।

(৪)

আনন্দ মধুর তব গান—
ধ্বনিয়াছে দিকে দিকে, জলে স্থলে, নীল নভস্তলে,
প্রান্তরে, কান্তারে; গাহে তরঙ্গিণী মৃদু কলকলে;
কি উদাত্ত তান,
আনন্দ মধুর তব গান।

(৫)

হে সুন্দর, আসিয়াছ আজি!
প্রসন্ন সুশুভ্র হাস্যে প্রস্ফুটিত করি পৃথিবীরে,—
বসিয়াছ শান্তাননে প্রচ্ছায় মলিন তরুশিরে—
শুভ্র সাজে সাজি'
হে সুন্দর! আসিয়াছ আজি।

(৬)

হে নবীন! হে চির সুন্দর।
তোমার লাবণ্য আজি লীলায়িত দিগ্ দিগন্তরে
তোমার আনন্দ আজি তরঙ্গিত সর্ব্ব চরাচরে—
শান্ত! মনোহর!
হে নবীন! হে চির সুন্দর!

(৭)

এহি, এহি, হে দীপ্ত প্রভাত।
হৃদয়ে দেহিমে বীর্য্য, কান্তি দেহ, অঙ্গে দেহ বল,
উঠুক ভেদিয়া হৃদি শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতিঃ শতদল,—
যাক কেটে রাত,—
হে উজ্জ্বল! হে দীপ্ত প্রভাত।

শ্রীঃ—

জ্যোতিষে অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার।

আধুনিক প্রায় সকল শিক্ষিত লোকের মতেই "অদৃষ্টবাদ" আমাদের জাতীয় অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ আমাদের জাতিটাকে একেবারে পঙ্গু ও নিশ্চেষ্ট করিয়া আধুনিক উন্নতিশীল জাতি সমূহের অনেক পশ্চাদবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে এবিষয়ে অনেকেই একমত। মায়াবাদ এপ্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়; অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে হিন্দু-ফলিত জ্যোতিষের উপরই সকলে দোষারোপ করেন। অনেকেরই ধারণা ফলিত জ্যোতিষ অদৃষ্টবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং স্বভাবতঃই তাহারা দেশহিতৈষণা প্রণোদিত হইয়া অদৃষ্টবাদ ও তাহার সহায়কারী ফলিত জ্যোতিষে বিতৃষ্ণ। বস্তুতঃ হিন্দুর ধর্ম্মপ্রবণতা ও তাহার আনুসঙ্গিক ফল অদৃষ্টবাদিতা যে আমাদের জাতিটাকে অনেক পরিমাণে পঙ্গু করিয়া আধুনিক জড় বিজ্ঞানের সভ্যতায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে বিরত করিয়াছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে দেখিতে হইবে জ্যোতিষ এ বিষয়ে কতখানি সহায়তা করিয়াছে বা আদৌ সহায়তা করিয়াছে কি না? আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ফলিত জ্যোতিষ এই অদৃষ্টবাদকে প্রশ্রয়তো দেয়ই নাই বরং পুরুষকারের দিকেই, বেশী প্রোৎসাহিত করিয়াছে।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মকেই এইজন্মে দৈব, ভাগ্য বা অদৃষ্ট নামে অভিহিত করা হয়। (১) জ্যোতিঃশাস্ত্র দ্বারা যে ফল নির্দ্দেশ হয়, তাহা মাত্র জন্মান্তরীন্ কর্ম্মকেই প্রকাশিত করে। (২) এখন দেখিতে হইবে মানুষ কেবল অন্যজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফলই ভোগ করে অথবা তাহার নিজস্ব কর্ম্ম কিছু আছে, যাহা জ্যোতিঃশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম নহে। অর্থাৎ মানুষ কেবল দৈবেরই দাস অথবা তাহার নিজ পুরুষকারের কিছু প্রভাব আছে? এবং এসম্বন্ধে জ্যোতিঃশাস্ত্র কি বলে?

(১) পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।

(২) যদুপচিতমন্য জন্মনি শুভাশুভং তস্য কর্ম্মনঃ পক্তিং। ব্যঞ্জয়তি শাস্ত্রমেতৎ তমসি দ্রব্যাণি দীপ ইব।

"হায়ণ রত্ন" নামক গ্রন্থে এবিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে। বৃহজ্জাতকে ভট্টোৎপল বিরচিত টীকায়ও ইহার আলোচনা দৃষ্ট হয়। তাঁহারা ঠিক যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাই আমরা প্রথমতঃ প্রদর্শন করিব॥ তাহারা বলেন—

"এই কালজ্ঞ জ্যোতিশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? যদি মানুষ কেবল অন্য জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগার্থেই এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে এবং সারাজীবন কেবল সেই পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফলই ভোগ করে, তবে এই শাস্ত্র দ্বারা তাহা জানিয়া কি লাভ? যদি জন্মান্তরীন্ ফল অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারই হয়, তবে এ শাস্ত্র দ্বারা তাহা জানা বা না জানা সমান। অপর বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্র সবই ব্যর্থ। নীতি-শাস্ত্রের উপদেশ, ধর্ম্মশাস্ত্রে যজ্ঞাদির বিধান, তীর্থ যাত্রাদির উপদেশ, রোগাদি প্রশমনের জন্য বিহিত ঔষধের ব্যবস্থা সবই নিরর্থক হয়। কারণ মানুষ দৈবের দাস, সে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবশে সৎ বা অসৎ কর্ম্ম আশ্রয় করিবে, তাহার জন্য বিধি বা উপদেশ বা নিষেধ কিছুই খাটেনা॥"

বস্তুতঃ মানুষ যদি পূর্ব্বজন্মের বিঘূর্ণ্যমান কর্ম্ম চক্রের মধ্যে কেবল পাক খাইতে থাকে তবে উদ্যম, অধ্যবসায় পুরুষকার প্রভৃতি কথাগুলিকে অভিধান হইতে বাদ দিতে হয় এবং মানুষগুলি নিশ্চেষ্টতায় জমিয়া স্থবিরতা লাভ ভিন্ন তাহাদের আর গত্যন্তর থাকে না॥ যাহা হউক এসম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত রূপ আলোচনার পর "হায়ণরত্নে" এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে মানুষের জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল দ্বিবিধ, দৃঢ় কর্ম্মোপার্জ্জিত ও অদৃঢ় কর্ম্মোপার্জ্জিত। প্রথমোক্ত কর্ম্মফল অনিবার্য্য—যেমন জন্মান্ধতা। এই কর্ম্মফল এত ভীষণ যে তাহার ফল হইতে মানুষ কিছুতেই পরিত্রাণ পায় না। আর অদৃঢ় কর্ম্মোপার্জ্জিত ফল প্রতিবিধান যোগ্য। অর্থাৎ জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সাহায্যে সেই প্রকার কুফল পূর্ব্বে জানিতে পারিলে প্রবল পুরুষকার অবলম্বনে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই স্থানেই নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইবে। ভট্টোৎপল বলিয়াছেন—কর্ম্মের নানারূপ বৈচিত্র্য আছে, কতকগুলি কর্ম্ম দৃঢ় মূল, আবার কতকগুলি শিথিল

মূল। (ক) মহাভারতে আছে দৈব, পুরুষকার ও কাল এই তিনটী মিলিত হইয়া ফল প্রদান করে। (খ) যাজ্ঞবল্ক, বলিয়াছেন যেমন এক চক্রের দ্বারা রথের গতি হয় না, সেইরূপ পুরুষকার ভিন্ন দৈব সুসিদ্ধ হয় না। (গ) ভগবান্ ব্যাস বলিয়াছেন—বিদ্বান্ ব্যক্তি পুরুষকার অবলম্বনে দুর্ব্বল দৈবকে ব্যর্থ করেন॥ (ঘ)

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দেখা যাইতেছে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল যদি প্রবল হয়, তবে এজন্মে তাহার ফল অন্যথা হইবে না; কর্ম্মফল দুর্ব্বল হইলে প্রবল পুরুষকার অবলম্বনে অন্যথা হইবে। জ্যোতিঃশাস্ত্র সূচিত কর্ম্ম ভিন্ন মানুষের একটী নিজস্ব কর্ম্ম আছে, যাহা জ্যোতিঃশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতে পারে না, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির উপরই তাহা প্রতিষ্ঠিত। তাহারই নামান্তর পুরুষকার। বস্তুতঃ দৈব ও ভাগ্য নামে আমরা যাহা বলি, তাহাও পুরুষকারের নামান্তর মাত্র, প্রভেদ এই যে সেই পুরুষকারটা এজন্মের নয়, পূর্ব্ব জন্মের। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমরাই নিজ নিজ ভাগ্যের জন্মদাতা ও প্রতিবিধাতা॥ জ্যোঃতিশাস্ত্র শুধু সাবধান করিতে পারে, শুভ বা অশুভ ফলের সময় নির্দ্দেশ করিয়া মানুষকে প্রবল পুরুষকার অবলম্বনে প্রোৎসাহিত করিতে পারে॥ জ্যোঃতিশাস্ত্র হইতে একটী উদাহারণে তাহার ফলনির্দ্দেশ চাতুর্য্য প্রকাশিত করিব। আয়ুর্গণনা বিষয়ে নানারূপ প্রক্রিয়া দ্বারা দুরূহ গণিতের সাহায্যে মানবের আয়ু নির্ণয় করিবার নিয়ম বিবৃত আছে। কিন্তু সেই গণনা অনুযায়ী আয়ুর অধিকারী মানব হইবে কিনা এ বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম আছে। যথা মানুষ পথ্যশীল অর্থাৎ ভোজনে সংযত, সচ্চরিত্র এবং জিতেন্দ্রিয় না হইলে উক্ত গণিতাগত আয়ুর অধিকারী হইবে না। (ক) অর্থাৎ জ্যোতিঃশাস্ত্রের দ্বারা স্থিরীকৃত আয়ুঃও যথেচ্ছাচারীর পক্ষে খাটিবে না। এখন পাঠক বর্গ বিচার করুন জ্যোতিষে অদৃষ্টের কি পুরুষকারের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে?

যাহাদের জ্যোতিষে বিশ্বাস নাই, তাহারা শনি রাহু প্রভৃতি গ্রহ গণের ফলাফল উল্লেখ করিয়া তীব্র উপহাস করেন। মানুষ স্বাধীন কর্ম্মের অধীন না হইয়া কোনও গ্রহ বিশেষের অধীন এ কথা তাহাদের অসহ্য। আবার যাহারা জ্যোতিষে আস্থাবান তাহারাও এমন অন্ধভাবে গ্রহগণের কারকতায় বিশ্বাসী যে নিজের শক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থাশূন্য। তাহারা গ্রহের শুভ বা অশুভ ফলকে অবশ্য মানিয়া লইয়া সেই সেই গ্রহের শরণাপন্ন হইয়া তাহারই উপাসনায় রত হয়েন। এই উভয় প্রকারের লোকই ভ্রান্ত। প্রথমতঃ জানিয়া রাখা ভাল, গ্রহগণ কোনও শুভ বা অশুভ ফলের কারক নহে, সূচক মাত্র। অর্থাৎ রাশি চক্রের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত গ্রহগণ মানবের শুভাশুভ ফল প্রকাশের চিহ্ন মাত্র, সেই গ্রহগণ নিজে কোনও ফল প্রদান করে না। শরীরের স্থান বিশেষে টিকটিকি পতিত হইলে সেই স্থানের নির্দ্দিষ্ট একটী ফল লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত ফল টিকটীকি প্রদান করে না, অর্থাৎ উক্ত ফলের জন্য টিকটিকি দায়ী নয়, ফল যে ঘটিবে, তাহা সে প্রকাশ করিতেছে মাত্র। সেইরূপ গ্রহগণও ফল প্রকাশক চিহ্ন মাত্র। গ্রহগণ যদি কেবল মাত্র সূচকই হয়, তবে গ্রহবিরুদ্ধ হইলে গ্রহশান্তি বা পূজার বিধান কি জন্য? এ বিষয়েও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা আছে। গ্রহগণকে সূচকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া "গ্রহরূপী জনার্দ্দনঃ" অর্থাৎ নারায়ণই গ্রহরূপে ফলদান করেন সুতরাং গ্রহপূজায় তাহারই পূজা হয় ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (খ) গীতায়ও আছে—

যোযো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু মিচ্ছতি।
তস্যতস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধ্যাম্যহম্॥
সতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্যারাধন মীহতে।
লভতেচ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন
জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

(ক) কর্ম্মনাং বৈচিত্র্যাং কানিচিৎ দৃঢ় মূলাণি কানিচিৎ শিথিল মূলানি॥

(খ) দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ভরতর্ষভ। ত্রয় মেত মনুষ্যানাং পিণ্ডিতং স্যাৎফলাবহম্।

(গ) যথা হ্যেকেন চক্রেন নরথস্য গতির্ভবেৎ॥ তদ্বৎপুরুষকারেণ বিনা দৈবং নসিধ্যতি।

(ঘ) হন্যতে দুর্ব্বলং দৈবং পৌরুষেণ বিপশ্চিতা॥

(ক) দে-পাপ-মুক্তপথ্যাদেব ব্রাহ্মণ নিন্দকা॥
[illegible] দুর্জনা যাজ্ঞা যেষাং মৃত্যুদকালজঃ॥
পথ্যাশিনঃ স্বধর্ম্মানঃ সৎকুলাঢ্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
দ্বিজদেবার্চ্চনা রতা যেষামায়ুর্নোদিতং॥

(খ) প্রাক্ কর্ম্ম সূচকাঃ খগাঃ কথমেষু ভক্তিঃ? কিন্তো গ্রহান্তিগতএব স বিষ্ণুঃ॥ দেবতা গ্রহরূপেণ মানুষ্যানাং শুভাশুভম্। ফলং প্রাগর্জিতং যত্ত তদ্দাতি স্বকীয়কম্।

বাল বিধবা।

জোস্‌নার শয্যায় ঘুম যায় রাত্রে ;
পুষ্পের গন্ধের সঞ্চার গাত্রে।
নিশ্বাস-ফিস্‌ফাস্, আস্‌বাব শুদ্ধ ;
কাক-রঙ্ কুন্তল অন্তার অন্ধ !
পাড় হীন বস্ত্রের আবরুর মধ্য,
অঙ্গের রূপ ঠিক চম্পক সদ্য !
কান্তের দর্শন, উচ্ছ্বাস বক্ষে ;
তাই ঠোঁট কম্পন, জল্‌ভার চক্ষে !
যৌবন তার এক ঝম্ ঝম্ বর্ষা ;
সুখ-সাধ সবশেষ, একদম ফর্সা !
দুঃখের দিন রাত, দুঃখের চিত্ত ;
হাস্যের লেশ নাই, ক্রন্দন নিত্য !
কন্যার-ভগ্নির মুখ্ খান দর্শি'
কয়জন চায় এই দুখ্ প্রাণ-পর্শী' !
শাস্তির বর্ষণ শাস্ত্রের কর্ম্ম ;
দুঃখের মূল নাশ চিত্তের ধর্ম্ম !
হায় হায় নিষ্ঠুর শাস্ত্রের ভক্ত,
একটুক্ নাই তোর মানুষের রক্ত।
থাক্ তোর বিচার-শক্তির গর্ব্ব ;
কিচ্ছুই নাই তোর সব জ্ঞান খর্ব্ব !
গণ্ডার চামড়ায় দুঃখের বেত্র
নিষ্ফল নিষ্ফল, শুক্‌নাই নেত্র !
দিন দিন লোপপায় গৌরব্ কার্য্য ;
কই কই, কই সেই প্রাক্তন আর্য্য !
ঝঞ্ঝাট-ঝঞ্ঝায় ঝট্‌পট্ রুগ্ন ;
ছট্‌ফট্ কর্চ্ছিস্ ; ঢের বোম্, দুঃখ।
প্রেম তোর জাগ্রৎ, হাড়মাস শুষ্ক ;
তিল তিল মর্চ্ছিস্, হচ্ছিস্ লুপ্ত !
সত্যই তোর দুখ নয় এক রত্তি ;
ঘুম যাস্, কই তুই কাঁদ্‌ছিস্ সত্যি !
কই, কই, কেউ নাই প্রাণবান্ বঙ্গে ;
ক্রন্দন সাঙ্গ বোন্, তাই তোর সঙ্গে॥

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সাধু দর্শন।

কয়েকদিন যাবৎ ময়মনসিংহ সহরে এক সাধুপুরুষের শুভাগমন হইয়াছে। তাঁহার বয়স সম্বন্ধে নানা জনরব। কেহ বলেন ৪০০ শত বৎসর, কেহ বলেন ৩৫০ বৎসরের কম নহে।

ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমরা সাধুসন্দর্শনে গমন করিলাম। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের বৈঠকখানা লোকারণ্য, দ্বার দেশের জনতা ভেদ করিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মুণ্ডিত শীর্ষ শ্মশ্রুগুম্ফ বিরহিত প্রসন্নবদন দিগম্বর মূর্ত্তি তক্তপোষ শয্যায় সমাসীন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর ও গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা। মেজের সতরঞ্চে পিপাসিত নেত্র দর্শকবৃন্দ উপবিষ্ট। সাধুর বয়স দৃষ্টতঃ ৮০ কিংবা ৯০ বয়স্ক বৃদ্ধের ন্যায় আমাদের বোধ হইল। বৃদ্ধ বটে কিন্তু স্থবির নহেন। যৌবনে বক্ষে ও বাহুদ্বয়ে বিশেষ শক্তি ছিল সন্দেহ নাই। ইহাঁর মহারাষ্ট্রীয় দেশের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। ইনি হিন্দী ভাষায় কথা কহেন, বাঙ্গালা জানেন না। অন্যান্য সাধুদের ন্যায় ইনি স্বল্পভাসী নহেন। আমরা এই ভরসায় তাঁহার চরণ বন্দনা পুর্ব্বক প্রথমতঃ তাঁহার নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম।

প্রসন্নমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিলেন, হাঁ, আমার লৌকিক নাম আছে বটে। আমার নাম কৃষ্ণাজী রাও। পূর্ব্ব নিবাস জিলা সেতারা, মেনোলী গ্রাম, এই গ্রাম নানা ফার্ণাবিসের অধিকার ভুক্ত।

এখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? কারণ কিছুই নয়, কেবল উদ্দেশ্য হীন দেশ ভ্রমণ। পূর্ব্বাঞ্চলের অনেকেই আমাকে শ্রদ্ধা করেন। এই সে দিনের কথা ; রাণী ভবাণীর জীবিত কালে তাঁহার নাটোরের ভবনে ও গিয়াছিলাম। রাজা রাজবল্লভের সহিত আমার সম্প্রীতি ছিল। আমি তাঁহাকে শালগ্রাম চক্র দিয়াছিলাম। ঐ চক্র এখন ভাগ্যকুলের কুণ্ড বাবুদের নিকট আছেন। ঢাকার শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ সেন জজ আমার বর্ত্তমান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ জেলায় আসিয়াছি। এখানে

রায় বাবু (পূর্ব্বোক্ত অবিনাশ বাবুর ভগ্নিপতি) আমার শিষ্য। এখান হইতে কোথায় যাইব স্থিরতা নাই।

প্রশ্ন ঃ—আপনি কতকাল যাবৎ গৃহত্যাগ করিয়াছেন ; আপনার মাতা পিতা জীবিত আছেন ?

সন্ন্যাসী শিরশ্চালনা পূর্ব্বক উত্তর করিলেন,—না আমি তাহা অবগত নহি। সে কি আজকার কথা ? স্মরণ হইতেছে, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের বাল্যে মৃত্যুর পর আমার মাতা পিতা আমাকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ তীর্থে শ্রীশ্রীত্রৈলিঙ্গস্বামী জীউর হস্তে অর্পণ করিয়া চলিয়া যান। তখন আমার বয়স ১১ বৎসর মাত্র। সেই সময়ে বালাজী বাজীরাও পেশোয়া হইয়াছিলেন। বলিতে গেলে, বাজীরাও সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় স্থানীয় ছিলেন।

এই সময়ে আমাদের মধ্যে জনৈক ইতিহাসজ্ঞ নিবেদন করিলেন যে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও কিছু উর্দ্ধ ১৫০ বৎসর হইল দেহ রক্ষা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার জানিতে বাসনা, স্বামীজীর বয়স ১৫০শত বৎসরের উপর হইবে কি না। মহাপুরুষ সস্মিত বদনে উত্তর করিলেন, আমার বয়সের স্পষ্ট সংখ্যা গণনা নাই। আমি ঔরংজেব বাদশাহের সমসাময়িক বটি।

বৈঠকখানার ঘরটী প্রশস্ত ছিল না। তখন বৈশাখের অপরাহ্ন, সমবেত ভক্ত মণ্ডলীর গ্রীষ্ম অসহ্য বোধ হইতেছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে শীত গ্রীষ্মে সমজ্ঞান এই মহাবৃদ্ধের দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যেও অনুমাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হয় নাই। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত—বোধ হয় তক্তপোষের তলস্থিত পুঞ্জীকৃত সুবৃহৎ ডাব তরমুজের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। গৃহমধ্যে মুক্ত বায়ুর সঞ্চালন জন্য যখন শিষ্যেরা দ্বারদেশের জনতা দূর করিতে প্রয়াসী ছিলেন তখন মহাত্মা তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, ইহাদের প্রতি অযথা বাক্য বা হস্তক্ষেপ করিও না ; আমরা সকলেই একই আত্মা, পৃথক ভাবিও না। এই সময়ে জনৈক কৌপীন ধারী প্রৌঢ় সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিলেন। সভাস্থ সকলে আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—ইনি নেপালী ব্রাহ্মণ ; ৪২ বৎসর পূর্ব্বে ইহার সহিত আমার হরিদ্বারে দেখা হয়। তদবধি ইনি আমার সঙ্গে আছেন। ইনিও আমার ন্যায় যুবক।

বিস্মিত ভাবে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাত্মন্, আপনার বয়ঃক্রম বোধ হয়"—মহাত্মা বাধা দিয়া বলিলেন, আবার বয়সের কথা বলিতেছ ? আমার বয়স এখন ২২ বৎসর ৩ মাস ৫ দিন হইবে।

সভাস্থ সকলে বিস্ময়ে নীরব। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সন্ন্যাসী প্রবর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তোমরা বিস্ময় বা সন্দেহ প্রকাশ করিও না। মানুষের অসংখ্য বৎসর জীবন ধারণ অসম্ভব নহে। তবে মাঝে মাঝে এই স্থূল দেহের জীর্ণ সংস্কার করিয়া লইতে হয়। আমি ১০০ বৎসর পর পর এক একবার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছি। এইরূপে আমার দুই তিন বার দেহ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই হিসাবে আমার পুনরায় ২২ বৎসর বয়স। সকলের অপেক্ষা বয়সে আমি বরং ছোট।

প্রশ্ন।—দেহের জীর্ণ সংস্কারের অর্থ বোধ হয় দেহ রক্ষা করিয়া নব কলেবরে জন্ম গ্রহণ করা। আপনি কি বারংবার শিশুদেহ গ্রহণ করিয়া মাতৃ অঙ্কে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন ?

উত্তর।—না, তাহা নহে। বার্দ্ধক্য হেতু যখন শরীরের রক্ত মাংস বিকৃত হইয়া উঠে, তখন মহাত্মাগণ লোকালয়ের বহির্ভূত গিরিকন্দরের নিভৃত স্থানে গমন করিয়া বনৌষধি সেবন পূর্ব্বক সপ্ত দিবস ব্যাপী এক প্রকার যোগ সাধন করেন। তৎপর শরীর ক্রমে সুস্থ বোধ হয়, এবং শরীরের অনুভূতি ফিরিয়া আইসে। পুরাতন চর্ম্মের স্খলন হইয়া নূতন চর্ম্মের উদ্ভব হয় এবং যুবকের ন্যায় অঙ্গকান্তির বিকাশ হয়। এই সময়ে এবম্বিধ দেহ রক্ষার জন্য সহচরের প্রয়োজন। বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম আপনারা অনেকেই বলেন। তাঁহার সঙ্গে আমি একবার নবকলেবরে মানস সরোবর তীর্থে গমন করিয়াছিলাম। এই তো সে দিনের কথা।

হাঁ, আমি সংস্কৃত জানি। বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি। গুজরাটী মারাঠী, কানাড়ি, দ্রাবিড়ীয় প্রভৃতি ৭।৮ টী প্রাদেশিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি আছে। ইতিহাসের রাজা রাজড়াদের প্রসঙ্গ জানি না। নিজামের সঙ্গে পেশোয়ার যে যুদ্ধ হইয়াছিল, বাল্যকালে দেখিয়াছি। এখন পশ্চিম দেশীয় ইংরেজ রাজা। কিন্তু সম্রাট ঔ

সাট বেদান্তের নামাবলীতে আমার প্রয়োজন নাই, এবং লেকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না।

এই সময়ে এক ধনবান ভক্তের গৃহ হইতে স্বামীজীকে লইয়া যাইবার জন্য একখানা গাড়ী উপস্থিত হইল। সুতরাং আমরাও ত্বরান্বিত হইলাম। সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম, মহারাজ, আপনার ধর্ম্মমত কি?

ধর্ম্মমত? সে অনেক কথা। হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সবাতেই আমার সহানুভূতি আছে।

"আপনি মুসলমানের হস্তে জল গ্রহণ করেন?"

"না, এপর্য্যন্ত আমি হিন্দুদের মধ্যেই পরিভ্রমণ করিতেছি এবং হিন্দুমাত্রেরই হস্তে জল গ্রহণ করিয়া থাকি। আমার শ্রীগুরুদেব হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মভেদ মানিতেন না।"

"মহারাজ গাত্রোত্থান করিবেন না; আমাদের আরও একটু জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি পরলোক মানেন?"

উত্তর—মানুষ মৃত্যুর পর কর্ম্মানুসারে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উচ্চ বা নীচ প্রাণীর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আর কস্মিন্ কালে দেখা হয় না।

"তবে যে আমরা প্রেত শ্রাদ্ধাদি—?"

সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন—শ্রাদ্ধাদি সর্ব্বৈব নিষ্ফল।

ভক্তেরা সাধুকে গাড়ীতে উঠাইলেন; আমরাও তাঁহার চরণ ধূলি লইয়া বিদায় হইলাম।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।

শ্রীমদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

২০শে বৈশাখ, ১৩২৭।

"না"য়ের নানা নক্সা।

বিনা বাক্যব্যয়ে অপরের কথায় সায় দিতে হইলে একটুখানি উর্দ্ধাধোভাবে মাথা নাড়িলেই হইল। উত্তমাঙ্গের এইরূপ ঈষৎ আনত স্পন্দন (nod) দ্বারা কায়িক বিনয়ের সঙ্গে মানসিক আনুগত্য, আনুকূল্য বা সম্মতি সূচিত হইয়া থাকে। মাথাটি একপাশে একটুখানি হেলাইলেও মৌন সম্মতির কায়িক বিকাশ হয়। ইহার অর্থ, আচ্ছা স্বীকার।

নীরব সম্মতির সরব বিকাশও আছে। মুখ বন্ধ রাখিয়া নিশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে বাক দিয়া "হু"। —একটু খানি হালকা গোছের, মিহি আওয়াজের হুঁ; হুঙ্কার নহে। অথবা মুখ ঈষৎ হা করিয়া অনুনাসিক "হুঁা"। হুঁা (yes) বোধ করি বিকল্পে অবাক সম্মতির সবাক সঙ্কেত। যথাহি বঙ্কিমে। রূপসী আসমান-শশী দিগ্‌গজ-বামনকে প্রিয়সম্বোধনে অভিভূত করিয়া বলিলেন, কেন এসেছি জান? তোমার সঙ্গে আমরা (আমি ও বিমলা) এখনই পলাইয়া যাইব। কেমন, পারিবে? শুনিয়া বামুন "অবাক্ হইয়া হুঁা করিয়া রহিলেন।" ইহার বিকল্পিত অর্থ, ব্রাহ্মণ এই পরম সৎপ্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ মুখদ্বারা মৌনসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

কথা কহা ও না কহা এই দুইয়ের মাঝামাঝি হুঁ বা হুম্। তথাহি অভিসারিকা আশমানি আহারে উপবিষ্ট দিগ্‌গজের প্রতি; "বলি ও রসিক রাজ!" উত্তর নাই। "ও রসরাজ!" উত্তর "হুম্"; yes, here I am. প্রতিরঞ্জন ভ্রমর গুঞ্জন (hum) অনুকরণ করিয়াই বোধ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালোয়াতগণ প্রথমে মুখ বন্ধ রাখিয়া হুম্ হুম্ গুণ গুণ রবে মনে মনে তান ঠিক করিয়া লইয়া অবশেষে মুক্তকণ্ঠে গান ধরিয়া থাকেন। যথা; "এ হুম্—উ হুম্ (একটু কাসিয়া) মরিরে ভারত জননী!"

অথ "হুঁা"য়ের বিপরীত "না"। প্রস্তাব মনোমত না হইলে মানসিক অপ্রসন্নতা মুখে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং নিষেধ জ্ঞাপনে ডাহিনে বামে শিরশ্চালনার কায়িক ভঙ্গিটিও কষ্টকর। এই মৌন ইঙ্গিতেও প্রস্তাবকারী প্রস্থানের গা না দেখাইয়া ঠায়ে বসিয়া তর্ক জুড়িয়া দিলে তোমাকেও কাজেই তুষ্ণীভাব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গুরুগর্জ্জনে হাঁকিতে হয়:—

"নাঃ! বড় জ্বালাতন কর্‌লে হে তুমি, চলা যাও হিঁয়াসে।"

এই স্থানেই "না"য়ের উৎপত্তি। সম্মতি ও অসম্মতি সূচক উভয়বিধ শিরসঞ্চালন প্রণালী বোধ হয় সর্ব্বদেশেই একপ্রকার এবং মানুষের সহজাত। ঙ, ঞ, ণ কোমল হুঁা, হুঁতে দেশ বিশেষে বর্ত্তমান। কিন্তু অসম্মতির আগে কেবল নাসিকার মিহি আওয়াজের কর্ম্ম নয়; মুখ ও

ওষ্ঠের দরকার। তাই পাইতেছি অনুনাসিক চরম বর্ণ দ্বয় ন এবং ম। মা নিষাদ ইত্যাদি। অনুমান হয় ম ও ন সংযোগে নিষেধের বাংলা নাম "মানা"। ন বর্ণটি নাস্তিক ও নিন্দিত। এর আভিধানিক মুখ্য অর্থ অভাব, বিরোধ, ভেদ, বন্ধন, অন্ধকার। স্বরাদি শব্দের আদিতে যোগ হইলে ইহার রূপ অন্ হয়, এবং ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বে থাকিলে অ হয়। In, un ইংরেজী প্রতিরূপ।

বাংলাতে নিন্দিত "না"য়ের নানা কপট রূপ বিদ্যমান। যথা; জীবাত্মা কি, না ঘটাকাশ। ব্রজগোপীদের মধুর রস কি, না শৃঙ্গার রস। ইতস্ততঃ মানে কি, না এদিক ওদিক। এখানে অর্থ ব্যাখ্যা বা namely. কি প্রশ্নের কি অদ্ভুত উত্তর এই অর্থে—"রামা, ভাত খাবি?" না, "হাত ধোব কোথায়?"

দু'য়ের অন্যতর, অথবা অর্থে। তুমি কা'কে চাও? রামকে কি শ্যামকে? প্রাদেশিক—রামকে না শ্যামকে? চিনি হতে চাও, না চিনি খেতে চাও?

নিষেধের অনুজ্ঞায় বলি, দিও না। কিন্তু Pray, do give মিনতি ভাবে; দাওনা, দাদা দাও দশটি টাকা ধার দাও। গাও না ভাই, গাও, একটা গান গাও। অনেকে বলিতে পারেন, এখানে না শব্দটি "কেন গাহিতেছ না?" প্রশ্নের ভগ্নাবশেষ। কিন্তু এস্থলে কারণ জিজ্ঞাসা রূপ ঔদ্ধত্যের লেশ মাত্র নাই; আছে কেবল কাকুতি মিনতি।

"কেন-না"। প্রথমে ইহার সদর্থের উদাহরণ দিতেছি। তিনি যাবেন না; কেন না, তিনি পীড়িত। অর্থাৎ, কেন তিনি যাইবেন না? সংক্ষেপে, কেন না? Why not? তদুত্তর, তিনি পীড়িত। অতঃপর দেখুন "কেন-না" র জন্ম-বিস্মৃতি। যথা; সুশীল ও সুবোধ এবার নিশ্চয়ই জলপানি পাইবে, কেন না তাহারা পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় হইয়াছে। ষ্টেশনে আমি তাঁহার চরণ ধূলি লইয়াছিলাম, কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? উত্তর—কেন না, তিনি আমার গুরুদেব। এখানে "কেন না" র অপপ্রয়োগ কিন্তু সংস্কার অভাবে বাংলায় বদ্ধমূল। সংস্কৃত করিলে হইবে "কারণ।"

"কি না"। সদর্থ Whether or not. তুমি ভাল আছ কিনা, লিখিও। অন্যার্থ কারণ বর্ণনা। তিনি বেহাৎ ভালমানুষ কি না, তাই এতটা সহ্য করলেন। সবিস্ময় খেদে; আমি বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিলাম, এখন বলে কি না—আমি ওর কেউ নই।

উত্তর লক্ষ্য প্রশ্নদ্বারা অনুকূল উত্তর আদায়ের চেষ্টায়। দুরন্ত শিশুর প্রতি বিজ্ঞ অভিভাবকের উক্তি "আজ আমরা দু'জনে দুপুর বেলা ঘরে বসে পড়বো; তুমি পড়বে, আমি পড়বো (সম্মতির ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া)—না—না—না?" ইতি প্রাদেশিক। কেমন, নয় কি? Is n't it? ইত্যর্থে। বলা হয় "না"? কিন্তু চাই "হাঁ"। শিক্ষার প্রভাব বহির্ভূত বয়ঃপ্রাপ্তগণ এমত স্থলে বলিয়া থাকে "না—রে?" যথা, বয়স্ক বয়স্কের প্রতি "বুড়ি গঙ্গা আর কতদিন? শীঘ্রই শুকাবে; না—রে!" বিক্রমপুরী "না" এর অন্যান্য উদাহরণ; যথা। সে করলে সে—না? সে করলে তো! অদূর ভবিষ্যৎ—কোন চিন্তা নাই, সে সব হবে'নে—সে সব হ'বে এখন, তুমি ভেবো না। বিস্ময়াপ্লুত অত্বরিত উক্তির পাদ-পূরণে!—দেখ, তোমার নূতন চাকর টা কি বোকা! সে "না" করছে কি,—এক দৌড়ে "না" যাইয়া, সড়কের ধারে যে জলের কল আছে সেই কলের গোল থাম্বাটারে "না" ডাক-চিঠির বাক্স ভাবিয়া—তারি ভিতর চিঠি খানি রাখিয়া চলিয়া গেছে!!" এখানে "না" গুলি না পড়িলেই পাঠোদ্ধার হইবে।

মুখে না না বলিয়া হাঁ আদায়ের চেষ্টার কথা বলিয়াছি। আবার হাঁ হাঁ দ্বারাও নিষেধ করা যায়। মুচিরাম গুড়ের দৃষ্টান্ত দিতেছি। গুড়-গৃহিণী ভদ্রকালী বিষ খাইব বলিয়া তেঁতুল গুলিতে বসিলেন। উহা বিষ জানে স্ত্রৈণ "মুচিরাম হাঁ—হাঁ করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন।" বলা বাহুল্য, ইহা অনুনাসিক হাহাকার। কর কি, কর কি, থামো থামো ইত্যর্থ।

না—করা। পূর্ব্ববঙ্গের অপূর্ব্ব ব্যবহার। সে "না" করে। মানা করে, রাজী হয় না, স্বীকার করে না, ইত্যর্থ! কেবল ভগবান ছাড়া আর কাহারও "না করিবার" সাধ্য নাই। যথা; ঈশ্বর না করুন যদি একটা ভালমন্দ খবর হঠাৎ এসে পড়ে, তাই এখনই (সময় থাকিতে) একটা ফর্দ্দ ধরা উচিত, কারণ দশাহ অশৌচ, সময় সঙ্কীর্ণ।

সময় সঙ্কীর্ণ। শ্রাদ্ধ অনেক গড়াইল। সঙ্গে গাহিয়ে বাজিয়ে নাই; আর কত তা না নানা করা যায়?

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

খেলা বনাম ব্যায়াম।

স্বীকার করিতেই হইবে ছেলেদের খেলাটাকে আমরা চিরকাল যতটা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি, উহা সেরূপ উপেক্ষার বিষয় নয়। খেলাটাকে সব সময়েই আমরা লেখাপড়ার সঙ্গে বাদ দিয়া দেখিতাম। এবং মানুষ গড়িতে ইহার যে কোন কার্য্যকারিতা আছে, ইহা আমরা কখনও মানিয়া লইতাম না। কয়েক বৎসরের মধ্যে খেলাটা যেন পড়াকেও ডিঙ্গাইয়া আসিয়াছে। ভাল ছাত্রকে কেহ জানুক আর নাই জানুক ভাল খেলোয়ার কে প্রায় সবাই জানে। কেহ কেহ বলেন যে খেলা ও পড়া, শস্ত্র ও শাস্ত্র, এদের দুইকে বিভিন্ন করাতে উভয়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যা যাহাকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইবে তাহারই মজ্জা বল হীন, কুণ্ঠিত ও নুইয়া পড়িয়াছে। দুর্ব্বল ব্যক্তি সতত নিজকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে! এবং আত্মরক্ষার জন্য নানা দুষ্ট বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের পক্ষে ত্যাগ পরায়ণ হওয়া দুষ্কর হয়। যাহারা নিজের বিষয়ে যত বেশী ব্যস্ত থাকে, তাহারা তত বেশী স্বার্থপর, কুটিল ও ক্ষুদ্র প্রাণ হয়। জানিনা কি কারণে এই কথিত শিক্ষিত বা বিদ্বান্ শ্রেণীতে স্বার্থদিক্ষুভাবের এত অভাব; তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অত ছোট গণ্ডিবদ্ধ। মনে হয়, যে শিক্ষায় পরের জন্য নিজকে দাঁড়াইতে হয়, সে শিক্ষাই ইহাদের হয় নাই। অথচ ইঁহারাই দেশের ভবিষ্যৎ সন্তান, বালক ও যুবক শ্রেণীর আদর্শ এবং সমাজের উপদেষ্টা।

বিদ্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, বিবেচনা দিতে পারে, ভালমন্দ বিচার ক্ষমতার পরিস্ফুরণ করিতে পারে, কিন্তু বিপদ-সঙ্কুল হইলেও তাহাকে আকরিয়া ধরিবার সাহস দান করে না। বিপদকে ভয় করিতেই শিক্ষা দেয়! বিপদকে উপেক্ষা করিবার শক্তি বিদ্যা হইতে পাওয়া যায় না। অপরদিকে শস্ত্রাভ্যাস সকল বিপদের এক মাত্র পরিণাম মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিতে অভ্যস্ত করে। ইহা হৃদয়ে বল সঞ্চার করে, পরের বিপদও ঘাড়ে তুলিয়া লইতে সঙ্কুচিত হয় না। মরণ-ভীষণ বিপদ্ হইতে যখন অপর সকলে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন মুহূর্ত্ত বিবেচনা না করিয়া পরের সাহায্য করে অগ্রসর হয়। সেখানে নিজের শ্রেয়ঃ এবং পরের শ্রেয় এ কথা ভাবিবারও তাহার অবসর হয় না। পুঁথির কীট গৃহকোণে বহু বীরত্ব কাহিনী পাঠ করে, অনেক কল্পনা ফাঁদে; কখনও বা সভার মাঝে বিনাইয়া বিনাইয়া বক্তৃতার অগ্নিবর্ষণ করিয়াই ফেলে। কিন্তু তখনই অদূরে জনপদ মধ্যে যদি অগ্নির লীলা প্রকটিত হয়, এ সকল কল্পনা-বীরগণ নিজকে বাঁচাইতেই বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর ঐ অগ্নি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে কা'রা? পরের গৃহ, পরের স্ত্রীপুত্র, পরের গৃহ-দ্রব্য বাঁচাইবার জন্য নিজ শরীর ও জীবনকে তুচ্ছ করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিস্তূপে প্রবেশ করে কা'রা? যাদের আমরা মনে ভাবি, শুধু খেলিয়া খেলিয়া, কুস্তি করিয়া, হাতাহাতি গুতাগুতি করিয়া জীবনটা নষ্ট করিয়াছে;—অকালকুষ্মাণ্ড, অপদার্থ বলিয়া যাদের সর্ব্বদা ঘৃণা করিয়া যাই—তারা। বিদ্বান বা শিক্ষিত গণ ইহাদের প্রতি সর্ব্বদাই উপেক্ষা প্রদর্শন করেন বলিয়া ইহারা তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেই চেষ্টা করে। ইহাদের সাহস, বুকভরা প্রাণ, ও উত্তেজনার একটানা স্রোত এমন একটা দিক গ্রহণ করে যেখানে আমাদের মার্জ্জিত রুচির দৃষ্টি পতিত হয় না। ইহাদের আবেগময় প্রাণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সুচিন্তিত ধারণার অভাবে যে কোন হেয় কর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া লয়, ক্রমে সঙ্গদোষে বিপথে পরিচালিত হয়।

আমার জিজ্ঞাস্য—এইরূপ যুবকদলের বিপথ গমন জন্য দায়ী কা'রা? যারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করেন, তাদের ঘৃণার দৃষ্টি ইহাদিগকে সমাজের যে স্তরে নিক্ষেপ করে সেখান হইতে সুপথে চলা বুঝি দেবতারও দুঃসাধ্য। প্রাণ প্রাণকেই চায়। শুধু বিদ্যা প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। শিক্ষিতগণের প্রাণহীন আদর হইতে ইহারা যে দূরে থাকিতে চায়, ইহা প্রাণেরই ধর্ম্ম। অন্যোন্য শ্রদ্ধা হইতে যে প্রাণের সম্বন্ধ ঘটে তাহাকেই বিভিন্নাবস্থায় বন্ধুত্ব, সৌহৃদ, সপ্রাণতা প্রভৃতি অভিধান দেওয়া হয়। যাহাকে আমি শ্রদ্ধা করি না, তাহাকে ভালবাসিতেও পারি না। অথচ এই প্রভাব কল্পন সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই

রুচিহীন, নিরক্ষর, আদর্শ মানব নহে। অথচ কাহারো প্রতিই আমরা শ্রদ্ধাহীন নহি। তাহাদের শুভ দিকটায় দৃষ্টি থাকে বলিয়াই তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করি ও তৎপ্রতি প্রীতিসম্পন্ন হই। এই বিপথরত যুবকদলের প্রকাশ্র দিকটার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি ইহাদের সঙ্গে মিশিতে যাই, তবে তাহারা আমাদের ঘৃণার খোঁচাটা কিছুতেই অনুভব করিবে না। শিক্ষিতগণের সহিত অকুণ্ঠিত মিশ্রণে ইহাদের মধ্যে উন্নত হইবার প্রয়াস জন্মিবে। ইহাদের একটার জীবনের গতি সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিলে সমাজের যে উপকার সম্ভব হইবে, পঙ্গু দশটী বিদ্বান্ দ্বারা তাহা হইবার নহে। অথচ এই শ্রেণীর যুবকদিগকে আমরা সমাজ বহির্ভূত করিয়া দিবার চেষ্টায় আছি। এরূপ দুই চারিজনের কথা আমরা জানি, যারা স্কুলে শিক্ষকদিগের উপহাসের পাত্র, পরিবারের উপেক্ষার পাত্র ও দুর্ব্বহ বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারাই অহোরাত্র, অক্লান্ত পরিশ্রমে নানা ব্যবসায়ে যশস্বী ও অপরের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহাদের সঙ্গে আমাদের মিলন সম্ভব হয় একমাত্র খেলার মাঠে। পাঠ-ক্লান্ত যে সকল যুবক শারীরিক জড়তা ভাঙ্গিবার জন্য কায়িক পরিশ্রমটা নিতান্তই হেয় বলিয়া মনে করে না, তাদের দেখাও মধ্যে মধ্যে সেখানেই পাইয়া থাকি। ইহাদের একদল খেলায় অতিভুক্ত, অন্যদল একটু নির্লিপ্ত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটা সুস্পষ্ট রেখা টানা না গেলেও দুই শ্রেণীর ছেলে-দের পার্থক্য স্পষ্ট অনুভূত হয়।

এই দুই শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে কিছু ব্যায়ামচর্চ্চার আভাস পাই। অথচ শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির সামঞ্জস্যের সহিত চরম পরিণতিই মনুষ্যত্বের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অথচ কোথাও এই শারীর চর্চ্চার কোন উদ্যোগ আমাদের নাই। শারীরিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণ জন্য প্রতি অঙ্গের নিয়মিত চালনা বা ব্যায়াম প্রয়োজন। এই ব্যায়ামের স্থান আমরা খেলা দ্বারা পূরণ করিতে চাহিতেছি। কিন্তু ব্যায়াম যে প্রয়োজন সিদ্ধি করে খেলায় তাহা সম্যক সম্পন্ন হয় না। হিন্দু যোগবাদে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া দীর্ঘ জীবন লাভের এবং মানসিক বৃত্তিচয়ের স্থিরতা সাধনের উপায় বলিয়া কথিত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত হয়। আসনাদি দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীর স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়; কিন্তু খেলায় এসব হয় না, পরন্তু ফুটবল প্রভৃতি খেলায় শ্বাস প্রশ্বাস অতিক্রত ও অনিয়মিত এবং পেশী সকলের আকস্মিক উত্তেজনা হইয়া থাকে। এ সকল খেলাতে আবার সকল অঙ্গের ও সমুদয় পেশীর চালনা হয় না। এ কারণে যে সকল খেলোয়ার অঙ্গ পুষ্টি জন্য প্রাত্যহিক ব্যায়াম চর্চ্চা না করিয়াছে তাহাদের শরীর ক্ষীণ, চক্ষু কোটরগত, চোয়াল বহিস্ফুর্ত্ত হইয়া পড়ে।

অপরদিকে ব্যায়ামাদি—কুস্তিখানায় বৈঠক ও বুক ডন, প্যারালাল বার, মুগুর, স্যাণ্ডোর ডাম্বেল, চেষ্ট এক্সাণ্ডার যাহারা নিয়মিত রূপে করিয়াছে তাহাদের শরীরের প্রত্যেকটী পেশী সুপুষ্ট ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয়। ইহার প্রত্যেক ব্যায়ামেই শ্বাস নিয়মিত এবং একটু আন্তরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রয়োগ প্রয়োজন হয়। খেলার মত ইহার প্রক্রিয়া উত্তেজনা বহুল নহে। কাজেই যতদিন ব্যায়াম করা অভ্যাসে আসিয়া না দাঁড়ায় ততদিন একটু ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। এজন্য একাকী ব্যায়াম করিবার ধৈর্য্য আমাদের থাকে না অনেকের একত্র মিলন ও উত্তেজনা পাওয়া যায় বলিয়া ব্যায়ামের পরিবর্ত্তে খেলাটা এরূপ আকর্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খেলাটার লক্ষ্য অনেক সময়েই সকলের সঙ্গে মিশিয়া একটু আমোদে সময়টা কাটাইয়া যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা একটু হাল্কা করিয়া লওয়া। কিন্তু ব্যায়ামের লক্ষ্য তা' নয়। শরীরকে দৃঢ় করা ও সেই দৃঢ় শরীরকে জীবনে উন্নতির পথে সহায়ক করাই ব্যায়ামের উদ্দেশ্য। ব্যায়ামকে একদম খেলার উপরে সর্ব্ববিষয়েই স্থান দেওয়া চলে। অথচ ছেলেদের মধ্যে এই ব্যায়ামাভ্যাসটুকু যাহাতে দৃঢ় হয় তাহার কোন চেষ্টাই আমরা করি না। এই অন্ধ খেলার দরুণ আমরা ছেলেদের শরীর এবং তৎসঙ্গে জাতীয় অনিষ্ট সাধন করিতেছি। বাঁচিবার জন্য যে

বিষম বন্দের মধ্য দিয়া আমাদের যাইতে হইবে তাহাতে ভঙ্গুর দেহের কোথাও স্থান নাই। সুস্থ, সবল, পটু ও কষ্টসহিষ্ণু যুবক দলের আবির্ভাব যাহাতে প্রচুর হয় সেবিষয়ে প্রত্যেকের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কোথাও সাধারণের ব্যবহার জন্য ব্যায়ামাগার নাই। কদাচিৎ কোন স্কুল সংলগ্ন ব্যায়ামাগার দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেখানে নিয়মিত ব্যায়াম করিবার কোনরূপ প্ররোচনা বা উৎসাহ নাই। আমি শুধু আমার জন্যই নই, আমাকে আমার দেশ ও জাতির প্রয়োজন আছে; আমার পরিবার এবং ভবিষ্যৎ বংশীয় গণেরও দাবী আমার উপর আছে, এরূপ ভাবনিচয় যাহাতে ছেলেদের মধ্যে স্ফূর্তি পায় তাহার কোন প্রকার কথা পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে আমরা ভয় পাই, এজন্য ছেলেদের মধ্যে দায়িত্ব বিহীনতা, উশৃঙ্খলতা, ও আত্মনাশের প্রয়োজন অত প্রবল দেখা যায়। দুই একটী কুস্তিখানা মাঝে ২ দেখা যায়, কিন্তু সেখানে যাওয়া যে গুরুতর অপরাধ ইহাই অভিভাবকগণ তাহাদের মন্তব্য দ্বারা প্রকাশ করেন। যদি শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী খেলার মাঠের ও কুস্তি-খানা বা ব্যায়ামাগারের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া প্রচলিত ব্যায়াম প্রণালীর উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করেন ও তথাকার যুবকদিগের সহিত কিয়ৎকাল ক্ষেপণ করেন তবে দেশের একদল দুরন্ত ছেলেকে ভালর দিকে চালিত করিয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। আজকাল বলিষ্ঠ দেহী, প্রশস্ত বক্ষ ও দৃঢ়িষ্ঠ যুবকশ্রেণী প্রস্তুত জন্য এইরূপ ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেরাণীগিরিই এখন জাতীয় আদর্শ নয়। সকলকেই ন্যূনাধিক নানা বিরোধের মধ্য দিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। কাজেই শ্রম-বিমুখ, কোমল দেহের ঠাঁই আর কোথাও নাই।

খেলার সমিতি (Club) মধ্যে সংঘ রচনার একটু আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। সকলের সমবেত অভি-রুচির সুপ্রণালীবদ্ধ পরিচালনাই জাতীয়তার ভিত্তি। সমবায়ে শক্তিচালনার বৃত্তি আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটী শোচনীয় অভাব। ইহার অনুশীলনের অনুকৃতি হয় এই খেলার মধ্যে। অবশ্যই ইহা বলা চলে না যে এই অনুশীলনের ফলে আমাদের খেলোয়াড়দের চরিত্রে ইহা সুপরিণত হইয়া উঠিতেছে। যাহা বাঙ্গালী মনের Orga nic defect তাহা সংশোধন করিয়া সেই বৃত্তিকে জাগাইয়া তোলা খেলার মাঠের এই খেয়ালী ছেলেদের কর্ম্ম নয়। সেই বৃত্তির একটু কম্পন আমরা সেখানে অনুভব করি। সাধারণতঃ দেখা যায় খেলার মাঠের ছেলেরাই বিধি ও আদেশ পালনে অধিক তৎপর। উহাদের এই উন্মুখ বৃত্তিটাকে অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত চালক উহার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে পারেন।

এই উৎকর্ষ সাধন দূরে থাকুক প্রায় সর্ব্বত্রই খেলার দলে বিচ্ছেদই শুধু দৃষ্ট হয়। ইহার একমাত্র কারণ খেলা ভিন্ন ইহাদের সম্মুখে অন্য কোন গৌণ লক্ষ্য নাই। উচ্চ আদর্শের অভাবে ইহারা খেলাটাকেই চরম বলিয়া ধরিয়া নেয়। বৃহত্তর জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ যাদের নিকট অপরিচিত, খেলার মধ্যে নীতিজ্ঞান যে পরিস্ফুট হইতে পারে, এ ধারণা তাদের না হইতে পারে, কিন্তু যারা শিক্ষিত বলিয়া সমাজের শ্রদ্ধা দাবী করিতে-ছেন তাদের পক্ষে খেলায় ক্ষুদ্র বাদবিসম্বাদ করা ও নীতি অমান্য করা, কখনও শোভা পায় না। এই খেলার মধ্যে যদি দু একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সতত উপস্থিত থাকেন এবং অভিভাবকগণ সর্ব্বদা মাঠে আসিয়া উহাদের এই নির্দ্দোষ ক্রীড়া ও আমোদে সহানুভূতি দেখান তবে খেলার মত্ততা অনেকাংশে কমিয়া যায় এবং ইহার কুফল নিবারিত হয়। খেলার যে একটু প্রাণসঞ্চারী প্রভাব আছে, তাহাও তখন অনুভূত হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ।

ন্যাতা।

১

দীন দয়ালের বৈঠক খানা
করেছি আফিস্ ঘর ;
তাহাতে বসিয়া পাঁচ সাত জন
নাহি করি কারো ভয়।
রাজনীতি যবে গজাইয়ে ওঠে,
ঐ ঘরে সবে যাই ছুটে পাটে ;
বার্ক, ম্যাক্‌ডৌন্ মরলে মর্লেও
কাঁধে করিয়াছে ভর,

বকি কত কথা, গলা ভেঙে ভেঙে,
হয় মাথা থর্ থর্।

২

রাজনীতি এই, শিখে যাও সবে,
হ'তে চাও দেশ ত্রাতা ;
যাদের মগজ হয়েছে গরম
বলে যাও দু'টো কথা।
করিতে হবেনা কোন কাজ আর,
Speech দিয়ে হবে পগাড়টি পার।
দশ জন মিলে বলুক না কেন—
দুই দশ কড়া কথা ;
Lecture দিতে হবে না কসুর,
Lungsএ হবেনা ব্যথা।

৩

রবি শশধর ফেলিব উপাড়ি
কথার দাপটে মোরা
দেশ হিত নীতি বলিব যখন,—
সকল কথার সেরা ;
চাঁদার খাতাটি তোমাদের কাছে,
লইয়া যাইব, বড় বেছে বেছে,
পালাতে নারিবে, হইবে যে দিতে,
সবার পকেট ঝাড়া ;
এতেই তোমরা Nation হইয়ে.
দুই পায়ে হবে খাড়া।

৪

তোমরা সকলে মানব অধম
তাইতো চিননা ত্রাতা ;
শুনিয়ে শোননা আমরা যে বলি—
তোমাদের হিত কথা।
কত কাজ তরে বলি তোমাদের,
করিতে চাহনা, একি গ্রহকের!
পান্‌টা জবাবে আমাদের কাছে
চাও হিসাবের খাতা ?
টাকার জবাবদিহি করিবারে
কেনগো ঘামাও মাথা ?

৫

মোদের জনম ভারত ভূমিতে
শুধু কথা বলিবারে ;
আমরা তোমরা, Speech দিতে আস
তাই কথা কাটিবারে।
যাহা করিবারে বলি তোমাদের,
করিতে পারনা, কথা বল ফের্ ?
কোন্ দেশে আর শুনিয়াছ কেহ—
চাপে ত্রাতাদের ঘাড়ে ?
আমরা বলিব, তোমরা শুনিবে ;
লইব Nation গড়ে।

৬

ব্যবসা না বুঝে কথা শুনে শুধু
করেছ কোম্পানী খাড়া ;
ডিরেক্টার তার হয়েছি আমরা,—
সকলি হয়েছে সারা ;
দু একটা আজো ঝিকিং জ্বলে,
মরিয়া বেঁচেছে পূর্ব্বজন্ম ফলে!
শিখে নেও, চাও ত্রাতা হইবারে,
মোদের কাজেরধারা ;
দেখনা Nation Embryo
শরীর দিতেছে ঝাড়া!

৭

আমাদের ছেলে এম এ বি এ করে
চাকরী জুটায়ে দিয়ে,
তোমাদের তরে খুলিব দোকান
Sharerএর খাতা নিয়ে।
মোদের যে ছেলে পাবেনা চাকরী,
উকীল হবেনা, পাবেনা ডাক্তারী,
প্রধান হইবে সেই দোকানের—
প্যাণ্ট পরে বুট পায়ে,
দুইশ রুপিয়া মাস মাহিয়ানা
তার তরে দিবে থুয়ে।
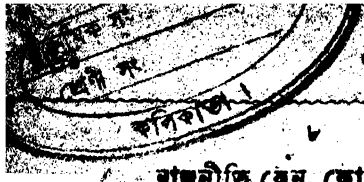
৮

রাজনীতি কেন, কোন নীতি তরে
খুজিনি বয়ের পাতা;
ভুঁইফোঁড় নীতি শিখিয়ে রেখেছি,
তাতেই খাখিছে মাথা।
প্রতিবাদ হ'লে তাই উঠি জলে।
জবাব জোটেনা ডুবুরি নামালে,
নাড়ী ভুড়ি শুধু বাহিরিতে চায়,—
খুলি কলেজের খাতা।
এই পুঁজি নিয়ে গড়িয়ে Nation
আমরা হইব ত্রাতা।

৯

ওই দেখা যায় পূরব গগনে
উষার কিরণ রেখা;
Agitationএর ফলিয়াছে ফল
স্পষ্ট যেতেছে দেখা।
যদি কিছু দিন পারি চালাবারে
বক্তৃতা নীতি প্রতি ঘরে ঘরে,
দূর করিবারে পারিব আমরা
জনম ভূমির ব্যথা।
কন্‌ফারেন্স কংগ্রেসে মোরা
ঘুরিনাকো বৃথা বৃথা!

১০

জাননা তোমরা হয়েছি আমরা
নিরেট বেহায়া হদ্দ!
ত্রাতা হলে আর থাকিতে হয়না
নিয়মেতে অবরুদ্ধ।
লোকমত বলে করিয়া প্রচার
পালনেতে তার নাহি অধিকার।
আজ একমত, কাল আর এক—
নিত্যই নূতন শ্রাদ্ধ।
বুদ্ধির চোটে কথার দাপটে।
Nation হইবে শুদ্ধ।

শ্রীকুমুদকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

সমস্যা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মের ছুটিতে শৈলেন বাড়ী যায় নাই। তাহার মানসিক অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। "হিত-সাধিনী" পত্রিকার সংবাদ স্তম্ভে সন্যাল বাড়ীর লোম-হর্ষণ ঘটনার সংবাদ পড়িয়া দুই দিন পর্য্যন্ত সে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে নাই; তাহার মানসিক অবস্থা কাহাকে খুলিয়া বলাও প্রয়োজন মনে করে নাই। নগেন তাহার কারণ বুঝিয়াছিল—কেন না, সে এ সংবাদ জানিত। সেও কিন্তু কাহাকে এ সংবাদ জানিতে দেয় নাই!

দুর্গাদাস বাবু শৈলেনের অসুখের সংবাদ পাইয়া এক দিন একা আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন; আর একদিন মেয়েদিগকে লইয়া আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। পারুল ও বকুল অনুরোধ করিয়া গিয়াছিল—একটু সুস্থ বোধ করিলেই যেন শৈলেন তাহাদের বাড়ীতে যায়। শৈলেন যায় নাই।

নগেন এখন দুর্গাদাস বাবুর বাড়ীতে বৈকালিক চা পান বৈঠকের একজন রীতিমত সভ্য; কখন কখন দুবেলাও তথায় পদধূলি ফেলিয়া থাকে।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ দুর্গাদাস বাবুর জন্ম-উৎসব। পারুলের প্রস্তাবে ও নগেনের অনুমোদনে এবং শেষ গৃহিণীর সমর্থনে উৎসবের বিশেষ আয়োজন হইয়াছে।

প্রগ্রেম ছাপা হইয়াছে—

প্রাতে ৬—৭টা উপাসনা।
৭—১০টা কীর্ত্তন।
১০—১২টা দরিদ্র বিদায়।
১—৩টা তত্ত্ব উপদেশ।
অপরাহ্নে ৪টা—৬টা টালিগঞ্জ বাগান বাটীতে উৎসব।
৬½টা—৭½টা তথায় উপাসনা।

শৈলেনকে পারুল নিজে হোষ্টেলে আসিয়া হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছিল। আজ নগেন আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

উৎসবে......সমবেত হইয়াছেন—শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়াছেন, ডাঃ বসু ও তাঁহার পরিবার আসিয়াছেন, ডাঃ গাঙ্গুলী আসিয়াছেন, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী আসিয়াছেন, দুর্গাদাস বাবুর অন্তরঙ্গ আরও কয়েক জন বন্ধু আসিয়াছেন। আর আসিয়াছেন—বিধু বাবু, যতীন বসু, শৈলেন ও নগেন।

উপাসনার পর সঙ্গীত। পারুল ও বকুল সমস্বরে গান গাহিল। সঙ্গীত শুনিয়া শৈলেন মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন সুধামাখা সঙ্গীত সে আর কখন শুনে নাই। জীবন ভরিয়া সে গণিতেরই উপাসনা করিয়াছে, কল্পনায় যে সঙ্গীত সে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিল, হৃদয় বীণা ছিন্ন করিয়া সে সঙ্গীত গগনে পবনে কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে। আজ নূতন করিয়া যেন সে নূতন সঙ্গীতের তান হৃদয়ে গাঁথিয়া লইল। সে সঙ্গীত কি মধুর! সঙ্গীত শুনিয়া শৈলেন আজ মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিল।

তারপর কীর্ত্তন। কীর্ত্তনও তাহার মনে সেই উদাস ভাবই জাগাইয়া রাখিল।

কীর্ত্তনের মাঝখানে পারুল আসিয়া তাহাকে জল খাইবার জন্য উঠিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। শৈলেন কীর্ত্তন ছাড়িয়া গেল না।

কীর্ত্তন শেষ হইলে শৈলেন বিদায় গ্রহণ করিল। পারুল দুই হাত জোড় করিয়া বিনীত ভাবে কহিল, আপনাকে আর এ বেলা কষ্ট দিব না। ওবেলাতে কিন্তু ৩টায় আপনার নিকট গাড়ী লইয়া যাইব। আমাদের টালীগঞ্জের বাগান বাড়ীতে যাইতে হইবে। নগেন বাবুরা সকলে ট্রামে যাইবেন, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।

শৈলেন উত্তর দিতে পারিল না, ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল।

শৈলেনের এই মানসিক ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ দুর্গাদাসবাবুর নিকট কেহ না বলিলেও কিছু দিন মধ্যেই তিনি তাহা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন।

পুত্রের শারিরীক মানসিক অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া জগবন্ধু বাবুই দুর্গাদাস বাবুকে সকল কথা লিখিয়াছিলেন এবং তাহার তত্বাবধান করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই সূত্রে পারুল প্রভৃতিও শৈলেনের মানসিক অসুস্থতার কারণ জানিতে পারিয়াছিল।

ঐ কারণে শৈলেনের এইরূপ মানসিক অসুস্থতার গুরুতাকে পারুল বড়ই উচ্চ আদর্শে গ্রহণ করিয়াছিল।

একদিন নগেন ও যতীনের সঙ্গে কথায় কথায় পারুল বলিয়াছিল—"শৈলেনদার ভাব-উন্মাদনা খুব গভীর আত্মজ্ঞান হইতে উদ্ভূত।"

হাসিয়া নগেন বলিয়াছিল—"পতঙ্গের রূপ তৃষ্ণার ন্যায় পাগলামী ও মারাত্মক।"

যতীন বোস বলিয়াছিল—"আমি বুঝতেই পারি না—এরূপ ভাব এতদিনও কিরূপে টিকে থাকতে পারে!"

পারুল বলিয়াছিল—"পতঙ্গের তৃষ্ণার গভীরতা ঠিক পতঙ্গ না হইলে কেহ বুঝতে পারে না। যে যাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধ জিনিসের মূল্য সে জানে, তাহা অন্যে কি বুঝবে?"

সেদিন পারুলের কথায় উভয়েই একটু দুঃখিত হইয়াছিল। পারুল আর তর্ক করে নাই।

শৈলেনের প্রতি সেই কারণে পারুলের সমস্ত প্রকৃতি শ্রদ্ধায় নত।

ঠিক ৩॥টায় আসিয়া পারুলদের গাড়ী মেডিকেল হোষ্টেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। আশা ভিতরে যাইয়া শৈলেনকে লইয়া আসিল। শৈলেন গাড়ীর উপরে যাইতে চাহিলে পারুল দুঃখিত হইয়া বলিল—"তাহা হইলে আপনি এই গাড়ীতেই বসুন, আমরা তাই বোন্ অন্য গাড়ীতে যাই।"

শৈলেনের আর উত্তর চলিল না; সেওতো তাদের 'শৈলেন দা'—তাই বোনেরই একজন।

শৈলেন আশাকে লইয়া একদিকে বসিল, পারুল অন্য দিকে বসিল।

পারুল জিজ্ঞাসা করিল—"আজকার কীর্ত্তন আপনার নিকট কেমন বোধ হইল শৈলেন দা?"

শৈলেনের কথা বলিবার বেশী ইচ্ছা ছিল না, অথচ প্রশ্নের উত্তর না দিলেও নয়; সে বলিল— "বেশ হইয়াছিল।"

গাড়ীর শব্দে কথা বেশী শুনা যাইতেছিল না, সুতরাং চীৎকার করিয়া শান্তি ভঙ্গ করা পারুল আর ভাল মনে করিল না।

কিছু দূরে গিয়া ট্রাম চলিয়া যাইবার অপেক্ষায় গাড়ী থামাইতে হইল তখন পারুল পুনরায় প্রশ্ন করিল—"আমাদের গানটী আপনার নিকট কেমন বোধ হইয়াছিল ?"

শৈলেন সংক্ষেপে উত্তর দিল—"বেশ শান্তি পাইয়াছি।"

"সকাল সময় তো কোন কাজই করেন না শৈলেন দা, তখন একবার আমাদের বাড়ী আসিলে কি হয় না ? আমরা যে সন্ধ্যা উপাসনার সময় প্রতিদিনই এইরূপ গান গাহিয়া থাকি।"

শৈলেন উত্তর করিল—"দুমাস মধ্যেই পরীক্ষা দিতে হইবে, এবে আমাদের Final Examination, সময় কোথায় ?"

পারুল ধীরে ধীরে বলিল—"মনের এইরূপ শান্তি লাভ না করিলে আপনি পরীক্ষায় appear হইবেন কি করিয়া আমি যে বুঝিতে পারিতেছি না।"

শৈলেন বলিল "দেখিব।"

গাড়ী পুনরায় চলিল এবং বাগান বাড়ীর গেটে আসিয়া থামিল।

এখানে কলের গানের ও মেয়েদের গান বাজনার বন্দোবস্ত ছিল। বিধুবাবু, নগেন ও যতীন বাবু পূর্ব্বেই আসিয়া সকল বন্দোবস্তই করিয়াছিলেন। বিধুবাবু ব্রাহ্মসমাজের একজন গায়কও বটেন তাঁহার গান গেট হইতেই শোনা যাইতেছিল। আশা নামিয়াই দৌড়াইয়া চলিল।

পারুল শৈলেনকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। শৈলেন কুণ্ঠিত হইয়া হাত ছাড়াইয়া নিল। নগেন দূর হইতে শৈলেনকে দেখিতে পাইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

বাগান বাটী খানা অতি পরিপাটী—পূর্ব্ব মুখে অবস্থিত। গেট হইতে দক্ষিণ দিকে একটী বড় রাস্তা গিয়া তাহা ঠিক চক্রাকারে ঘুরিয়া বামদিকে আসিয়া পুনরায় গেটে মিলিয়াছে। সেই বড় রাস্তাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গোল রাস্তার মধ্যস্থলে নানা জাতীয় ফুলের গাছ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজান রহিয়াছে। তাহার মাঝে মাঝে বসিবার আসন স্থাপিত। রাস্তার দুই পার্শে ২ ফুট চওড়া করিয়া লাল লাল পেনপার্জ রোপন করিয়া তাহা এমন ভাবে সমান করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে যে দেখিতে ঠিক যেন ২ ফুট চৌড়া এক খানা গালিচা আস্তৃত রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণের দিকে পাতা বাহারের একটী চক্রব্যূহ। বহু ঘুরিয়া ফিরিয়া—একবার বাহির হইয়া, আর একবার মধ্যে গিয়া—ব্যূহের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। একবার প্রবেশ করিলে, ব্যূহের ভিতরে না পঁহুছিয়া পাতা বাহারের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার আর উপায় নাই। উত্তরদিকে অন্ধকারময় কুঞ্জবন। সেই অন্ধকার কুঞ্জপথ অতিক্রম করিলে পর যেন নন্দন কানন। শ্যামল দূর্ব্বা আস্তরণে বসিয়া এখানে স্বর্গ সুখ উপভোগ করা যায়। পশ্চিমে একটী হংস ডিম্বাকারের পুষ্করিণী পুষ্করিণীটা রক্ত কুমুদ পল্লবে সমাচ্ছন্ন। তাহার তীরে নারিকেল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের সারি। পুষ্করিণীটার পূর্ব্বদিকে সিঁড়ি বাঁধান; সিঁড়ির উপরে একটী দোতাল গৃহ; তাহাই বাগান বাটী।

নগেন শৈলেনকে বাগানের সম্মুখের ভাগটা দেখাইয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল।

পারুল শৈলেনকে ডাকিয়া উপরে লইয়া গেল। সেখানে ব্রাহ্ম বন্ধুদের মেয়েরা এস্রাজ বাজাইয়া গান করিতেছিলেন। গান থামিলে বকুল মঞ্চে দাঁড়াইয়া রবি ঠাকুরের "পুরাতন ভৃত্য" কবিতাটী ঠিক ভাব অনুরূপ ভঙ্গীতে পাঠ করিল। বকুলের অঙ্গভঙ্গী ও মুখের ভঙ্গী দেখিয়া শৈলেন না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। ইহার পর আর তাহার ভাল লাগিল না, সে বাহির হইয়া আসিল।

নীচের তলায় চা গরম হইতেছিল। বাহিরে কলের গ্রামোফোনের গান চলিতেছিল। শৈলেনের মনটা কোথায় ভাল বসিতেছে না, বুঝিয়া পারুল তাহাকে তাহার সঙ্গে দিয়া বলিল "বাক্সো তা তা, শৈলেনদাকে কুঞ্জবনে নিয়ে

যা—যান শৈলেনদা, সেখানে তারি আরাম পাইবেন।"

শৈলেন একটু শান্তিরই অনুসন্ধান করিতেছিল। তাহার সঙ্গে গিয়া অন্ধকার কুঞ্জবনে প্রবেশ করিল। সেখানে বাস্তবিকই আরাম। শৈলেন-কুঞ্জবন ঘুরিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল—শান্তি যেন তাহাকে দুইবাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া লইল। সে তাহাকে ধরিয়া লইয়া সেই নির্জ্জন প্রস্তরাসনে বসিয়া পড়িল। চারিদিক উচ্চ বৃক্ষ ও অন্ধকার কুঞ্জবনে ঘেরা সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশের পথ হীন ছায়া শীতল এ স্থানটী প্রকৃতই শান্তি নিকেতন।

শৈলেন বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। তাহা বাগানের হরিণ শিশুটীকে দৌড়াইতে লাগিল।

মহিলাদিগের কাকলিতে যখন কুঞ্জবন মুখরিত হইয়া উঠিল, তখন শৈলেন চকিতে গাত্রোত্থান করিয়া এক দিকে সরিয়া গেল এবং তাহাকে লইয়া ধীরে ধীরে কুঞ্জের বাহিরে চলিয়া আসিল।

পারুল তাহাকে পথে আটকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কুঞ্জবন আপনার নিকট কেমন বোধ হইল?"

শৈলেন বলিল—"ভাল লাগিলেই কি আর সর্ব্বদা এখানে আসিবার উপায় আছে?"

"পরীক্ষার পরেতো সর্ব্বদাই আসিতে পারিবেন।"

"দেখা যাবে।"

"ওদিকের চক্র ব্যূহটা দেখিয়া আসিয়া বসুন ওখানে, আমরা আসিতেছি।"

শৈলেন তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতে গৃহটীর সম্মুখ দিয়াই যাইতে হয়। গৃহের সম্মুখে আসিবা মাত্র বিধু বাবু বলিলেন—"বসুন শৈলেন বাবু, চা টা হোক" তিনি আমাকে চা আনিতে ডাকিলেন। এই সময় দুর্গাদাস বাবুও তাঁহার আর কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া পুকুরের পাড় ঘুরিয়া চক্রব্যূহে যাইতেছিলেন। সুতরাং শৈলেন অপেক্ষা করিল।

শাস্ত্রী মহাশয় ঘরে ছিলেন, তিনি আসিয়া বাহিরে বসিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বিধু বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "রাজমোহন বাবু এলেন না কেন?"

বিধু বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে তিনি তাঁর একটী আত্মীয়ের মৃত্যুতে পশ্চিমে চলে গেছেন।"

বিধু বাবু আর বলিলেন না—বলতে লাগিলেন "দুঃখ কষ্ট মানুষকে জর্জ্জরিত করে ফেলে। ওর কোন Consolation ই নেই।"

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—"দুঃখ অশান্তির একমাত্র কারণ, আমাদের ভগবানে অবিশ্বাস। Consolation খুব আছে।"

বিধু বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে আমরা কি তাঁকে মানিনে? বিশ্বাস করিনে?"

শাস্ত্রী-"নিশ্চয় করি না।"

বিধু—"ভগবান নেই?"

শাস্ত্রী—"যাহারা ভগবান বলিয়া একজন সর্ব্বনিয়ন্তা আছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন—তাঁহারা বিধিকে বিশ্বাস করেন, দুঃখ অশান্তির ভিন্ন ধারও ধারেন না।"

বিধু—আমরা কি নাস্তিক? আমরা ব্রাহ্ম সমাজের সকলেই পরমকারুণিক মঙ্গলময় পরম ব্রহ্মকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি। করি নে একথা কেউ বলতে পারেন না; অথচ দুঃখ কষ্টতো এক দিনের জন্যেও একটু কম ভোগ করিনে!

শাস্ত্রী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"আপনারা ভগবানের শক্তিকে নিজের শক্তি অপেক্ষা বেশী বলিয়া জ্ঞান করিলে, আত্মশক্তিকে কখনই এত প্রাধান্য দিতে পারিতেন না। ভগবানের শক্তিতে বিশ্বাস করেন না বলিয়াই প্রতি কার্য্যে প্রতি অনুষ্ঠানে নিজের শক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। তারপর শক্তি পরিচয়ে বিফল হইয়া যখন দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে থাকেন তখন তাহার দোষের ভাগী ভগবানকে করিয়া থাকেন। আমাদের যে দৃঢ় ভাবে এধারণা বদ্ধ মূল হয় যে ভগবানের ইঙ্গিত ব্যতীত জগতের একটী অণুও এদিক হইতে ওদিকে যায় না; এবং ইষ্টই হউক আর অনিষ্টই হউক, সেই এক পরম ব্রহ্মেরই ইঙ্গিতে হইতেছে এবং তাহাও জগতের কোন মঙ্গলের জন্যই হইতেছে, তবে সে কর্ম্ম যাহা লৌকিক

ইষ্ট হউক আর অনিষ্টই হউক, লৌকিক সুখই হউক আর দুঃখই হউক, তাহা নিশ্চয় তাঁহারই মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে হইয়াছে, এই সত্য বিশ্বাস করিতাম। এই ধারণাই ভগবানের প্রতি দৃঢ় ধারণা। এই ধারণা থাকিলে অশান্তি ও দুঃখ বোধ হইতে পারে না।"

বিধু বাবু একটু অগ্রসর হইয়া হাত কচলাইয়া বলিলেন—"মহাশয়, আর একটু বুঝিয়ে বলুন।"

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—"সোজা কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে—আমরা ঈশ্বর হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছি এবং সেই জন্য সর্ব্বদাই নিজকে বড় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। বিপদে পড়িতেই আত্মশক্তির ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি হয়, তখন ভগবানের উপর দোষ দিয়া—দুঃখ কষ্ট ভোগ করি। আমার ভিতরে ভগবানের ভাব জাগ্রত থাকিলে আজ আমার প্রিয়তম পুত্রের বিয়োগেও মনে হইবে মঙ্গলময়ের কোন শুভ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য, তাহারই ইচ্ছায় একার্য্য হইয়াছে। পুত্রটী বর্ত্তমান থাকিলে তাহা দ্বারা অবশ্যই আমার কোন না কোন অনিষ্ট হইত। এই ধারণা যদি আমার থাকে—তবে কি আমার দুঃখ বা কষ্টের কারণ থাকিবে?"

শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শুনিয়া শৈলেন মনে বেশ শান্তি পাইতেছিল। সে মনে মনে ডাকিল—"ভগবান কোন্ সাধু উদ্দেশ্যে তুমি এরূপ করিলে তুমিই জান; প্রভু তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!"

বিধু ছাড়িবার পাত্র নহে, সে বলিল—"আমি যে ভগবানকে বিশ্বেস করিনে, একথা ভাল করে বুঝেই উঠতে পারুম না—আমার সম্বন্ধে—।"

শাস্ত্রী মহাশয় এই সরলচিত্ত জীবটীকে লইয়া একটু ব্যস্ত হইলেন। তিনি একটু রাগ দেখাইয়া বলিলেন—"আপনিকি সর্ব্বদা সত্যকথা বলিয়া থাকেন? কোন অন্যায় কর্ম্ম করেন না? সত্য করিয়া বলুন দেখি।"

বিধু "এমন কি সত্যি করে বলতে পারি?"

শাস্ত্রী "কেন পারেন না?"

বিধু—"কত সময় কত অন্যায় করে ফেলি!"

শাস্ত্রী—"মিথ্যা বলেন না?"

বিধু লজ্জিত হইয়া বলিল "বলি বই কি?"

শাস্ত্রী—"সেই যে অন্যায় করেন ও অসত্য কথা বলেন, অবশ্য লোকের নিকট নিজকে সত্য বাদী বলিয়া, জ্ঞানবান বলিয়া পরিচয় দিতে। ঠিক নয় কি? এখনও যে একটু গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেও সেই কারণে।"

বিধু বিনীত ভাবে বলিল—"আজ্ঞে ঠিক বলেচেন।"

শাস্ত্রী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস হইতেই মিথ্যার উৎপত্তি—আপনি ভগবান অপেক্ষা মানুষকে বেশী ভয় করেন এবং নিজকে অধিক বড় করিতে চান। ভগবানকে বেশী ভয় করিলে—সর্ব্বদর্শী ভগবানের অজ্ঞাতে যে আপনি এই পাপ করিতেছেন না, সেইটী ভাবিয়াই লজ্জিত হইতেন।"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"ঠিক কথা, আমরা ভগবান অপেক্ষা মানুষকে ভয় করি বেশী, মানুষের নিকট নিজকে সত্যবাদী বলিয়া পরিচয় দিবার সময় ভগবানের কথা একবারেই ভুলিয়া যাই"

এই সময় মহিলারা কুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। দুর্গাদাস বাবুও বন্ধুগণ সহ সেই স্থানে আসিয়া পঁহুছিলেন।

শৈলেন চক্রব্যূহ দেখিয়া সন্ধ্যা সমাগমে দুর্গাদাস বাবুর নিকট বিদায় হইলেন। পারুল তাহাকে গাড়ীতে যাইতেই অনুরোধ করিয়াছিল—সে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে পারুল কম্পিত হস্তে তাহার গলায় একটী ফুলের মালা ও বুকের পকেটের উপর একটী গোলাপ ফুলের "বোকে" বসাইয়া দিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সমাজ সমস্যায় মাথা দিয়া তারাচরণ মুখুর্জ্জি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। পুলিসের চাকুরীর পরিণামে যে বিপদ তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছিল তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হাতের টাকাতো সকলি গিয়াছিল, তাহার পরও গ্রামের তারাপদ সান্ন্যাল হইতে জমি বাড়ী রেহাণ-বন্ধক রাখিয়া তিন হাজার টাকা আনিয়াছিলেন। সে টাকার একটী পয়সা সুদও এ পর্য্যন্ত পরিশোধ করিতে পারেন নাই, ছয় বৎসরে তাহা সুদে আসলে প্রায় পৌনে পাঁচ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল।

সামাজিক দলাদলি যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন পীরপুরের অসংখ্য অনাবশ্যক মোকদ্দমা আদালতে গড়ায়। তারাপদ সান্ন্যালও সেই সময় তাহার রেহেনী খতের নালিশ করেন। ইচ্ছা করিলে সান্যাল আরও পাঁচ ছয় বৎসর অপেক্ষা করিতে পারিতেন; তিনি তাহা করেন নাই। তারপর যখন সান্যাল বাড়ীর দুর্ঘটনার মূল বলিয়া সকলেই তারাচরণকে সন্দেহ করিল, তখন তারাপদ তাঁহাকে গৃহহীন পথের ভিখারী করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

মোকদ্দমা ডিক্রি হইয়াছে। দাবী আদালত খরচ সহ প্রায় পাঁচ হাজারে উঠিয়াছে। সুতরাং দরদার তাহার পক্ষে অসাধ্য—ভরসা এক মাত্র পুত্র; সেও যদি অবাধ্য হয় তবে সান্যালদের প্রতিজ্ঞা ফলিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

তারাচরণ গ্রীষ্মের বন্ধে পুত্রকে বাড়ী আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া লিখায় 'জন্মোৎসব' শেষ করিয়া নগেন বাড়ী আসিয়াছে।

প্রথম দিন তারাচরণ ঋণ সম্বন্ধে পুত্রের নিকট কোন কথাই তুলেন নাই। পরদিন প্রাতে তিনি নগেনকে জানাইলেন—

"সান্ন্যালের ডিক্রির একটা বেন্দোবস্ত না করিলে আর চলে না; লোকটা কেবল হুজুগে মাতিয়া নালিশ টা করিয়াছে—সময় ছিল তার আরও ছয় বৎসর।"

নগেন কোন কথা বলিল না। চৌকীর কোণে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

তারাচরণ—"এ সম্বন্ধে পরামর্শ কি? ডিক্রির টাকাটা এখন আদালতে দাখিল করিয়া দিতে পারিলেই মুখ থাকে।"

নগেন—"আমি এ সম্বন্ধে কি বলিব? আমার যোগ্যতা তো দেখিয়াছেন। দুটী বৎসর বসিয়া থাকিয়াও একটা ২৫৲ টাকার চাকুরী পাইলাম না। আমি এখন এই সমস্যার কি করিতে পারি?"

তারাচরণ—"এখন তো তুমিই করিবে—উপযুক্ত পুত্র তুমি। চুরী কর, চামারী কর, যেরূপ করিয়াই হউক, ঋণও দিতে হইবে, পরিবারও প্রতিপালন করিতে হইবে। আমার এ বৃদ্ধ বয়সে কি আর চিন্তার ক্ষমতা আছে?"

নগেন—"আমাকে কি করিতে বলেন? এ সম্বন্ধে আমার একেবারেই কোন অভিজ্ঞতা নাই। কোন পন্থা নির্দ্দেশ করিলে সে সম্বন্ধে ভাল মন্দ আলোচনা করা যায়।"

তারাচরণ বলিলেন—"ঋণ তো শোধ করিতে হইবে?"

নগেন বলিল—"না শোধ করিলে কি হইবে?"

তারাচরণ হাসিয়া বলিলেন—"পাগল, এ ঋণ শোধ না করলে, মাথা রাখিবার স্থান থাকিবে না। এ যে বাস্তুভিটা লইয়া গেল।"

নগেন বলিল—"সে তো ঠিক কিন্তু ঐ বাস্তুভিটা কি পাঁচ হাজারেরই উপযুক্ত! তুলনা করিলে কোনটা গুরুতর—পাঁচ হাজার টাকা, না ওই জমি-বাড়ী? অবশ্য যদি জমি বাড়ীই অধিক মূল্যবান হয়, তবে এই জমি বন্ধক দিয়া অনায়াসেই অন্য কোন স্থান হইতে পাঁচ হাজার টাকা আনিয়া এ ঋণ শোধ করা যাইতে পারে।"

তারাচরণ—"সেটাই তুমি ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। এই পৈত্রিক ভিটা বাড়ী গেলে, স্ত্রী পুত্র পরিজন লইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, কাহাকে বলিব, একটু স্থান দাও—কেই বা সেরূপ স্থান দিবে।"

নগেন বলিল—"জয়নগরের বাড়ীতো খালি পড়িয়াই আছে; যদি পাঁচ হাজার টাকা এ বাড়ী-জমির মূল্য যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে তাহা আপাততঃ বরং ছাড়িয়া দেন। পাঁচ হাজারের উপর বাড়ী জমি বিক্রয় হইয়া যাউক। আমরা গিয়া জয়নগরেই বাস করিতে থাকি।"

তারাচরণ বলিলেন—"পৈত্রিক বাড়ী নিলামে তুলিয়া শেষ বয়সে শ্বশুর বাড়ীতে থাকিব?"

নগেন—"ঋণ করিলে তো ঋণ দিতে হইবে? এখন পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া যদি জমি বাড়ী রাখেন শোধ দিবার উপায় কি? আর ছয় বৎসরে যে তাহা ৮ হাজার হইবে, বার বৎসরে ১০ হাজার হইবে।

জীবন করিয়া কি কেবল অভাবের সঙ্গেই যুদ্ধ করিব ? এ যুক্তি কি সমীচীন ?”

তারাচরণ—“সংসার করিতে হইলে, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করিতে হইলে. অভাবের সঙ্গে যুঝিতে হয় বৈ কি? ক্ষমতা থাকিলে হয়ও না। তুমি বি, এ, পাস করিয়াছ এম, এ, পাস করিয়া উকীল হইবে—তোমার উপর সংসারের সমস্ত ভরসা—এখন তুমিই যদি নিরাশ করিয়া দাও—।”

নগেন—“তেমন অদৃষ্ট হইলে তখন এরূপ জমি বাড়ী পীরপুরে যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। আমি এই জমি বাড়ী দশ হাজারের দায়িত্বে রাখিবার পরামর্শ সঙ্গত মনে করি না।”

তারাচরণ “পাগল, দশ হাজার হইবে কেন ? বার বৎসরের মধ্যে কি আমাদের অবস্থা ভগবান একটুও উন্নত করিবেন না—পেলা. খেলা এরা দু ভাইওতো ভত দিনে বি, এ, পাশ করিয়া তোমার সাহায্য করিতে পারিবে ? সাহস না থাকিলে কি এ দিনে চলে !”

নগেন এ পর্য্যন্ত কোন কথার স্পষ্ট ভাবে উত্তর দেয় নাই ; অথচ প্রতি কথারই তেমন উত্তর তাহার মনে যোগাইয়া উঠিতেছিল। এইবার সে ধীরে ধীরে বলিল--“অতি সাহসের ফল প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে।”

তারাচরণ রাগ করিয়া বলিলেন “আমার বাবা যদি আমাকে বি,এ, পাশ করাইতেন, আমি এরূপ দশ হাজার বিশ হাজার কে তুচ্ছ জ্ঞান করিতাম।”

পিতার খরচে নগেন বি,এ, পাশ করে নাই। এন্ট্রেন্স পরীক্ষার পূর্ব্বেই তাহার পিতার চাকুরী গিয়াছিল। তারপর সে নিজের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত পাঠ বজায় রাখিয়াছে। তাই পিতার কথায় বলিবার মত উত্তর তাহার মনে জমিয়া উঠিয়াছিল। সে নিজকে সংযত করিয়া বলিল—“আমার সাহসে কুলায় না, তা আমি কি করিব। আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করুন।”

তারাচরণ “বাজারের বিষ্ণুপাল মৌজায় রাখিয়া পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ দিতে সম্মত আছেন। আমি তাহা লইয়াই সান্যালের ঋণ শোধ করিয়া দিতে চাই, তোমাকেও সেই জন্যই আনাইয়াছি।”

নগেন “বেশ. এ টাকা পরিশোধের উপায় ?

তারাচরণ “তাতো বটেই। তাহারও যোগাড় একরকম ঠিক।”

নগেন “তা যদি ঠিক থাকে তবে আমার আপত্তির কারণ কি ? আর আপত্তি থাকিলেই বা তার মূল্য কত ?”

তারাচরণ কতক্ষণ থামিয়া থাকিয়া বলিলেন—“তাম-গ্রামের কুঞ্জবাবু মেয়ে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। অবস্থা তাঁহাদের মন্দ নহে। আমি অলঙ্কার পত্র বাদে. নগদ পাঁচ হাজার চাহিয়া ছিলাম, আড়াই হাজার দিতে তাঁহারা স্বীকৃত। একটু দম ধরিলে তিনহাজার পাওয়া যাইতে পারে। মেয়েটী ভদ্র ঘরের, দেখিতে মন্দ নহে।”

নগেন হঠাৎ কোন উত্তর করিল না। উত্তর করিবার প্রয়োজনও দেখিতে পাইল না। চুপ করিয়া রহিল।

তারাচরণ বলিতে লাগিলেন—“আশ্বিন কার্ত্তিকে যদি তিনহাজার শোধ দিতে পারি, থাকে দুইহাজার। তা না হয় বাহিরের জমি কতকটা বিক্রয় করিয়া ফেলিব। জয়নগরের তালুকের আয়ে ও বাকী জমির ধানেই সংসার চলিবে—পরামর্শ টাকি মন্দ মনে কর ?”

নগেন কোন কথাই বলিল না।

সুতরাং তারপর আর কোন কথা হইলনা। সন্ধ্যার পর পিতা পুত্র পুনরায় একত্র হইলেন।

তারাচরণ কথা তুলিলেন—“টাকা লইয়া বিবাহ করিব না,—একথা বোধ হয় তোমার অবস্থার লোকে আর এখন বলিতে পারে না। এরূপ বলা নিতান্তই পাগলামী।’

নগেন উত্তর করিল না।

তারাচরণ—“তাহা হইলে বিষ্ণু পালকে খবর দেওয়া প্রয়োজন। লেখা পড়া—কাল্‌ই হইয়া যাউক।”

নগেন বলিল—“সেটা আর কাল কেন, ৮।১০ দিনের জন্য পাঁচ হাজারের সুদই বা দেই কেন, আর ৮।১০ দিনই বা বলি কেন ? মাত্র ডিক্রি হইয়াছে। তারপর ডিক্রীজারি. নীলাম, ঢের সময় আছে—অন্ততঃ ৩।৪ মাস। এই তিন চার মাসের সুদ কেন দেই। কর্জ্জ করিতে হয়, যখন নিতান্ত প্রয়োজন হইবে, তখন করিবেন।

আর তাহাতে আমার উপস্থিত থাকিবারইবা এমন কি প্রয়োজন ?”

তারাচরণ বলিলেন—“টাকাটা মুখের উপর না ফেলিয়া দিতে পারিলে কেহ থাকে না। দেখুক বেটা —তারাচরণের ক্ষমতা আছে কিনা ?”

নগেন হাসিয়া বলিল—“এ বড় বেশী ক্ষমতার বিষয় কি হইল ? আর এরূপ ক্ষাত্র জনক জেদ সর্ব্বদাই নিন্দনীয়।”

তারাচরণ হাসিয়া বলিলেন—“লড়িতে হইলে মানুষের মতই লড়িতে হইবে, মরার মত নহে। আর তোমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, তোমাকে সঙ্গে না রাখিয়া টাকা দিবে না। দুই জনের নামেই দলিল দিতে হইবে। জয়নগরের সম্পত্তিও রেহানাবদ্ধ রাখিতে হইবে। ওতে আর কি বিশেষ ক্ষতি ?

নগেন কথা শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রসমিত করিয়া বলিল—

“দুই জনে দলিল লিখিয়া দিতে আমার কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু জয়নগরের মাতামহ সম্পত্তি আমি রেহানাবদ্ধ করিতে কখনই পারিব না।”

নগেন ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

সে রাত্রে সে সম্বন্ধে আর তারাচরণ কোন কথা তুলিলেন না। পরদিন প্রাতে তিনি পুনরায় নগেনকে ডাকাইলেন।

তারাচরণ নগেনের মেজাজ জানিতেন নগেন উদ্ধত স্বভাবেরও ছিল ম, খুব অনুগতও ছিল না। সে যাহা ভাল না বুঝিত, তাহাতে হঠাৎ মতামত প্রকাশ করিত না; কিন্তু যাহা অনিষ্টকর মনে করিত, তাহা করিতে একবার অসম্মত হইলে, তাহাতে আর কদাপি সম্মতি দিতনা। জয়নগরের সম্পত্তি যখন সে দায়াবদ্ধ করিতে অসম্মত হইল, তখন তারাচরণের সকল আশা ভরসাই শেষ হইয়া গেল।

নগেন যে এক ব্রাহ্ম ডাক্তারের মেয়ে বিবাহ করিয়া তাহার খরচে বিলাত যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা তিনি পরেশের ও নলিনীর মুখে শুনিয়াছিলেন। তাহারা বাড়িতে আসিয়া প্রায়ে এই কথা রটনা করিয়া দিয়াছিল; এইরূপে তারাচরণও এই সংবাদ শুনিয়াছিলেন। তারপর তিনি পরেশ ও নলিনীকে জেরা করিয়া ভিতরের খবর লইয়াছিলেন।

তারাচরণ সুচতুর লোক তাই প্রথমেই নগেনকে সে সকল প্রশ্ন না করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধ পর হইয়াছিলেন। এইবার নগেন আসিলে তিনি বলিলেন—

“তোমা দ্বারা তবে কোন উপকার প্রত্যাশা বৃথা ?”

নগেন চুপ করিয়া রহিল।

তারিণী বলিলেন—“পিণ্ড প্রাপ্তির পথেও বালি দেখা যাইতেছে !”

নগেন তথাপি নিরুত্তর।

তারিণী—“জানতেছি তুমি জগবন্ধু বাবুর এক শালীর কন্যা বিবাহ করিয়া বিলাতে যাইতেছ—ব্রাহ্মণের ছেলের কি শেষ এই দুর্গতি ?”

নগেন বলিল—“যাইবার প্রস্তাব হইয়াছে বটে, কিন্তু আপনাদের সম্মতির অপেক্ষায় আমি সম্মতি দেই নাই; বিবাহের কথা মিথ্যা, বিলাত যাওয়াকে দুর্গতি বলিয়াও আমি মনে করি নাই।”

তারিণী—“জগবন্ধু রায়েরই এই কারসাজি; নিজে ডুবিয়াছেন, পরকেও ডুবাইতেছেন।”

নগেন—“জগবন্ধু বাবু বোধ হয় ইহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না।”

তারিণী—“তবে তুমি বিলাতেই যাইবে?”

নগেন—“আপনি যদি আমাকে গৃহে রাখিয়া ঋণ মুক্ত হইতে পারেন, প্রয়োজন কি বিলাতে যাইবার।”

তারিণী তোমা দ্বারা আমার যে সাহায্য হইবে, তাহাতো সম্মুখেতেই বুঝলাম।”

নগেন “তবে আর তিন বৎসর পরে ওকালতি পাসের আশায় বসিয়া থাকিয়া কি হইবে। আপনাদেরও উপকারে আসিব না, নিজের জীবনটাকেও অভাব গ্রস্ত করিয়া রাখিব—এ কোন প্রয়োজনে ?”

তারিণী রাগ করিয়া বলিল—“ব্রাহ্মণের সন্তান জাহান্নামে যাইও না। কুলে কলঙ্ক আনিও না। পিতৃ পিতামহের পিণ্ড লোপ করিও না।”

বড়োমা—"ওকালতি আমি পাশ করিতে পারিব না। দুইবেলা ছটি ছেলেকে পড়াইতে যাই, তারপর ল কলেজে যাই, আসিয়া স্নান আহার করি, দ্বিপ্রহরে এম. এ. ক্লাসে যাই—আমার পড়িবার সময় কোথায়? না পড়িয়া কি এম, এ, বি, এল হওয়া যায়? এখন বাড়ীতে ৫২ টাকার বেশী কোন মতেই দিতে পারিতেছি না। ল ক্লাস, এম, এ, ক্লাস ছাড়িয়া দিলেও ১০।১৫ টাকার বেশী দিতে পারিব না। বি এ, পাস করিয়া যাহা আয়ের আশা থাকলেও আমার দ্বারা আর অধিক কি হইতে পারিবে, বুঝিতে পারিতেছি না। যদি বলেন, মাষ্টারির চেষ্টা করিতে পারি। মাষ্টারির ভাবষ্যৎ আশায় পাঁচ হাজার টাকা ঋণ আপনি করিবেন না। সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাউক।"

তারাচরণ রাগ হইয়া বলিলেন—"জাহান্নামে যাও।"

নগেন ধীরে ধীরে পিতার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

পরদিন নগেন কলিকাতা চলিয়া যাইবে, সুতরাং দ্বিপ্রহরে তারাপদ সান্যালের সহিত সাক্ষাত করিয়া তিনি কিছু কাল সময় দেন কি না চেষ্টা করিয়া দেখিতে—চাহিয়াছিল। মাতৃ বিয়োগের পর হইতে নগেন মাতামহ আলয়েই বাস করিত, সুতরাং গ্রামের কাহারও সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। মাঝে মাঝে ৫।৭।১০ দিনের জন্য আসিত, সমবয়স্ক দলের সহিত খেলিয়াই সে সময় কাটাইয়া দিত; তারপর কলিকাতায় গিয়া অবধি আজ ৭ বৎসর মধ্যে সে পীরপুর গ্রামে আসে নাই।

সে দ্বিপ্রহরে আহারের পর জগবন্ধু বাবুর সহিত সাক্ষাত করিল। এবং তাঁহাকে লইয়া তারাপদ সান্যালের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

নগেনের পরিচয় পাইয়া তারাপদ দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারাচরণই যে তাঁহার কুলে কালিমা লেপন করিবার ব্যাপারে একজন শ্রেষ্ঠ পরামর্শ দাতা ছিল, তাহা বলিয়া তারাপদ দুঃখে ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

জগবন্ধু বাবু নগেনের প্রার্থনা জানাইলে তারাপদ নগেনকে বলিলেন—"যাও বাবা, তোমাকে না জানাইয়া তোমার অজ্ঞাতে আমি কিছু করিব না; তুমি বি বিলাতেই যাও, আমি অপেক্ষা করিব। তুমি পীরপুরের ভবিষ্যৎ গৌরব স্বরূপ—পিতার কুবুদ্ধির অনুসরণ না করিয়া—সুপথে চলিয়া দেশের গৌরব রক্ষা কর।"

যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে তারাচরণ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্যামগ্রামের প্রস্তাব চালাইব কি?"

নগেন বলিল—"সম্পত্তি রক্ষা না পাইলে কেবল বিবাহের জন্য বিবাহ করিব না—উপার্জ্জন-ক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত করিব না।"

তারা—"কেন?"

নগেন—"যে পিতা মাতার অন্নবস্ত্র যোগাইতে অক্ষম তার পক্ষে—।"

আর কথা শুনা গেল না। নগেন রওনা হইয়া গেল।

মোক্ষ-লাভ।

গুরু কহিলেন শিষ্যে,—মৃত্যুকালে যার
হরিনাম ফুটে মুখে মাত্র একবার,
শ্রীহরি আপনি তারে নিয়ে যান এসে,
সে নিত্য আনন্দময় শ্রীবৈকুণ্ঠ বাসে!
শিষ্য কহে—চমৎকার! তবে এই বেলা
লুটি স্বর্গ-মধু-চক্র, করি লীলা খেলা!
মৃত্যুকালে হরিনাম লব একবার
হাতে হাতে মোক্ষলাভ নিশ্চিত আমার!
গুরু কন—শুন বৎস অবহিত হয়ে,
সারা জন্ম থাক যদি লীলারঙ্গ লয়ে,
জাগিবে পিয়াসা তারি সে পরম ক্ষণে
মৃত্যুকালে হরিনাম হবে নাক মনে!
হৃদিপদ্মে হরি যার বিরাজেন সুখে
মৃত্যুকালে হরিনাম ফুটে তারি মুখে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ

সৌরভ

অষ্টম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, জৈাষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২৭। { অষ্টম ও নবম সংখ্যা

আলেকসন্দরের পঞ্চনদ আক্রমণ।

(১)

য়ুনান বা গ্রীস্ দেশের নাম সকলেই জানেন। আলেকসন্দার ঐ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা ফিলিপ ঐ প্রদেশের অন্তঃপাতি ম্যাশিডোনিয়ায় রাজত্ব করিতেন। ইহার পূর্ব্বে পারসীকেরা কয়েকবার গ্রীস্ আক্রমণ করিয়া উহার অনেক অনিষ্ট করিয়াছিলেন। আলেকসন্দর বাল্যকালে এ সকল কাহিনী শুনিতে ২ ক্রমে ক্রমে পারসীকদিগের উপর একবারে খড়্গহস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ধীরে ২ সমগ্র য়ুনান জয় করিলেন ও প্রায় ৭০,০০০ সৈন্য সঙ্গে লইয়া পারস্য অভিমুখে রওনা হইলেন। ইহার পর তিনি কি প্রকারে এসিয়া মাইনর, মিশর, পারস্য প্রভৃতি রাজ্য হস্তগত করিয়া আধুনিক আফগানিস্থানে প্রবেশ করিলেন, তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিব না, কারণ তাহার সহিত উপস্থিত কথায় কোনও বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

খ্রীঃপূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকসন্দর হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া প্রায় ৬০,০০০ য়ুরোপীয় সৈন্যেরসহিত কোহ-ই-দমন প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। বিনা যুদ্ধে ঐ স্থান অধিকার করিয়া তিনি নিকয়া নামক নগরে প্রবেশ করিলেন। আধুনিক জেলালাবাদের কয়েক মাইল পশ্চিমে নিকয়া অবস্থিত ছিল। এই স্থান হইতে তিনি তাহার সমস্ত সৈন্যের প্রায় অর্দ্ধভাগ সেনাপতি হিফেসটিয়ন এবং পারডিকসের অধীনে খাইবার পাশের ভিতরদিয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং অপরার্দ্ধ স্বয়ং লইয়া উত্তর দিকের কতিপয় অসভ্য জাতিকে দমন করিবার জন্য গমন করিলেন। তাঁহার মনে হইল, যদি ঐ সকল জাতিকে দমন না করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে পরে বিশেষ কষ্ট দিতে পারে।

উপর্য্যুক্ত সেনাপতি দ্বয় পথিমধ্যে বিশেষ কোনও প্রকার বাধা পাইলেন না। সিন্ধুনদের পূর্ব্ব তটে ঐ সময়ে যে সকল রাজ্য ছিল উহাদের মধ্যে তক্ষশীলা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ঝিলম্ ও চেনাব নদীর মধ্যে সেই সময়ে পুরুরবা নামক একজন ক্ষত্রিয় নরপতি রাজত্ব করিতেন। তক্ষশীলার সহিত পুরুরবার বহুদিন হইতে শত্রুতা চলিতেছিল। কিন্তু পুরুরবা শৌর্য্য ও বীর্য্যের সহিত তক্ষশীলার নরপতি আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি এতদিন পর্য্যন্ত মনের আগুন মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া এই প্রবল বিদেশী দিগ্বিজয়ীর সহিত যোগদান করিলেন; কারণ তিনি খুব জানিতেন যে, পুরুরবার ন্যায় ক্ষত্রিয় নরপতি কখনও আলেকসন্দরের অধীনতা স্বীকার করিবেন না।

আলেকসন্দর নিজে কাবুল নদের উত্তরে কুনার নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সকল জয় করিয়া আরও উত্তর দিকে গমন করিলেন। সেখানে বাজোর নামক এক পরাক্রান্ত রাজ্য অধিকার করিয়া আস্পেসিয়ানদিগকে আক্রমণ করিলেন। ভারতের উত্তরে ইহাদের মত পরাক্রমশালী জাতি আর ছিল না। প্রথম যুদ্ধে আলেকসন্দরকে হটিয়া আসিতে হয়, দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহারা পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে গ্রীকেরা প্রায় ৪০,০০০ লোককে বন্দী করেন এবং তাহাদের প্রায় ২৩০,০০০ গাভী লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে

প্রেরণ করেন। ইহার পর তিনি অকসস নদী পার হইয়া আরও কিয়দ্দূর উত্তরে গমন করেন এবং আলেকসন্দ্রিয়া নামক এক সহর স্থাপিত করিয়া তথায় কয়েক সহস্র গ্রীক সৈন্য রক্ষা করেন। ইহার পর গ্রীক বীর ভারতের দিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পথিমধ্যে "মস্পাগা" রাজ্য অবস্থিত ছিল। কথিত আছে যে, ইহার নরপতি বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। মস্পাগার একদিকে স্বয়াট্ নদী ও অপর দিকে দুর্গম গিরিমালা, এতদ্ব্যতীত সহরের চারিদিকে বিশেষ সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। আলেকসন্দর নদীর দিক হইতে সহর আক্রমণ করিলেন এবং কয়েক দিবস দিন রাত্রি ভীষণ যুদ্ধের পর রাজধানী হস্তগত করিলেন। গ্রীক-লিখিত ইতিহাসে লিখিত আছে যে, মস্পাগা অধিপতিকে, সাহায্য করিবার জন্য ভারত হইতে ৭০০০ বীর সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঠিক সময়ে ইঁহারা পঁহুছিতে পারেন নাই বলিয়া সহরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন নাই। সহর হস্তগত হইবার পর আলেকসন্দর ইঁহাদিগকে তাঁহার সহিত যোগদান করিতে বলেন। তাঁহারা ছিলেন প্রকৃত ক্ষত্রিয় সন্তান। স্বদেশের বিরুদ্ধে বিদেশীকে সাহায্য করিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। তখন গ্রীকেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা একে একে সকলেই জীবন বিসর্জ্জন করিলেন তথাপি বিদেশীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন না।

ইহার পর তিনি "নোরা" আক্রমণ করেন। তাহার পর 'বজিরা' অধিকার করেন। এই স্থানের এবং অপরাপর আরও কয়েকটি সহরের অধিবাসীরা সিন্ধু নদের নিকটবর্ত্তী মহাবন্ পর্ব্বতের উপর আশ্রয় গ্রহণ করেন। পর্ব্বতটি নদী তীর হইতে প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চ এবং উপরে উঠিবার একটী ভিন্ন আর পথ ছিল না। আলেকসন্দর বিশেষ আয়োজনের পর মহাবান্ আক্রমণ করিলেন এবং প্রায় তিন সপ্তাহ বিশেষ চেষ্টার পর উহা অধিকার করেন। ইহার পর তিনি ক্রমে সিন্ধু নদীর তীরবর্ত্তী 'ওহিন্দ' সহরে প্রবেশ করিলেন। অনেকে মনে করিতেন—এই ওহিন্দই আধুনিক 'আটক' সহর কিন্তু প্রসিদ্ধ কুনর্ সাহেব বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন ওহিন্দ্ একণে অন্দ্ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা আটকের ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

আলেকসন্দর এই ওহিন্দ হইতে সিন্ধু পার হইবার বন্দোবস্ত করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি সৈন্যদিগকে একমাস কাল বিশ্রাম করিবার অবসর দেন। তাহার পর একদিন প্রাতঃকালে দেবদেবীর পূজা করিয়া আলেকসন্দর নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। যথা সময়ে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইল। ইহার পূর্ব্বে একদিন তক্ষশীলার অধিপতি স্বয়ং আসিয়া আলেকসন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার অধীনতা স্বীকার করেন। তিনি যে কি জন্য "গায়পড়া" হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন, তাহা আমরা উপরে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি।

প্রাচীন কালে তক্ষশীলা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত রাওলপিণ্ডির উত্তর-পশ্চিমে এবং হসন আবদাল সহরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ইহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের ভগ্নাবশেষ-নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন জাতক পুস্তক সকলের অনেক স্থানে ইহার উল্লেখ আছে। তখন ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের দূরবর্ত্তী দেশ সকল হইতে ছাত্রেরা উপস্থিত হইতেন।

তক্ষশীলার অধিপতি আম্ভি শুধু যে আলেকসন্দরের অধীনতাই স্বীকার করিলেন এমত নহে, তিনি নানা প্রকারের বহুমূল্য উপহার, সুন্দরী দাসী সকল এবং ৫০০০ সৈন্য, গ্রীক বীরকে অর্পণ করিলেন। আলেকসন্দর আম্ভির সাহায্য না পাইলে যে সহজে সিন্ধু নদী পার হইতে পারিতেন না, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আম্ভি বশ্যতা স্বীকার করাতে সিন্ধুর উভয় তটবর্ত্তী প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান নৃপতি সকল আলেকসন্দরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। ইঁহারা সকলে যদি মিলিত হইয়া গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন এবং মহারাজ পুরু যদি তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতেন, তাহা হইলে হয়ত গ্রীকদিগকে সিন্ধুর অপর তীর হইতেই স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইত—অথবা হয়ত কেহই আর দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিতেন না। কিন্তু হতভাগ্য

ভারতের লোক একতার মর্ম্ম কোনও দিন জানিতেন না। সেই প্রাচীন মহাভারতের যুগ হইতে আধুনিক মীরজাফরের সময় পর্য্যন্ত—আমাদের দেশে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' নীতির শত শত উদাহরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করিয়া আছে। আজ পর্য্যন্ত আমরা এই সর্ব্বনেশে নীতির ফলভোগ করিতেছি। মুসলমানেরা এদেশে আজ প্রায় ৯০০ বৎসর বাস করিতেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল না। হিন্দুদিগের মধ্যেও তাই! পরস্পরের সর্ব্বনাশ সাধনে সকলেই তৎপর।

আলেকসন্দর সিন্ধু পার হইয়া তিন দিনের মধ্যে তক্ষশীলায় উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে থাকিয়া তিনি চারিদিককার প্রধান প্রধান সামন্ত ও নৃপতিগণের নিকট হইতে সম্রাটোচিত সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু পুরুরবা ধরা দিলেন না। আলেকসন্দর তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ক্ষত্রিয় নৃপতি বলিয়া পাঠাইলেন—"তাঁহার সহিত গ্রীক রাজের অবিলম্বে সাক্ষাৎ হইবে—যুদ্ধক্ষেত্রে।"

কয়েকদিবস তক্ষশীলায় বিশ্রাম করিবার পর আলেকসন্দর পুরুরবার রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে সময়ে ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থান মহারাজ পুরুর শাসন দণ্ডের অধীন ছিল। তক্ষশীলা হইতে ঝিলম নদীর দূরত্ব ১০০ বা ১১০ মাইলের অধিক ছিল না (১)। সে সময়ে এই পথের অবস্থা যে খুব ভাল ছিল, তাহা বোধ হয় না। কারণ ঐ ১১০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে তাঁহার প্রায় দুই সপ্তাহ লাগিয়াছিল। তিনি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ঝিলম নদীর পশ্চিম পারে উপস্থিত হইলেন। নূতন বর্ষার জলে নদী তখন দুইকূল প্লাবিত করিয়া ছুটিতেছিল। তিনি সিন্ধু নদ পার হইবার জন্য যে সকল নৌকা ব্যবহার করিয়াছিলেন, উহাদিগকে গরুর গাড়ীর সাহায্যে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন।

নদীর পরপারে মহারাজ পুরু প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য লইয়া (২) উপস্থিত ছিলেন। এই সৈন্যের মধ্যে বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত হস্তীও ছিল। আলেকসন্দর স্পষ্ট বুঝিলেন যে, এই বিশাল বাহিনীর সম্মুখে ঐ বিপুলকায়া নদী পার হওয়া অসম্ভব। ৪।৫ মাস অপেক্ষা না করিলে নদী স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হইবে না। অথচ এতদিন অপেক্ষা করা তাঁহার নিকট সমীচীন মনে হইল না। তিনি তখন কৌশল নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি নিজের সৈন্যদিগের মধ্যে প্রচার করিলেন যে, নবেম্বরের পূর্ব্বে তিনি নদী পার হইবেন না। তখন সেই নদীর তীরে শিবির স্থাপিত হইল। ৪।৫ মাসের উপযুক্ত রসদ সংগ্রহের জন্য তিনি চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। পুরু এই সকল আয়োজন দর্শনে নিশ্চিন্ত হইলেন; বুঝিলেন, আশু কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই।

কিন্তু তিনি বিষম ভ্রম করিলেন। তিনি বুঝিলেন না যে, আলেকসন্দর গোপনে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী প্রস্তুত করাইয়া অন্য দিক হইতে নদী পার হইবার আয়োজন করিতেছেন। (৩) এই সময় ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ

(১) ঐ সময়ে পঞ্চনদ প্রদেশের প্রায় সমস্ত নদীই অন্য পথে প্রবাহিত হইত।

(২) আলেকসন্দরের সমস্ত ইতিহাস আমরা গ্রীক ইতিহাস হইতে প্রাপ্ত হই। আমাদের নিজের কোনও ইতিহাস এ সম্বন্ধে আদৌ লিখিত হয় নাই। তাঁহারা এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন আজ আমাদিগকে তাহাই অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হয়। এই ইতিহাসের একটি বিশেষত্ব এই যে, আলেকসন্দর এদেশে যে কোথাও পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা কোথাও উল্লেখ নাই।

(৩) বিদেশীয় লেখকেরা যখন তখন আমাদিগকে 'cunning' 'crafty', 'men of duplicity' প্রভৃতি সুমধুর বিশেষণে বিশেষিত করেন। তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল তাঁহাদেরই একচেটে। অথচ তাঁহাদের ভাষাতেই আছে, 'Every thing is fair in love and war'. যুদ্ধের সময় কুটিল নীতির প্রয়োগে তাঁহারা যেমন নিপুণ এমন আর কেহই নহে। আমাদের প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি যুদ্ধের সময় যে কি প্রকার সরলতা অবলম্বন করিতেন তাহার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত মহাভারত, রামায়ণ, রাজস্থান প্রভৃতি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে অবশ্য দুই এক স্থানে যুদ্ধের সময় কুটিল নীতির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা প্রায়ই ঐ নীতিকে ঘৃণা করিতেন।

থাকাতে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইল। তিনি গোপন অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিলেন যে, তাঁহার শিবিরের প্রায় ষোল মাইল উপরে (উত্তরে) পার হইবার উপযুক্ত স্থান। ঐ স্থানে নদী ঘোর ফেরাতে উহার পরিসর খুব কম ছিল এবং গভীরতাও অধিক ছিল না। যে স্থানে তিনি শিবির সংস্থাপিত করিয়াছিলেন একণে, উহা ঝিলম নামে প্রসিদ্ধ। আলেকসন্দর ক্রেটিরস্ নামক সেনাপতিকে ঐস্থানে কয়েক সহস্র সৈন্যের সহিত স্থাপিত করিয়া অর্দ্ধ পথে অপর দুই জন সেনাপতিকে রক্ষা করিলেন। তাঁহাদিগকে আদেশ দিলেন যে, তিনি নদী পার হইবা মাত্র তাঁহারাও যেন নদী পার হয়েন। এই সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ হইবার পর একদিন গভীর রাত্রে তিনি ১২,০০০ পদাতিক ও ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া শিবির ত্যাগ করিলেন। ভাগ্যক্রমে, সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় তাঁহার কার্য্য অপর পার হইতে কেহই লক্ষ্য করিল না। তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পার হইবার নৌকা প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তুত। তাঁহার সৈন্য সকল যখন নদীর প্রায় মধ্য স্থলে উপস্থিত হইল তখন মহারাজের কয়েকজন প্রহরীর দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহারা অবশ্য তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে এই সংবাদ প্রেরণ করিল। অবিলম্বে শঙ্খ-ধ্বনির সাহায্যে চারিদিকে সংবাদটি ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঝিলম হইতে ঐ স্থান প্রায় ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এতদূর হইতে সৈন্যাদি সুসজ্জিত করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। মহারাজ পুরুর পুত্র যখন ২০০০ সৈন্য ও ১২০ টা রথ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন আলেকসন্দর নদী পার হইয়া উপযুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়াছেন। হিন্দু সৈন্য যদি তাঁহার নদী পার হইবার সময় উপস্থিত হইতে পারিত, তাহা হইলে বহুতর গ্রীক সৈন্যকে নদীর মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইত।

যাহা হউক, অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৭,০০০ সুশিক্ষিত এবং প্রবীন সৈন্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় বালক ২০০০ সৈন্য লইয়া অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার সৈন্যেরা অনতিবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিন্তু মহাবীর পুরুর পুত্র পিতার নামে কলঙ্ক লেপন করিল না। সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অক্ষয় বীরলোকে চলিয়া গেল। পুরুর নিকট সংবাদ পঁহুছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতেও এক বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন না। কিয়দংশ সৈন্য শিবির রক্ষার জন্য রাখিয়া তিনি পুত্রহন্তাকে শাস্তি দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন।

যে স্থানে পুরু স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য একক আলেকসন্দরের বিশ্ব বিজয়ী সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তাহা এক্ষণে 'করুরী' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পশ্চিম-উত্তরে শিরওয়ালি এবং দক্ষিণে পকরল্।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সমস্যা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শ্রাবণ মাস। সুর-তরঙ্গিনী জাহ্নবী পূর্ণ যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে ঘাট-বাট শীলা-সোপান প্রক্ষালন করিয়া তীর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

গঙ্গা এখানে উত্তর বাহিনী। কাশী, দশাশ্বমেদ ঘাটের উপরে একটী ছোট বাড়ীর দ্বিতলের উন্মুক্ত বারান্দায় বসিয়া অপরাহ্নে একটী যুবক ও একটী যুবতী আলাপ করিতেছিল। ঊর্দ্ধে মেঘ সংযুক্ত ধূমায়মান আকাশ, নীচে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ কলনাদিনী গঙ্গা। দূরে, অপর তীরে কাশী নরেশের বিশাল প্রাসাদের উচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছিল। যুবক যুবতীকে তাহা দেখাইয়া বলিল—"ওই ব্যাস কাশী, ওখানে মরিলে কি হয় জান?"

যুবতী বলিল "মরিলে আবার কি হয়?"

যুবক—"ওখানে মরিলে গাধা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।"

যুবতী হাসিয়া বলিল—"রামনগরের লোকগুলি পুণ্য করিয়া মরিলেও গাধাই হইবে—ব্যবস্থাটিতো মন্দ নহে। আপনি কি তাহা বিশ্বাস করেন?"

যুবক হাসিয়া বলিল—"তাহারা যদি গাধাই হয়, তবে আমার বিশ্বাসে আপত্তি কি?"

যুবতী বলিল—"কাশীতে মরিলে স্বর্গে যাইবে, আর তার দুই মাইল দূরে মরিলেই একেবারে গাধা—এ সংস্কার শিক্ষিত লোকের ভিতর কেমন করিয়া থাকিতে পারে, আমি চিন্তা করিয়াই উঠিতে পারি না! আচ্ছা কারলীর রাজকুমারকে যিনি রক্ত দান করিয়াছেন, তাহার মৃত্যুতে কোথায় স্থান হওয়া উচিত?"

যুবক—"কেবল রক্ত দান করিলেই হইবে না; স্বর্গের আদালতে মনের বিচার হয়। কে কি অভিপ্রায়ে কোন্ স্বার্থে রক্ত দান করে, চিত্রগুপ্ত তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে কার্য্যের উদ্দেশ্য বিচার করেন—তদনুসারে ধর্ম্মরাজ 'রায়' প্রদান করেন।"

যুবতী—"আমি কারলী রাজের ধাত্রীকন্যার উচ্চ আত্মত্যাগ মহিমার কথাই কেবল চিন্তা করিতেছি। এই রকম কয়জন পারে?"

যুবক—"ওই মেয়েটার রক্তদানে আত্মত্যাগের বিষয় কিছুই নাই; সে রাজার ধাত্রীর কন্যা, একে পরাধীন, তার উপর রাজার আদেশ—তাহার সাধ্য কি যে তাহা অমান্য করে? তবে এরূপ ব্যাপারে আত্মত্যাগ পুরুষজাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, মেয়েদিগের মধ্যে অসম্ভব।"

যুবতী রাগ দেখাইয়া বলিল—"স্বার্থপর পুরুষ জাতিই বেশী, কোমল নারী প্রকৃতি স্বার্থের ধার ধারে না; পুরুষের স্বার্থের ইঙ্গিতে তাহার মূক শক্তি সর্ব্বদাই পরিচালিত হইতেছে।"

"ঠিক কথা!" বলিয়া যুবক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। এই সময় একটী কিশোরী আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে যুবকের চোখ টিপিয়া ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। যুবক দুই হাতে তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে টানিয়া আনিতেই সে চুপি চুপি বলিল "শুনেছ দিদি, রাজবাড়ীর মেয়েটী নাকি মারা গেল! মেয়েটা রাজপুত্রের জন্য তার জীবনটা দিল; দিদি, তোমাদের অন্ধ ভালবাসার এই—পরিণাম!"

যুবতী বলিল—"উনি কিন্তু ওর ভিতর স্বার্থত্যাগ কিছুই দেখেন না। ভালবাসার কিছুই পান না।"

যুবক বলিল—"ভালবাসার ওতে কি আছে? মেয়েটাকে যে বাধ্য হইয়াই রক্ত দিতে হইয়াছে। সে কি নিজ ইচ্ছায় রক্ত দান করিয়াছে?"

যুবতী ও কিশোরী একত্রে বলিল—"নিশ্চয়।"

যুবতী বলিল—"চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য বা জীবনের জন্য মানুষ আত্ম সুখ বা আত্ম জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়, তাহাই প্রকৃত ভালবাসা।"

"দিদি যে "বিষবৃক্ষের" হর দেব ঘোষালের চিঠি খানা মুখস্থ করিয়াছ দেখিতেছি।" বলিয়া কিশোরী হাসিয়া উঠিল। কিশোরীর সঙ্গে যুবকেও হাসিয়া উঠিল। যুবতীর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া গেল।

এই সময় দুর্গাদাস বাবু আসিয়া বলিলেন—"কারলীর রাজকুমার সুস্থ আছেন, ব্রহ্মচারী বাবার চিকিৎসায় বেশ হাত আছে! আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রেও Transfusion of blood এর ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাহার ব্যবহার নাই।"

বকুল জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়েটা নাকি মারা গেল বাবা?"

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—"ওতে মারা যাওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। যাহার শরীর দুর্ব্বল বা যাহার শরীরে রক্ত কম, তাহার শরীর হইতেতো আর রক্ত গ্রহণ করা হয় না। তবে বাহিরের লোকে সেই রূপই মনে করে বটে। আমি এই মাত্র রাজ বাড়ী হইতেই আসিলাম।"

ইহার পর অন্য প্রসঙ্গ উঠিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাদাস বাবু বড়ই মাতৃভক্ত। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা কাশী-বাস করেন। দুর্গাদাস বাবু মায়ের সুখ-সুবিধার জন্য যতদূর প্রয়োজন, সুব্যবস্থা করিয়া, দিয়াছেন। বাঙ্গালী টোলায় একটী ক্ষুদ্র কোঠা ভাড়া করিয়া ঠাকুর চাকরের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে শেষ গতি হয়, বৃদ্ধা তাহারই ভরসায় অপেক্ষা করিতেছেন।

ইতোমধ্যে তাঁহার শারিরীক অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছিল—গঙ্গার ঘাটে যাওয়াও বন্ধ হইয়াগিয়াছিল, তাই পুত্রকে দেখিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলেন।

দুর্গাদাস বাবু চিঠি পাইয়াই মাতৃচরণ দর্শনে যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। এই সময় কলিকাতার অবস্থাও একটু সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সহরের নানা স্থানে প্লেগ। একদিন তাঁহার নিজ বাড়ীতেই প্লেগ দেখা দিল,—তাঁহার ঘোড়ার চাকর প্লেগে আক্রান্ত হইল। সেই দিনই সপরিবারে দুর্গাদাস বাবু টালিগঞ্জের বাগান বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইলেন। লোকটাকেও হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া তাহার ঘরের চালা খানা পুড়াইয়া ফেলিলেন। বাড়ীর অনেক জিনিস পত্রও নষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে নগেনের Preliminary পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সে ও পরীক্ষার পর তাঁহাদের সহযাত্রী হইবে এবং কাশী হইতে আসিয়াই আমিরিকা যাত্রা করিবে স্থির করিয়াছিল। সুতরাং দুর্গাদাস বাবু নগেনের জন্য ৪৷৫ দিন বিলম্ব করিয়া তাহাকে সহ সপরিবারে বেনারস চলিয়া গেলেন।

দুর্গাদাস বাবুর টেলিগ্রাফ পাইয়া ডাঃ বাক্‌চি এক খানা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুর্গাদাস বাবু সপরিবারে সেই বাড়ীতে উঠিলেন; নগেন দুর্গাদাস বাবুর মার সঙ্গে বাঙ্গালী টোলায় রহিল।

দুর্গাদাস বাবুর মাতার বয়স ৭৪। এই বয়সেও তিনি প্রতিদিন গঙ্গায় যাইয়া স্নান করেন, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শন করেন এবং নিজের অন্ন নিজে রাঁধিয়া খাইতে চেষ্টা করেন। ঠাকুর আছে; কিন্তু তাহাকে সকল দিন রান্না প্রস্তুত করিতে হয় না। সে বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় যায়, মন্দিরে যায়। যে দিন রান্না না, করিতে হয়, সে দিন পয়সা লইয়া যায় কিন্তু অন্ন ছত্রে আহার করে।

দুর্গাদাস বাবু প্রাতে বৈকালে দুই বেলাই মাতৃ চরণ দর্শন করিতে আইসেন! মায়ের চিঠি পাইয়া তিনি ডাঃ বাক্‌চিকে ও গুরুদাস কবিরাজকে তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহারা প্রতিনিয়ত আসিয়া দেখিয়া যাইতেছিলেন, ঔষধও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা ঔষধ গ্রহণ করেন নাই। ৺কাশীধামে আসিয়া ঔষধ গ্রহণ তিনি কখনও করেন নাই। আর করিবেনও না।

দুর্গাদাস বাবু মাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করেন; দুই বেলাই জুতা ছাড়িয়া বার অন্দর বারান্দায় অপেক্ষা করেন, মা বাহিরে আসিলে মাটিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম ও তাঁহার পদাঙ্গুলিতে মস্তক স্পর্শ করেন। নগেন তাঁহার এই মাতৃভক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপ্লুত হইয়াগিয়াছে। আশু ও ভাতা পিতার অনুসরণেই পিতামহিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইয়া থাকে। পারুল ও বকুল বৃদ্ধ পিতার মাতৃভক্তির অনুষ্ঠান গুলিকে 'লাঞ্ছনা' বলিয়া প্রথম দিন হাস্য করিয়াছিল,—নগেনের ঘৃণা প্রকাশে তাহাদের আচরণ শোধরাইয়া গিয়াছে। তাহারাও তাহাদের পরিপাটী পোষাক পরিচ্ছদের সতর্কতা লইয়া যথা সম্ভব বিনীত শ্রদ্ধা ভক্তিই প্রদর্শন করিয়া থাকে। গৃহিণীও শাশুড়ীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

নগেন বৃদ্ধার ব্যবহারে মুগ্ধ। সে এখন বৃদ্ধার গঙ্গা-স্নানের সাথী। প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করে, গৃহে আসিয়া কিঞ্চিৎ আহার করে, তারপর দুর্গাদাস বাবুর বাড়ী যায়। দ্বিপ্রহরে আহার করিয়া বিশ্রাম করে, বিকালে পুনরায় তথায় যায়। সন্ধ্যায় আসিয়া বৃদ্ধাকে লইয়া বিশ্বেশ্বরের মহা আরতি দর্শন করে। ইহাই হইয়াছে এখন তাহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য।

আজ পনর দিন হইল তাঁহারা কাশীধামে আসিয়াছে। আসিবার কয়েক দিন পরেই কাশ্মীর রাজ পুত্রকে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

রাজপুত্রের বয়ক্রম ২০৷২২ বৎসর। নানাপ্রকার কুৎসিত রোগে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া যুবক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। রোগীর জীবনের কোন আশা নাই দেখিয়া রাজা পুত্রকে লইয়া মহাপুরুষ-দিগের আশ্রয় ভিক্ষার্থ ৺কাশীধামে আসিয়াছেন এবং দশাশ্বমেধ ঘাটস্থিত অহল্যাবাইর প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন।

এই সময়ে ৺কাশীধামে মহাত্মা যোগজীবন ব্রহ্ম-চারীর আগমন হয়। মহাত্মা যোগজীবন শ্রীশ্রীত্রৈলিঙ্গ স্বামী অপেক্ষাও বয়সে বৃদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, 'তিনি

জাহাঙ্গীর পাদসাহের সম সাময়িক'; কেহ বলেন 'বাদসাহ আকবর শাহের সময়ের লোক'। কিন্তু তিনি নিজে বলিতেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে নাম প্রচারে ব্রতী ছিলেন, তখন তিনি রামেশ্বর সেতুবন্ধে অবস্থান করিতেন; সেইহেতু তাঁহার সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয় নাই। মহাত্মা যোগজীবনের বয়ক্রম এই হিসাবে চারিশত বৎসর এবং ইহার মধ্যেই তিনি ৩।৪ বার দেহের সংস্কার করিয়াছিলেন।

৮ কাশীধামে মহাত্মা যোগজীবনের তখন খুব নাম-ডাক। তিনি যেমনি বয়োবৃদ্ধ বলিয়া পরিচিত, তেমনি জ্ঞান-বৃদ্ধ বলিয়াও খ্যাত হইয়াছিলেন। বহু ভাষা ও বহু শাস্ত্রে—বিশেষতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রে—ইহার জ্ঞান সর্ব্ববাদী সম্মত ছিল।

কারলীর রাজা যাইয়া অসিঘাটে মহাত্মা যোগজীবনের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং পুত্রের অন্তিম অবস্থার কথা নিবেদন করিয়া একবার আসিয়া তাহাকে পদধুলি দান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করেন।

রাজার আগ্রহে ব্রহ্মচারী রাজপুত্রকে আসিয়া দেখিয়া বলেন—"আমি আপনার পুত্রকে রক্ষা করিয়া দিব। ইহার শরীরে আমি নূতন রক্ত প্রবেশ করাইব এবং ইহার দূষিত রক্ত মোক্ষণ করিয়া ফেলিয়া দিব। এক জনকে ইহার জন্য রক্ত দান করিতে হইবে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরূপ লোক চাই? বয়স, এবং স্ত্রী কি পুরুষ প্রয়োজন, জানাইলে অনুসন্ধান করিতে পারি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"বয়স ইহার সমান বা কিছু কম, ষোলর কম না হয়, দেহ বলিষ্ঠ ও সুস্থ, শরীরের রক্ত নির্দ্দোষ, যুবক, কিম্বা যুবতী হইলেও হইবে। তাহার শরীরের রক্ত আমি defibrinate করিয়া লইব।"

রাজা—"তাহার শরীর হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া লইয়া কুমারের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে সে ব্যক্তির অবস্থা কি হইবে?"

ব্রহ্মচারী—"কোন অনিষ্ট হইবে না, অনিষ্ট হইতে দিব না; তাহার শরীরে প্রচুর রক্ত থাকিলেই নেওয়া হইবে।"

রাজা—"কোন সুস্থকায় পশুর রক্তে সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না কি?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন—"যে একটা রাজ্যের ভাবি উত্তরাধিকারী, তাহার পশু স্বভাব কখনই মঙ্গল জনক নয়। যাহার রক্ত গ্রহণ করা হইবে, তাহার রক্ত দানের সময় মনের ভাব শান্ত ও উৎফুল্ল থাকা চাই; ভীত ও স্তম্ভিত রক্তে শরীরে বিপরীত ক্রিয়া করিবে। পিতাকে পুত্রের এবং পুত্রকে পিতার রক্ত দানই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।"

রাজা বলিলেন—"তাহাই হইবে।"

ইহার পর রাজার এক ধাত্রীর কন্যা স্বেচ্ছায় তাহার রক্ত দান করিতে সম্মত হইলে ব্রহ্মচারী কুমারের উপর অস্ত্র-উপচার করেন। এ ঘটনারই আভাস পাঠক পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পাইয়াছেন।

নগেনের ইচ্ছা ছিল একদিন দুর্গাদাস বাবুকে লইয়া ব্রহ্মচারীর নিকটে যায়। আজ সেখানে যাইবে ভাবিয়া আসিয়া বাড়ীর গেটে দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় একটী যুবক তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—"বাঃ আপনি যে?"

নগেন সেই অপরিচিত যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুতেই তাহার পরিচয় স্মরণ হইতেছিল না।

যুবকটীও একটু লজ্জিত হইয়াছিল, সে দৃঢ়তার সহিত বলিল—"আপনার নাম নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়—না?"

নগেনও হাসিয়া বলিল—"হাঁ—আপনাকে—"

যুবক নগেনের মুখ হইতে কথা টানিয়া লইয়া বলিল—

"—চিনিতে পারেন নাই অবশ্যই।"

নগেন লজ্জিত হইয়া বলিল—"ঠিক মনে হইতেছে না।"

যুবক—"আমার নাম মহেশ ভট্টাচার্য্য। বহুদিনের কথা—ঢাকা পগোজ স্কুলে এক সঙ্গে পড়িতাম।"

নগেন লজ্জিত হইয়া বলিল—"আমাকে মাপ করিবেন—আপনি এখন কোথায় আছেন, কি করিতেছেন?"

যুবক—"আমি দুর্গাবাড়ীতে থাকি, এখানে বিশুদ্ধানন্দ চতুষ্পাঠিতে জ্যোতিষ পড়িতেছি। আপনি ওকালতি করিতেছেন অবশ্যই।"

নগেন—"না দাদা, উকিল হইব কি, এখনও পড়াই শেষ হয় নাই। দুটা বৎসর মাঝে কামাই গিয়াছে।"

ভট্টাচার্য্য বলিল—"চলুন অগ্রসর হই, গমনোন্মুখই তো দেখিতেছি।"

নগেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"এক স্থানে যাইবার কথাছিল—।" একটী ভদ্র লোক অপেক্ষা করিবেন।"

ভট্টাচার্য্য—"কোথায় যাইবেন,—কেই বা অপেক্ষা করিবেন?"

নগেন—"যোগ জীবন ব্রহ্মচারীর নিকট যাইতে ইচ্ছা ছিল।—"

ভট্টাচার্য্য—"চলুন না—সে তো দুর্গাবাড়ীর নিকট—অসিঘাট।"

নগেন—"তাঁহার সহিত আপনার আলাপ আছে কি?"

ভট্টাচার্য্য—"আমরা দুই তিন দিন গিয়াছি। তিনি খুব আলাপি লোক। লোকের সকল কথারই উত্তর দেন। নানা রকম প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। লোকটা চার শতাব্দীর প্রাচীন, বহু গুণে গুণবন্ত!

নগেন—"সে তো শুনিতেছি, এত দিন কি লোক বাঁচিতে পারে?"

ভট্টাচার্য্য—"সে সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত আলাপ ছিল, অবশ্য আমার নয়—কাশীর প্রায় সকল বড় লোকই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন—তাঁহাদের সহিত আলাপে ব্রহ্মচারী বাবাই বলিয়াছেন—মানুষের অসংখ্য বৎসর বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব নহে। তবে মাঝে মাঝে দেহের জীর্ণ সংস্কার করিতে হয়। মহাত্মাও ৩ বার দেহের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন, ৪র্থ সংস্কারে তাঁহার বয়স ৪৩ হইয়াছে। শরীরের চর্ম্ম শিথিল হইয়া গেলেও মাথার চুল বা দাড়ি একটীও পাকে নাই—আশ্চর্য্য!"

নগেন, ভট্টাচার্য্যের সহিত অসি ঘাটে যাইয়া যোগ-জীবন ব্রহ্মচারীর পদধূলি লইয়া আসিল।

ব্রহ্মচারীর সহিত সেদিন তাহার বিশেষ কোন আলাপ হইল না। লোকের গতি বিধি ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়াই নগেন সে দিন চলিয়া আসিল। ভট্টাচার্য, তাহাকে পুনরায় তাহার বাসায় আসিয়া পঁহুছাইয়া দিয়া গেলেন।

নগেন বাসায় আসিয়া বৃদ্ধাকে আশ্রম দর্শনের কথা বলিলে বৃদ্ধাও সাধু দর্শনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শৈলেন শেষ পরীক্ষা দিয়া পিতার আদেশে বাড়ীতে আসিয়াছে। দেশের খবর আর কাহারও নিকট না জিজ্ঞাসা করিয়া সে তাহার বৌদিদির নিকট শুনিতে বসিল। শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল "সান্যালদের বাড়ীর ঘটনাটা কিরূপে হইল, তারপর আর একেবারেই সাড়াশব্দ নাই! এর ভিতরের রহস্যটা কি বৌদি?"

বৌদি বলিলেন "সেই যে দিন ইস্কুল ঘরে সভা হইল—সভার পরে সান্যাল বাবু আমাদের বাড়ীতে আসিয়া প্রস্তাব তুলিয়া গেলেন। রাত্রে হিতসাধিণীর বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আহার করিয়াছিলেন; খাওয়া দাওয়ায় রাত অনেকটা হইয়াছিল। আমরা সবে চক্ষু বুজিয়াছি, তার একটু পরেই গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদের ভয় হইতে লাগিল; ঠাকুরকে কোথাও যাইতে দিলাম না। তিনি অতুলকে দৌড়াইয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া খবর দিল। তখন ঠাকুর আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি লোকজন ডাকিয়া—লইয়া গেলেন। রাত্রি ভরিয়া অনুসন্ধান হইল, কোন খোজই পাওয়া গেল না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাতঃকালেই মহকুমায় যাইয়া পুলিস সাহেবকে লইয়া আসিলেন। আহা মেয়েটার জাতি ও গেল—!" বলিয়া বৌদিদি কাঁদিতে লাগিলেন।

শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল—"এরূপ হইল কেন? করিলই বা কারা? তার কিংকিছু জানা গেল না?"

বউদি চখের জল মুছিয়া বলিলেন—"ঐ দিনের সভায় সান্যাল বাবু নাকি ও পাড়ার মুখুজ্জ্যে মহাশয়ের ও চক্রবর্ত্তী দিগের কুল-কর্ম্মের কলঙ্ক কথা বলিয়াদিয়াছিলেন, তাই ওরাও তাহার কুলে কলঙ্ক দিল। শুনিতেছি আপনার মুখুজ্জ্যে খুড়াই লোকজন দিয়া এই কলঙ্কের কার্য্য করিয়াছিলেন।"

শৈলেন অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল—"পুলিস সাহেব আসিল, তবে মোকদ্দমা চলিল না কেন ?"

বৌদি—"পুলিস সাহেব প্রতিমার মাকে ও ঠাকুর-মাকে আদালতে লইয়া যাইতে চাহিল। শত্রুপক্ষ রটনা করিয়াছিল যে প্রতিমার সহিত পূর্ব্ব হইতেই বদ লোকের দোষ-ভাব ছিল, তার মা' তা জানিত—এসব কুকথা মোকদ্দমার সময় প্রতিমার মাকে জেরা করিয়া অপমান করিবে, তাই সাণ্ডাল বাবু কলঙ্কের উপর কলঙ্কের ভয় পাইলেন।"

শৈলেন চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল—"প্রতিমার কি আর কোনই খোঁজ হইল না ?"

বৌদি—"তাহাকে এক মুশলমান জমিদার মুশলমান করিয়া 'নিকা' করিয়া ফেলিয়াছে।" বৌদির চক্ষে জল ধারা বহিতেছিল। শৈলেনেরও দুই চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িল।

বৌদি বলিতে লাগিল—"তারপর এই ছয় মাস গ্রামে কি কেহ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারে ? আমাদের বাড়ীতে সারারাত চৌকিদার বসিয়া থাকে। বাহির হইতে ঘরের তালা বন্ধ করিয়া এমন ডাকাতি কখনও শুনি নাই! এখন পাড়ার সকলের বাড়ী। পাহারা বন্দিই এইরূপ পাহারা বন্দি অবস্থাতেও কি নিশ্চিন্তে ঘুমাইবার যো আছে ? আজ এর বাড়ীতে আগুন, কাল তার মাথায় বাড়ি, পরশু তার গোহালে গরু নাই.—একটা না একটা আছেই—। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রায়ই আসেন; মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কে লইয়া সে দিন আসিয়া ছিলেন। দুই পক্ষের লোককেই জামিন দিতে হইয়াছে। শীঘ্রই নাকি গ্রামে নিগ্রহ পুলিসের থানা বসিবে ; এ গাঁ কি আর বাসের যোগ্য আছে ?"

বৌদির নিকট হইতেই শৈলেন গ্রামের অবস্থা যথা সম্ভব অবগত হইয়া বিকালে পাড়ায় বাহির হইল।

শৈলেন গ্রামে বাহির হইয়া প্রথমেই নগেনদের বাড়ীতে গেল। সে বাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আজ কয়েক দিন হইল বাড়ীখানা পোড়া গিয়াছে। পোড়া টিনের একখানা চাপড়া জড় করিয়া তাহাতে সেই পোড়া টিনের বেড়া লাগাইয়া তারাচরণ অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করিতেছেন।

শৈলেনকে দেখিয়া মুখুর্জ্জা ঘর হইতে একখানা [illegible] আনিয়া বসিতে দিয়া বলিলেন—"এইতো বাবা, [illegible] কিসে আছি—এ কি ভদ্রলোকের গাও মা চলা[illegible] যেন ?"

শৈলেন তারাচরণের পদধূলি লইয়া বলিল—"এ ঘটনা কবে ঘটিয়াছে ?"

তারাচরণ তামাকটা টানিতে টানিতে বলিলেন—"বুধে বুধে আট দিন আজ। বসো বাবা বসো।"

শৈলেন তারাচরণের বসিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

তারাচরণ—"হুকায় দম টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কবে আসিয়াছ বাবা ? ভাল তো ?"

শৈলেন নম্রভাবে উত্তর দিল—"আজ প্রাতে ৮টায় আসিয়াছি। শরীর ভালই আছে। বাড়ী পোড়ার সংবাদ আমরা পাই নাই, নগেনও পায় নাই।"

তারাচরণ রাগের সহিত বলিল—"ও হতভাগার কথা বলিও না। ওটাই বাবা আমার যত দুঃখের মূল। আমার মাথা রাখিবার ঠাঁই নাই, অথচ তাঁর দেশ [illegible] চলিতেছে! বাবু আমেরিকায় যাইবেন—এখন কাশী ভ্রমণ হচ্ছে।"

শৈলেন—আপনি কি তার চিঠি পাইয়াছেন তবে ?"

তারাচরণ তামাকে দম দিয়া কাসিতে কাসিতে বলিলেন—'দেখবে, দেখবে কি লিখেছে সে কুলাঙ্গার হতভাগা ?" বলিয়া তিনি "পেলা" "পেলা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পেলা আসিলে তারাচরণ বলিলেন—"তোর বড়দার চিঠিখানা আন্ দেখি—আমার কোটের পকেটে আছে।" তারপর শৈলেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"দেখবে, আজকালকার শিক্ষা যুবক-দিগকে কত অসংযত ও অহমিকা পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে ?"

পেলা চিঠি আনিয়া দিল। তারাচরণ তাহা শৈলেনের হাতে দিয়া বলিলেন—"পড়।"

শৈলেন চিঠি খানা পড়িল।

[illegible]চরণকমলেষু—

[illegible] Preliminary পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। উত্তর [illegible] হয় নাই। আমি আমেরিকাই যাইব স্থির [illegible]য়াছি। সংসারের কল্যাণ সাধন ও পিতা মাতার [illegible] অভিযোগ মোচনই আমার এ যাত্রার উদ্দেশ্য। [illegible] অর্থ চান—অর্থ চাওয়াই জগতের এখন স্বাভাবিক [illegible]। প্রয়োজনও তার এত অধিক যে ভগবানের [illegible] আমরা মূলতঃ ইহাই চাই। আমাদের বাড়ী [illegible] জায়গা জমি এত সঙ্কটাবস্থায় রহিয়াছে যে [illegible] অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষী না হওয়া ব্যতীত তাহা [illegible] উপায় একেবারেই নাই। বিবাহ করিয়া সেই [illegible] ঋণ শোধ করিবার ও পর প্রত্যাশী হইয়া বাঁচিয়া [illegible]বার ইচ্ছা অত্যন্ত জঘন্য ইচ্ছা। ইহাতে মানুষের [illegible] বৃত্তি ও ভাব মলিন হইয়া যায়। অথচ অর্থ [illegible]।

[illegible] ভাবে—সরল ভাবে চিন্তা করিতে গেলে ইহা [illegible] স্বীকার করিতে হইবে যে সৎমা যাহার ঘরে আছে [illegible] অর্থ উপার্জ্জনে তাহার ক্ষমতা না হওয়া পর্য্যন্ত [illegible] পক্ষে বিবাহ করিয়া জন বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা, সেই [illegible] অলক্ষ্মী ডাকিয়া আনার সহায়তা করা ব্যতীত [illegible] কিছুই নহে।

[illegible] উপার্জ্জন-ক্ষম ব্যক্তির সরল মন ও স্বচ্ছল অব- [illegible] উপর নিতান্ত মতভেদ সত্ত্বেও 'কাটাকাটি মারামারির' [illegible] সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। অর্থহীন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি [illegible] সৎ এবং নিরীহ প্রকৃতির হইলেও নিত্য [illegible] তাড়নায় তাহার প্রকৃতি বিকৃত হইয়া যায়।

[illegible] আমার বর্ত্তমান অবস্থায় ঋণশোধ করিয়া, ভ্রাতা- [illegible] লেখা পড়া শিখাইয়া, বাড়ীতে খরচ-পত্র দিয়া [illegible]তাকে সুখী রাখিয়া মনুষ্যের ন্যায় বাঁচিয়া থাকি- [illegible] আশা দুরাশা। যাহা করিতে বসিয়াছি, তাহা [illegible] দুরাশা; তথাপি চেষ্টা করিতে হইবে। আশী- [illegible] করিবেন যেন এ চেষ্টায় ভগবান সহায় হন।

[illegible] হইলে জাতি নাশের জন্য চিন্তার বিষয় কিছুই [illegible] বাড়ী জমির জন্যও আপনি অনুমাত্র চিন্তা করি- [illegible] না। আমি সান্যাল মহাশয়ের নিকট হইতে [illegible] লইয়াছি। তিনি আমার আগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অদ্য আমি কাশীধাম যাত্রা করিলাম। সেপ্টেম্বরের ১ম সপ্তাহে আমেরিকা যাত্রা করিব। ইতি—

সেবকাধম—শ্রীনগেন্দ্রনাথ শর্ম্মাঃ।

শৈলেন চিঠি পাঠ করিয়া চক্ষু তুলিলে তারাচরণ বলিল—"দেখিয়াছ সৎমার উপর কি রকম ইঙ্গিত, আর কেমন বক্তৃতা! পাষণ্ড ফাজিল—অধঃপাতে যাউক। তিনি গিয়াছেন আবার তারাপদ সান্যালকে খোসামদ করিতে! কুপুত্র—পিতৃ পিতামহের পিণ্ড লোপকারী"—

তারিণী বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া হুকাটা কম্পিত হস্তে একদিকে ঠেস দিয়া রাখিয়া দিলেন।

শৈলেন বিনীত ভাবে বলিল—"আপনি তাহাকে অভিসম্পাত করিলে তাহার অকল্যাণ হইবে। বিদেশে কত বিপদ, কত দুর্ঘটনা! আপনি প্রসন্ন-মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন। মাতা পিতা গুরুজনের অসন্তোষ বজ্রের মত সন্তানকে আহত করে। আপনি তাহা কদাচ করিবেন না।"

তারাচরণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—কুপুত্র অপেক্ষা নির্ব্বংশ ভাল, নির্ব্বংশ ভাল! হতভাগা অধঃ- পাতে যাউক।"

শৈলেন ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতা মাতার অভিসম্পাত বজ্রের মত পুত্রের উপর কার্য্য করিয়া থাকে; ইহার প্রমাণ অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে। যে দিন তারাচরণ ক্রোধে অধীর হইয়া শৈলেনের সম্মুখে পুত্রের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া- ছিলেন, সেই দিন দুর্গাদাস বাবু প্রভৃতির ৺কাশীধাম ত্যাগ করিবার কথা।

প্রাতে উঠিয়া নগেন ষ্টেসনে গাড়ী রিজার্ভ করিতে গিয়াছিল। একখানা পাইওনিয়ার হস্তে ফিরিয়া আসিয়া সেখানা দুর্গাদাস বাবুর সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"খবর দেখুন, গত ৪ঠা আগষ্ট আমাদের প্রবীণ মহাসভা [illegible] সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন!"

দুর্গাদাস বাবু পত্রিকা খানা লইয়া দেখিতে লাগিলেন। নগেন পায়চারি করিতে করিতে বলিল—"থাক; একটা কথা বলিতে—"

দুর্গাদাস বাবু পত্রিকার উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন—"কি কথা?"

নগেন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"আমাদের বিভিন্ন ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য এক—ভগবানে পঁহুছা। এই শেষ মীমাংসা সম্বন্ধে কোন ধর্ম্ম-সমাজেরই মতভেদ নাই, পঁহুছার পন্থা লইয়াই যত গোল যোগ। এতদিন কাশীতে থাকিলেন—আপত্তি কি চলুন না গঙ্গাস্নান করিয়া একটাবার বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া আসি! জগতের এত ভক্তি-শ্রদ্ধা, আকুল প্রার্থনা যেখানে স্তূপ হইয়া আছে, তাহা ধর্ম্মের না হউক—আনন্দের হিসাবে—অগত্যা অভিজ্ঞতার হিসাবেইবা মন্দ কি?"

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—"আর ভক্তিরইবা না কেন? অযুত ভক্তের ব্যাকুল প্রাণ যেখানে গড়াগড়ি যায়, সে স্থান ধর্ম্মের স্থান, ভক্তির স্থান নয় কেন? ভগবান সেখানে অবশ্যই আছেন। কুসংস্কার আমার নাই, চল না সকলেই!"

দুর্গাদাস বাবুর কথায় পারুল ও বকুল হাসিয়া কুটপাট্ হইতে লাগিল। দুর্গাদাস বাবুর স্ত্রী সর্ব্বদাই স্বামীর মতের অনুগমন করিয়া থাকেন, সুতরাং সেখানে আর মত ভেদ হইল না। তখন সকলেই তাড়াতাড়ি কলিকাতা যাত্রার মালপত্র বাঁধিয়া রাখিয়া গঙ্গাস্নানের আয়োজন করিতে লাগিল।

নগেন বলিল—"যোগজীবন ব্রহ্মচারী যাইবার দিন সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন—সেখানে একবার যাওয়া প্রয়োজন না?"

দুর্গাদাস—"তিনটায় অসিঘাটে যাইব।"

পারুল হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—"মন্দিরে যাইতে আমাদের কি কি লইতে হইবে?"

নগেন বলিল—স্নানের কাপড় গামছা লও, তোমাদের সেমেজতো লইবেই; জুতা ছাতি লইও না; এই, আর কি?"

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—"টাকা ভাঙাইয়া কিছু পয়সা লইতে হইবে। মন্দিরেও কিছু দেওয়া প্রয়োজন, তাহা কাহারও উপকারের জন্য নয়, নিজেরই চিত্ত [illegible] উৎকর্ষের জন্য। ভক্তি ভগবানের দিকে; অনন্যের ভগবানের সেবা।

দুর্গাদাস বাবু খালি পায়ে সপরিবারে স্নানার্থী [illegible] মণিকর্ণিকার ঘাটে চলিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

তিনটায় দুর্গাদাস বাবু ও নগেন একখানা গাড়ী [illegible] করিয়া বাবা যোগজীবনের আশ্রমে আসিয়াছে। দুর্গাদাস বাবু ইতঃপূর্ব্বে আরও দুই দিন আসিয়া ব্রহ্মচারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। একদিন সপরিবারেই আসিয়াছিলেন। কারলীর রাজবাড়ীতে [illegible] উপচারের দিন দুর্গাদাস বাবুর সহিত ব্রহ্মচারীর প্রথম আলাপ। ঐ দিন ডাঃ বাকৃচি ও দুর্গাদাস বাবু তাঁহার চিকিৎসায় সাহায্য করিয়াছিলেন। নগেন [illegible] ভট্টাচার্য্যের সহিত প্রথম আশ্রম দর্শনের পর প্রায় প্রতিদিনই ব্রহ্মচারী বাবার পদধূলী লইতে আসিত। তাহার সম্মুখে ব্রহ্মচারী বহুলোকের মনের কথা, ভূত ভবিষ্যতের কথা বলিয়া দিয়াছেন। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া কেবলি দেখিয়াছে। তাহার নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একদিনও সে ব্রহ্মচারী বাবাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করে নাই।

ব্রহ্মচারী দুই তিন দিন তাহাকে আসিতে দেখিয়া একদিন তাহার পরিচয় লইয়াছিলেন। সেইদিন হইতে নগেন তাঁহার পরিচিত।

দুর্গাদাস বাবু ও নগেন যাইয়া দেখিলেন ব্রহ্মচারী আগন্তুকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন।

দুর্গাদাস বাবুকে দেখিয়া ব্রহ্মচারী বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা আস্তীর্ণ কম্বলে উপবেশন করিলেন।

সম্মুখে একটী রোগী। তাহার ঘন ঘন হিক্কা হইতেছিল। রোগী জীর্ণ শীর্ণ। ২১ দিনের জ্বর। ১০৫ ডিগ্রি জ্বর সহ সে গতকল্য ব্রহ্মচারীর নিকট আনীত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী একটা ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাকে গঙ্গায় ডুবাইয়া

...রে ... আসেন এবং সমস্ত ব্যক্তি বাহিরে ...লিয়া যাবেন। এই অপূর্ব্ব ব্যবহারই ২৭ দিনের ... ছাড়িয়া গিয়া এখন ফিকা হইয়াছে; ইহা নূতন ...র্গ।

দুর্গাদাস বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহার হঠাৎ ... গেল কিসে—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

ব্রহ্মচারী—"আপনি ডাক্তার, খুব জিজ্ঞাসা করিতে ...রেন। ইহার জ্বর গিয়াছে হরিতাল ভস্ম প্রয়োগে—"

দুর্গাদাস বাবু বুঝিলেন। আর কোন প্রশ্ন ...রিলেন না। একটু পরে বলিলেন—"আজ আমরা ...লিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"বেশ, কলিকাতা গেলে আপ-...র আশ্রমে অতিথি হইব, মনে রাখিবেন।"

দুর্গাদাস বাবু হাত যোড় করিয়া সৌজন্য দেখাইয়া ...লেন—"সে তো আমার উপর বিশেষ অনুগ্রহ, মনে ...খ্‌বেন।"

নানা প্রসঙ্গের পরে দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—...রাণীর রাজপুত্র বেশ রক্ষা পাইয়াছেন—আশ্চর্য্য!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"দীর্ঘজীবী হইবে না; বড় ...কের ছেলে—অত্যাচার করিবে, তারপর ভোগিয়া ...বে।—দেখুন, এ বিদ্যা একদিন আর্য্য-ভারতে ...সঞ্চারিনী সঞ্জীবনী বিদ্যা বলিয়া পরিচিত ছিল। ...পতি পুত্র কচ এই বিদ্যা শিখিবার জন্য শুক্রাচার্য্যের ...ট অধ্যয়ণ ছুটিয়াছিলেন। যযাতি রাজা এই ...বনী বিদ্যা প্রভাবে পুত্রের রক্তে যৌবন লাভ করিয়া ...কুমার পুত্রকে কিছুকালের জন্য নির্জ্জিব করিয়া ...য়াছিলেন। যৌবন ভোগান্তে পুনরায় নিজ রক্ত ... পুত্রে যৌবন দান করিয়াছিলেন। এ আর্য্য ...তের বিদ্যা, কিন্তু এই ভারতেই এখন তাহা অজ্ঞাত। ...রোপ তো এ বিদ্যার সহিত পরিচিত এই সে দিন ...মাদের বাল্যকালে—১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে। রোমের ... Innocent VIII এর উপর এই চিকিৎসার ... পরীক্ষা হয়। এখন সমগ্র ইউরোপে ইহা ...—British Pathologyতে পর্য্যন্ত স্বীকৃত ...য়াছে।"

এই সময় নগেন তাহার শরীরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ সহ্য করিয়া রহিল—তারপর আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার অস্থির ভাব দেখিয়া ব্রহ্মচারী তাহার দিকে ধ্যান নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—"যুবক, তোমার মহাগুরু তোমার উপর অসন্তুষ্ট।"

দুর্গাদাস বাবু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

ব্রহ্মচারীর চক্ষু হইতে তীব্র জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল—তিনি যেন যুবকের ভূত ভবিষ্যৎ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন—"শুভ হইতে অশুভের এবং অশুভ হইতে শুভের উৎপত্তি—ইহাই বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছাই পূরণ হইবে।" বলিয়া ব্রহ্মচারী নগেনের হস্তধারণ করিয়া সবলে টানিয়া দিলেন, তাহার শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল।

দুর্গাদাস বাবু নগেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শরীর কেমন বোধ করিতেছ?"

নগেন বলিল—"বেদনাটা যেন হঠাৎ নাই। কিন্তু শরীর টা কেমন কেমন বোধ হইতেছে।"

"তবে চল এখন বিদায় হই।" বলিয়া দুর্গাদাস বাবু উঠিয়া ব্রহ্মচারীর নিকট বিদায় হইলেন।

নগেন ব্রহ্মচারীর পদধূলি লইতে যাইয়া বলিল—"আশীর্ব্বাদ করিবেন—যেন ভগবান আমার শুভ উদ্দেশ্যে সহায় হন।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"অসম্ভব।"

নগেন উঠিতেছিল—থমকিয়া বসিয়া পড়িল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"যাহা ঘটিবে, তাহার জন্য চিন্তা করিও না। ভগবান সহায় আছেন। দেখি হাত?"

নগেন হাত বাড়াইয়া ধরিল।

ব্রহ্মচারী হাত দেখিয়া বলিলেন—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না,—ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

নগেন "তবে আমার কি কর্ত্তব্য।"

ব্রহ্মচারী—"ভগবানের উদ্দিষ্ট পথই প্রকৃত সুখের পন্থা; তাহার উপর নির্ভর পরায়ণ হইয়া চলিও—

নিজ বল বুদ্ধিকে প্রবল বলিয়া কখনও গণ্য করিও না। ইহাই যুবক জীবনের প্রকৃত পন্থা।"

নগেন—তবে আসি; আজই কলিকাতা চলিয়া যাইব।"

ব্রহ্মচারী—"তবু যাইব! যাইবার তুমি কে? তোমার যাওয়া ভগবানের ইচ্ছা নহে।"

নগেনের নিকট ব্রহ্মচারীর কথাবার্ত্তা প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছিল। সে বিনীত ভাবে বলিল—"তবে কি কর্ত্তব্য?"

ব্রহ্মচারী—"আজ যাও।"

নগেন ধীরে ধীরে বলিল "তবে কি আমার আজ কলিকাতা যাওয়া হইবে না?"

ব্রহ্মচারী—"ভগবান যদি নেন, তবেতো যাইবেই—নতুবা কাল দেখা হইবে।"

নগেনের উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কি জানি কি হয়! অথচ কথা গুলি তাহার নিকট নিতান্তই যেন বাজে কথা—ঠাট্টা তামসার মত বোধ হইতে ছিল। সে মনে মনে ভাবিতেছিল—ব্রহ্মচারী এত ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়া আমার সঙ্গে বাচালতা করিয়া তাহার মূল্যবান সময় নষ্ট করিবেন? নগেন পুনরায় পদধূলী লইয়া বলিল—"তবে কাল পুনরায় আসিব।"

ব্রহ্মচারী রাগ দেখাইয়া বলিলেন—"যাও!"

দুর্গাদাস বাবু গাড়ীতে বসিয়া অপেক্ষা করিতে ছিলেন; নগেন যাইয়া বলিল—"ব্রহ্মচারীকে বুঝিলাম না; আমার যাওয়া আজ হইবে না।"

দুর্গাদাস বাবুর নিকট সে সংক্ষেপে ব্রহ্মচারির উক্তি বিবৃত করিল। দুর্গাদাস বলিলেন—"চল বাসায় তো যাই।"

দুর্গাবাড়ীতে গাড়ী থামাইয়া নগেন মহেশকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল—"আজ চলিয়া যাইবার কথা, আমি চলিয়া গেলাম কি না কাল প্রাতে একবার আমাদের দশাশ্বমেধ ঘাটে ও বাঙ্গালী টোলায় বাড়ীতে আমার তত্ত্ব লইও।"

মহেশ বাহির হইতেছিল, তাহার সঙ্গ লইল এবং কিছু দূরে আসিয়া নামিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পর নগেনের শরীরের বেদনা বৃদ্ধি হইল। সে দুর্গাদাস বাবুকে বলিল, আপনারা আজই চলিয়া যান—আমি মনের ধাঁধা না ভাঙ্গিয়া আসিব না; কাল আর একবার ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাঁর মেজাজটা খুসি করিয়া যাইব; তাঁহার কথায় মনটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

নগেন বেদনা অগ্রাহ্য করিয়াই সকলকে লইয়া ষ্টেসনে গেল। ও তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। আশা, ভাতা, বকুল, নগেনকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিল। ভাতাকে চুমাদিয়া, আশার গালে ধীরে ধীরে টোকা মারিয়া, বকুলের করমর্দ্দন করিয়া নগেন আদর প্রকাশ করিল। পারুল ঢিপ করিয়া নগেনের পায়ে প্রণাম করিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। নগেন সকলকে উঠাইয়া দিয়া বিদায় লইল।

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—"কাল চলিয়া যাইও।" গাড়ী চলিতে লাগিল। পারুল—রুমাল উড়াইয়া, ঘুরাইয়া নগেনকে বিদায় দিল, নগেনও রুমাল ঘুরাইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিল। বাসায় আসিবার পথেই নগেন, তাহার শরীরে এমন উৎকট বেদনা অনুভব করিতে লাগিল যে ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিবারও তাহার তর সহিল না। সে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এক বিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিনেই পীরপুরের সম্যক অবস্থা শৈলেন মন দর্পণে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সমস্যা সমাধান তাহার নিকট বিশেষ জটিল বলিয়া বোধ হইল না। খুব সহজ বলিয়াও মনে হইল না। পারিবারিক সমস্যা স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিলেই মীমাংসা হয়। সামাজিক সমস্যায় আত্মত্যাগ চাই। একটী নিজের স্বার্থকে পরিত্যাগ করা, আর একটী নিজেকেই তার জন্য দেওয়া।

সমাজ সমস্যা মীমাংসার জন্য শক্তিমান পুরুষের দরকার। যার ধনের গৌরবে, মানের গৌরবে, বিদ্যার গৌরবে বুদ্ধির গৌরবে—এক কথায় যার ব্যক্তিত্বের গৌরবে সমাজ উজ্জল, এমন লোক চাই। এমন লোক হওয়া কি সহজ? সুতরাং সামাজিক সমস্যা সমাধান করা যাহার তাহার পক্ষে সহজ নয়।

যাই হউক শৈলেন সুশীল বিভাভূষণকে খবর দিয়া আনাইল।

ইতোমধ্যে একদিন সে তারাপদ সান্তালের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ভদ্রলোক তাহার নিকট মনের কষ্ট বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

শৈলেন বলিল- "মহাশয় মোকদ্দমা টা ছাড়িয়া দিয়া ভাল করেন নাই। ঐ টা দ্বারাই সমাজের লোক চিনা যাইত।"

তারাপদ বলিলেন—"ও কথাই বাবা আমার নিকট তুলিও না, মনে বড় কষ্ট পাই। ও মোকদ্দমা রাখিলে শত্রুদল আমার কুৎসা রটনা করিয়া আমাকে দেশ হইতে তাড়াইত। অথচ সাক্ষী হীন মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইত।"

ইহার পর শৈলেন আর সে সম্বন্ধে কোন কথা তুলে নাই।

শাস্ত্রী বিভাভূষণ আসিলে তাঁহাকে লইয়া শৈলেন পুনরায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সমাজ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে লাগিল। বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিয়া, বিনা সুদে টাকা দাদন করিয়া, দুঃখে কষ্টে সহানুভূতি জানাইয়া, গ্রামের জলা-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, বিনা পয়সায় ফটো তুলিয়া শৈলেন অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি, স্নেহ ও প্রীতির পাত্র হইয়া উঠিল।

ইতোমধ্যে তাহারা একদিন হিতসাধিনীর অধিবেশনও করিয়াছিল। তাহাতে তারাচরণ ও তাঁহার কতিপয় নগণ্য লোক ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত হইয়া সমস্যা সমাধানের অনুকূলেই মত প্রদান করিয়াছিলেন।

শৈলেন যখন সমাজ মীমাংসার পথে খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, সেই সময় তাহাদের প্রিন্সিপ্যালের এক টেলিগ্রাম পাইয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হয়।

বাড়ী ছাড়িবার পূর্বদিন তাহার বৌদি তাহাকে ধরিয়া বসিল। বৌদি বলিল—"আপনিতো যাইতেছেন, আমাকে কি জবাব দিয়া যাইবেন?"

শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল—"এ কোন অভিনয় আবার?"

বৌদি—"এখনতো সংসার করিবার সময় আসিয়াছে—"

শৈলেন "সময় আসিলে সংসার পাতাই যদি জগতের বিধি হয় তবেতো পাতিতেই হইবে।"

বৌদি—"তবে তাহার উদ্যোগ করিব, জানিবেন।"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"সময় আসিবার সূচনায় চাঁদ উঠিবে, জ্যোৎস্না ফুটিবে, মলয় ছুটিবে, মাধবী আহাকার করিবে, কোকিল কুহু ডাকিবে—তবেতো সময় আসিবে।"

বউ দি—"আজ যে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী. চাঁদও উঠে, জোছনাও ফোটে. মলয় ছুটিয়া অনেক দূর গিয়াছে,—কোকিলও ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—আর আমরা মাধবীর দল—আহাকার করিতেছি—তবে সম্মতি?"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"তোমাদের দ্বাদশীর চাঁদ, শারদীয় জোছনা, তোমাদের মলয়, তোমাদের কোকিল, আমার প্রাণেতো আর বান ডাকাইতে পারিবে না। ও তোমাদের জড়জগতের কথা নয়, মনোজগতের কথা।

বৌদি! ও বনমাঝে নয়—মনমাঝে, সাজ সরঞ্জাম লইয়া প্রকাশ হওয়া চাই, যাক ওসব সময়ে হবে। এবার তো যাই।"

বৌদি দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"না ঠাকুর পো, ও হইবেনা—আমার মাথা খাও, আমাকে সম্মতি দিয়া যাইতে হইবে। ঠাকুর পাত্রি দেখিতেছেন—"

শৈলেন গম্ভীর ভাবে বলিল—"তবে আরো কিছুদিন অপেক্ষা কর বৌদি। বিবাহ করিলে যদি সমাজের বিশেষ কোন কল্যাণ হয়, তবে অবশ্যই করিব—তখন আমিই তোমাকে বলিব—তোমাকে আমার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না।"

বৌদি বলিল—"আমি আপনার কথা বুঝিলাম না। আমাকে বুঝাইয়া বলুন।"

শৈলেন—"সময়ে আপনি বুঝিবেন। ও তত্ত্ব কেউ কাহাকে বুঝাইয়া দেয় না।"

বৌদি হাসিয়া বলিলেন—"তবে কি? মেম সাহেব আনিবেন?"

"আমি হিন্দু, অদৃষ্ট বিশ্বাসী হিন্দু; ভগবান প্রজাপতি যাহা ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাই করিব। 'করিব' বলিতে পারি না—তাহাই হইবে।"

বৌদি—"মাকে কি বলিব? তিনিতো উত্তর চাহিবেন।"

শৈলেন—"তাঁহাদের মনে কষ্ট দিও না; তাঁহাদিগকে যথারীতি কথা বার্ত্তা চালাইতে বলিও। পরীক্ষায় পাস হই, ফেল হই, আর পড়িব না—দেশের জন্য খাটিব ইচ্ছা করিয়াছি। দেশ ও সমাজের হিতের জন্য উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারি; বিবাহ তাহারই মধ্যে একটী। বাঙ্গালীর অর্থ নৈতিক অবস্থা শোচনীয়, সমাজের অবস্থা ততোধিক—বিবাহ তাহা সমাধানের একটী প্রধান বিষয়। কেবল ভোগের জন্য বিবাহ—এই জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া দিতেছে। সুতরাং একটু চিন্তা করিয়া বিবাহ করিব। বিবাহ ব্যাপারে পিতামাতা অপেক্ষা যে বিবাহ করিবে তাহার চিন্তা বেশী করাই বর্ত্তমান যুগে উচিত। প্রাচীন সত্য যুগ নাই—সে যুগের দীর্ঘ পরমায়ুও নাই। এখন পিতা বাইট বৎসর বয়সে পুত্রের বিবাহ করাইয়াই গতায়ু হন—পুত্রকে—তারপর বিশাল পরিবার লইয়া হাবুডুবু খাইতে হয়। অবশ্য আমাদের যদিও সে অবস্থা নয়। আমি জাতির কল্যাণের হিসাবে বলিতেছি। আজ এই পর্য্যন্ত।"

পরদিন শৈলেন কলিকাতা চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতে ৮টায় মহেশ ভট্টাচার্য্য আসিয়া দেখিল ঘরের দরজা উন্মুক্ত,—নগেন্ ঘুমাইতেছে; সে প্রথমে দুই তিনটা ডাক দিয়া ক্ষান্ত হইয়া ছিল, এইবার শরীরে ঝুঁকিদিয়া তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিল। শরীরে ধরিয়া সে দেখিল শরীর আগুনের মত গরম মহেশ বুঝিল, প্রবল জ্বরের তাড়নায় নগেনের চেতনা শক্তি লুপ্ত হইয়াছে।

মহেশ কর্ত্তব্য স্থির করিল; তারপর দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটেই মহেশের পরিচিত এক ডাক্তারের ডিস্পেন্সেরী ছিল; সেখান হইতে সে যাইয়া ডাক্তার বাবুকে লইয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিলেন—তখনও নগেন সংজ্ঞাহীন। রোগীর দেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—"প্লেগ।"

মহেশ ভীত হইয়া বলিল—"উপায়?"

ডাক্তার—"সহরের পশ্চিমে প্লেগের খুব আক্রমণ আছে, গঙ্গার পাড়ে ছিল না—রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর।" বলিয়া ডাক্তার বাহির হইয়া গেলেন।

মহেশ নিরুপায় হইয়া বাঙ্গালীটোলার বাড়ীতে দুর্গাদাস বাবুর মাতাকে একটা তত্ত্বদিয়া ও লোকজনের অভাব জানাইয়া একেবারে ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

ব্রহ্মচারী অবস্থা শুনিয়া বলিলেন—"যুবক একা আছে, তাহা হইলে যে লোকের প্রয়োজন; খাটিতে পারে এমন লোকের প্রয়োজন।"

মহেশ বলিল—"প্লেগের রোগীর পরিচর্য্যা করিতে লোকের ভয় বিস্তর,—লোক পাওয়া যাইবে না—উপায় নাই—।"

ব্রহ্মচারী—সাহস দিয়া বলিলেন—"ভয় নাই।" জন সেবায়—নারায়ণের সেবায় বিপদ নাই—সে বিপদ আমার লইয়া আইস—আমার মা দুঃখিনীকেই; চল আমিই যাইতেছি।" বলিয়া ব্রহ্মচারী তাঁহার পেটিকাটী বাম হস্তে ও বৃহৎ যষ্টিটী দক্ষিণ হস্তে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

মহেশ গাড়ী লইয়া গিয়াছিল। গাড়ী চলিল। তাঁহারা অল্প দূর হাঁটীয়া গিয়া একটী ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারে দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারী ডাকিলেন—"মা। মা দুখিনী।"

ডাক শুনিয়া একটী মলিন বসনা কিশোরী আসিয়া বাহির হইল। ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আইস মা তোমার গামছা কাপড় লইয়া আইস, আর এখানে আসিতে পারিবে না; এই গাড়ীতে উঠ।"

কিশোরী যথা সম্ভব সত্বর তাহার ক্ষুদ্র সম্পত্তি আগুলিয়া লইয়া আসিয়া বাবার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"গাড়ীতে উঠ; তোমরা গাড়ীতে যাও, আমি আসিতেছি।"

মহেশ দুখিনীকে লইয়া গাড়ীতে চলিয়া গেল।

কাশীর অলি গলি ঘুরিয়া গাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ব্রহ্মচারী একজন ডাক্তার লইয়া আসিয়া নগেনের নিকট পঁহুছিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন—একটী বৃদ্ধা

স্ত্রীলোক নগেনের মাথায় ধরিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন—আর উপায় হীনের মত চারিদিকে ফেল ফেল করিয়া চাহিতেছেন।

বৃদ্ধা ব্রহ্মচারী বাবাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"বাবা আসিয়াছ, এখন তুমি দেখ, এ অনাথ বালক—বাঁচেনা বুঝি—একেবারেই জ্ঞান নাই। উপায় কি হইবে বাবা ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "কোন চিন্তা নাই, এই আমি দেখিতেছি।"

এই সময় দুঃখিনীকে লইয়া মহেশ ভট্টাচার্য্যও আসিয়া উপস্থিত হইল।

ব্রহ্মচারীর নির্দ্দেশ মতে মহেশ গরম জল করিয়া আনিলেন। ব্রহ্মচারী অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা শরীরের রক্ত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার তাহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। দুঃখিনী রোগীর মাথায় নেকড়া ভিজাইয়া জল সেক দিতে লাগিল,—বৃদ্ধা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী রক্ত পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারকে বলিলেন "আপনি রোগীর নাড়ীর প্রতি লক্ষ্য রাখুন, আর টেম্পারেচার দেখুন, আমি ইহার শরীরের দূষিত রক্ত টা ফেলিয়া দিতেছি। অনেকটা ফেলিতে হইবে।"

ক্ষিপ্র হস্তে ব্রহ্মচারী রোগীর দক্ষিণ বাহুতে যন্ত্র বসাইয়া যন্ত্রের মুখে রবারের লম্বা নল পুরাইয়া দিলেন—তীব্রবেগে শরীরের দূষিত কাল রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তারপর যন্ত্র তুলিয়া লইয়া শরীরের সন্ধি স্থান সমূহে সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিলেন। শরীরের স্থানে স্থানে প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া দিলেন ও ক্ষত স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন।

কার্য্য শেষ করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আর কোন ভয় নাই। এখন জ্বর আপনা হইতেই যাইবে ; না গেলে, বিকালে তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে। পথ্য—বেদানার রস দুধ, সাবু। বেদানা প্রচুর চাই। অনেক রক্ত বাহির হইয়া গিয়াছে।"

ডাক্তার বিদায় হইলেন।

ব্রহ্মচারী যাইবার সময় বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনার সঙ্গে আমার মা দুঃখিনী কে রাখি-বেন ; যতদিন রোগীর চলিবার শক্তি না হইবে, ততদিন মা আমার আপনার নির্দ্দেশ মত রোগীর পরিচর্য্যা করিবে। তার পর আমি তাহাকে লইয়া যাইব। আমি প্রয়োজন মত আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইব। প্রলেপ গুলিই শরীরের রক্ত নির্দ্দোষ রাখিবে। রোগীর সহিত কথা বলিবেন না।"

ব্রহ্মচারী চলিয়া গেল। মহেশও তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। প্লেগের নাম শুনিয়া মহেশ ভয় পাইয়াছিল, তাই সে দশাশ্বমেধ ঘাটে শরীর প্রক্ষালণ করিয়া জুতা জামা ধুইয়া বাসায় গেল।

দুর্গাদাস বাবুর মা ঠাকুর চাকর লইয়া সে বাড়ী হইতে এ বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। সে বাড়ীর তালা বন্ধ রহিল।

শেষ বেলায় নগেন চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দুঃখিনী ঝিনুক দিয়া তাহার মুখে বেদানার রস তুলিয়া দিল। সে এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। স্বপ্নের ঘোরে সে যেন দেখিতে পাইল—কৈশোর যৌবনের দুকূলে পা রাখিয়া এক খানা সুষমাময় মোহিনী মূর্ত্তি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ব্যবচ্ছেদ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার মুখে তৃপ্তির অমৃত তুলিয়া দিতেছে। তখন সৌন্দর্য্য সমালোচনার শক্তি থাকিলে নগেন নিশ্চয় মনে মনে বুঝিত—পারুলের সৌন্দর্য্য ইহার তুলনায় কোথায় লাগে ?

বিপর্য্যয়ে—

১

আঁধিয়ার রজনীর যাত্রীরা সব !
চৌপ'র রাতভর কেন কলরব !
পূরব গগণে হের উষার আভাস,
এইবার হাড়ে ঠিক লাগছে বাতাস।
চোখ ডলে আঁখি মেলে চাও একবার,
মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নাই আর।
ভালো আজ অতীতের বেদনা বিষাদ,
ছেড়ে ফ্যালো জীবনের সব অবসাদ।
সকল কাজের সেরা ত্যাগো এই কালে,
কেমনে টিকিবে পাব দুনিয়ার হালে।

২

মাথার উপরে হোক্ মেঘ-গর্জ্জন,
ঘন ঘোর বজ্রের হোক্ বর্ষণ।
ঝর্ ঝর্ ঝম্-ঝম্ বৃষ্টির জল,
নষ্ট হউক্ শত সৃষ্টির ফল।
ভেঙে চুরে আসে যদি প্রলয়ের ঝড়,
কন্‌কনে শীতে দেহ কাঁপে থর্‌থর্!
চলিতে হইবে তবু দুর্গম পথ,
পাবে না পাবে না পথে পুষ্পক রথ।
দুঃখে ফেলিছ কেন গাঢ় নিশ্বাস!
নামিয়া আসুক্ প্রাণে মহা বিশ্বাস!

৩

ক্যালো না হাজার কেন নয়নের বারি,
কেউতো র'বে না কাছে দিন দুই চারি!
মাথা কুটে ছাতি পিটে মর নিশিদিন,
মুখভার ক'রে থাক বিষাদ মলিন,
ডেকে কেউ শুধাবে না করি' সমাদর,
হাত দুটি বুলাবে না মাথার উপর!
পাবে না পাবে না কারো স্নেহ অনুরাগ,
সুখের পায়রা সবে, চায় সুখ-ভাগ।
ভয় কেন পাস্ তুই ওরে প্রাণবান্!
নির্ভয়ে লও যেচে দুঃখের দান!

৪

ভাখনা চলিছে সবে চলার নেশায়,
দুখ শোক বুকে চেপে তালে তালে যায়!
কেহতো বসিয়া নাই, চলিছে কেবল,
তুই কেন ব'সে র'বি বদ্ধ পাগল!
ফুল ফোটে, ফল ধরে, পাখী গান গায়,
নদীজল কলকল্ চলিছে হেলায়।
পশুপাখী তরুলতা নিশিদিন চলে,
চলিতেছে সকলেই প্রাণপণ বলে।
চলিবার লক্ষ্য শুধু আপন বিকাশ,
ছুটে ভাঙা গড়ে' গড়া চলে বারমাস।

৫

তোমাদেরো যারে আছে চলিবার বেগ,
সেদিন-ই বুঝিবে যবে কেটে যাবে মেঘ।
এক আশা এক ভাষা এক পিপাসায়,
দিনরাত ছুটে চল ঘন তমসায়!
মানুষ হইতে চাও, ছাড়' লোক-লাজ!
বাম হাতে চোখ মোছ', ডান হাতে কাজ।
ব'সে ব'সে কেন শুধু কর ঘ্যান্ ঘ্যান্!
প্রাণ পাওয়া জীবনের হোক্ মহা ধ্যান্!
সময় থাকিতে আজ কর প্রাণপণ!
চলার নেশায় মাতো, ছুটুক্ জীবন!

৬

জাগিয়াছে মাড়োয়ারী পার্শী প্রাচীন
সাঁওতালি বুনো গারো কাফ্রি মলিন।
তুমি কেন ব'সে ভাবো শিরে দিয়ে হাত!
দুই বেলা নাহি জোটে দুই মুঠা ভাত!
যে জাতি আনিল আগে জ্ঞানের আলোক
হাহাকার করে তার কোটি কোটি লোক!
পেটে নাই শুধু ভাত, পরার কাপড়,
লাখ্ লাখ্ মরিতেছে ক্ষুধায় কাতর!
মরিয়া উজাড় হলো, ভারত শ্মশান,
ঈশান বাজান্ তাই আপন বিষাণ!

৭

ক্ষুধায় বামুন করে পাদুকা সেলাই,
চণ্ডী করিছে পাঠ মেথর কসাই!
নাপিত ধরিল হাল ছেড়ে ক্ষুর কাঁচি,
চাষা বলে "দুত্তোর্, বাবু হোলে বাঁচি!"
কামার কুমার ছেড়ে নিজ নিজ বাড়ী,
সহরে হয়েছে সবে, একি কাড়াকাড়ি!
ওলট পালট—তবু চাই কিছু চাই,
কাজের রাজ্যে আর জাতিভেদ নাই!
জগৎ জুড়িয়া চলে সাগর-মথন!
ভারত বাসীরা করে গরল-গ্রহণ!!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ।

দিন অবসান প্রায়। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হাটবাটের সব কলরব নিঃস্তব্ধ হইয়া গিয়া একটী অন্ধকারপূর্ণ মৌন প্রশান্তি চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যার এই "মহানীরব" "সৌম্যগম্ভীর" মুহূর্ত্তে শুচিশুভ্র-মানস ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধন্য হইবার নিমিত্ত আমরা জোড়াসাঁকো রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলাম। বেহারা গিয়া তাঁহাকে খবর দিল যে আমরা আসিয়াছি। অনতিবিলম্বে দেখিতে পাইলাম—শুভ্রবসনপরিহিত সুশুভ্রশ্মশ্রুশোভিত ঈষৎলম্বিত কেশ-শোভিত একটী দিব্যজ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমাদের পুরোভাগে আবির্ভূত। চিনিলাম—ইনিই রবীন্দ্রনাথ! আমরা অবনতমস্তকে শ্রদ্ধাপুত একটী প্রণাম—ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ের একটী পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন তাঁহার চরণে জ্ঞাপন করিলাম; তিনিও স্নেহাশীষ বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন। অতঃপর তিনি একটী কেদারায় উপবেশন করিলেন, আমরাও তাঁহারি আদেশক্রমে অপর দুইটী চেয়ারে বসিলাম। এরপর বর্ত্তমান লেখকের সহিত কবিসম্রাটের যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার ভাষা যথাসাধ্য বজায় রাখিয়া নিম্নে বিবৃত হইল:—

লেখক:—আপনি শীঘ্রই বিলেত যাচ্চেন্ শুনে, আমরা আপনার কাছে এলাম—সুদীর্ঘ কালের ভিতরে আর ত দেখা হবে না।

রবীন্দ্রনাথ:—হ্যাঁ এবার দীর্ঘকালের জন্যই যাচ্চি—প্রথমটি য়ুরোপ যাচ্চি; সেখান থেকে আমেরিকা ও জাপানে যেতে হবে। পৌষমাসের পূর্ব্বে ফিরতে পারব না। দুটো বই নতুন বের হয়েচে—সে দুটো জনসাধারণের ভিতরে যাতে প্রচারিত হয়, সেজন্যে আমার উপস্থিতি প্রয়োজনীয়—এ ছাড়া সে-সকল দেশ হতে আমাকে তারা নিমন্ত্রণ করেচে—সে জন্যেও যাচ্চি। আচ্ছা! বিলেত যাত্রাটা তোমার কাছে কিরূপ মনে হয়?

লেখক:—আমার স্বাধীন মত জিজ্ঞাসা করচেন কি?

রবীন্দ্রনাথ—হ্যাঁ, তাই করচি।

লেখক:—য়ুরোপের সঙ্গে আত্মীয়তা না করে এখন আর উপায় কৈ? পশ্চিম একেবারে হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ে মোড়ে এসে পড়েচে। তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌বে কে? আমাদিগকে তাদের সহিত মিলিত হতেই হবে। নচেৎ আমাদের জীবন রক্ষা করাও দায় হয়ে উঠ্‌বে। আর এক কথা এই যে প্রত্যেক জাতিই শৈশব অবস্থায় নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্য থেকে উন্নত হয়ে পরিপুষ্ট হয়ে বিশিষ্ট একটী জাতীয়ত্বকে সৃষ্টি করে থাকে, তখন বাহিরের সঙ্গে সংঘাত লাগা বাঞ্ছনীয় নয়—ছোট চারাগাছকে যেমন একটী পরিবেষ্টনের ভিতরে বাড়তে দিতে হয়, তেম্‌নি প্রত্যেক জাতিকেও সেইরূপ বাড়তে দিতে হয়—তার একটী বিশিষ্টতা যতদিন না হয়। তারপর একদিন আসে যে দিন সেই বিশিষ্টতা সার্থকতা লাভ করে—সে দিন স্বাতন্ত্রের দিন নয়—মিলনের দিন, অহঙ্কারের দিন নয়, প্রেমের দিন—বর্জ্জনের দিন নয়, গ্রহণের দিন, ঐক্যের দিন—সেই দিন প্রত্যেক জাতি আপনার সমস্ত জ্ঞানকে প্রেমকে কর্ম্মকে বিশ্বমানবের সামগ্রী করে তোলে—সেই দিন প্রত্যেক জাতি পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্মিলনে আপন মহিমাকে মহোজ্জ্বল করে তোলে—আমার বিশ্বাস আজ সেই দিনই এসেচে। এখন যদি স্বতন্ত্র হয়ে থাকি তবে সেটা শুধু যে অসুবিধাকর তা নয়, সেটা অধর্ম্ম।

রবীন্দ্রনাথ—আমরা যদি কূপমণ্ডূকের মত নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকুতে বসে থাকি, তবে আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধির বিকাশ হবে কোথা থেকে। বাহিরে একবার বেরোও দেখ্‌বে সর্ব্বত্রই কত প্রকার সাধনা-তপস্যা চল্‌চে কেউ স্থির হয়ে নেই—সর্ব্বত্রই মুক্তির জন্য অক্লান্ত প্রয়াস।

লেখক:—আর বাহিরের সঙ্গে যাচাই করে না দেখ্‌লে আপ্‌নাকেও সত্য দৃষ্টিতে দেখা যায় না—তখন আপ্‌নাকে এত একান্ত করে দেখা হয় যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এমনসময় এণ্ড্রুজ সাহেব রবীন্দ্রনাথের একখানি ইংরাজি কাব্যগ্রন্থ হাতে লইয়া সেই প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন—তাঁর পরিধানে একটী সাদাসিদে বসন, অঙ্গে বিলম্বিত একটী লম্বা পাঞ্জাবী। সেই গ্রন্থ হইতে দুয়েকটী কবিতার তাৎপর্য্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন--বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত প্রাণহিল্লোল কি অপরূপ ভঙ্গীতে কবির মানসনয়নে প্রতিভাত হইয়া তাঁহার চিত্তটীকে নিগূঢ়-রস-সঞ্চার-বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে বুঝাইয়া দিলেন—তাঁহার কাব্য নিচয়ের সরল অর্থ লোকেরা উপলব্ধি করিতে না গিয়া কিরূপে সেগুলোকে কোন জটিল তত্ত্বের রূপক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া বিপদে পড়ে—তাহারাই বলে যে তাঁহার কবিতার অর্থ বোঝা যায় না—অথচ সরল অর্থ জল্ জল্ করিতেছে। প্রায় বিশ মিনিট কাল উভয়ের কথোপকথন চলিল—তারপর এণ্ড্রুজ্ সাহেব চলিয়া গেলে আবার আমাদের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা এণ্ড্রুজ সাহেবের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইনি এরূপ বাঙালী কাপড় পরিধান করেই সকল সময় যাপন করেন?

রবীন্দ্রনাথ,—ইঁহার কিছু নাই। এতবড় বিদ্বান্ অথচ ইঁহার এত দৈন্য। আলিগড় কলেজে এঁকে প্রিন্সিপাল স্বরূপে যেতে বলেছিল, সেখানে থাকলে প্রচুর অর্থ পেতেন—কিন্তু তিনি যাননি। ইনি আমার শান্তিনিকেতন ইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে composition শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইনিই ত তপস্বী। এত বড় ত্যাগী কয়জন আছে? সর্ব্বভূতের ভিতরে ইনি একটী চিন্ময় সত্তাকে উপলব্ধি করচেন্ বলেই তাদের কল্যাণের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন ইনি। তাই সুদূর ভারতবর্ষের দীন বালকদের সঙ্গে অবাধিত মিশ্রণে এঁর হৃদয়ে অহৈতুকী প্রীতির আবির্ভাব হয়ে থাকে। তাঁদের মঙ্গলেই তিনি আপনাকে উৎসৃষ্ট করচেন্। আমি নিজের সম্বন্ধে এত বড় আত্মত্যাগের কল্পনাও করতে পারি না—এই খানেই ইনি আমার চেয়ে অধিক মুক্ত।

সে দিন মাদ্রাজে কুলিরা ধর্ম্মঘট করেছিল, ইনি [illegible] তাদিগকে সাহায্য করতে ছুটে গেলেন—কি [illegible] ছিল তাঁর সেখানে যাবার? তবু ত গেলেন—এই ত [illegible]।

লেখক:—আত্মোৎসর্জ্জনই ত মানুষের সাধনা—কেউ করচে কাব্যে, কেউ বা কর্ম্মে, কেউ শিল্পে, [illegible] সঙ্গীতে—তপস্যা একই। এই এণ্ড্রুজ সাহেব [illegible] ভিতরে আপনাকে মুক্ত করে দিয়েচেন—তেমনি আপনি [illegible] কাব্যে আপনার আনন্দময়ী পরম শক্তিটাকে উৎসৃষ্ট [illegible] কর্‌তে চলেচেন্।

রবীন্দ্রনাথ:—সে পার্থক্য হচ্চে প্রকৃতিগত, রুচিগত [illegible] যায় যা temperament,

লেখক:—আমার বিস্ময় বোধ হয়, আপনি এত বড় একটী শক্তি—একটী সম্পদ্ আপনার সাহিত্যে কাব্যে ও প্রবন্ধে প্রকাশিত করচেন্, অথচ তা কেহ বুঝ্‌লে না, অন্ততঃ বাংলা দেশ বুঝ্‌ল না।

রবীন্দ্রনাথ:—তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই।

লেখক:—আমাদের কিন্তু প্রধান দুঃখই এই। পশ্চিম আপনাকে যা-হোক্ কথঞ্চিৎ বুঝেচে, আমরা আপনার ঘরের লোক হয়ে আপনাকে বুঝলাম না। এর চেয়ে ক্ষোভের কারণ কি আর হতে পারে! এই সেদিন গিরিজাশঙ্কর বাবুর ফাল্গুনীর একখানা সমালোচনা পড়্‌লাম। দেখ্‌লাম ভদ্রলোক ঐ নাটকটার কোনো কিছুই বোঝেন-নাই, খামখা কতকগুলো মিথ্যাবাদ প্রচার করেচেন। আমার পড়ে হাসি এল—"ভালো মানুষ নই গো মোরা ভালোমানুষ নই" এই কথাটার যে কি তাৎপর্য্য তাও বোঝেন নি। তারপর বুদ্ধি এত ক্ষুরধার যে "অন্ধ বাউল" যে কেন এলো, সেটার পর্য্যন্ত মর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে পারেন নি! তলিয়ে না পড়ে, না বুঝে, অনর্থক কতকগুলো গাল দেবার জন্যেই সমালোচনায় লেগে গেচেন!

রবীন্দ্রনাথ:—বহুপূর্ব্বের থেকেই আমার লেখা পড়ে কতলোক এরূপ কত সমালোচনা করেচে। আমি তাতে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত নই।—এ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

লেখক:—বড় বড় লোকদের কাছে শুনেচি তাঁরা বলেন, যে আপনি বড় Destructive, Constructive genius আপনার নেই। আমার মনে হয় কিন্তু ঠিক্ এর বিপরীত। গড়চেনই ত আপনি—ভেঙ্গেচেন টুক্। তবে যা ধ্বংস করেচেন্ তা সৃষ্টিরই পূর্ব্ব আয়োজন

[illegible] জন্যেই ব্যস্ত হন নি—গড়ে, তবে ছেড়েছেন্—[illegible] করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন্, পাপকে [illegible] পুণ্যের জয় পতাকা উড্ডীন করেছেন, বহ-[illegible] অধর্ম্মের অচলায়তনকে বিদীর্ণ করেছেন্. [illegible] করেছেন কি ব্যস্ত হয়েছেন্,—এত আপ্‌নারি [illegible] "কারাগার যা ছিল, সেত আমি ভেঙে ফেলেচি, [illegible] উপকরণ দিয়ে সেই খানেই তোমাকে মন্দির [illegible] তুলতে হবে"। "নূতন সৌধের সাদা ভিত্‌কে [illegible] আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও"। [illegible] যা গড়েছেন্ তার মহিমা চিরদিন অক্ষয় হয়ে [illegible]। আমাদের জাতীয়-জীবনে আপনি যে [illegible] উদ্বোধন কর্‌লেন, এর গরিমা একদিন [illegible] হয়ে উঠ্‌বেই! এই উদ্বোধন সত্যের উদ্বোধন, [illegible] উদ্বোধন। এই উদ্বোধন বাণী আজ দিগ্-[illegible] ধ্বনিত কর্‌ছে—যুগযুগান্তের জন্য এ অমর হয়ে [illegible]—এই উদ্বোধন-মন্ত্রের ঋষি হচ্ছেন্ আপনি—আমরা [illegible] শিষ্যের মত একে অনুসরণ করে চল্‌ব!

রবীন্দ্রনাথ :—দেখ! প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে [illegible] একটা message আছে। সেই message প্রচার [illegible] ভার আছে তার 'পরে। সেই message চির-[illegible] কিন্তু তার আকারটা হচ্চে অভিনব। মনুষ্যত্বের [illegible] যেখানে রয়েচে, সেই খানেই সেই চিরনবীন, [illegible] message আর গোপন থাকে নাই! [illegible] একটা message ছিল, সেটা আমি প্রচার [illegible]—কিন্তু অহরহ মিথ্যার অন্ধকারে যাদের দৃষ্টি [illegible] হয়ে আছে তারা সত্যের আলোক দেখ্‌লে সহসা [illegible] ওঠে—তাদের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক নয়—তারা [illegible] একি গোলমাল! আমাকেও তারা তাই ভেবেচে, [illegible] আমি কি সত্য-প্রচার কর্‌ব না? অবশ্যই কর্‌ব। [illegible] লোক এখন বুঝ্‌চেনা, একদিন না একদিন [illegible] হবেই তাদের!

লেখক :—দেশের লোক আপনার সম্বন্ধে কতদূর [illegible]—তারা বলে আপনি আচার-নিয়ম মানেন না, [illegible]!

রবীন্দ্রনাথ :—দেখ! আধুনিক হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের অনুপ্রাণনা কোথাও জাগেনি—কোথাও কোনো প্রকৃত সাধক নেই—সেই জন্যেই দেশের লোকেরা কতকগুলো আচার-নিয়ম পালন করেই ভাবে যে সব হয়ে গেল; আর অন্যত্র সহস্রবিধ পাপে লিপ্ত হতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ভাবে তারা, যে, আচার নিয়ম জিনিষটাই একটা মস্ত লাভ; এই ভেবে তারা পুণ্যকে সস্তা করে নিয়েচে—বিশেষ বিশেষ কতকগুলা অনুষ্ঠান ঠিক্ রাখ্‌লেই হ'ল; তারপর জাল জুয়োচুরি যাই কর না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।—তাই দেখা গেচে, কত উকিল কত দারোগা দীন দরিদ্রকে নিষ্পেষিত করে অর্থ লুণ্ঠন কর্ত্তে দ্বিধা বোধ করে না—অথচ তারাও আচার-নিয়মগুলোকে হুবহু বজায় রাখ্‌চে!

এরমানে আর কিছু নয়—অন্তরে অন্তরে যে অপরিসীম রিক্ততা এসে পড়েচে সেইটেকেই কতকগুলো বাহ্য জিনিষ দিয়ে ভরাট্ করে দিতে চাচ্চে। কিন্তু বাহিরকে হাজারই চক্‌চকে করো না কেন, ভিতরে যদি পদার্থ না থাকে তবে তা সম্পূর্ণ নিরর্থক ত বটেই বরং একটা দারুণ বন্ধন। যাদের মুক্তির দিকে কিছু-মাত্র আগ্রহ নেই—তাদের পক্ষে এই-সব আচার-অনুষ্ঠান কেবলই বন্ধন। প্রকৃত ধার্ম্মিক যদি কেউ আবির্ভূত হন, তা হলে অবশ্য এগুলির সার্থকতা হয়ত থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমি কর্‌চি দালালীগিরি, আমার ওটা কতক মন্ত্র আওড়ালে আর কতকগুলো জলের ধারায় স্নান কর্‌লে কি হবে?

লেখক :—দালালীগিরি আর দারোগাগিরিই ত মানুষের চরম লক্ষ্য নয়—তার লক্ষ্যই হচ্চে মুক্তি! কিন্তু মুক্তিকে লাভকর্ত্তে হলে তো কর্ম্মের মধ্যদিয়ে নিয়ম অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে যেতে হবে!

রবীন্দ্রনাথ :—নিশ্চয়ই! কর্ম্মকে ও নিয়মকে বাদ্ দিয়ে যে মুক্তি সেত মুক্তিই নয়, সে আর কিছু। এই কথাই ত আমি বারবার বলেচি। নিয়ম বন্ধনের ভিতর দিয়েইত আনন্দ স্বরূপ আপনাকে মুক্তি দান কর্ত্তে কর্‌তে চলেচেন্।

নিয়মকে বাদ্ দিলে আবার একাল হবে কি করে? নিয়ম ত চাইই, তবে আমি এই কথা বলতে চাই, যে

যারা মুক্তিকে চায়না, ভোগকেই চায়, তারা নিয়ম পালন কর্‌চে কেন ? না, তারা মনে করেচে যে নিয়ম-পালন কর্‌লেই খুব একটা লাভ হল—ভুলে গিয়েচে যে নিয়ম—জিনিষটা মুক্তির বাহন মাত্র। অর্থাৎ সে নিয়মগুলো ততক্ষণই সার্থক যতক্ষণ তা আনন্দের মুক্তিকে প্রকাশ কর্‌চে, নচেৎ নিরর্থক। কিন্তু আমাদের দেশের লোক-দের এদিকে কোনো নজর নেই। তার ফলে হয়েচে কি, আচার নিয়ম মাত্রই একটা পুণ্যকর ব্যাপার হয়ে উঠেচে, তাতে কতকগুলো ভালো নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মন্দ নিয়মও আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেচে—তাতে অতি তুচ্ছ লোকাচার গুলোকেও চল্‌তে না দিয়ে অচল করে রাখা হয়েচে এবং ভুরিপরিমিত অসংযত উচ্ছৃঙ্খল প্রথা সমাজের মধ্যে ঢুকে পড়েচে !

প্রকৃত ধর্মপ্রাণ এদেশে জন্মে নাই, তাই এদেশে এসব চলেচে। প্রকৃত ধর্মের আবেগ যদি একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ত, তবে কি এসব কুনিয়ম দেশে থাকৃত। তবে কি আচার গুলোকে এ রকম অচল খোঁটার মত ব্যবহার করা হত, এবং তাতেই লোকেরা সন্তুষ্ট থাক্‌ত !

দেখ ! তোমার যদি টাকা পাবার জন্যে লালসা থাকে, তবে যে কেউ তোমাকে সেই অর্থ-লালসার চরিতার্থতার জন্যে কোনো পথ দেখিয়ে দেয়, তুমি নির্ব্বি-চারে তা কখনো মেনে নিতে পার্‌বেনা ; তুমি পরীক্ষা কর্‌বে সে পথ প্রকৃত পথ কি না ; তার পর তাকে অবলম্বন কর্‌বে—যদি তা না কর তো বোঝা যাবে তোমার অর্থের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ নেই। তেম্‌নি ধর্মকে লাভ কর্‌বার জন্যে প্রাণে যার পিপাসা জেগেচে তাকে ত কেউ ছুটো নিয়মের কথা বলে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না—সেত দেখ্‌বে, সে নিয়ম সত্য-নিয়ম কিনা—তাতে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে কিনা ; সেত কখনোই কলুর বলদের মত অন্ধ আচার গুলো মেনে চল্‌বেনা—সে বুদ্ধি খাটিয়ে বিচার করে দেখ্‌বে কোন্ আচার ধর্মের পক্ষে অনুকূল এবং কোনটা প্রতিকূল। সে যে [illegible] নিয়ম-পালন করুবে তা তোমার আমার খামখেয়ালি নিয়ম নয়—তা বিশ্বের অমোঘ নিয়ম, একের সুদৃঢ় নিয়ম —বিশ্বের সেই অখণ্ড নিয়মকে মানি না বলেই ত [illegible] প্রকার নিরর্থক আচারের বন্ধনে জর্জরিত হচ্চি—[illegible] নানাপ্রকার কৃত্রিম বীভৎস প্রথার পীড়নে পীড়িত [illegible] —মনুষ্যত্বকে বহুবিধ ভীরুতা ও মূঢ়তা দ্বারা খর্বীকৃত [illegible] ফেল্‌চি।

উপনিষদে আছে "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ [illegible] শাশ্বতীভ্যঃ" সমাভ্যঃ অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাযথ, [illegible] এলোমেলো নয়, এবং সে বিধান শাশ্বত কালের। [illegible] নিত্য কালের জন্য বিহিত—তা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন [illegible] খেয়াল নয়। সেই নিয়মকে না মেনে আপন [illegible] আর যাকেই মান্‌তে যাও তাতে বন্ধনটাকেই [illegible] কর্‌বে, মুক্তি থেকে আত্মাকে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত [illegible] বঞ্চিত করা হবে। এবং সেই বন্ধনটাই [illegible] আজ একাধিপত্য বিস্তার করেচে।

লেখক :—আপনাকে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল বলে [illegible] কর্‌চে--কিন্তু বস্তুতই তারাই উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত ; [illegible] তারা বিশ্ববিধাতাকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিশিষ্ট বিশিষ্ট কৃত্রিম প্রথাকে নিদারুণ ঔদ্ধত্যের [illegible] জাহির কর্‌চে।

রবীন্দ্রনাথ—এবং সেই জন্য তারা এত অহংকৃত [illegible] উঠেচে যে তারা বিশ্বের সবাইকে ছোট করে [illegible] নিজেরা সব চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌তে চায়।

লেখক :—আচ্ছা, এদেশে যে সব ধর্মসাধন [illegible] আছে—যেমন বিধবার নির্জ্জলা একাদশী [illegible] বোঝা যায়, যে সম্পূর্ণ নিরর্থক ও মুক্তির প্রতিকূল, [illegible] এগুলোকে নির্মমভাবে এদেশে প্রচলিত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ :—বিশেষতঃ বাংলা দেশে। [illegible] ভাবে যে নির্জ্জলা একাদশী কর্‌লেই পবিত্রতা [illegible] হ'ল—এদিকে বালবিধবাদের শিক্ষার কোনো [illegible] নেই—চোখের সাম্‌নে কত অসদ্দৃষ্টান্ত দেখ্‌চে—[illegible] তাদের মন কত কলুষে পরিপ্লুত হয়ে উঠ্‌চে—[illegible] কারু খেয়াল নেই—নির্জ্জলা একাদশীটি ঠিক [illegible] আছে ! আচ্ছা এই যে একাদশীর দিন [illegible] জল মুখে দিতে পাবে না এইটে কি পুণ্য না [illegible] এতে মন বিশুদ্ধ হয় না, তামসিক হয়ে ওঠে ? [illegible]

...কি কোনো অর্থ আছে—এতে কি সংযম শিক্ষা হয়। আর আর দেশে অল্প অল্প দুধ ঐ সব খেতে দেয়—কিন্তু এদেশে মরবার মুখে ঔষধ খাওয়ানোও নিষেধ, এবং এই নিষেধ না মান্‌লে সেটা হল পাপ! দেহের পবিত্রতার জন্যে অবশ্য পবিত্র আহার করা উচিত! তামসিক আহারের বদলে সাত্ত্বিক ভোজ্য গ্রহণ করা উচিত। নিরামিষ আহার এই জন্যেই কল্যাণপ্রদ। বিধবাদের নিরামিষ আহার করানোটা ভালই; কিন্তু একাদশীটা নিরর্থ পীড়ন—অথচ যে পীড়নে ... দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে না উঠে, তামসিক হয়ে যায়। ... নিয়ম শুচিতা পবিত্রতা এই কথাগুলো আমরা ... আওড়াচ্ছি অথচ এগুলোর আদর্শ যে কি, তা আমাদের মনে নাই। এই সেদিন হেমার গ্রেণ সাহেবের ... পর তাঁকে নিমতলায় দাহ করানো হ'ল। এরকম ... পবিত্র ব্যক্তি সুদুর্লভ। এতবড় মহাপ্রাণ খুব ... দেখা যায়; অথচ নিমতলায় তাঁর শবদাহ হল বলে ...বাসী' পত্রিকায় বের হল "হিন্দুধর্ম আজ রসাতলে ...!" আমি ত বলি নিমতলার চৌদ্দপুরুষের সৌভাগ্য ... বড় মহাত্মা-লোকের শব আজ—সেখানে দগ্ধ ...।

শুচিতা কাকে বলে? নিজেকে চতুর্দ্দিকের সংস্রব ... বাঁচিয়ে রাখ্‌লেই কি শুচি হওয়া যায়। বিশ্বের ... মানবকে দূরে দূরে রেখে নিজেকে স্বতন্ত্র করে ... কি-শুচি হওয়া যায়! মানুষ মানুষকে, শুধু মানুষ ... পবিত্রতম মানুষকে বিদেশী বলে ত্যাগ কর্‌বে এই ... শুচিতার চিহ্ন! এ যে ঘোর অশুচিতা, ঘোর পঙ্কি-...—এ তে অহঙ্কারই বাড়ে, আর—কিছু হয় না। ... আদর্শ কি? সে হচ্ছে আত্মসুখ কে বর্জ্জন ...—বিলাসিতা ও ভোগ্‌কে ত্যাগ করে আত্মাকে ... সমাহিত করে রাখা! সংযমের আদর্শ কি? সেত ... নয়। সে হচ্ছে চিত্তকে সর্ব্বক্ষোভ বিমুক্ত রাখা ... পাপপূর্ণ আন্দোলনগুলোকে দমিত করা—... বিক্ষোভগুলোকে প্রশমিত করা—কিন্তু এখন ... ও পবিত্রতার যে আদর্শ এদেশে প্রচলিত আছে ... চিরকাল মোল আনাই আছে! পবিত্র হতে হ'লে শুধু নিরামিষ হবিষ্য খেলেই চল্‌বে না—মনে মনে লোভকে কমাতে চাই। লুব্ধ অন্তঃকরণে নিরামিষ খেলেও তা পাপ। এখনকার হবিষ্য ব্রতধারী অনেক লোকই লোভের দাস।

লেখক:—আচ্ছা অমুক জাতির হাতে খেলেই অপবিত্র হ'ল, এ রকম যে একটা ধারণা সমাজে আছে সেটা কি ঠিক?

রবীন্দ্রনাথ:—কখনই নয়। পবিত্রভাবে পবিত্র সাত্ত্বিক আহার সাত্ত্বিক বিহার এ সমস্তই শুচিতার চিহ্ন। ব্রাহ্মণ যদি ময়লা হাতে ময়লা জল দেয়, তবে তা বর্জ্জনীয় এবং মুসলমান সন্তানও যদি পবিত্রভাবে বিশুদ্ধ জল দেয় তবে তা সানন্দে গ্রহণীয়। দেখ্‌তে হবে আহার যা কর্‌চ তা পবিত্র এবং বিশুদ্ধ কিনা—যে দিচ্ছে সে পরিষ্কার এবং পবিত্র কিনা এবং যা আহার কর্‌চ তাতে তোমার কিঞ্চিৎ পরিমাণেও লোভ আছে কিনা! এই তিনটের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌লেই শুচিতা রক্ষা করা যেতে পারে।

দেখ, এখনকার দিনের আচার নিয়ম সংযম ও শুচিতার আদর্শ দেখে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিচার কর্‌তে যেও না। তখন অগ্নি, জল, মাটি, অন্ন প্রভৃতির সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন কর্‌বার জন্যে প্রত্যহই নানা কর্ম্মে নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা স্মরণ করবার বিধি ছিল—তখন সমগ্র ভারতীয় জাতি জীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করে, মৎস্য মাংস আহার পরিত্যাগ করে, নিরামিষ আহার কর্‌ত। নদী সঙ্গমে, সমুদ্রতীরে, পর্ব্বত শিখরে, যেখানেই ভূমার বিশেষ বিশেষ প্রকাশ দেখা গেছে, সেখানেই ভারতের তপস্বীগণ তীর্থস্থান স্থাপন কর্‌তেন—মানুষ সেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত পূর্ণতম মিলনে সার্থক হতে পার্‌ত! কিন্তু এখনকার দিনে সে form গুলো আছে কিন্তু সেই spirit নেই। তাই সে সব আচারগুলো পুঁথিগত হয়ে গেছে—তাই সে সব সংযমের ও শুচিতার উদ্বোধনকারী নিয়মগুলোকে বিকৃত করে পালন করা হচ্ছে। এখনকার শাস্ত্রানুশাসন হচ্ছে যে অমুক তীর্থে অমুক জলের ধারায় অবগাহন কর্‌লেই চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হবে—এখন এতে মানুষ ...

জগতের সম্বন্ধরহিত আত্মার যোগ শিক্ষা কিছুই দেওয়া হচ্ছে না অথচ নিয়মটাকে কৃত্রিম উপায়ে চালানো হচ্ছে। গয়ায় দেখেছি স্ত্রীলোকেরা অজস্র স্বর্ণমুদ্রা পাণ্ডাদের পায়ে ঢেলে দিচ্ছে—যাদের না আছে বিদ্যা, না আছে চরিত্র; এতে যে একটা অন্ধনিষ্ঠা প্রচার করা হয়, তাতে বিচার বুদ্ধি নষ্ট হয়, এবং spiritual মুক্তির এটা একটা ঘোর বাধা।

লেখক:—মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে আপনার কি মত তা জানবার জন্তে আমাদের সবিশেষ কৌতূহল আছে।

রবীন্দ্রনাথ:—দেখ! এদেশে এখন যে ভাবে মূর্ত্তিপূজা করা হয়, তাতে মূর্ত্তিকেই চরম ও পরম উপাস্য ভাবে দেখা হয়—ও ভাবে মূর্ত্তিপূজা করার কোনো মানে নেই, কেন না উহাতে আত্মোপলব্ধির কিছুমাত্র সাহায্য করে না—বরং ক্ষতিই করে। কিন্তু মূর্ত্তিপূজাতে যদি মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে অমূর্ত্ত ব্রহ্মকে দেখবার সাধনা হয়, তবেই তাই সার্থক ও সুন্দর। এখনকার দিনের মূর্ত্তিপূজা নিতান্ত বীভৎস ভাবে আচরিত হয়, কিন্তু মূর্ত্তিপূজা জিনিষটা কখনো খারাপ নয়—এর খুব বড় একটা অর্থ আছে—এতে সাধনাকে সুসঙ্গত ও সুসম্পূর্ণ করেই তোলে—আমাদের দেশে মূর্ত্তিকে নিয়ে এক প্রকার ভক্তি বিলাসিতা সৃষ্টি করে বসে—নিজ নিজ হৃৎপ্রবৃত্তি গুলোর চরিতার্থতা কর্‌বার জন্যই যেন মূর্ত্তিপূজা—তাতে কত-রকম অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতা ও বীভৎসতা আছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ভাবকে রূপের ভিতর দিয়ে দেখ্‌বার জন্যে যদি কেউ মূর্ত্তিপূজা করেন তাহলে তাতে এ সমস্ত খামখেয়াল চল্‌তে পারে না; তাতে ধীরতা থাক্‌বে, সংযম থাক্‌বে, নিয়ম থাক্‌বে।

আমাদের ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনাই হচ্ছে রূপের ভিতর দিয়ে অরূপকে উপলব্ধি করা—অরূপকে রূপের ভিতর দিয়ে দেখা কিন্তু প্রাণের আনন্দ না জাগ্‌লে বৃথা মূর্ত্তিপূজা করে লাভ নেই। অনেকে বলেন মূর্ত্তি পূজা কর্‌তে কর্‌তে পরে মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে; কিন্তু সেটা ভুল—আগে প্রেম না জাগ্‌লে, আমরা রূপের ধ্যানে ব্যাপৃত থাক্‌লে পরে ভাবের অভিব্যক্তি হতেই পারে না। প্রাণের আনন্দ যখন উদ্বেল হয়ে উঠে, আপনাকে আপনি ধর্‌তে পারে না, তখনি রূপের ভিতর দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে। রূপ সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে আরো সম্পূর্ণ করে তোলে। প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ যখনি হয়েছে তখনি তা রূপ গ্রহণ করেছে। সেইজন্তেই ভারতবর্ষ মূর্ত্তির সাধনাকে এত উচ্চে স্থান দিয়েছে। বস্তুতঃ নিরাকার সাধনার চেয়ে সাকার সাধনা যে অনেক উন্নত এবং পূর্ণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমিও তাই কর্‌চি। আমি রূপেরই উপাসক। রূপের ভিতরে অরূপের অনুভূতিই আমার সাধনা—রূপকে আমি কোনদিনই বাদ দিই নাই। জগতের কত বিচিত্র রূপের ভিতর দিয়ে অনন্তের আনন্দকে আমি দেখ্‌চি এবং তার কাছে আমার আত্মাকে উৎসৃষ্ট করে দিচ্চি। এমন কি, অরূপ যিনি সেই পরমাত্মাকেও ত আমি রূপ দিয়ে দেখ্‌চি। এই ত হচ্ছে ভারতের চরম সাধনা। এই সাধনাতেই রাম-প্রসাদ, চৈতন্যদেব সিদ্ধ হয়েছিলেন।

লেখক:—আচ্ছা, আমাদের দেশের মেয়েদের উন্নতির জন্য কি ভাবে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাদের কাজ কি?

রবীন্দ্রনাথ:—কথাটা যখন উঠ্‌ল তখন এই প্রসঙ্গে এবার গুজরাটে মেয়েদের সঙ্গে আমার যা আলাপ হয়েছিল তা বল্‌ছি শুন—

এবার বোম্বাইয়ে গিয়ে অনেক মেয়েদের সভায় ও অন্যান্য নানান সভায় বক্তৃতা দিলেম। সেখানকার লোকেরা আমাকে খুব অভিনন্দিতও করেছিল কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি কিছুতেই পেলেম না। তারপর একদিন মেয়েরা আমাকে নিমন্ত্রণ কর্‌লে—আজকাল শিক্ষিত বলে যা বোঝায়, তা তারা নয়। অর্থাৎ তারা ইংরেজি জানে না। কিন্তু তারা আমাকে যে তাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিয়ে বরণ করে নিলে তাতে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। তাদের কাছে গিয়ে আমার হৃদয় খুলে গেল। কোনও প্রকার সংকোচ রইল না। তারা আমার কাছে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলে। আমি বল্লেম:—

মাতৃগণ! তোমরাই হচ্ছ দেশের কল্যাণী মূর্ত্তি-রূপিনী! অথচ দেশে তোমরা যে বেঁচে আছ, তার

কোনো চিহ্ন নেই। তোমরা আজ দেশের পুরুষদের বুঝি কেবে দেবার জন্তে এবং পাখা দিয়ে বাতাস করবার জন্তে। কিন্তু তোমাদেরও একটা কর্মের ক্ষেত্র আছে। সে ক্ষেত্র অবশ্যই পুরুষদের ক্ষেত্রের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু তবুও একটা ক্ষেত্র আছেই। অনেকে বল্‌তে চান মেয়ে পুরুষে কোনও ভেদ থাক্‌বে না—কিন্তু ভেদ যেখানে সত্যকার সেখানে তা থাকবেই এবং থাকাই শ্রেয়। সেজন্তে ওদিকে বুদ্ধি দিলে চল্‌বে না। পুরুষ পুরুষের কাজ করুক, আর মেয়ে মেয়ের কাজ করুক। এইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু মেয়েদের কাজ কি? আজ মেয়েরা যে নিরর্থক আচার-নিষ্ঠায় জর্জ্জরিত হয়ে রয়েছে এতে তাদের নারীত্বের মহিমাকে খর্ব্ব করে দিয়েছে। মেয়েরা কি করবে? তারা নিজেরা পরস্পরের সঙ্গে কল্যাণবন্ধনে মিলিত হবে এবং কল্যাণ হিসেবে কল্যাণ-কর্ম্মে ব্রতী হবে এবং পুরুষদের মধ্যে যে অনৈক্য আছে সেটাও ঘুচাতে চেষ্টা কর্‌বে। পুরুষেরা অহর্নিশ কত কি লীগ তৈরী কর্‌চে—সে জন্ত তারা খেটে মর্‌চে। তারা নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। এদের যে মিলন তা হচ্ছে স্বার্থের মিলন—কিন্তু মেয়েরা যে মিল্‌বে তা হবে প্রেমের মিলন। মেয়েরা পুরুষদিগকেও স্বার্থের থেকে প্রেমের পথে আন্‌তে চেষ্টা করবে এই হচ্ছে তাদের কাজ। মেয়েদের তুচ্ছ কর্‌লে চল্‌বে কেন? মেয়েইত একদিন বলেছিল—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম।"

লেখক:—কিন্তু আমরা মেয়েদের উচ্চ শাস্ত্র হতে বঞ্চিত করেচি, তাদের কোন একটা মূল্যই দিই না। তাদের গায়ত্রী পাঠ পর্য্যন্ত নিষেধ।

রবীন্দ্রনাথ:—এটা সম্পূর্ণ গায়ের জোরে করা হয়েচে—কেননা মেয়ে পুরুষে কতকগুলো বিষয়ে পার্থক্য থাক্‌লেও মূলে সবাই এক। কিন্তু সেই মূলকেই যদি হরণ কর, তবে আর রইল কি?

গায়ত্রীই বল উপনিষদই বল—এ বিশ্ব মানবের সম্পত্তি। এ মেয়ে-পুরুষ সবার নিজের জিনিষ। গায়ত্রী বিশ্বামিত্রকে এখন খেলো করে সবাই নিয়েচে। তার তাৎপর্যের দিকে নজর রেখে সে মন্ত্র কেহই জপ করে না।

কিন্তু গায়ত্রীর সাধনাই ভারতের শ্রেষ্ঠতম সাধনা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ এর নাম হচ্চে ব্যাহৃতি। অর্থাৎ চারদিক থেকে আহরণ করে আনা। যথার্থ আর্য্য যিনি তিনি এই ভাবে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চিত্তকে প্রেরণ করে সমস্ত বিশ্ব-জগতকে মনের মধ্যে আহরণ করে আনেন—

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—

ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করচেন—তাঁর প্রেরিত সেই ধীশক্তিতেই তাঁকে ধ্যান কর্‌ব। বাইরের জগৎ ও আমার অন্তরে ধী, এই দুইই একই শক্তির বিকাশ, এ জান্‌লে জগতের সঙ্গে আমার চিত্তের, এবং আমার চিত্তের সঙ্গে সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব কর্‌তে পারি। এতেই দেখা যাচ্চে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ অনুভব করা এইটেই ছিল ভারতবর্ষের সাধনা। ভারতের ঋষি হচ্চেন তাঁরাই—তে সর্ব্বং সর্ব্বতঃ প্রাপ্যধীরা

যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাভিশন্তি

যাঁরা পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন্ সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েচেন্ সকলের মধ্যে প্রবেশ করেচেন্। সর্ব্বানুভূতিই হচ্চে ভারতবর্ষের সাধনা। নিকটে ও দূরে যা-কিছু দেখা আত্মার যোগে সকলের মধ্যে আপনাকে বিস্তৃত করে দেওয়াই হচ্চে আত্মার মুক্তি। তাতেই আত্মার প্রকাশ। এক সময়ে ভারতবর্ষ জগৎকে মায়া-ছায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে নির্ব্বাণের সাধনা কর্‌তে লেগে গিয়েছিল সত্য কিন্তু এইটেই ভারতবর্ষের প্রকৃতি নয়—এটা বিকৃতি। মায়াবাদীরা বলেছিল যা-কিছু দেখ্‌চ সবই মৃত্যু, সবই মিথ্যা, তুমি নিজেও মিথ্যা—অতএব সব ত্যাগ করো এবং আপনাকেও ত্যাগ করো অর্থাৎ মর—এই আত্মহত্যার সাধনায় সিদ্ধ হতে যদিচ কেহই পারেন নি। কিন্তু উপনিষদ সীমা ও অসীম দুইই মেনেচেন্—রূপ, অরূপ দুইই মেনেচেন্, অহং ও সোঽহং দুইই মেনেচেন্। তাঁরা জগৎকে কখনো বাদ দেন নি।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেখ্‌বে—এইত উপনিষদের উপদেশ।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু
যে বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে বিশ্বেশ্বরকে দেখা? বিশ্বের মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে এক বার উপলব্ধি কর্‌লে পর, আমাদের দৃষ্টির সব জড় আবরণগুলো দূর হয়ে যায়—তখন জগৎ আর শুধু জগৎই নয়—তা ব্রহ্মময়, তখন রূপ আর মোহ নয়—তা অপরূপেরই প্রকাশক্ষেত্র। তখন বিশ্ব একটা যন্ত্রের মত আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে থাকে না—প্রতি মুহূর্ত্তেই এই অখণ্ড আকাশের অসীম আনন্দ থেকে তা জন্মগ্রহণ করচে, এই কথা বুঝ্‌তে পারি; তখন আকাশ ও পৃথিবীর, জীব ও শিবের, ভক্ত ও ভগবানের অচিন্ত্য লীলারহস্য উপলব্ধি কর্ত্তে পারি; তখন দেখি সর্ব্বত্রই আনন্দ—পরমানন্দ, সর্ব্বত্রই মুক্তির উৎস উৎসারিত, সেই উৎস ধারায় চিত্তটাকে সুস্নাত ও পবিত্র করে পরিপূর্ণ করে তুল্‌তে পারি; তখন সকলের সঙ্গে সহযোগে বল্‌তে পারি যে আমি ধন্য!!!

নেপালী দরবার।

(মহারাণী লক্ষ্মীদেবী)

নেপালী দরবারের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে মহারাণী লক্ষ্মী-দেবীর নির্ব্বাসনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; এই প্রবন্ধে কি কারণে নেপালের পাটরাণী লক্ষ্মীদেবী বেনারসে নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন, তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

চৌতুরিয়া ও পাণ্ডেগণ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। কিছুকাল গত হইলে মহারাজাধিরাজ উহাদিগকে দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। ফতেজঙ্গকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দেওয়া স্থির হইল। তিনি না আসিয়া পঁহুছা পর্য্যন্ত জঙ্গ বাহাদুরই প্রকৃত প্রস্তাবে অস্থায়ী ভাবে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল ফতেজঙ্গ নামে মাত্র প্রধান মন্ত্রী,কিন্তু মহারাণীর প্রিয়পাত্র গগন সিংহ সামরিক ও বৈষয়িক সর্ব্ববিধ ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিয়া প্রধান মন্ত্রী হইয়া বসিয়াছেন। কার্য্যতঃ ফতেজঙ্গ মাত্র দেওয়ানী বিচারক হইয়া রহিলেন। বর্ত্তমান মন্ত্রী সভায় জঙ্গ বাহাদুরের সর্ব্ববিধ প্রাধান্য এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি যুবরাজের পক্ষের লোক বলিয়া মহারাজ ও মহারাণী কর্তৃক এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল হইলেও জঙ্গবাহাদুর বিপুল উন্নতশীল বলিয়া কেহই তাঁহাকে জেনারেল পদ হইতে নামাইতে সাহস করিল না। তাঁহার আধিপত্য একরূপ রহিয়াই গেল।

নেপালের এই বিষম গোলযোগের সময় প্রথম শিখ যুদ্ধ চলিতেছিল। হীন কুলোদ্ভব গগনসিংহের মহারাণীর নিকট সর্ব্বদা যাতায়াতে এবং মহারাণীর নাম করিয়া তাঁহার আদেশে কার্য্য হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করায় মহারাজা ক্রমেই অসন্তুষ্ট হইতেছিলেন। ইহার পরে গগনসিংহের বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। ১৮৪৬ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর গগনসিংহ যখন নিজ পূজায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন লালঝা নামক একব্যক্তি জানালা দিয়া গুলি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। গগনসিংহের দেহ মাটীতে পড়িয়া রহিল, সমগ্র ঘর রক্তে ঢেউ খেলাইতে লাগিল। হত্যাকারী কোন দিক দিয়া পলাইয়া গেল, কেহ ধরিতে পারিল না। চতুর্দ্দিকে হুলু স্থূল পড়িয়া গেল। অনেক মাথাওয়ালা লোকই বুঝিতে পারিলেন, এই অঘটন জন্য কোন একটা ভীষণ ব্যাপার অচিরে উপস্থিত হইবে। সকলে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বেশী সময় অতিবাহিত হইলনা। এই ভীষণ হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ মহারাণীর নিকট পঁহুছিবা মাত্রই মহারাণী প্রতিহিংসায় জলিয়া উঠিলেন। তিনি অনতি-বিলম্বে পদব্রজে গগন সিংহের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং গগন সিংহের মৃতদেহ দর্শন করিয়া ভীষণ প্রতি-হিংসার বশবর্ত্তী হইলেন এবং ইহার প্রতিকারে প্রয়াসী হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে উপায়েই পারেন

রাজদ্রোহীদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন। তিনি অবিলম্বে কোট প্রাসাদে আসিয়া সকল কর্ম্মচারী ও সর্দ্দারগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, অবিলম্বে সকলেই আসিয়া একত্র সমবেত হইলেন। প্রখর বুদ্ধিমান জঙ্গবাহাদুর তদীয় ভ্রাতৃগণ সহ কিছু সৈন্য লইয়া আসিলেন। এই হত্যা সম্পর্কে জঙ্গবাহাদুর বলিলেন "১৮৪৩ খৃঃ অঃ হইতে মহারাজ মহারাণীকে রাজ প্রতিনিধির অধিকার দান করিয়াছেন সুতরাং মহারাণীই এই বিষয়ের বিচার করিয়া হুকুম দিতে পারেন।" জেনারেল অভিমান রাণা এই সময় মহারাজকেও ডাকিয়া তথায় উপস্থিত করিলেন। [illegible] হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। [illegible] হিংসার প্রতিমূর্ত্তি ক্রোধান্ধা মহারাণী কাজী বীর কিশোর পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ করিলেন। অভিমান রাণা নিরাপত্তে তাহা সম্পন্ন করিলেন। বীর কিশোর বারবার নিজকে নির্দ্দোষ বলিতে লাগিলেন। ক্রোধোন্মত্তা মহারাণী অনন্ত প্রতাপে বীরকিশোরের মাথা কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। কে প্রকৃত দোষী তাহা মহারাজ জানিতেন। অভিমান রাণা মহারাজকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু মহারাজ বিনা বিচারে তদ্রূপ হুকুমে সম্মতি দিলেন না। রাজাধিরাজের [illegible] তখন অভিমান রাণা মানিয়া লইলেন। ইহার [illegible] মহারাণী সভা বসাইতে আদেশ করিলেন। মহারাজ [illegible] "এই আপদ সময়ে প্রধান মন্ত্রী [illegible] বিবেচনার সাহায্য লওয়া দরকার।" [illegible] বলিয়া তিনি জঙ্গবাহাদুরের এক ভ্রাতাকে লইয়া [illegible] ফতেজঙ্গের বাড়ী চলিয়া গেলেন। ফলকথা [illegible] মহারাজের উপস্থিত থাকিতে সাহস হয় [illegible] এবং রেসিডেন্টকে গগন সিংহের হত্যাকাণ্ডের [illegible] ছিলা করিয়া মহারাজ সরিয়া পড়িলেন। [illegible] দুই প্রহর। এই সকল কারণে গগন [illegible] যথাসময়ে শ্মশানে নীত হইতে পারে

[illegible] কোট প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন তখন [illegible] তাঁহাকে বলিলেন "বীর কিশোর পাণ্ডের [illegible] আদেশ অমান্যকারী জেনারেল অভিমান রাণার অবিলম্বে প্রাণদণ্ড করিয়া মহারাণীকে একটু ঠাণ্ডা করা হউক।" মহারাণীর ইচ্ছা যে ফতেজঙ্গই প্রধান মন্ত্রী থাকিবেন ও জঙ্গবাহাদুর প্রধান সেনাপতি হইবেন। ফতেজঙ্গ এই ব্যবস্থায় রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন "বীর কিশোরের যথারীতি বিচার হউক। অভিমান রাণা মহারাজের হুকুম মানিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন সুতরাং তিনি নির্দ্দোষ।" অভিমান রাণাকে ফতেজঙ্গ জঙ্গবাহাদুরের কথা বলিলে তিনি তাঁহার তিন রেজিমেণ্টের সেনাদলকে সাবধানে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিলেন এবং প্রাসাদের বাহির স্থিত সেনাগণকে বন্দুকেগুলি ভরিতে হুকুম দিলেন। এই সময় জঙ্গবাহাদুর মহারাজের কাছে—উপর তালায় গিয়াছিলেন। তিনি মহারাণীকে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিলে মহারাণী রাজ প্রতিনিধির তরবারী হস্তে নীচে আসিয়াই ফতেজঙ্গ, দল ভঞ্জন পাণ্ডে ও অভিমান রাণা প্রভৃতিকে সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আমার বিশ্বাসী সেনাপতি গগন সিংহকে হত্যা করিয়াছে, শীঘ্র বল!" কেহ উত্তর দিল না। ফতেজঙ্গ উত্তর দিলেন "সকল কথা তদারকে বাহির হইবে।"

ক্রোধোন্মত্তা মহারাণী তখনই বীরকিশোরের উপর তরবারী উত্তোলন করিলেন, এই বিষম হত্যাকাণ্ড হইতে বিরত থাকিতে তিনজন মন্ত্রী তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং যথা সাধ্য শান্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন।

উপর তলায় ফিরিয়া যাইবার সময় মহারাণী সিড়িদিয়া উঠিতেছেন এমন সময় বন্দুকের শব্দ হইল। ফতেজঙ্গ ও দলভঞ্জন হত হইলেন। অভিমান রাণা আহত হইয়া পড়িলেন। ফতেজঙ্গের পুত্র খড়্গ বিক্রম, জঙ্গবাহাদুরের ভ্রাতা রাম বাহাদুর ও কৃষ্ণ বাহাদুরের কপালে কুকরির আঘাত করিলেন এবং একজন সিপাহীকে কাটিয়া ফেলিলেন। তিনি পুনরায় রামবাহাদুরকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে জঙ্গবাহাদুর নামিয়া আসিয়া একজন সিপাহীর বন্দুক লইয়া খড়্গ বিক্রমকে নিহত করিয়া ভ্রাতাকে রক্ষা করিলেন।

বিষম ঘটার সহিত নেপালের রাজনৈতিক রঙ্গ মঞ্চ

গর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রকৃত পক্ষে ইহার পরই ঘন বজ্রপাত আরম্ভ হইল। দারুণ হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। যে যাহাকে পাইল মারিয়া ফেলিল। শত্রু মিত্রের ঠিকানা রহিলনা। এই সময় জঙ্গবাহাদুরের রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা আসিয়া পঁহুছিল এবং মহারাণী উপর তালা হইতে হুকুম দিতে লাগিলেন "আমার শত্রুদিগকে নির্ব্বংশ কর।" তখন মৃতদেহের স্তূপ পড়িয়া গেল। জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে, মহারাণীর লোক প্রথমে গুলি চালাইলে পরে জনগণ উন্মত্ত হইয়া হত্যাকাণ্ড সংঘটন করে। এই ব্যাপারের পরিণাম কি হইবে পূর্ব্বে কাহারো জানা ছিল না। ৩১ জন বড় সর্দ্দার বা উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী, ২০ জন মধ্যবিদ সর্দ্দার, বহুতর সিপাহী ও সাধারণ ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। একই সময়ে হঠাৎ এইরূপ ভাবে হত্যাকাণ্ড ভারতের স্বাধীন রাজ্য কেন—পৃথিবীর কোন যথেচ্ছাচারী স্বাধীন দেশেও ইতঃপূর্ব্বে আর হইয়াছে কিনা বলা যায় না। এই অমানুষিক ব্যাপার ইতিহাসের বিশেষ আলোচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। ভীরু স্ত্রৈণ মহারাজার অবিবেচনায় যে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

যখন হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল তখনই মহারাণী জঙ্গবাহাদুরকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দিয়াছিলেন। জঙ্গবাহাদুর মহারাণীকে তাঁহার হনুমান ঢোকা প্রাসাদে পঁহুছাইয়া দিয়া মহারাজের নিকট গিয়া প্রধান মন্ত্রী হিসাবে অভিবাদন করিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "আমার রাজ্যের এতগুলি প্রধান ব্যক্তির হত্যা কে ও কেন করিয়াছে?" জঙ্গবাহাদুর বলিলেন "আপনি ত মহারাণীকে সর্ব্বক্ষমতা দিয়াছেন, যাহাকিছু তাঁহার হুকুমেই হইয়াছে।" মহারাজ তখনই মহারাণীর নিকট অন্দর মহলে গেলেন। মহারাণী ভূতলে লুণ্ঠিতাবস্থায় পড়িয়া কাঁদিতেছিলেন। রাজা ও রাণী উভয়ের মধ্যে বচসা হইল। রাণী কহিলেন "আমার বড় পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত না করিলে আরো নরহত্যা হইবে।" মহারাজ রাগ করিয়া পাটন নগরের দিকে অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন। পথে তাঁহার ভবানী সিংহের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। রাজার আরদালী—রাণীর গুপ্তচর এই সংবাদ রাণীকে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভবানী সিংহের বধের করার জন্য ৫০ জন সৈন্য পাঠাইলেন। রাজার সাক্ষাতেই ভবানী সিংহের শিরোচ্ছেদ হইল। রাজা আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না। এই সময় জঙ্গবাহাদুরের এক ভ্রাতা মহারাজকে গোপনে যাইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিলেন। ইহার পরই হত সর্দ্দার দিগের সম্পত্তি মহারাণীর হুকুমে সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। তাঁহাদের পরিবার বর্গ এক একটী পুটলী লইয়া দেশ ত্যাগী হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেম।

মহারাণী লক্ষ্মীদেবীর দুষ্ট বুদ্ধির এইখানেই শেষ হইল না। তিনি জঙ্গবাহাদুরের নিকট যুবরাজ সুরেন্দ্র বিক্রমকে হত্যা করাইয়া স্বীয় পুত্রের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। জঙ্গবাহাদুর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। রাজবাটীতে এইরূপ অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের পরই মহারাণীর আদেশে যুবরাজ ও তাহার ভ্রাতাকে তাঁহাদের আবাস বাটীতেই অবরুদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণীর এই দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার জন্য জঙ্গবাহাদুর তাঁহার নিজের দুই ভ্রাতাকে তাঁহাদের প্রহরী করিয়া রাখেন এবং প্রত্যহ স্বয়ং গিয়া উঁহাদিগকে দেখিয়া আসিতেন। এই সময় মহারাণী ও জঙ্গবাহাদুর রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন; কিন্তু সকল রাজকার্য্যই মহারাজাধিরাজ, যুবরাজ এবং মহারাণীর নামে পরিচালিত হইত। মহারাণী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, জঙ্গবাহাদুর তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধির পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, অথচ এই বিষম হত্যাকাণ্ডের কার্য্যও নিষ্ফল হইল, তখন তিনি বীরধুজ বাশ'নয়াৎ নামক এক ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। মহারাজাধিরাজ, যুবরাজ, জঙ্গবাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতাগণকে রাজবাটীর এক ঘরে যাহাতে একত্র আনাইয়া সকলকেই একবারে নিহত করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার, চিন্তা করিতেও অন্তর শিহরিয়া উঠে।

হত গগন সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র উজিরসিংহ পিতার মৃত্যুর পর জেনারেল পদ পাইয়া এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। বিজলী রাজ নামক এক পণ্ডিতও এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। পরে এই পণ্ডিতের [illegible]

বুদ্ধি আসিয়া পড়িয়াছিল। অসচ্চরিত্রা মহারাণীর দুষ্টচেষ্টার জন্য দেশের এতগুলি প্রধান মাথাওয়ালা সর্দ্দার নিহত হইল—আর যে সকল বাকী আছেন তাহারাও এবার গেলে দেশের দশা কি হইবে, পণ্ডিতজী ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া এই ষড়যন্ত্রের কথা জঙ্গবাহাদুরকে জানাইয়া দিলেন। ষড়যন্ত্রকারী উজির সিংহ কতকগুলি সৈন্য ও অলিজয়া বন্দুক জোরে রাজবাটীতে (১৮৪৬ সালের ৩০শে অক্টোবর) লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে ষড়যন্ত্রকারী বীরধুজ বাশনিয়াৎকে দিয়া মহারাণী জঙ্গবাহাদুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন জঙ্গবাহাদুর নিজেই রাজবাটীর দিকে যাইতেছিলেন। বীরধুজ সাক্ষাতে বলিল "মহারাণী আপনাকে ডাকিয়াছেন।" জঙ্গবাহাদুর কহিলেন "তাহা অসম্ভব, তুমিই না আমার স্থলে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছ? রাজপ্রাসাদে আমার কি কাজ থাকিতে পারে?" বীরধুজ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। জঙ্গবাহাদুরের আদেশে কাপ্তেন রাণা মীর অধিকারী তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। তখন রাজ্যের সমস্ত বড় লোক ও প্রজা সাধারণ বুঝিতে পারিল যে, মহারাণীই এই সব অনর্থের মূল। সকলে মহারাণীর উপর শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িল, তাহার ফলে সকলেই যুবরাজের পক্ষবর্ত্তী হইল। জঙ্গবাহাদুরও ভবিষ্যৎ শান্তির আশা করিতে লাগিলেন।

জঙ্গ বাহাদুর রাজ বাটীতে গিয়া মহারাজ ও যুবরাজের পদতলে পাগড়ী স্থাপন করিয়া কহিলেন—"আমার চাকরীর ইস্তাফা লওয়া হউক, অথবা যুবরাজের শত্রুদিগকে নিঃশেষে বধ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হউক।" মহারাজ নিজের ও যুবরাজের হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; তিনি এইবার তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ রাজ্য নিরাপদে রক্ষা করার জন্য তাঁহার উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

রাজবাটি হইতে বাহিরে আসিয়া জঙ্গ বাহাদুর সৈন্যদিগকে অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজবাটি ঘিরিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। তৎপরে রাজবাটীর ভিতর হইতে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগকে একে একে হত্যা করিলেন। ১৫ জন বাসানিয়াৎ বংশের লোক ও ৫ জন সামরিক কর্ম্মচারী নিহত হইল।

পূর্ব্বেই এই ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া উজিরসিংহ পলাইয়া নেপালের বাহির হইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। মহারাজ জঙ্গবাহাদুরকে ভীমসেন থাপার সমস্ত জায়গীর সম্পত্তি প্রদান করিয়া রাণাজী পদবী দান করিলেন। ঐ দিনই বিকালে জঙ্গ বাহাদুর মহারাণীকে জানাইয়া পাঠাইলেন "যুবরাজের প্রতি একান্ত বিরুদ্ধ ভাব জন্য আপনাকে আর নেপালে স্থান দেওয়া হইবে না। অতঃপর দুই পুত্রসহ আপনাকে বেনারস গিয়া অবস্থান করিতে হইবে।"

মহারাণী লক্ষ্মীদেবী একান্ত নিরুপায় হইয়া অবশেষে এই ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইলেন এবং অব্যবস্থিত চিত্ত স্বামী মহারাজকেও তীর্থ দর্শনের অছিলায় সঙ্গে যাইতে বাধ্য করিলেন। ১৮৪৬ সালের ২৩শে নবেম্বর তাঁহারা বেনারস যাত্রা করিলে যুবরাজই রাজ প্রতিনিধি হইলেন। জঙ্গ বাহাদুর নিজের ভ্রাতাগণকে এবং অনুগত আত্মীয়গণকে পবর্ণরী পদ ও সামরিক প্রধান কর্ম্মগুলি দিয়া রাজ্য রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন।

মহারাণী লক্ষ্মীদেবীর জন্য বেনারসে সরকার হইতে বাড়ী বাগান প্রভৃতি করিয়া দেওয়া হইল। এই সময় বেনারসে বহুসংখ্যক নির্ব্বাসিত নেপালী ছিল, তাহারা আসিয়া মহারাজকে ঘিরিয়া বসিল। মহারাজ পুনরায় বিরুদ্ধ দলে যোগদান করিলেন।

নেপালে ফিরিবার অছিলায় ১৮৪৭ সালে ২৪শে মার্চ্চ তারিখে তিনি সেগৌলী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এবং গুরুপ্রসাদ চৌতুরিয়া রাণীর সহিত মিলিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জঙ্গ বাহাদুর ও যুবরাজ মহারাজকে নেপালে যাইতে লিখিলেন কিন্তু মহারাণীকে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না। এই পত্র পাইয়া মহারাণী নির্ব্বাসিতদের সহিত ষড়যন্ত্র করতঃ মহারাজ দ্বারা এমন এক আদেশ পত্র বা পরওয়ানা সহি করাইয়া নেপালের সৈন্য ও প্রজাদের উপর প্রেরণ করিলেন যে "তোমরা সকলে প্রধান মন্ত্রী ও তাহার দলের সকলকে অবিলম্বে হত্যা কর।"

অসম সাহসী বীর জঙ্গ বাহাদুর গুরুপ্রসাদ চৌতুরিয়া ও কাজী জগতরাম পাণ্ডেকে ঐ পরোয়ানা সহ ধৃত করিলেন এবং সৈন্যগণকে একত্র করিয়া কহিলেন "আমিই সেই প্রধান মন্ত্রী, তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিতে পার।" বলিয়া বুক পাতিয়া সাহসী বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রজা ও সৈন্যেরা বলিল "এই হুকুম আমরা মানিনা— যেহেতু মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত রাজশক্তি দান করিয়া নেপালের বাহিরে গিয়াছেন। এখন যুবরাজের হুকুমই মানিব।"

ইহার পর ১৮৪৭ সনের ১২ই মে মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম সাহকে বিধি মত সিংহাসনে বসান হইল। এবং রাজ্যের সমস্ত সর্দ্দার ও সৈন্যাধ্যক্ষ গণের দস্তখত যুক্ত পরোয়ানা মহারাজের নিকট প্রেরিত হইল।

মহারাণীর চরিত্রের জন্য রাজ্য রসাতলে যাইতে বসিয়াছি'। অধুনা জঙ্গবাহাদুরের কার্য্যতায় তাহা সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল। সেই হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মহারাণী বেনারসেই রহিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

সংগ্রহ।

শব্দানুভূতি।

ভগবানদত্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন একটী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে অপর ইন্দ্রিয়গণ স্বগ্রাম বাসীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য যেন নিজেদের স্কন্ধে অধিকতর কর্ম্মভার বহন করিয়া অসমর্থ ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি পূরণ করিতে চেষ্টা করে। একজন মূক-বধির নেত্রের সাহায্যে ইসারা ইঙ্গিতে এরূপ বুঝিতে পারে যে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। সেইরূপ অন্ধও তার শ্রবণ ও স্পর্শের দ্বারা অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। আমরা অদ্য একটী অন্ধ উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদের কথা উল্লেখ করিব। ইহার নাম জন গ্রিমস্ উইলকিনসন। (Mr. John Grimshow Wilkinson) ইনি ২২ বৎসর বয়সে অন্ধ হইয়া উদ্ভিদ তত্ত্বের গবেষণা আরম্ভ করেন। এখন ইহার বয়স ৬৪ বৎসর, ইনি উদ্ভিদ বিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত হইয়াছেন। কেবল মাত্র স্পর্শের দ্বারা তিনি ইংলণ্ড এবং অন্য দেশ জাত প্রায় ৮০০ শত ফল-পুষ্প প্রদ বৃক্ষ ও লতা-গুল্মের পরিচয় বলিয়া দিতে পারেন।

অনেক সময় দেখা যায়, কেহ কেহ প্রেমাস্পদের গতি বিধি এরূপ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা করেন যে কেবল মাত্র সামান্য পদশব্দ শুনিয়াই তাহার আগমন ও নির্গমন বলিতে পারেন।

এই উইলকিনসনও শব্দতত্ত্ব এরূপ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমি ও শূন্য ভূমির উপরে শব্দের পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তৎপরে তিনি ভিন্ন ২ বৃক্ষের উপরে বৃষ্টিপাত হইলে তাহাদের বিভিন্নরূপ বৃষ্টিজল গ্রহণের শব্দ অনুভব করিতে থাকেন।

তিনি বলিয়াছেন জুলাই মাসের গরমে একটী পপি গাছ (Poppy) ও তন্নিকটবর্ত্তী আর একটী গাছ স্পর্শ করিলে তিনি পপি গাছটীকে অপেক্ষাকৃত শীতল বোধ করেন। তাঁহার যখনই এই তাপ বৈষম্য অনুভব হয় তখনই মনে হয় এরূপ কেন হয়?

বৃষ্টি পাতের সময়ে ভিন্ন ২ বৃক্ষে ভিন্ন ২ শব্দ হয়; তাহাতেও তিনি বৃক্ষের পরিচয় বলিতে পারেন। তিনি বলেন করেন পাইনাস্ সিলভেস্ট্রীস্ (Pinus sylvestris) নামক বৃক্ষ বৃষ্টি পাতেও অত্যন্ত নীরব থাকে। কেবল প্রবল বজ্র-পাতের সময়ে উহাতে মাঝে ২ সাই সাই শব্দ হয়। ঝড় বৃষ্টিতে ওক বৃক্ষ (Oak) ভীষণ শব্দ করিয়া থাকে। এই ওক বনে পাখীর ডাকও প্রবলরূপে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। কিন্তু পাইন বনে পাখীর ডাক অত্যন্ত মৃদু শুনা যায়। যদিও পপলার বৃক্ষ প্রবল তড়িত ভারাপন্ন তথাপি প্রচণ্ড বজ্র-পাতের সময়ে উহা নীরব থাকে। এবং বজ্রপাত বন্ধ হইয়া গেলে উহার শাখা পল্লবে একরূপ শব্দ হয়। বৃক্ষ-গুল্মাবৃত জঙ্গল ও শূন্য ময়দানে বৃষ্টি-পাতের শব্দের পার্থক্যও তাঁহার অনুভূতি এড়াইতে পারে নাই।

স্পর্শ সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন যে কোন কোন লোকের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সুখানুভব হয়। তিনি একজন ডাক্তারের কথা বলিয়াছেন, যাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া তিনি বুঝিতে পারিতেন যে ঐ ডাক্তার অত্যন্ত সাধু

ভাবাপন্ন কিন্তু তিনি একজন সুদক্ষ অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে অনেকে লোকের মুখের চেহারা দেখিয়া লোকটী কিরূপ তাহা স্থির করেন কিন্তু তিনি বলেন জেলের ভিতরে গিয়া তিনি কয়েদির সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিতে পারেন, কে দুষ্কার্য্য করিয়া চিরাভ্যস্ত হইয়াছে। লোকের মনের ভাব তাহাদের কার্য্যের দ্বারা—এমন কি সামান্য হস্তপদাদির চালনায়ও প্রকাশ হইয়া পড়ে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। রয়েল ইনিষ্টিটিউসনে অধ্যাপক ব্রেগ (W. H. Bragg) শব্দ তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া এই ঘটনাবলির উল্লেখ করিয়াছেন।

মঙ্গল গ্রহে খবরাখবর।

লণ্ডন ডেইলি মেলে (London Daily Mail) সি- মারকণি লিখিয়াছেন যে কিছু দিন যাবৎ তারহীন টেলিগ্রাফে কার্য্য করার সময়ে মাঝে মাঝে একরূপ সঙ্কেত পাওয়া যাইতেছে। উহা একরূপ অর্থহীন শব্দ সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। এই সাঙ্কেতিক শব্দ দিবা রাত্রি উভয় সময়েই পাওয়া গিয়া থাকে। এই সঙ্কেত কোন দেশ কিম্বা মহাদেশে আবদ্ধ নহে, ইহা একই সময়ে লণ্ডন ও নিউইয়র্কে পাওয়া যাইতেছে, মিঃ মারকণি বলেন যে ইহা এক অদ্ভুত শব্দ এবং বোধ হয় ইহা পৃথিবীর বহির্দ্দেশ হইতে আসিয়া থাকে। কোন কোন অক্ষর—বিশেষতঃ ৩ অঙ্কের সঙ্কেত অনেক সময়েই পাওয়া যায়। কিন্তু এ যাবৎ ইহার কোনরূপ অর্থ বোধ গম্য হইতেছে না। শব্দের বেগ সমান এবং বহু দূর হইতে আসিতেছে মনে হয়। তিনি বলেন, ইহার কারণ আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারি না। হয়ত ইহা কোনরূপ বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তনের দ্বারাও হইতে পারে এবং সূর্য্য মণ্ডলে ভীষণ উচ্ছ্বাসে এই বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। মিঃ মারকণিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে অপর কোন গ্রহ হইতে পৃথিবীতে সঙ্কেত প্রেরণের চেষ্টা হইতেছে কি না? তাহার উত্তরে তিনি বলেন "আমি এ কথা একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারি না, কিন্তু ইহার কোন নিশ্চয় প্রমাণ নাই।" এই শব্দের কোন বিশেষ সময় নাই ইহা দিবা রাত্রি উভয় সময়েই সমান। এই ঘটনা গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য করা হইয়াছে কিন্তু যুদ্ধের জন্য ইহার বিশেষ কোন সন্ধান করা হয় নাই। ইতঃ পূর্ব্বেও একবার মঙ্গল গ্রহ হইতে আলোক সঙ্কেতের কথা প্রচারিত হইয়াছিল, এরাও কেহ কেহ মনে করেন, মঙ্গল গ্রহ হইতে এইরূপ সঙ্কেত করা হইতেছে। আলোক সঙ্কেত হইতে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে হয়ত কোন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

চন্দ্রলোকের পথে।

এতকাল চন্দ্রলোকে গমন একটা গল্পের বিষয় ছিল। জুলেস ভার্ণ তাঁহার "চন্দ্রলোকে গমন" নামক উপ-ন্যাসে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। অনেক সময়ে মানুষ যাহা কল্পনা করে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা যায়। আমরা বাল্য কালে যে পুষ্পক রথের কথা কিম্বা সমুদ্র গর্ভে প্রবেশের গল্প শুনিয়াছি বর্ত্তমান যুগে তাহা প্রকৃত কার্য্যে দেখিতেছি।

আমেরিকার ক্লার্ক কলেজের অধ্যাপক গডার্ড (R. H. Goddard) সাহেব বায়ু মণ্ডলের উপরের স্তর পরীক্ষা করিবার জন্য একরূপ হাউই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এ যাবৎ আমরা মাত্র ১৯ মাইল উর্দ্ধের খবর পাইয়াছি, কিন্তু এই অধ্যাপকের যন্ত্রের সাহায্যে ২০০ মাইল বায়ু স্তর ভেদ করিয়া তদূর্দ্ধে উঠাও সম্ভব হইবে। এই হাউইয়ে প্রবল বিস্ফুরক নিহিত হইবে। প্রথমটীর বেগে হাউই বহু উর্দ্ধে উত্থিত হইলে দ্বিতীয়টী বিদীর্ণ হইবে এবং তাহার ফলে হাউই আরও উর্দ্ধে উঠিবে। এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে একটীর পরে আর একটী বিদীর্ণ হইতে থাকিবে। দুইটী বিদারণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে উহা নীচে পড়িতে পারিবে না, কারণ উহাতে একরূপ পেরাসুট থাকিবে। সে সময়ে উক্ত হাউইয়ে যে সকল যন্ত্র থাকিবে তাহাতে উপরস্থ বায়ু স্তরের অবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইবে। বায়ু মণ্ডলের উপরের স্তরের অবস্থা জানাই এই যন্ত্রের উদ্দেশ্য। এই হাউইটী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলিবে। ২৩০ মাইল যাইতে মাত্র ইহার ৩½ মিনিট সময় লাগিবে। এখন কথা এই—বায়ু মণ্ডলে উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করিয়া প্রবল বেগের জন্য বায়ু সংঘর্ষে উহা জ্বলিয়া অনেক সময়ে ভস্ম হইয়া যায়, সে স্থলে এই

হাউইটীও যে সেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে। পণ্ডিতগণ মনে করেন হাউই যখন পৃথিবীর আকর্ষণের সীমার বহির্ভূত হইবে, তখন নিকটস্থ উপগ্রহ চন্দ্রের আকর্ষণে উহা চন্দ্রলোকে যাইয়া পড়িবে। এরূপ হওয়াও কতদূর সম্ভব জানি না। যখন হাউইটী পৃথিবীর আকর্ষণের সীমার বাহিরে যাইবে তখন সেখান হইতেই যে চন্দ্র তাহাকে টানিয়া লইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? যদি উহা পৃথিবী ও চন্দ্রের আকর্ষণের সাম্য স্থানে উপনীত হয়, তবে কি উহা উল্কা সমূহের মত নিজ কক্ষে চলিতে পারিবে না? পণ্ডিতগণই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

তুমি ও আমি।

বড় নগর—বড় সহর
অট্টালিকায় বাস;
বড় রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ায়
চল্‌ছ বার মাস।
কলের জলে স্নানটা চলে,
কর্‌চ তাই পান;
বালাম চাল, বুটের ডাল
উদরে দাও স্থান।
ঘৃত দুগ্ধে তুমি মুগ্ধ
জল খাইতে সুজি—
রসগোল্লা, কাঁচা গুল্লা,
বাদসাভোগ, লুচি।
পয়সা তোমায় ভূতে যোগায়
মস্ত তুমি লোক,
ভাব্‌চ মনে—দিনে দিনে
আরো বৃদ্ধি হোক।
তাতেও তোমার দুঃখ ঘুচায়
নাইকো মনে আশ;
এত যে চাও এত যে পাও—
অভাব বার মাস।

*　*　*　*

লক্ষ্মী ছাড়া, পল্লি পাড়া,
আমার বাড়ীঘর।
গ্রাম্য পথে, কোন মতে,
চল্‌চি নিরন্তর।
খড়ের ঘরে বসত ক'রে
জুড়াই মনের ব্যথা।
ঘরের কোণে বাগান বোনে
লাগাই পাতা লতা।
আউস অন্ন, আমার জন্য—
আহ্লাদে তা খাই।
দামের মলে বিলের জলে
তৃষ্ণা ভুলে যাই।
জলপানি মোর ইক্ষুগুড়,
মুড়ি মুরকি চিড়া।
তাতেই তুষ্ট; দুঃখ কষ্ট
নাইকো মনের পীড়া।
ঘাট বাট, শ্যামল মাঠ,
সবুজ ঘাসের হাসি,
আমার প্রাণে শান্তি আনে,
ভুলায় দুঃখ রাশি।
আমি ক্ষুদ্র, দীন দরিদ্র,
অভাব দিবা রাতি
ত্রিশ দিনে বিশ বিঘে
নাইকো অন্য গতি।
এতেই আমি সুখের স্বামী,
পল্লি মায়ের বুকে।
ছেলে মেয়ে কোলে নিয়ে
থাকি মনের সুখে॥

শ্রীজগদীশচন্দ্র দত্ত গুপ্ত।

জ্যোতিষে প্রত্নতত্ত্ব।

আধুনিক সময়ে ঐতিহাসিক আলোচনা ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং প্রাচীন শিল্প কলা ভাস্কর্য্য ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে নিত্য নব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া মানব সমাজকে কৌতূহলী ও বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিতেছে। মৈত্রেয় লিখিত সিরাজদ্দৌলা, বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গৌরবিবরণ, সরকারের মোগল বৃত্তান্ত প্রভৃতি মানব সমাজকে যত খানি কৌতূহলী ও বিস্মিত করিতে পারে নাই, দশরথ মহিষী কৈকেয়ীকে আর্ম্মেনিয়ান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, কালিদাসকে স্ত্রীলোক ও খনাকে পুরুষ বলিয়া পরিচিত করিবার দক্ষতা, ঢাকার বিক্রমপুর পরগণাটিকে বর্দ্ধমানে বদ্‌লী করার কল্পনা প্রভৃতি সেই পূর্ব্ব-বিস্মিত মানব সমাজকেও হতবুদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই। সুতরাং এতাদৃশ ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ যুগে জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের সামান্য ২।১ টী তত্ত্বকে "প্রত্নতত্ত্ব" বলিয়া প্রকাশ করা বোধ হয় খুব অসমসাহসিকতার কার্য্য হইবে না।

ইতঃ পূর্ব্বে ১৩২৩ সালের ভাদ্র সংখ্যার সৌরভের "ফলিত জ্যোতিষে যবন প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে ফলিত জ্যোতিষের একাংশ যে মুসলমানদিগের নিকট হইতে গৃহীত তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ফলিত জ্যোতিষে উল্লেখিত নানাপ্রকার গণনার বিষয় অবলম্বনে তৎকালীন সামাজিক রুচি ও অবস্থার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

ফলিত জ্যোতিষের অন্যতম অংশের নাম প্রশ্নগণনাধ্যায়। কেহ জন্মগ্রহণ করিলে সেই মুহূর্ত্তের লগ্ন ও গ্রহসংস্থান দৃষ্টে যেরূপ জাতক জীবনের ফলাফল নির্দ্দেশ করা যায়, সেরূপ কেহ কোনও বিষয়ে গণনা করাইবার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সেই জিজ্ঞাসা মুহূর্ত্তের লগ্ন ও গ্রহ সংস্থান করিয়া প্রশ্ন গণনা করিতে হয়। এই গণনাকে তাজিক প্রশ্নগণনা কহে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চপক্ষী মতে, পাশার সাহায্যে—রমল মতে, যৌগিক ক্রিয়াবলম্বনে স্বরোদয় মতে, প্রশ্নাক্ষর সাহায্যে এবং দেবতা, ফল, পুষ্প, নামাক্ষর প্রভৃতি দ্বারা—নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বনে ফলিত জ্যোতিষে প্রশ্নগণনার নিয়ম বিবৃত আছে। কিন্তু তাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধেই বহু গ্রন্থ দৃষ্ট হয় এবং ইহার আলোচনা এত বিস্তৃত যে অন্যান্য প্রণালী তাহার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য বলিয়া মনে হয়। এই প্রশ্নগণনাধ্যায়ে অনেক রকমের প্রশ্নগণনারই উপদেশ আছে; কিন্তু তথাপি কতকগুলি বিষয় বিশেষ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাজিক প্রশ্নগণনাবিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রায় ২০।২৫ খানা গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রত্যেক গ্রন্থেই কোন কোন রকমের প্রশ্নগণনার বিষয়ে সামান্য ভাবে উপদেশ দিয়া কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই বিস্তৃত আলোচনার বিষয়গুলি সমস্ত গ্রন্থেই একরূপ। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে অন্যান্য বিষয়গুলির তুলনায় সেই বিষয়গুলিই তৎকালে খুব বেশী আলোচিত হইত। তাহা হইলে যাহা সমস্ত গ্রন্থেই বিশেষ বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে সেই বিষয়গুলি আলোচনা করিলে সেই সময়ের সমাজ ও জনগণের রুচির এবং কার্য্যাবলীর কতকটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতে পারে সন্দেহ নাই

প্রশ্ন গণনাধ্যায়ে "স্ত্রীচিন্তা" বিষয়ক একটী প্রকরণ আছে; সেই প্রকরণে নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির গণনার সঙ্কেত লিখিত আছে। যথা—

(১) বিবাহ হইবে কিনা? (২) বিবাহ ছাড়া অন্যভাবে স্ত্রীলাভ হইবে কিনা? (৩) কন্যা বরণ করিতে চলিলাম, কন্যালাভ হইবে কিনা? (৪) এই স্ত্রীলাভ ব্যাপার কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইবে? (৫) প্রস্তাবিত কন্যার চরিত্র শুদ্ধ কিনা? (৬) আকাঙ্ক্ষিত রমণীর সহিত কলহাদি হইবে কিনা? (৭) এই রুষ্টা স্ত্রী আবার আসিবে কিনা? (৮) আমি কিরূপ স্ত্রী চিন্তা করিতেছি? (৯) আমি অন্য কোনও রমণী সম্ভোগ করিতে পারিব কিনা? (১০) সম্ভোগ-বিলাস হাস্যাদি যুক্ত হইবে কিনা? (১১) অন্য * * * * হইবে? ইত্যাদি—

উল্লিখিত প্রশ্নের নমুনা দেখিয়া ও প্রত্যেক প্রশ্নগণনা গ্রন্থে উহার বিস্তৃত আলোচনা দেখিয়া, এবং ঐরূপ প্রশ্নের প্রকাশ্যে জ্যোতিষীর নিকট গণনা করাইয়া লইতে লোকে লজ্জিত হইত না বুঝিয়া তৎকালীন সমাজের নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বোধ হয় কেহই উচ্চমত পোষণ করিবেন না। ইহা ছাড়া জন্মকুণ্ডলীর গ্রহসংস্থান ফলে, এবং দশার ফলে লিখিত বহু শ্লোকে বহুস্থানে স্ত্রীলাভ, উত্তম স্ত্রী ভোগ, দিব্যাঙ্গনা লাভ ইত্যাদি বর্ণিত আছে। দশাফলে অনেকেই লক্ষ্য করিবেন, স্ত্রীলাভ ব্যাপারটী একজনের জীবনে ৫।৬ বার উল্লেখিত থাকে। যে স্থানেই উত্তম সময়ের বা উত্তম গ্রহের বা উত্তম যোগের বিস্তৃত ফল লিখিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক স্থানেই রমণীলাভ কথাটী পরিত্যক্ত হয় নাই।

প্রশ্ন গণনার এইরূপ ধারা হইতে আমরা সে কালের জনগণের ও সমাজের রুচির বিষয় যাহা চিন্তা করিতে পারি, সে কালে সাহিত্যের ভিতর হইতেও তাহার আভাস ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আমরা কাদম্বরীতে অবিবাহিত শূদ্রক রাজার গৃহে—কি রাজসভা, কি অন্দর মহল—সর্ব্বত্র স্ত্রীলোক কে প্রহরা কার্য্যে নিযুক্ত দেখি, রাজাকে শত শত যুবতী গণিকা দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্নান কার্য্য সমাধা করিতে দেখি। রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়কে পাঠ সমাপনের পরে পত্রলেখা নাম্নী একটী যুবতীকে তাম্বুল করঙ্ক বাহিনী রূপে দেওয়া হইয়াছিল এবং সে সর্ব্বদা রাজ পুত্রকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিত। এই পত্রলেখা কিন্তু কোনও রাজার দুহিতা, তাহার পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের সহিত তাহাকেও আনয়ন করা হইয়াছিল। তখন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরে বিজিত রাজার রাজ্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করার সময় বিজিত রাজার অন্তঃপুরের রমণীবৃন্দও পরিত্যক্ত হইত না। আধুনিক সময়ে যেরূপ বড় লোককে ডালি দেওয়ার সময় খাসী পাঁঠা দেওয়া হয়, সেইরূপ সেই সময়ে জয়ী রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য উপঢৌকনের সামগ্রী মধ্যে রমণী-রত্ন একটী বিশেষ সামগ্রী বলিয়া গণ্য ছিল। এই ব্যাপদেশে কত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হইত—মুদ্রারাক্ষসের "বিষকন্যা" তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। পরস্ত্রী আত্মসাৎ করার কলা কৌশল সে যুগে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, দশকুমার চরিত পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। মৃচ্ছকটিকে বেশ্যার সহিত আদর্শ নায়কের বিবাহ সঙ্ঘটন করিয়া শূদ্রক কবি সেকালের সমাজের একটী অদ্ভুত রুচির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন সন্দেহ নাই।

একনিষ্ঠ প্রেম তৎকালে খুব বিরল ছিল। বেশী দিনের কথা নহে—শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আত্ম জীবন চরিতে লিখিয়াছেন—তখন কোনও গণ্যমান্য লোককে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার সময় "ইনি ইহার রক্ষিতাকে একখানি ইষ্টকালয় করিয়া দিয়াছেন" বলিয়া গুণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। তৎকালীন সমাজের নৈতিক অধোগতি বিষয়ে সংশয়ের কারণ নাই, তবে জ্যোতিষের মধ্যেও যে ইহা ধরা পড়িয়াছে ইহাই আমার বক্তব্য।

প্রশ্ন গণনাধ্যায়ে যুদ্ধগণনা প্রকরণটী বিস্তৃত। দুর্গ ভঙ্গ হইবে কিনা? কোন দিক হইতে আক্রমণ হইবে? ইত্যাদি প্রশ্নের সহিত অস্ত্রাদি বিষয়ক প্রশ্ন গণনার নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত আছে। তদ্দ্বারা সেই সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ যে একটা নিত্যকার ঘটনা ছিল, তাহারও কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মৃগয়া গণনা, দূরদেশ-স্থিত ব্যক্তি সম্বন্ধে গণনা, বৃষ্টি গণনা প্রভৃতি লক্ষ্য করার বিষয়। এই সমস্ত গ্রন্থ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে রচিত সুতরাং সেই দেশের পুস্তকে বৃষ্টি গণনার বাহুল্য উক্ত দেশের জলাভাবের আভাসই প্রদান করে।

আজকাল কেহ জ্যোতিষীর নিকট স্ত্রী চিন্তাপ্রকরণের বিষয় নিয়া গণনা করাইতে যায় না। ইহা নৈতিক উন্নতির লক্ষণ। যুদ্ধ বিগ্রহ, সন্ধি, বৃষ্টি, মৃগয়া গণাইতেও আধুনিক লোক ব্যগ্র নহে; তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি সে সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। "মোকদ্দমার জয়পরাজয়", "বদলী প্রশ্ন", "পদোন্নতি", "লটারী", "চাকুরী লাভ", 'পরীক্ষায় পাশ না ফেল" ইত্যাদি। ইহার মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে উক্ত লটারী ইত্যাদি নূতন বিষয় গুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্যোতিষ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা নাই, অতি সামান্য ভাবে ইঙ্গিত আছে মাত্র। এই গণনার বিষয়গুলি আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সামাজিক অবস্থানুসারে গণনার বিষয় পরিবর্ত্তন হয় সুতরাং গণনার বিষয় অবলম্বনেও যে সামাজিক অবস্থার একটী আভাস পাওয়া যায় ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকাব্যতীর্থ,
কাব্যরত্ন, জ্যোতিঃ সিদ্ধান্ত।

মা আনন্দময়ী।

(চিত্র)

কর্ত্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমান্ত করিয়া তবে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি উচ্চ শিক্ষিত। গৃহিণীর বিদ্যা ততদূর না গেলেও স্কুলের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকেও সুশিক্ষিতা না বলিয়া উপায় নাই। ওকালতিতে কর্ত্তা বিমল বাবুর পশার মন্দ নহে; গৃহিণী হিমাংশুবালার রমণী সমাজে ডাক হাঁক, জাঁক জমক যথেষ্টই আছে। থাকিবার কথাই তো, তিনি নিজে উচ্চ শিক্ষিতা, তার উপর আবার ধনী।

হিমাংশুবালাকে গৃহিণী বলায় কেহ মনে করিবেন না যে বিমল বাবুর জননী বর্ত্তমান নাই। বৃদ্ধা অন্নপূর্ণা পুত্রের বিবাহ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবশ্যই গৃহিণী ছিলেন, এখন পেন্‌সন্ পাইয়াছেন; পঞ্চাশোর্দ্ধে পেন্‌সন্ পাওয়া আইনের ব্যবস্থা। বিমল বাবুর একটী কন্যা ও একটী পুত্র বর্ত্তমান। কন্যা বিজলী বঙ্কিত-বিধির গণ্ডি কাটাইয়া বিজলী হানিবার মাহেন্দ্রক্ষণে পঁহুছিয়াছে, পুত্র অমলের হাতে খড়ি না পড়িলেও কাগজ পেন্‌সীল পড়িয়াছে। সংসারে একটা দাসী আছে, নামটা তার বজায় সেকেলে, তাই তাহাকে দাসী বলাই এখানে সঙ্গত। আর আছে একটা পুরাণো চাকর। চাকরটার নামের অন্ত নাই—অন্নপূর্ণার নিকট সে সনাতন, ালের গৃহিণী ও বিজলার নিকট সে কখনও বেয়ারা, কখনও বুড়ো, অবিবাহিত বিমলের নিকট ছেলে বেলায় ছিল সে—সনাকাকা, এখন হইয়াছে খানসামা; বালক অমলের এখনও জ্ঞানোদয় হয় নাই, তাই তাহার নিকট সে বুড়াদাই রহিয়াছে।

বিমলের ভদ্রাসন বাড়ী একটা অশিক্ষিত অধিবাসী সমাকুল পল্লীগ্রামে অবস্থিত, তাই শ্যামা পূজার সময় ভিন্ন বিমলের আর দেশে যাওয়া হয় না।

দীপান্বিতার সময় মাকে নিয়া বিমল কয়েকদিনের জন্য বাড়ীতে যান মাত্র। তাঁহাদের বাড়ীটাকে দেশের লোকে 'বাবুর বাড়ী' বলে। এই বাবু শূন্য বাবুর বাড়ী বৎসরের সাড়ে এগার মাসই পেচক, চর্ম্ম চটিকা প্রভৃতি নিশাচরগণের ইজারা দখলে থাকে। বাড়ীতে যে বৃদ্ধ সরকার আছে, সে বাবুর খাজানাদি আদায় তহশীল করে, আর বাকী সময় এই ইজারাদারদিগের সহিত নিষ্ফল লাঠালাঠি করিয়া দিন কাটায়।

পরেশ বিমলের খুল্লতাত ভ্রাতা। সে অতি শৈশবে মাতা পিতা হারাইয়া অন্নপূর্ণার স্নেহে ও তৎপর বিমলের পৈত্রিক সম্পত্তির উপস্বত্বে পুষ্ট হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পন করিয়াছে। স্বীয় অজ্ঞতা নিবন্ধন অন্নপূর্ণা ও উদাসীনতা বশতঃ বিমলচন্দ্র পরেশের এই অনধিকার ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু হিমাংশুবালার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট সে ক্রটী অগোচর থাকিতে পারে নাই; তাই, দুই বৎসর হইল পরেশ স্বাবলম্বন দ্বারা মানুষ হইবার সদুপদেশ সহ এই সংসার হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

(১)

এবার বড় দুর্ব্বৎসর, পাটের বাজার মন্দা থাকায় মামলা মোকদ্দমা নাই বলিলেও হয়। গৃহিণীর ক্যাস বাক্স এবার রজত খণ্ডের মধুর নিক্কনে শব্দায়মান হয় না। ইহাতে হিমাংশুবালার যে কি কষ্ট তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবে না। এই মানসিক অশান্তির ফলটা প্রত্যক্ষভাবে অন্নপূর্ণা ও সনাতনকে এবং পরোক্ষ ভাবে বিমল বাবুকে উপভোগ করিতে হইতেছিল।

কালীমূর্ত্তির বীভৎসতা ও পৌত্তলিকতার বিষয় চিন্তা করিয়া হিমাংশুবালা অনেকদিন হইতে এই বাজে ব্যয়টা উঠাইয়া দিবার জন্য স্বামীকে উপদেশ দিয়া আসিতেছিলেন। এবার অভাবের বাজারে যাহাতে উহা না হয়, তজ্জন্য বিশেষ পীড়াপিড়ি আরম্ভ করিলেন। পত্নীর উপদেশ এইবার অবহেলা করা সাধ্যাতীত বুঝিয়া বিমল বাবু সরকারের উপর নিষেধ আজ্ঞা জারি করিলেন। বুড়া বেচারার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। মুনিবের হুকুম, সে আর কি করিবে? কুলগুরু ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরকে সমস্ত নিবেদন করিয়া সে অশ্রুমোচন করিল। ব্রহ্মানন্দ শিষ্যা অন্নপূর্ণার অভিমত জানা আবশ্যক বোধ করিয়া সহরে আসিয়া অন্নপূর্ণাকে বলিলেন—"তুমি জীবিত থাকিতে

মা আনন্দময়ীর সেবা বন্ধ হইল এ কেমন কথা?" অন্নপূর্ণা অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিলেন—"পাপের শাস্তি পাইতেই না আমি আজও বাঁচিয়া আছি। একে একে সবাই গেল, আমি পাপীরই মৃত্যু নাই।"

ব্রহ্মানন্দ—"মৃত্যু কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে পারে না। কর্ম্মফল ভোগিতেই হবে। বউমা শ্যামা পূজার বিরোধী কেন?"

অন্নপূর্ণা—"আমি কি বল্‌বো?"

বিমল নিকটে ছিল, তাই হিমাংশুবালা অবগুণ্ঠনে কিঞ্চিদ্দূরে উপবিষ্টা ছিলেন। অন্নপূর্ণার কথায় তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল, উত্তেজিত স্বরে সে বলিল—"কাল্পনিক উলঙ্গ মূর্ত্তির বীভৎস ছবি দেখিয়ে ছেলেপুলের হৃদয় কলুষিত ক'রে লাভ কি? বিশেষ পৌত্তলিকতা সভ্যতার বিরোধী।"

গুরু—বিমল, তোমারও কি এই মত?

বিমল—অন্যায় দেখি না। ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি কি?

গুরু—আমি মূর্খ, যুক্তি প্রমাণ দর্শাবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু সব কাজই কি যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়া সম্পাদিত হয়?

বিমল—হওয়া উচিৎ।

গুরু—সকল সময় উচিতের মর্য্যাদাই বা রক্ষিত হয় কই?

বিমল—আপনি কি তবে অন্যায়ের অনুমোদন করেন?

এমন সময় পরেশ আসিয়া প্রথমতঃ গুরুকে তৎপর অন্নপূর্ণা, বিমল ও বৌদিদিকে প্রণাম করিল। পরেশকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রহ্মানন্দ বিমলকে বলিলেন "সে কথা পরে বলিব। বল দেখি, অধুনা চিত্রকরদের ভিতর শকুন্তলাকে ত কেহ দেখে নাই, তবে শকুন্তলার চিত্র অঙ্কিত হইল কিরূপে?"

বিমল—চিত্রকর কালিদাসের বর্ণিত চিত্রে তুলি ও রং এর সাহায্যে প্রতিফলিত করিয়াছে।

গুরু—শকুন্তলা নামে কেহ ছিল কি না তার কি কোন প্রমাণ আছে?

বিমল—ব্যাসের কল্পনাও হইতে পারে।

গুরু—কল্পনায় লিখিত চিত্র ঘরে রাখিতে তবে কোন দোষ নাই?

বিমল—কি দোষ?

গুরু—তবে মা আনন্দময়ী কল্পনা প্রসূতা হইলেই বা তাঁর চিত্র উপেক্ষিত হইবে কেন? মা ত পুরাণাদি দ্বারাই পরিকল্পিত?

বিমল—চিত্র দোষের নহে, কিন্তু শ্যামার উলঙ্গ চিত্র বড়ই কুৎসিত!

গুরু কতক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া বলিলেন—তোমাদের নভেলের কমলিনী, বিনোদিনীর চিত্র হইতেও কি কুৎসিৎ?

পরেশ—বৌদি, তোমার লণ্ডন রহস্য খানা দাও না?

হিমাংশুবালা সঙ্কুচিত করিয়া পরেশের পানে তাকাইয়া বলিল "বিজু তার বাক্সে বন্ধ ক'রে রেখেছে।"

বিমল—কমলিনী, বিনোদিনী প্রভৃতির চিত্র কুৎসিত নহে। আর্টের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উহা বড় সুন্দর।

গুরু—আনন্দময়ীরও দুইটা দিক আছে, শুধু আকৃতি দেখিয়া সমালোচনা চলে না; প্রকৃতিই সমালোচনার প্রধান বিষয়। সংহার মূর্ত্তিময়ী রণরঙ্গিণী মার কার্য্যটাই দেখা উচিৎ। বিদ্যাসাগরের রূপে লোক তাঁহার বশীভূত হইয়াছে এমন কথা ত শুনা যায় নাই,—তাঁর গুণেই লোক বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

হিমাংশু—ছেলে পুলে অত বুঝে না, যা দেখে, তাই শিখে।

গুরু—যা দেখে তা শিখে না,—যা শিখান যায় তাই শিখে। ইংরেজের প্রজাত প্রেম, স্বদেশানুরাগ, শিল্প বানিজ্যোৎসাহ প্রভৃতি গুণগ্রাম শিক্ষিত বাঙ্গালী নরেরাই ত দেখিতেছে, শিখ কেহ তা শিখিয়াছে কি?

বিমল—পৌত্তলিকতা অসভ্যতার নিদর্শন।

গুরু—গীর্জ্জায় যীশুখৃষ্টের চিত্র রাখা হয় কেন? তাহার চূড়াতে ক্রশ চিহ্ন কেন?

বিমল—যীশুর জীবন বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ার জন্য।

গুরু—বাইবেল পড়িলেই ত সব জানা যায়, তবে চিত্রের আবশ্যকতা কি?

বিমল—চিত্রে স্বরূপ উপলব্ধি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হয়।

গুরু—হিন্দুর মূর্ত্তি পূজার উদ্দেশ্যও তাই। মন্ত্রগুলি

পড়িয়া দেখিও, উহাতে পুতুলের উপাসনা নাই—সেই চিন্ময়ী শক্তিরই উপাসনা আছে। আদ্যা শক্তির ষড়ৈশ্বর্য্যের স্পষ্ট উপলব্ধির জন্যই মূর্ত্তির কল্পনা। উহা পুতুল পূজা নহে,—পুতুলের পূজা করিলে ধ্যান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইত না।

এমন সময় বিজলী আসিয়া ডাকিল "বেয়ারা"! সনাতন জড়সড় হইয়া উপস্থিত। বিজলী ভ্রূভঙ্গি করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল "আমার খাবার আনিস্‌নি কেন রে?

সনাতন—দিদিমণি, আমার বড় জ্বর হইয়াছে, তাই যাইতে পারি নাই।

বিজলী—খাবার সময় ত একথাল উ'ড়ে যায়; তখন ত জ্বর আসে না!

বৃদ্ধ নীরব—ব্রহ্মানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারা যায়, কাজ করান যায় না। তুমি বুদ্ধিমান উচ্চ শিক্ষিত, যাহা ভাল বুঝ করিও। তোমার সংসার হইতে এতকাল পরে মা আনন্দময়ীর অন্ন উঠিতেছে দেখিয়া এত কথা বলিলাম।"

অন্নপূর্ণা—ঠাকুর, আনন্দময়ীর অন্ন ওঠে, আমার অন্ন ওঠে না কেন?

গৃহিণী কুটীল নেত্রে শাশুড়ীর পানে তাকাইল।

পরেশ—মা আনন্দময়ীর খাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁর অন্নের অভাব হইবে না। গুরুদেব, আপনি দুঃখ করিবেন না। এও বোধ হয় তাঁর একটা লীলা।

গুরু—দীর্ঘ জীবী হও। যার লীলা মা ই জানেন। আর দুই মাস পরইত দীপান্বিতা? দেখি মা কি করেন।

(২)

পরেশ মহকুমায় জমিদারী কাছারীর নায়েব। মহকুমায় অত্যন্ত কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পরেশ জন সাধারণের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করিয়া দিবা রাত্রি রোগীর পরিচর্য্যা করিতেছে। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা পরেশ ও সেই দারুণ ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। বান্ধব-হীন পরেশকে আর কে দেখিবে? সকলে পরামর্শ করিয়া পীড়িত পরেশকে তাহার উকিল দাদার বাসায় পাঠাইয়া দিল। কিন্তু সেখানে তাহার স্থান হইল না। সংক্রামক ব্যাধি—তাই বৌদিদি তাহাকে বাড়ীতে রাখা বিপদ জনক মনে করিয়া হসপিটালে পাঠাইয়া দিলেন। বিমল বাবু ডাক্তারদেরে বিশেষ রকম অনুরোধ করিয়া দিলেন, যেন পরেশের চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয়।

বুড়া সনাতনের প্রাণটা বড় বেয়াদব। সে রোজই যাইয়া পরেশকে দেখিয়া আসে, এমন কি অনেক সময় তাহার সেবা শুশ্রূষাও করে। হিমাংশুবালা ব্যাধি সংক্রমণের ভয়ে সনাতনকে বলিলেন "অত মায়া দেখাতে হ'লে হস্‌পিটেলে গিয়েই থাক। আমার ছেলে পুলের ঘর।"

অন্নপূর্ণা কয়েক দিন হয় দেশে গিয়াছেন, তাই এসব খবর রাখেন না।

পরেশ অনেটা ভাল হইয়াছে, আজ সনাতনকে অনেক ক্ষণ বসিতে দেখিয়া পরেশ বলিল—"সনাকাকা, অনেক্ষণ এসেছ এখন যাবে না?" সনাতনের বক্ষ চক্ষুজলে প্লাবিত হইল। পরেশ ত অবাক! ক্রন্দনের কারণ সে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—কেন, কাঁদছ দাদা?

সনাতন—গিন্নি মা, আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। দুঃখে ও অভিমানে পরেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

সনাতন—যাব, তুমি একটু ভাল হইলেই আমি যাব।

পরেশ—তবে আর কোথায় যাবে?

সনাতন—যেখানে দুই চক্ষু যায়! ভিক্ষা করে খাব।

পাশের ঘরে নবীন ডাক্তার দাঁড়াইয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল। নিকটে আসিয়া বলিল—"এখনও কি লোকে ভিক্ষা দেয়?"

সনাতন—গৃহস্থ লোক দেয় না ত কি?

পরেশ—ডাক্তার বাবু, এখনও দিন রাত্রি দুটাই আছে।

নবীন—উজ্জ্বল আলোকে দেশ উদ্ভাসিত হইয়া পড়িয়াছে; এই বৃদ্ধের ন্যায় পেচকের আর এখানে স্থান নাই।

পরেশ—মা আনন্দময়ীর লীলা বৃক্ষ পত্রের এক পাশে আলো অপর পাশে অন্ধকার চিরদিনই থাকবে।

ডাক্তারের অনুমতি লইয়া পরেশ সনাতনকে হসপিটালেই রাখিল।

নবীন ডাক্তার বয়সে নবীন; পরেশের সমবয়সী ও স্বজাতীয়। হাসপাতালেই উভয়ের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। পরেশ হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া দুই সপ্তাহ নবীনের বাসায় থাকিতে বাধ্য হইলেন। নবীনের সহোদরা হেমলতার যত্নে ও তাহার মাতা ও ভ্রাতৃ বধুর স্নেহে পরেশ বড় সুখে এই কয়দিন অতিবাহিত করিল। যৌবনোন্মুখী হেমলতার অপরূপ রূপ লাবণ্য পরেশের হৃদয়ে একটা বেশ ভাবান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

(৪)

শ্যামা পূজার আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকি। অন্নপূর্ণা দিবারাত্রি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। এতকাল পর মা আনন্দময়ীর চরণ দর্শনে বঞ্চিতা হইবেন ভাবিয়া তাঁর স্বামী-শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। সারাদিন আনন্দময়ীকে ডাকিয়া ডাকিয়া উপবাসিনী অন্নপূর্ণা অবসন্ন দেহে তন্দ্রাভিভূতা, হইয়াছেন; এমন সময় গুরুদেব আসিয়া ডাকিলেন।

অন্নপূর্ণা উঠিয়া গুরুর পদধূলি গ্রহণে তাঁহাকে বসিতে দিয়া নিজে অদূরে মৃত্তিকায় উপবেশন করিলেন।

গুরু—কি স্থির করিলে ?

অন্নপূর্ণা—কি আর করিব ? আমার হাতে টাকা থাকিলে মা কি আমার ঘরে চরণ ধূলি না দিয়া পারিতেন ?

গুরু—যোগ্য পুত্র সত্ত্বেও তোমার এই দুর্দ্দশা!

অন্নপূর্ণা—ইংরেজী পড়া বউ আমার ছেলেকে বশ করিয়াছে। আমি মন্দ ভাগিনী না হইলে পুত্র আমার পর হইবে কেন ?

গুরু—নিমন্ত্রণ না হয় না হইল। সামান্য ব্যয় হইলেই ত পূজা হইতে পারে।

অন্নপূর্ণা—এক পয়সা খরচ হইলেও সরকারের দণ্ড হইবে ও চাকুরী যাইবে, বিমল এরূপ লিখিয়াছে।

গুরু—তবে কি আর কোন উপায় নাই ?

"যাঁর উপায় তিনিই করিবেন" বলিয়া পরেশ আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিল। সনাতন উভয়ের চরণ ধূলি লইয়া কাঁধের বোচ্‌কা এক পাশে নামাইয়া রাখিয়া ব্রহ্মানন্দের জন্য তামাক সাজিবার চেষ্টা দেখিল। অন্নপূর্ণা পরেশের মস্তক স্পর্শে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "এত শুখাইয়াছ কেন বাবা ?"

পরেশ—কলেরায় বড় টানাটানি করেছিল, জ্যেঠাই মা, কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদের সঙ্গে পেড়ে উঠলো না।

গুরু—দয়াময়ী মা তোমার মঙ্গল করুন!

পরেশ—গুরুদেব, আনন্দময়ীর পূজার আয়োজন করুন; টাকা যত লাগে আমি দিব।

"সত্যি বাবা, সত্যি!" বলিতে বলিতে আনন্দের আবেগে ব্রহ্মানন্দ পরেশকে আলিঙ্গন করিলেন। পরেশ ঠাকুরের পদধূলি লইয়া বলিল "মাত্র এক পুত্রই যে সব কাজ করিবে তার মানে কি ? অপর পুত্র কি কিছুরই অধিকারী নয় ?"

গুরু—অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু প্রবৃত্তি কই ? যে টুকু ছিল বিজাতীয় শিক্ষার ফলে তাও যাইতে বসিয়াছে।

পরেশ—কিন্তু পূর্ব্বাকাশে উষার রক্তিম ছটা দেখা যাইতেছে।

গুরু—এ চপলার ক্ষণিক হাসি, আশার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে পারি না। শক্তির অংশ স্বরূপিনী রমণীই যখন শক্তির সম্মান করিতে ভুলিতেছে, তখন আর আশা কি ?

পরেশ—আশা, যুগ যুগান্তরের ঘাত প্রতিঘাতেও হিন্দুধর্ম্ম স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

গুরু—বিজাতীয় সভ্যতার প্রবল স্রোতে বুঝি সব ভাসিয়া যায়!

পরেশ—যে ভীষণ বন্যা গৃহাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তরুলতা, গো মেষাদি ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেই বন্যাই আবর্জ্জনা রাশি অপসারিত করিয়া বিধৌত ধরা বক্ষে স্বাস্থ্যের নবজীবন সঞ্চার করে। যে তপন কিরণে রোগ প্রবণতা শক্তি বিদ্যমান সেই তপন তাপই প্রাণী জগত ও উদ্ভিদ জগতকে সঞ্জীবিত ও সংবর্দ্ধিত করিতেছে। সুতরাং যে বিজাতীয় সভ্যতার ক্ষণ প্রভায় ভারতবাসী হিন্দুর হিন্দুত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে, সেই সভ্যতাই আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া আর্য্য ঋষিদের প্রবর্ত্তিত বিধি নিষেধের সারবত্তা বুঝাইয়া দিতেছে ও দিবে।

গুরু—আশীর্ব্বাদ করি জয় যুক্ত হও, ধর্ম্মে তোমার অচলা ভক্তি থাকুক।

পূজার উদ্যোগ আয়োজন হইল। সনাতনের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া অন্নপূর্ণা সপরিবারে নবীন ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। পরেশের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও বিমল প্রভৃতি কেহ আসিল না।

মহাধুমধামে শ্যামা মার অর্চ্চনা হইল। হেমলতার শ্রমশীলতা ও বিনয় নম্রতা দেখিয়া অন্নপূর্ণা বিমুগ্ধা হইলেন। গুরুর মত লইয়া হেমলতার সহিত পরেশের বিবাহ দিবার জন্য নবীন ডাক্তারের নিকট তিনি প্রস্তাব করিলেন। ডাক্তারও সানন্দে সম্মতি দিলেন; কিন্তু পরেশ বিবাহ করিতে চায় না। গুরু ও নবীনের কথায় প্রতিবাদ করিয়া সে বলিল—"আমি যুদ্ধে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, এখন বিবাহ করিতে পারি না।"

নবীন—বিবাহ তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে কেন ?

পরেশ—মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া কেন একটী অবলার সর্ব্বনাশ করিব ?

নবীন—ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ভিন্ন কে কার সর্ব্বনাশ করিতে পারে ? আমরা হিন্দু, কর্ম্ম ফলে বিশ্বাস করি।

পরেশ—তর্কে আপনার সহিত আমি আটিয়া উঠিব না, তা জানি।

গুরু—শক্তির সহায়তায় শক্তি সাধনা কত সহজ, তন্ত্রে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বাবা, তোমার জ্যেঠাইমার মনে কষ্ট দিও না।

পরেশ নীরব হইল। নবীন বলিল—"বিবাহ সংস্কার দ্বারা পূর্ণতা লাভ কর, তারপর কর্ত্তব্যাবধারণ করিও। উশৃঙ্খল চিত্ত প্রকৃত কর্ত্তব্যাবধারণে সমর্থ হয় না।

জ্যেঠাইমাকে কষ্ট দিতে পরেশ অসমর্থ; বিশেষতঃ নিজের চিত্তটাও কেমন হইয়া গিয়াছে। তাই প্রতিবাদে তাহার বড় প্রবৃত্তি রহিল না। সুতরাং বিবাহ স্থির হইল।

বিমলের নিকট পত্র গেলে হিমাংশুবালা সম্মতি দিলেন।

এই দুর্দ্দিনে রাঁধুনী বামুনের খরচ টা বাঁচাইতে পারিলে হানি কি ? যথাসময়ে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। নিজে যে স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, সেই দাদার বাসায় হেমলতাকে পাঠাইতে পরেশের আপত্তি থাকিলেও অন্নপূর্ণার সেবা শুশ্রূষার জন্য পরেশ মানাভিমান সমস্ত বিসর্জ্জন দিল। বিমল নববধূ সহ মাতাকে বাসায় আনিলেন। পরেশ কার্য্যস্থলে চলিয়া গেল।

(৪)

আবার দীপান্বিতা আসিল। অন্নপূর্ণা ও হেমলতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও কোন ফল হইল না, হিমাংশু বাসার জেদই বজায় রহিল। বিমলের বাড়ীতে এবার আনন্দময়ী আসিলেন না। অন্নপূর্ণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইলেন; ভক্ত চূড়ামণি পরেশ দেশে নাই, সে বিবাহের ছয় মাস পরেই মেসোপটেমিয়া চলিয়া গিয়াছে।

দিন যেমন যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল। গৃহকার্য্যের যাবতীয় ভার হেমলতার উপর পড়িয়াছে, রাঁধুনী বামন ও দাসী উঠিয়া গিয়াছে। হেমলতা দিবারাত্রি ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত। তাহাতে তাহার আনন্দ ভিন্ন অবসাদ নাই।

প্রতিবেশিনী সবজজ পত্নী প্রমীলাদেবী দ্বিপ্রহরের পর বিমলের বাসায় বেড়াইতে আসিয়াছেন। বাবুদের অফিসে থাকা কালে মেয়েদের এবাসায় ওবাসায় ঘুরিয়া বেড়ান টা সহরের চির প্রচলিত প্রথা। বিজলীর স্কুল বন্ধ, সে এক খানা আরাম কেদারায় অর্দ্ধ শয়ন অবস্থায় থাকিয়া, 'ঘরেবাইরে' পড়িতেছে। হেমলতা পান সাজিতেছিল। যথা বিহিত অভ্যর্থনা ও আসন গ্রহণের পর প্রমীলা হাসিয়া বলিলেন "মেয়েদের লেখাপড়া শেখা কত দরকার মিসের, এখন তা বুঝেছে। ওখানা কি বই বিজু ?"

বিজলি—রবি বাবুর 'ঘরে বাইরে ?'

প্র—বেশ বইখানা কিন্তু। আমাদের উনি আবার এ সব ভালবাসেন না; বলেন পড়তে হয় রামায়ণ মহাভারত পড়।

হিমাংশু—ইংরেজী পড়লেই কুসংস্কার যায় না। এই দেখনা মহাভারতের মত কুৎসিৎ বই পড়বার লোকও এখন রয়েছে।

হেমলতা—কেন দিদি, মহাভারত কুৎসিৎ কিসে ?

হিমাংশু মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—কুন্তী দ্রৌপদীর কথা ও কি কুৎসিৎ হ'তে পারে? প্রাতঃস্মরণীয়াদের কথা!

হেম—আমরা একজনের মনই যোগাতে পারি না—আর দ্রৌপদী পাঁচ স্বামীর প্রতি কেমন অচলা ভক্তি রেখে সংসারের পরীক্ষায় পাড় হয়ে গেছে! স্বামীদেরে সৎকার্য্যে উৎসাহিত করে কত বড় বড় মহৎ কাজ করিয়েছে। বল্‌তে গেলে দ্রৌপদীর মত সহধর্ম্মিনী হয় না,—সে আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

হিমাংশু—তোর নেকামি রেখে দে। অহল্যা দ্রৌপদী তারা কুন্তীর নাম লইয়া তুই স্বর্গে যা, আমাদের ও স্বর্গের প্রয়োজন নাই—

হেম—কুন্তী দেবী পরম পবিত্রতাময়ী রমণী ছিলেন—মন তাঁর কখনও কলুসিত ছিল না।

"তোর এমন বিদ্যা হয় নি যে তোর কাছে আমার উপদেশ নিতে হবে।" বলিয়া হিমাংশু বালা উঠিয়া গেলেন। হেমলতা সঙ্কুচিত হইয়া বলিল "আমারই অন্যায়।"

প্রমিলা—কে বলে তোর অন্যায়? তর্কে হে'রে রাগ করলে কি করা যায় ?

হেম—দিদির সঙ্গে আমার তর্ক করাই অন্যায়। কাজকর্ম্ম ছে'ড়ে তর্ক করা আরও অন্যায়।

প্র—আচ্ছা ছোট বউ, রাতদিন খেটে খেটে তোর কি একটুকু অবসাদও আসে না ?

হেম—দাদার মুখে শুনেছি, ভগবান বলেছেন মানুষকে তিনি এমন ভাবে সৃজন করেছেন যে মানুষ মুহূর্ত্তও কর্ম্ম ছাড়া থাক্‌তে পারবে না। যদি তাই হয়, তবে কাজে বিরক্তি আস্‌বে কেন ?

প্রমিলা—না হউক, একটু সাজ গোজ, একটু আমোদ প্রমোদ কত্তেও কি তোর ইচ্ছা হয় না ?

হেমলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আমিতো বেশ আমোদেই আছি; দুঃখ ত আমার কিছুই নেই।

প্রমিলা—স্বামী তোর রণক্ষেত্রে কি অবস্থায় আছে কে জানে ?

হেম—তাঁর কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে তিনি সেখানে গিয়াছেন, এখানে আমার কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে পারলেই আমি সুখী।

প্রমিলা—কার জন্য খেটে খেটে শরীর মাটি কচ্ছিস্ ?

হেম—মাটির শরীর মাটি হবে, কেউ ফিরাতে পার্ব্বে না। তবে কর্ত্তব্যে অবহেলা করে নারী জন্ম নিস্ফল করবো কেন ?

প্রমিলা—বিজুর বিয়ের কি হলো ?

হেম—এত ছোট বেলায় বি'য়ে দেওয়া দি'দির ইচ্ছে নয়।

প্রমিলা—নমুনা যা দেখা যাচ্ছে,—

অন্নপূর্ণার ডাকে ছোট বউ উঠিয়া গেল।

(৫)

কাছারী হইতে রিক্ত পকেটে ফিরিয়া আসিয়া বিমল বাবু আজ আর টিফিন্ খান নাই; বিমর্ষ চিত্তে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। বৎসরটা ভরিয়াই এবার রিক্ত পকেটে ফিরিতে হইতেছে; কিন্তু অন্য কোন দিন তো এমন ভাব

হন না। পত্নী বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন কারণ জানিতে পারিলেন না, তখন তিনি ক্ষুন্ন মনে শয়ন কক্ষে যাইয়া নভেলের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ভাশুরের অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া হেমলতা কি অসুখ জানিবার জন্ত একবার শাশুড়ীকে একবার খোকাকে পীড়ন করিতেছিল। বিমল তাহা দেখিতেছিলেন আর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন।

সনাতন আসিয়া বলিল—"কর্ত্তা মা, দিদিমণির নেমন্তন্ন, আজ আসিতে তার অনেক রাত হবে।

বিমল— সে কি এখনও স্কুলে আছে?

সনাতন—না, গাড়ী করিয়া গেছেন।

হিমাংশু বালা বাহিরে আসিয়া বলিলেন "কার বাসায় নেমন্তন্ন?"

সনাতন—তা জানি না মা।

বিমল—তা আর জেনে কি হবে? আমার যেমন অদৃষ্ট!

হিমাংশু—কেন গা, অমন কথা বলছ কেন? নেমন্তন্নে গিয়েছে, তার হয়েছে কি?

বিমল—কি আর হবে? যেমন কর্ম্ম আমি করেছি, ফলও তেমি ভোগ করবো। এখন জাতি কুল সব যাবে।

হিমাংশু—মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই যা মুখে আসছে তাই বলছ।

বিমল—তা ঠিক, তবে খারাপ আজ হয় নি, যে দিন তোমায় ঘরে এনেছি সেই দিন থেকেই হয়েছে।

ক্রোধে হিমাংশু বালার অধর কম্পিত হইল, মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া বিমল বলিল—আমার উপর রাগ করলেই দেশের লোকে ভয় পাবে না। দশজন আমার খাতকও না প্রজাও না।"

হিমাংশু—কোন্ হতভাগা বুঝি আমার বিজুর বিরুদ্ধে তোমায় লাগিয়েছে, তাই বিশ্বাস করে বসে আছ। বিজু কি আমার তেমন মেয়ে? সে যেমন লেখা পড়ায় টেক্কা দিয়েছে তেমি গান বাজানাতেও সকলের ভালবাসা কেড়ে নিয়েছে। আমার চাইতেও সে ভাল বাজাতে ও গাইতে পারে।

বিমল—বস্, তবে আর কি! শৃঙ্খলমুক্ত পাখীর মত এখন যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে কিম্বা যা তা করতে আর দোষ কি?

হিমাংশু—দেখ, মিছে চেঁচিও না। পাশের ঘরে তোমাদের গুরুদেব রয়েছেন।

বিমল—গুরুদেব এসেছেন? তবে মা আনন্দময়ীর কৃপা থেকে আমি এখনও বঞ্চিত হইনি! ব্রহ্মানন্দ আসিয়া একখানা চেয়ারে উপবেশন করিলে বিমল তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া নীচে নামিয়া উপবেশন করিলেন।

গুরু—ভাল আছ ত বাবা?

বিমল—আমার ভাল না থাকাই ভাল।

গুরু—কেন? এমন কথা কেন বল? তোমার লক্ষ্মী সংসার।

বিমল—আমিও এদ্দিন তাই মনে কত্তুম। এখন আমার সেই মোহ কেটে গেছে।

গুরু—কি হয়েছে—আমায় খুলে বল তো?

বিমল—কি আর বলবো! আমি নিজের পায় নিজে কুঠারাঘাত করেছি। স্ত্রী কন্যাকে স্বাধীনতা দিয়ে এখন জাতি কুল হারাতে বসেছি। অন্যায়ের আমার অন্ত নাই। মার মনে যে কত কষ্ট দিয়েছি আপনি তা সবই জানেন। তাই পরেশকে নিরাশ্রয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি, রুগ্ন অবস্থায় হাঁসপাতালে পাঠিয়েছি। তার স্ত্রী দিবারাত্রি দাসীর মত এ বাড়ীতে খেটে খেটে অবসন্না, তার দিকে একবার ফিরেও চাই নি; এর উপর আমার স্ত্রীর বাক্য যন্ত্রণা ত লাগাই আছে। শিক্ষাও সংসর্গ-গুণে নাস্তিকতা আমার হৃদয় অধিকার করেছে, তাই মা আনন্দময়ীর জন্ত সামান্ত ব্যয় করাটা অপব্যয় মনে করে মার বুকে শেল নিক্ষেপ করেছি।

গুরু—নিজের ভ্রম বুঝিয়াছ দেখে আমি বড়ই সুখী হইলাম। কুপুত্র হইলেও কুমাতা হয় না,—তুমি বিপথে গেলেও আনন্দময়ী তোমায় ত্যাগ করেন নাই।

বিমল—বিজলী আমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, এখন আমি কি করবো উপদেশ দিন।

গুরু—মাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই তোমার আনন্দময়ী। বিমল মাতার চরণ ধরিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। মারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মা বলিলেন "চল সকলকে লইয়া বাড়ী যাই। সহরে বউ ঝির লজ্জা সরম থাকে না।

গুরু—সহরের দোষ অপেক্ষাও কর্ত্তার দোষ অধিক। কতগুলি কুরুচি পূর্ণ পুস্তক তোমার কন্যার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছ, যখন দেখিলাম গৃহস্থালীর কার্য্য কিছুই করিতে না দিয়া কন্যাকে বাবু বানাইতেছ, যখন দেখিলাম বৃদ্ধ সনাতনকে তিরস্কার করিতে তোমার কন্যা বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিল না, এবং তোমাদেরও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই তখনই বুঝিলাম কন্যার মাথা খাইতে বসিয়াছ। যখন দেখিলাম বউমা আনন্দময়ীর প্রতি ভক্তি হারাইতেছে তখনই বুঝিলাম বিপদ নিকটবর্ত্তী। এখন আর অনুতাপ করিয়া লাভ কি? স্ত্রীকন্যা সহ বাড়ীতে যাইয়া কতকদিন বাস কর, পরে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিয়া সহরে আসিবে।

হিমাংশুবালার নিষেধ সত্তেও বিমল বাবু সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন।

(৬)

কার্ত্তিকমাস, দেশের জল নিতান্ত খারাপ। চারিদিকে নানা রকম ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ সময় বঙ্গদেশের পল্লি-সমূহের প্রায় সর্ব্বত্রই এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। বারমাস কলের জল খাইয়া বিমলের পরিবারবর্গের এই জল সহ্য হইল না। বাড়ীতে কলেরা দেখা দিল। প্রথমেই বিমল বাবু আক্রান্ত হইয়া শয্যা লইলেন। হিমাংশুবালা সহরে যাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপিড়ি করিয়াও কোন ফল করিতে পারিলেন না। হেমলতার পত্র পাইয়া নবীন দা ঔষধের বাক্স সহ বিমলের বাড়ী আসিলেন। আজ হিমাংশুবালার আহ্বানে তাহাদের শুশ্রূষার জন্য আসিল সহরে প্রতিবেশী পুত্র ফটিক ওরফে প্রফুল্ল। প্রফুল্লকে দেখিয়া বিমলের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। বিজলী প্রাণ খুলিয়া প্রফুল্লকে অভ্যর্থনা করিল।

দুই দিন না যাইতেই বালক অমলের দাস্ত আরম্ভ হইল, শুনিয়া বিমলের অবসন্ন প্রাণ আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা অহর্নিশি মা আনন্দময়ীকে ডাকিতেছেন, আর রাজ্যের যতকিছু মানস করিতেছেন। হেমলতার আহার নিদ্রা নাই—ঘর কন্নার কাজ ত আছেই, তার উপর রোগীর শুশ্রূষায় তার ক্লান্তি বোধ নাই।

আজ বিমলের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর আসিয়া কাছে বসিলেন। নানা কথায় অবসন্ন বিমলকে উৎসাহিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। নবীন ব্রাহ্মণের উত্তর সাধকতা করিতেছে এমন সময় সনাতন আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"ডাক্তার বাবু, সর্ব্বনাশ হইল, রক্ষা করুন। ফটিক বাবু দিদিমণিকে খালের ঘাটে নৌকায় তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছে। বিমল বালিসে মুখ গুঁজিলেন,—ডাক্তার এক লাফে ঘরের বাহির হইয়া খালের দিকে ধাবিত হইলেন। বৃদ্ধ সনাতন তাহার অনুসরণ করিল। অন্ধকারে অতি কষ্টে নৌকার অনুসন্ধান হইল। নৌকা ধরা পড়িল। ফটিককে পাওয়া গেল না। বিজলীকে নিয়া সকলে ঘরে ফিরিল। তারপর তিন দিন কাটিয়াছে, রোগীদ্বয়ের অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু বিজলীরও ভেদ বমন আরম্ভ হইল। এবার হিমাংশুবালার চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে শাশুড়ীর চরণ ধরিয়া বলিল—"কি উপায় হবে মা? আমার পাপে যে সর্ব্বনাশ হলো!"

অন্নপূর্ণা—"বাছা, কাঁদিয়া কি হবে? আনন্দময়ীকে ডাক কিন্তু শেষ রাত্রিতে বিজলী সকলকে কাঁদাইয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। মাতা কাঁদিয়া আকুল হইলেন, অন্নপূর্ণার চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশী অস্থির হইয়া উঠিল। হেমলতা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে খোকা ও ভাসুরের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কাঁদিল না কেবল ব্রহ্মানন্দ আর বিমল।

আজ দীপান্বিতা। শ্যামা পূজার আয়োজন হইয়াছে। রোগী দ্বয়ের অবস্থা অনেক ভাল। বড় ডাক্তার আর ভয় নাই জানাইয়া ভিজিট ও পাথেয় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। শাশুড়ী বড় বধু সমস্ত দিন পূজার মণ্ডপে পড়িয়া রহিয়াছেন। হেমলতা সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়াও পূজার আয়োজন ঠিক করিয়া দিয়াছে। পূজায় বসিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "সত্যই মা, তোর দশ হাত আছে।" নবীনের নিষেধ সত্ত্বেও বিমলকে মণ্ডপের বারেন্দায় বিছানা করিয়া দিতে হইয়াছে।

পূজা শেষ হইল গুরু বলিলেন "বলি দাও।" সকলে জোড় হস্তে মাকে ডাকিতে লাগিল। নবীন তীক্ষ্ণধার খড়্গে ছাগ মুণ্ড ছেদন করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনগণ কালী প্রীত্যে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। এমন সময় সনাতন পরেশ পরেশ বলিয়া চিৎকার করিল। সকলে দেখিল পরেশ আসিয়া মণ্ডপের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। হেমলতা একবার পরেশের পানে তাকাইয়া পরক্ষণেই প্রতিমার চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। তাহার অপাঙ্গ বাহিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। পরেশ বলিল "পাষাণি, সামান্য অপরাধে তুই এত বড় একটা বলি না নিয়ে ক্ষান্ত হলি না। বিজুকে ছেড়ে না হয় আমায় গ্রহণ কর্‌তি। বিমল অতি কষ্টে শয্যার উপর বসিয়া বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আয় ভাই, আমায় কোল দে। মা উচিত বিচার করেছেন।"

ব্রহ্মানন্দ ঠিক পরেশ মা উচিত বিচার করেছেন। করুণাময়ীর কত করুণা! বিজলীকে গ্রহণ করে তিনি সর্ব্বাংশে তোমাদের মঙ্গল করেছেন।"

পরেশ—তবে তাই হউক। সর্ব্বমঙ্গলা মা, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

পরেশ যাইয়া বিমল প্রভৃতির পদধূলি গ্রহণ করিল। ব্রহ্মানন্দ যজ্ঞ সমাপনান্তে সকলকে আশীর্ব্বাদ দিলেন। নবীন প্রসাদ বাটিয়া দিল। যুদ্ধে বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখাইয়া পরেশ কর্তৃপক্ষের প্রশংসা ও আদেশ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করার ফলেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিল। হেমলতা বলিল "মার করুণা সবার চেয়ে আমার উপরেই বেশী।" পরেশ হেমলতাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিল—"তাত হবেই তুমি যে তাঁর পূজার যোগাড় দিয়াছ।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত।

সৌরভ

অষ্টম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, শ্রাবণ ১৩২৭। | দশম সংখ্যা।

আলেকসন্দরের পঞ্চনদ আক্রমণ।

(২)

পুরু জানিতেন যে, গ্রীকেরা হস্তীর সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। তিনি ভাবিলেন, তাহারা এই বিশাল কায় জন্তুদিগকে দেখিয়া নিশ্চয়ই বিশেষ ভীত হইয়া পড়িবে। এই খানেই যে তিনি বিশেষ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব। রথের কথা আমরা প্রাচীন পুস্তক সকলে প্রায়ই দেখিতে পাই। ইহার বিশেষ বর্ণনা নিস্প্রয়োজন। আমাদের দেশে রথ যাত্রার সময় যে প্রকারের রথ ব্যবহৃত হয়, ইহা প্রায় অবিকল সেইপ্রকার। প্রভেদ এই যে, প্রাচীন যুদ্ধের রথ সকল একতালা হইত। রথারোহীর পদমর্য্যাদানুসারে ইহাতে এক হইতে আটটা পর্য্যন্ত ঘোড়া ব্যবহার করা হইত। পুরুর সমস্ত রথেই চারিটা করিয়া ঘোড়া ছিল। প্রত্যেক রথের উপর ছয়জন করিয়া লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজন ধনুর্বাণধারী, দুইজন অসিধারী এবং অবশিষ্ট দুইজন চালক বা সারথি। প্রয়োজন হইলে সারথিরাও অস্ত্রধারণ করিত। প্রত্যেক হিন্দু পদাতিক সৈন্যের নিকট তরবারি ও ঢাল থাকিত। এতদ্ব্যতীত তাহারা বল্লম বা ধনুক ব্যবহার করিত। সে সময় ধনুকের দৈর্ঘ্য যোদ্ধার দৈর্ঘ্যের সমান ছিল। বাণ সকল ছয় হাতের কম হইত না। তীর চালাইবার সময় ধনুকের এক প্রান্ত ভূমিতলে রক্ষা করিয়া বাম পদ দ্বারা চাপিয়া ধরা হইত। এই বাণ সকল এমন তীক্ষ্ণ হইত এবং এপ্রকার বেগের সহিত ত্যাগ করা হইত যে, অতি উৎকৃষ্ট বর্ম্ম এবং ঢালও অনায়াসে ভেদ করিয়া ফেলিত। প্রত্যেক হিন্দু অশ্বারোহী সৈন্যের নিকট দুইটা করিয়া বল্লম এবং একটা ঢাল থাকিত।

আলেকসন্দর হিন্দু নরপতির সৈন্য সন্নিবেশ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিলেন যে, সম্মুখ ভাগ হইতে আক্রমণ করিলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। তিনি একদল অশ্বারোহীকে বিপক্ষের বামপার্শ্ব আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি স্বয়ং তাহাদের পশ্চাতে রহিলেন। এই সময় একদল গ্রীক সৈন্য ঝিলমের ঘাট হইতে নদী পার হইয়া হিন্দুদিগের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া হিন্দুদিগের উভয় বাহুর সেনারা বিশেষ সংত্রস্ত হইয়া হস্তী সৈন্যের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহাতে একটা গোলোযোগ উপস্থিত হইল। হস্তীযুথ হিন্দুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিল। মাহুতেরা তাহাদিগকে গ্রীকদিগের মধ্যে চালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহারা গ্রীকদিগের সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অতি ভীষণ বেগে হিন্দু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। পুরু স্বয়ং স্বীয় ছত্রভঙ্গ সৈন্যদিগকে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। গ্রীকদিগের মতে, মহারাজা পুরুর বিশাল বাহিনী এইরূপে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংশ হইয়া গেল। গ্রীকদিগের হতাহতের সংখ্যা ১০০০ এর অধিক হইল না।

আমরা কিন্তু যুদ্ধের এই বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বৈদেশিকের লিখিত ভারত ইতিহাসের অনেক স্থানে আমরা এই ভাবের কাহিনী পাঠ করি। যে স্থানে বিদেশীয় ও দেশীয়ের মধ্যে যুদ্ধ

অভিনয় হইয়াছে সেই স্থানেই দেশীয়ের সংখ্যা বিদেশীয়ের ১০।১২ গুণ। অবশেষে দেশীয়ের সম্পূর্ণ পরাজয়, হাজার হাজার দেশী হত এবং আহত; অথচ বিদেশীয়ের হতাহতের সংখ্যা অতি নগণ্য। উপরোক্ত যুদ্ধের বর্ণনাও কি অনেকটা এই প্রকার নয়? পাঠক দেখিয়াছেন, হিন্দু সৈন্যের সংখ্যা গ্রীক সৈন্য অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। মহারাজ পুরু বীরত্বের জন্য আলেকসন্দরের পর্য্যন্ত প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে গ্রীকদিগের বীরত্বের কথা জানিতেন না, এমত নহে। এরূপ স্থলে ইহা কখনও সম্ভব নয় যে, তিনি যুদ্ধস্থলে একদল কাপুরুষকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। হয় হিন্দুরা কাপুরুষ ছিলেন, কিম্বা তাহারা সংখ্যায় খুব অল্পছিলেন। আর যদি তাঁহারা গ্রীকদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় প্রায় চারিগুণ অধিকছিলেন, তাঁহা হইলে পরিণাম নিশ্চয়ই অন্যপ্রকার হইয়াছিল। যে দিক দিয়াই আমরা ইহার বিচার করি না কেন, গ্রীকদিগের বর্ণনা যে সত্য নহে, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

হিন্দু সৈন্য পলাইল বটে, কিন্তু পুরু একা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বন্দী হইলেন। সেই অবস্থায় যখন তাঁহাকে গ্রীক পতির নিকট আনয়ন করা হইল, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনার সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?" মহারাজ পুরুর সর্ব্বাঙ্গ রুধির প্লাবিত, চারিদিকে ক্ষত চিহ্ন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় তখনও পর্য্যন্ত অদম্য তেজে পূর্ণ ছিল। তিনি গ্রীবা উন্নত করিয়া কহিলেন, "আমি আপনার বন্দী হইলেও ক্ষত্রিয় নরপতি। আপনি হিন্দু নন বটে, কিন্তু আপনি বীর, এই জন্য আপনাকে আমি ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করি। সেই জন্য আমার বিশ্বাস, একজন ক্ষত্রিয় নরপতি অপর একজন ক্ষত্রিয় নরপতির সহিত যে প্রকার ব্যবহার করেন, আমি আপনার নিকট ঠিক সেই ব্যবহার আশা করি।"

আলেকসন্দরের সভাসদেরা একজন পরাজিত বন্দীর মুখে এইরূপ তেজের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এই কথা শুনিয়া গ্রীক বীর যখন সহসা গাত্রোত্থান করিয়া পুরুকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন এবং স্বীয় সিংহাসনের উপর স্থাপিত করিলেন, তখন চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

এই ঘটনায় পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখকেরা আলেকসন্দরকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। কারণ, এ প্রকার ঘটনা তাহাদের ইতিহাসে খুব বিরল। কিন্তু আমাদের দেশে এমন ঘটনার কোনও অভাব নাই। আমাদের দেশের রাজারা অতি প্রাচীন কাল হইতে পরাজিত বিপক্ষের সহিত এই প্রকার ব্যবহারই করিতেন।

এই যুদ্ধের পর আলেকসন্দর দুইটি নগর স্থাপিত করেন। যেখানে পুরু পরাজিত হইয়াছিলেন, সে স্থানে 'নিকয়া' নামক এক নগর সংস্থাপিত হয়। আর যে স্থানে তিনি ঝিলম্ নদী পার হইয়াছিলেন,—তাঁহার প্রিয় অশ্ব প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তথায় এক সহর স্থাপিত হয়।

ইহার পর তিনি পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া কয়েকজন হিন্দু নরপতিকে পরাজিত করেন এবং নির্ব্বিবাদে চেনাব নদী অতিক্রম করেন। তৎপরে তিনি রাবি পার হয়েন। এই স্থানের অধিবাসীরা গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে আত্ম কলহ উপস্থিত হওয়াতে আলেকসন্দর অনায়াসে তাঁহাদিগকে দমন করেন। ইহার পর তিনি বিয়াস্ নদী তটে উপস্থিত হন।

গ্রীক ইতিহাস লেখকগণের মতে, এই স্থানে গ্রীকসৈন্য একত্র সম্মিলিত হইয়া আলেকসন্দরের নিকট উপস্থিত হয় এবং আর অধিক অগ্রসর হইবার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে। আলেকসন্দর তাহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু আর অগ্রসর হইতে তাহারা কোনও মতে স্বীকৃত হইল না। আলেকসন্দর এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। চতুর্থ দিন যখন তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদেরা তাঁহাকে বলিলেন যে, আর অগ্রসর হওয়া মঙ্গলকর নহে, তখন তিনি বাধ্য হইয়া শান্ত ভাব ধারণ করিলেন। সেইদিনই তিনি সৈন্যদিগকে ফিরিবার আদেশ দিলেন। (সেপ্টেম্বর খ্রীঃ পূঃ ৩২৬)। তাঁহার বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ তিনি বিয়াসের তীরে দ্বাদশটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে সকলে ঝিলমের পূর্ব্ব তীরে উপস্থিত হই-

লেন। এইখানে আলেকসন্দর সমস্ত সৈন্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। একভাগ সৈন্য প্রায় ২০০০ নৌকার সাহায্যে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিবে। অপর ভাগ আলেকসন্দরের অধীনে নদীর দুই কূলের পথে ঐ সকল নৌকার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে। অক্টোবর মাসে গ্রীক্ সৈন্য এইভাবে কুচ করিল। পঞ্চম দিবসে গ্রীক্ সৈন্য ঝিলম্ ও চিনাবের সঙ্গম স্থলে উপস্থিত হইল। কথিত আছে, এইখানে তাঁহাদের কয়েক খানি বজরা ডুবিয়া যায়। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে পঞ্জাবের সমস্ত নদীই তখন অন্য পথে প্রবাহিত হইত। এই জন্য আজ প্রায় ২০০০ বৎসর পরে আলেকসন্দরের ফিরিবার সঠিক পথ জানা আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পথিমধ্যে তিনি মলয় নামক এক অতি পরাক্রান্ত পার্ব্বত্য জাতিকে জয় করেন। ইহারা প্রায় ১০০০০০ সৈন্য লইয়া গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। নানা কারণে তাহাদের মধ্যে আত্ম কলহের সূত্রপাত হয় এবং অবশেষে কয়েকজন প্রধান ২ কর্ম্মচারী আসিয়া গ্রীকদিগের সহিত মিলিত হয়।

এই মলয়দিগের বিরুদ্ধে আমরা গ্রীকদিগকে অতি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিতে দেখি। ৫০।৬০ হাজার মলয়কে সামান্য ২।৩ হাজার গ্রীকেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে কচুকাটা করিয়া ফেলিয়াছিল! এই ইতিহাসের লেখক অবশ্য গ্রীসের লোক। এইখানে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল। একবার এক চিত্রকর এক খানি চিত্রে দেখাইয়াছিলেন যে, একজন মনুষ্য নিরস্ত্র অবস্থায় এক অতি ভীষণ সিংহকে পরাভূত করিতেছে। সমস্ত দর্শকই চিত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে এক সিংহী একটি শাবক লইয়া সেই পথে যাইতেছিল। সে ঐ চিত্র দেখিয়া তাহার শাবকটীকে বলিল "যদি চিত্রকর একজন আমাদের স্বজাতি হইত, তাহা হইলে চিত্র ঠিক বিপরীত ভাবে চিত্রিত হইত।" এই কথার সার্থকতা আমরা ইতিহাসে অনেক সময় দেখিতে পাই।

ইহার পর গ্রীকেরা সিন্ধুদেশে প্রবেশ করে। আলেকসন্দর এই স্থানের অধিবাসীদিগকে ও তাহাদের আচার ব্যবহার দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অকাল মৃত্যু আদৌ ছিল না। শতকরা ৯৪।৯৫ জন লোক ১২০ হইতে ১৩০ পর্য্যন্ত বাঁচিতেন। মাদক দ্রব্য কেহই ব্যবহার করিতেন না। দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি অনেক ছিল, কিন্তু সে বিষয় সেদেশীয় কাহারও স্পৃহা ছিল না। অতি সামান্য দ্রব্য দ্বারা তাঁহারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। ভারতের অন্যান্য সমস্ত স্থানে ঐ সময় ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা ছিল বটে কিন্তু প্রাচীন সিন্ধিরা এই প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। সমস্ত দেশের মধ্যে আইন কানুন বা আদালত ও পুলিশের কোনও অস্তিত্ব ছিলনা, কারণ দেশের মধ্যে অন্যায় কার্য্য বড় একটা ঘটিত না।

ঐ সময়ে সিন্ধুর মোহানার নিকট 'পটল' নামক এক সহর ছিল। ঐ স্থানের নরপতি বিনাযুদ্ধে গ্রীক রাজের অধীনতা স্বীকার করেন। আলেকসন্দর এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন।

এইস্থানে তিনি তাঁহার সমস্ত সৈন্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশ কান্দাহার ও সিস্থান্ (প্রাচীন শকস্থান) হইয়া পারস্য অভিমুখে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় অংশ একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে দিয়া পারস্যে প্রেরিত হয়। তৃতীয় অংশকে তিনি স্বয়ং লইয়া গিড্রোসিয়ার (আধুনিক বেলুচিস্থান) ভিতর দিয়া পারস্য অভিমুখে গমন করিলেন (খ্রী. পূ. ৩২৪)।

আলেকসন্দর খ্রী পূ, ৩২৭ সালের মে মাসে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে প্রবেশ করেন। তাহার পর খ্রী পূ ৩২৫ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। অর্থাৎ তিনি সদলবলে ২৫ মাস কাল এই দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ভারতে অবস্থান কালীন তিনি এই দেশের কয়েক স্থানে কয়েকটি সহর স্থাপিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দুই একস্থানে তিনি তাহার স্বদেশীয় স্যাট্রাপ্ বা গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার আড়াই বৎসর পরে তিনি ব্যাবিলন সহরে প্রাণত্যাগ করেন।

এই ঘটনার পর কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে গ্রীক অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনেকের মতে গ্রীক অধিকার লুপ্ত হইবার পরও আলেকসন্দরের পরিত্যক্ত গ্রীক্ সৈনিক পুরুষেরা এই দেশে থাকিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা এই দেশের লোকের মধ্যে মিশিয়া যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠক জানেন, ভারতবাসীর মধ্যে বহুতর বিদেশী জাতি মিশিয়া গিয়াছে। গ্রীক জাতিরা এদেশে বাস করাতে আমাদের মধ্যে স্থপতি বিদ্যার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে গ্রীসের লোক সুকুমার শিল্প ও স্থপতি বিদ্যার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপরদিকে গ্রীকেরাও আমাদের নিকট হইতে জ্যোতিষ, দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান এবং ক্রমে ক্রমে এই সকল বিদ্যা তাঁহাদের নিকট হইতে য়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, আলেকসন্দর আদৌ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই; কারণ তাঁহার অভিযানের কথা ভারতের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কোনও পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইতে সাহস করি না। ইতিহাস লিখিবার প্রথা এদেশে কখনও ছিল না। বিশেষ আলেকসন্দর বিদেশী, বিধর্ম্মী ছিলেন এবং তাঁহার নিকট পদে পদে পরাজিত হওয়াতে হিন্দুরা এসব কাহিনী লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। হর্ষচরিত সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইহাতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত হর্ষ হিন্দু ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত কবি তাঁহার কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর কবি তাঁহার বিষয়ে আর কিছুই বর্ণনা করেন নাই। অশোক ও কনিষ্কের ন্যায় পরাক্রান্ত নরপতি ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দুযুগে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি কিন্তু তাঁহার কাহিনী আমরা কোথাও দেখিতে পাই না।

আলেকসন্দর যে সময় তক্ষশীলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন মগধের সিংহাসনে মহাপদ্ম নন্দ উপবিষ্ট ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক যুবক মহাপদ্মের অতি নিকট আত্মীয় ছিলেন। কোনও কারণ বশতঃ তিনি নৃপতির কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়েন। তিনি প্রাণভয়ে মগধ ত্যাগ করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে গমন করেন এবং আলেকসন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি গ্রীক রাজকে মগধ আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আলেকসন্দর তাঁহার নিকট মহাপদ্মের সৈন্যাদি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ অবগত হন। সে সময়ে নাকি মগধপতির অধীনে প্রায় ১০ লক্ষ সৈন্য ছিল। অনেকে বলেন, এই বিশাল বাহিনীর কথা শ্রবণ করিয়াই আলেকসন্দর মগধ রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হয়েন নাই।

ঐ সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে বহুসংখ্যক স্বাধীন নরপতি রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা সর্ব্বদা পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ করিতেন। একতা তাঁহাদের মধ্যে আদৌ ছিল না। তাঁহারা যদি একত্র মিলিত হইয়া আলেকসন্দরকে আক্রমণ করিতেন তাহা হইলে হয়ত এই অভিযানের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত

সমস্যা।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলেন কলিকাতা পঁহুছিয়াই কলেজ হস্পিটালে চাকুরী লইয়াছে। চাকুরী তাহার করিবার ইচ্ছা ছিল না, হাতে লোক নাই বলিয়া প্রিন্সিপেল তাহাকে খবর দিয়া আনাইয়াছেন; দুই মাসের জন্য কাজ করিতে হইবে মাত্র।

শৈলেনের একটা স্পেপসট ক্যামেরা ছিল। হাসপাতালের কার্য্য শেষ করিয়া বিকালে সেটী হাতে লইয়া শৈলেন দুর্গাদাস বাবুর বাড়ী চলিল।

বাড়ীর নীচের হলে পা দিয়াই শৈলেন দেখিল, ভিতরের বারান্দার নীচে আশা তাহার রংএর বাক্স লইয়া বসিয়া এক খানা ছোট ক্যামভাসে একটী পদ্ম ফুল আঁকিতেছে, আর পারুল পিনাফোর্স দিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া খুব মনোযোগের সহিত তাহা দেখিতেছে।

দৃশ্যটী শৈলেনের নিকট বড়ই সুন্দর বোধ হইতে-ছিল। সে ধীরে ধীরে হলের ভিতর অগ্রসর হইয়া—জানালার পর্দ্দা তুলিয়া তাহার প্লেটভর ক্যামেরায় দৃশ্যটী আটকাইয়া ফেলিল।

তারপর নীরবে উপরে চলিয়া গেল। শৈলেনকে দেখিয়া বকুল কলরব করিয়া উঠিল—"বাঃ, শৈলেন দা যে, কবে আসিলেন? আজ ফটো তুলিলেন নাকি?' শৈলেন ব্যাগটা সাবধানে এক কোণায় টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"বাঃ বকুল দি যে! কবে আসিলে?" বকুল হাসিয়া কুটপাট হইল।

শৈলেন বলিল—"আমি কোথায় গিয়াছিলাম? তোমরাইতো কাশী গেলে, আসিয়াতো ডাকিয়াও একবার জিজ্ঞাসা করিলে না?"

তাতা দৌড়িয়া যাইয়া তাহার বড় দিদি কে খবর দিল। শৈলেনের আগমন বার্ত্তা পাইয়া পারুল উপরে আসিল; সে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল আছেন, শৈলেন দা!"

শৈলেন বলিল—"বড় ভাল নই।"

"কেন? কি হইয়াছে?"

শৈলেন—"তুমি আগে বল, কেন ভাল থাকবো?"

পারুল—"আপনারা ডাক্তার, কত নিয়ম পত্রের বক্তৃতা করেন, উপদেশ দেন, আর নিজের বেলায়ই ভাল থাকিবেন না?"

শৈলেন—"ডাক্তারী করিইতো লোকের অসুখ বিসুখ হবে বলিয়া—এবং চিকিৎসা পত্র করিব বলিয়া।"

পারুল—'তবে কি অসুখ বিসুখ মানুষের ধর্ম্ম?"

"আমার তো মনে হয় তাই—শরীরং ব্যাধিমন্দিরং।" বলিয়া শৈলেন হাসিল।

হাসিতে হাসিতে শৈলেন বলিল—"নগেনকে কোথায় গুম করিলে?

পারুল গম্ভীর ভাবে শ্বাস না ফেলিয়া বলিতে লাগিল—"তাঁর অসুখ, কাশীতে আছেন, প্লেগ হইয়াছিল। বাবা যোগ-জীবন ব্রহ্মচারী চিকিৎসা করিতেছেন। শরীর হইতে অনেক রক্ত ফেলিয়া দেওয়ায় তিনি খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।"

শৈলেন জিজ্ঞাসা করিলে—সে খানে আর কে আছে, তোমরা কিরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিলে?"

পারুল বলিল—তিনি আমাদের সঙ্গে আসেন নাই। পর দিনও না পঁহুছায় এবং কোন চিঠি না পাওয়ায় বাবা urgent টেলি করেন; তাতেও কোন উত্তর আসে না। আমরা আসিবার দিন তাঁহার শরীরে হঠাৎ বেদনা হইয়া ছিল—তাই টেলিগ্রামের উত্তর না পাওয়ায় আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম না। বাবা ঠাকুর মার নিকট চিঠি লিখেন ও টাকা পাঠান। পাঁচ দিন পর ঠাকুর মার চিঠির উত্তর আসিল—নগেন বাবুর প্লেগ হইয়াছিল—ব্রহ্মচারী রক্ত মুক্ষণ করিয়া প্লেগ থামাইয়াছেন- এখন জ্বর আছে—শরীর বড় দুর্ব্বল, ব্রহ্মচারী ঔষধ দিতেছেন—এবং বলিতেছেন জ্বর ধীরে ধীরে যাইবে। অন্ততঃ এক মাসের কমে শরীর সুধরাইবে না। প্রয়োজন হইলে রক্ত আরও ফেলিয়া দিয়া তাজা রক্ত শরীরে প্রবেশ করাইতে হইবে। কাল বিধু বাবুকে তাঁহার শুশ্রূষার জন্য পাঠান হইয়াছে। ডাঃ বাক্‌চির নিকটও বাবা চিঠি দিয়াছেন।

শৈলেন চিন্তিত হইল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কোন তারিখে কাশী হইতে রওয়ানা হইয়াছ?"

পারুল—"৭ আগষ্ট—সোমবার।"

শৈলেন "নগেনের বেদনা কোন সময় হইয়াছিল?"

পারুল—"বিকালে তিনটা চার টার মধ্যে ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়াছিলেন,—সেই খানেই তাঁহার বেদনা হয়। শৈলেন দা, আশ্চর্য্য হইবেন, ব্রহ্মচারীর কথা শুনিলে—তিনি নাকি নগেন বাবুর দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ হইয়াই বলিলেন, তোমার মহাগুরু তোমার উপর বিরক্ত,—তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না! নগেন বাবু কলিকাতা আসিবেন বলিলে ব্রহ্মচারী বলেন—আজ কলিকাতা যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব!' এইরূপ অনেক আশ্চর্য্য কথা। এখন দেখিতেছি, হয় ব্রহ্মচারীই গোপনে বুজরুকি দেখাইবার জন্য কিছু করিয়াছে, নয় আর কি বলিব?"

শৈলেন বলিল—"ব্রহ্মচারী মহাপুরুষ। তাঁহার কথা সত্য। ঠিক ঐ সময় ৭ই আগষ্ট সোমবার নগেনের

পিতা তাহার উপর খুব দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে ছিলাম। নগেনের সময় ভাল নহে। এই সময় আমার তাহার নিকট যাওয়া উচিত ছিল—কিন্তু কি করি?"

ব্রহ্মচারীর রক্ত চিকিৎসার ও কারলীর রাজ কুমারের কথা পারুলের বলিবার বড় আগ্রহ ছিল; শৈলেনের মুখের ভাব দেখিয়া পারিল না।

পারুল বলিল—আপনি আর কেন যাইবেন? বিধু বাবুই আছেন। ঠাকুর মাও সেই বাড়ীতে আসিয়াছেন। সে বাড়ী যে আমরা ছ মাসের জন্ম ভাড়া করিয়াছিলাম; না হইলে প্লেগের রোগী লইয়া উপায় ছিল না।"

শৈলেন অনেক কথা বলিবে, পারুলও শৈলেনের নিকট অনেক কথা বলিবে—উভয়ের এরূপ ইচ্ছা ছিল। নগেনের বিপদ বার্ত্তা উভয়েরই অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। উভয়েই চুপ করিয়া রহিল।

এই সময় গৃহিণী আসিয়া শৈলেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কবে আসিলে বাবা?"

শৈলেন—"পরশ্ব আসিয়াছি। আসিয়াই কলেজ হাসপাতালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এসিষ্টেন্ট বিদায় নিয়া গিয়াছেন, আজ একটু অবসর পাইয়াছি—তাই আসিতে পারিলাম।"

গৃহিণী বলিলেন—নগেনের কথা শুনিয়াছ তো! আমার ইচ্ছা ছিল না, তাকে রাখিয়া আসি। তার ঐ কুসংস্কার—ব্রহ্মচারীর কথায় ভুলিয়া—

পারুল বাধা দিয়া বলিল—"না মা, ওই ব্রহ্মচারী বাবা নাকি মহাপুরুষ—এই না শৈলেন দা বলিলেন"

শৈলেন গৃহিণীর নিকট পুনরায় সকল কথা বলিল।

গৃহিণী বলিলেন "এখন বাবা যদি তাহাকে আরোগ্য করিয়া দেন।"

এইবার গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"শৈলেন, বাবা এবার কিন্তু কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি। বাবা বিশ্বেশ্বরের জাতি নষ্ট করিয়া দিয়া আসিয়াছি।"

শৈলেন বলিল—"সে কেমন?"

তখন পারুল শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্বেশ্বর দর্শন ও স্পর্শন কাহিনী বিবৃত করিল।

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"বিশ্বেশ্বর যে জগতের সর্ব্ব জাতিশ্বর। তাঁহার জাতির কি আর ক্ষয় আছে?" হাসিয়া গৃহিণী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

শৈলেন বলিল—"তবে আজ আসি।

পারুল—"বিকালে চা না খাইয়া এতদিন পরে যাইতে পারিবেন না।"

শৈলেন—"মনটা বড় খারাপ হইয়াছে, তোমাদের সেই গানটী যদি শুনাইয়া দাও যতক্ষণ বল থাকিতে পারি। মনে এখন একটু শান্তির প্রয়োজন।"

"তবে বরাবর আসিবেন কিন্তু!" বলিয়া পারুল বকুলকে লইয়া গিয়া অর্গেন খুলিল।

*   *   *   *   *

শৈলেন মুগ্ধ চিত্তে গান শুনিল। তারপর চা পান করিয়া চলিয়া গেল।

যাইবার সময় পারুল স্মরণ করাইয়া দিল "মনে থাকে যেন।"

শৈলেন বলিল—"পরের চাকরী। দেখা যাবে।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ চৌদ্দ দিন। নগেন একভাবে শয্যায় শুইয়া আছে। সে যখনই চক্ষু মেলিয়া চায়, তখনই যেন জীবন্ত স্বপ্ন তাহার চোখের উপর খেলা করিতে থাকে। সে কিছু দিন পূর্ব্বে ষ্টারে আবুহোসেনের অভিনয় দেখিয়াছিল। তাহার মনে সেঅভিনয় কিছুদিন বেশ আমোদ দিয়াছিল—আজ কয় দিন যাবৎ যেন তাহা তাহার নিকট প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নগেনের জ্বর ছাড়িয়াছে কিন্তু ভাল করিয়া কথা বলিবার কি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা হয় নাই। চিৎ হইয়া নিঃশব্দে শুইয়া থাকে, আর সময় সময় তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট কিশোরীর প্রদত্ত চামচে দেওয়া বেদানার রস ও ঈষৎ গরম দুগ্ধ পান করে। দুঃখিনীও এক দৃষ্টে রোগীর মুখের দিকেই তাকাইয়া আছে। যখনি রোগী চক্ষু মেলিয়া চাহিতেছে, তখনই সে চামচে করিয়া বেদানার রস তুলিয়া দিতেছে। শরীর ঘামিলে শরীরের

ঘাম মুছাইয়া কাপড় টানিয়া গায়ে তুলিয়া দিতেছে। বাতাসের প্রয়োজন হইলে পাখায় বাতাস দিতেছে। ইঙ্গিতে যেন সকল কার্য্য হইতেছে।

দুর্গাদাস বাবুর মা এবং বিধু বাবুও যত্নের ত্রুটী করিতেছেন না; তাঁহারা রোগীর পথ্য প্রস্তুত কার্য্যে ও বাহিরের নানা যোগাড়ে ব্যস্ত। মহেশ ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ভীত প্রকৃতির লোক, সে মাঝে মাঝে বাহির হইতে সংবাদ লইয়া চলিয়া যায়। ব্রহ্মচারী কদাচিত আইসেন। বিধু বাবুকে প্রতি দিন ৮টায় যাইয়া রোগীর অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়া আসিতে হয়।

দুঃখিনীকে বৃদ্ধা কৃপার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। কাশীধামের অজ্ঞাত কুলশীলা কিশোরী ও যুবতীদিগের প্রতি বৃদ্ধার সে ঘৃণা তাহা দুঃখিনীরও ছিল। মহেশ ভট্টাচার্য্য যখন উপায়হীন হইয়া শুশ্রূষাকারীর অভাবের কথা বৃদ্ধাকে প্রথম দিন বলিয়া ছিল, বৃদ্ধাই তখন তাহাকে বলিয়াছিলেন "টাকা হইলে কাশীতে এমন লোকের অভাব হইবে না।" তারপরেই মহেশ এই যুবতীকে লইয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং বৃদ্ধা তখন ব্রহ্মচারীর মা সম্বোধনের কোন বিশেষত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন না। তাহাকে ঘৃণার চখেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই দুই সপ্তাহ ধরিয়া তাহার ব্যবহারে ও সেবায় তাহার প্রতি বৃদ্ধার কৃপার ভাব বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিধু যখন প্রথম বৃদ্ধার নিকট যুবতীর পরিচয় চাহিয়াছিল, তখন বৃদ্ধা বিধুর দৃষ্টিকে ভয় পাইয়া বলিয়াছিলেন "ওতে আমাদের কি দরকার বাবা, আমাদের কাজ হউক, যোঁক দিলে—কঠিন, মারাত্মক রোগ,—লোক পাওয়া দায় হইবে। তখন খাটুনী বাড়িবে তোমারই বাবা বেশী।"

বিধু বুঝিয়াছিলেন, এবং বৃদ্ধের সন্দেহে লজ্জিত হইয়াছিলেন। ইহার পর বিধু এ সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট উত্থাপন করেন নাই। যুবতীর প্রতি তাঁহারও দৃষ্টি প্রীতির ধারাই চালিয়াছিল।

বিধুর অনেক দিন ইচ্ছা হইয়া ছিল, দুঃখিনীর সহিত আলাপ করে, তাহাকে সদুপদেশ দিয়া নারকীয় পথ হইতে উদ্ধার করে, এবং কলিকাতা লইয়া গিয়া অনাথ আশ্রমে তাহার স্থান করিয়া দেয়।

পতিতার জীবনের ভবিষ্যৎ চিত্র ভাল করিয়া নাবুঝাইয়া দিলে, যৌবনোন্মুখ কিশোরীকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করা যে অসম্ভব কার্য্য, তাহা বিধু বুঝিত, তাই দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা তাহার মনে ধর্ম্মভাব প্রদান করিবার অবসর সে খুঁজিতেছিল। বিধুর সেরূপ অবসর যথেষ্ট থাকিলেও দুঃখিনীর তাহা ছিল না। সে রোগীর শয্যা ছাড়িয়া অতি অল্প সময়ই উঠিত। বাহ্যি প্রস্রাব ও স্নান-আহারের সময় ব্যতীত আর কোন কার্য্যে তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইত না।

দ্বিপ্রহরে নগেনের তন্দ্রার ভাব দেখা গিয়াছিল। বৃদ্ধাও আহার করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। অবসর বুঝিয়া বিধু রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া দুঃখিনীকে বলিল—তুমি নিয়ত অবিশ্রাম খাটছ দুঃখিনী, একটু rest নাও। আমি পাখা করছি। বসো তুমি ও দিকে একটু।"

দুঃখিনী উঠিল না। একটু পাছ ফিরিয়া বসিল মাত্র।

বিধু বলিল—"তুমি কি লেখা পড়া জান?"

দুঃখিনী নীরবে বসিয়া রহিল। উত্তর করিতে পারিল না।

বিধু আরও কয়েকটা পাইল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু একটীরও উত্তর দিল না। বিধু একটু নিরাশ হইল বটে কিন্তু কথা বলিতে নিরস্ত হইল না।

বিধু দুঃখিনীকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল "জগতে পাপীকে ঘৃণা কে না করে? পাপী যখন তাহার আত্ম পাপের প্রায়শ্চিত্য প্রত্যক্ষ করে, তখন সেও নিজের প্রথম জীবনের দুষ্ক্রিয়ার জন্য repent করে থাকে, নিজকে ধিক্কার দেয়, কিন্তু তখন তাহা too late-ও সময় দিলে তো তা আর জীবনের কোন উপকার আসে না। সময়ে নিজের mistake সম্বন্ধে চলাই উচিৎ। আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক, পাপকে ঘৃণা করি, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করি না। যদি এখনও ভুল ভেঙ্গে সমাজের বক্ষে আশ্রয় লও, Rescue houseএ বা orphanageএ তোমার স্থান করে দিতে পারি। জীবনকে সুপরিচালিত করবার সেখানে বিস্তর উপায় আছে। সূচীর কার্য্য, সেলাইর

কার্য্য, ধাত্রীবিদ্যা, সেবা শুশ্রূষা শিক্ষা করিয়া সমাজে good life lead কত্তে পার। পতিতার জীবনের জঘন্য পরিণাম আর তোমাকে প্রত্যক্ষ কত্তে হয় না।—"

বিধু দুঃখিনীর দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল।

দুঃখিনীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝড়িতেছিল।

বিধু মনে মনে বুঝিল "যখন অনুশোচনা এসেচে তখন উদ্ধারের চেষ্টা দুশ্চেষ্টা হইবে না।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহিণী দুর্গাদাস বাবুকে বলিলেন—"এতগুলি খরচ-পত্র হইবে, ইহাতে কি মেয়ের মত নেওয়া প্রয়োজন না। পনর ষোল বৎসরের, মেয়ে, ছেলেমানুষ তো নয়!"

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—"নিতে চাও নেও।"

গৃহিণী বলিলেন—"অবশ্য পারুল আমার তেমন মেয়ে নয়। তথাপি তার মত নেওয়া খুবই উচিত। আমি আজই তাহাকে এ সম্বন্ধে দু-চার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিব।"

যথাসময়ে গৃহিণী কন্যাকে অন্তরালে লইয়া কথা পারিলেন।

"যতীন বোস যে আমাদের খরচে আমেরিকা যাইতেছে, তাকি তুই জানিস মা?"

পারুল হাসিয়া বলিল—"তা আর জানি না? নগেন বাবুও তো যাইবেন কথা ছিল, তার কি হইল মা?"

মা বলিলেন, "নগেনের ব্যারাম হইয়া গেল, সে আর এবার যায় কি করিয়া, এবার একজনকেই পাঠান হউক, ইহার অবস্থা দেখিয়া বরং পরে—আগামী বৎসর তাহাকে পাঠান যাইবে। যতীন বোসকে আমরা কেন খরচ দিতেছি, তাহাও তুই জানিস তো?"

পারুল হাসিয়া বলিল—খুব ভাল জানি না; তবে শুনিয়াছি। তা মা, এ বিষয়ে বকুলের মতটা নেওয়া উচিত, আমি মনে করি।"

মেয়ের কথায় মার গোল বাঁধিল। তিনি কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিবার জন্য বলিলেন—"ওকে কেন জিজ্ঞাসা করিব? ও কি তোমার মত বলিবে?"

পারুল—"ও আমার মত কেন বলিবে, ও তারই মত বলিবে।"

মা হাসিয়া বলিলেন—তার মতের প্রয়োজন?"

পারুলও হাসিয়া বলিল—"তবে আমার মতের কি প্রয়োজন হইবে?"

মা—"এখন তোমার মতেরই প্রয়োজন?"

পারুল হাসিয়া বলিল—"তুমি না পার বরং আমিই জিজ্ঞাসা করিব।"

তাই—মা বুঝিলেন পারুল পূর্ব্বে ভুল শুনিয়াছে, এখনও ভুল বলিতেছে। তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিলেন "যতীনের সহিত তোমারই বিবাহের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বড় বোনের না হইলে কি ছোট বোনের বিবাহ হইতে পারে?"

পারুলের মুখ চোক্ লাল হইয়া গেল—সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

মা মেয়েকে আদর করিয়া নিকটে টানিয়া লইয়া গামছা দিয়া গা মুছিয়া দিতে দিতে বলিলেন—"তুই কি তা শুনিস নাই?"

পারুল সংক্ষেপে উত্তর দিল—"না।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"তবে এখনতো শুনিলি—উত্তর দে।"

পারুল হাসিয়া বলিল—"আমাদের বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ আছে—"

মা বুঝিয়া বলিলেন—"না হয় কাল বলিস, চিন্তা করিয়াই বলিস।"

"আমি বকুলের মতই তোমাকে জানাইব মা।" বলিয়া পারুল চলিয়া গেল।

বকুল তাহাদের পাঠের কোঠায় বসিয়া মৃণালিনী পড়িতেছিল আর হারমোনিয়াম যোগে আস্তে আস্তে তাহার গানের সুর ভাজিতে ছিল। পারুল গিয়া কোন ভূমিকা না করিয়াই তাহাকে বলিল—"তোর যে বিবাহ বকুল।"

সে এই মাত্র মুখরা গিরিজায়ার কথা গুলিই চিন্তা করিতেছিল, তেমনি মুখরার ন্যায় বলিল—বর তুমি নাকি দিদি?" বলিয়াই বকুল খুব একদম হাসিল।

পারুল হাসিয়া বলিল—কেন লো?

"বড় বোনের বিবাহটাওতো হওয়া চাই—তাই জিজ্ঞাসা করিলাম।"

পারুল বলিল—"বর যতীন মাষ্টার'।"

সার যে গুরু, গুরুর সঙ্গে, কি শিষ্যার বিবাহ হয়? গুরুর সঙ্গে গুরুর বিবাহ। তুমিও আমার গুরু, তিনিও আমার গুরু, গুরুতে গুরুতে মিল।" বকুল আবার হাসিল।

পারুল নিরাশ হইয়া বলিল—"সে কি কখনও হয়?"

বকুল—"হয় না, বলিয়াই কি তোমার মাথার ভারি মোট আমার মাথায় ফেলিয়া দিবে?"

পারুল বলিল—"সে তো আর আজই নয়—দুই বছর পরে—সাহেব হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলে পরে।"

বকুল বলিল—'ও সাহেব সুবা লরেন্স ফষ্টর, হারুন অল রসিদ—আমার উপর এ অত্যাচার কেন?"

পারুল ঠাট্টার স্বরে হাসিয়া বলিল—"তবে আপনি চান কি?"

"আমি চন্দ্রশেখরও চাই না, গোবিন্দলালও না, নগেন্দ্র নাথও না, নবকুমারও না—চাই আমি হেমচন্দ্র—।" বলিয়া বকুল হার্ম্মনিয়ামে গান ধরিল—

'আমার তরে যে সপিবে দেহ,
আমার তরে যে সপিবে প্রাণ
তার তরে মোর আঁখি বরষিবে
এ বীণা তাহার গাইবে গান।—"

পারুল আশা ছাড়িল না।

বিকালে চাএর বৈঠকে পারুল তাহাদের কুঞ্জবনে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিল। শৈলেন এ প্রস্তাবে খুব সমর্থন করিল। যতীন মাষ্টারেরও মত লওয়া হইল। বকুল দিদির অনুগামিনী, সুতরাং তাহার মত হইতে অবশ্যই রহিল।

রবিবার ৩ টায় টালিগঞ্জ যাওয়া স্থির হইল।

দান ও দয়া

ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বুদ্ধিতা নিয়া নানারূপ কিংবদন্তী প্রায় সব দেশেই কম বেশী রহিয়াছে। কবে কোন্ ব্যক্তি, যে ডালে বসিয়া ছিল, সেই ডালেরই গোড়া কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাই নিয়া আমাদের যত রসিকতা; এবং পাছে জিনিষটী লোকে বিস্মৃত হইয়া যায়, সেই জন্যই বোধ হয় কালিদাসের মত একটী প্রসিদ্ধ নামের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে।

বস্তু বা বিষয়ের পারম্পর্য্য যে ঠিক মত রক্ষা করিতে পারে না, ইংরেজী প্রবচন অনুসারে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়, ঘোড়াটীকে গাড়ীর সম্মুখে রাখিবার জন্য। এখানে অবশ্যই ইঙ্গিত হইতেছে যে, কোনও এক নির্ব্বোধ ব্যক্তি ঘোড়া দিয়া গাড়ী টানাইতে গিয়া গাড়ীর পিছনেই ঘোড়াটাকে জুড়িয়া দিয়াছিল; কিন্তু কোথায় কবে যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কোন প্রত্নতাত্ত্বিকই বোধ হয় জানেন না। এই রকম একটা উল্টা বুদ্ধির কথা, বুদ্ধিমান্‌কে স্মরণ করাইয়া দিয়া সতর্ক করিবার জন্যই বোধ হয়, হোলির রাজা ঘোড়ার লেজের দিকে লাগাম লাগাইয়া থাকেন।

কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চিন্তা করিতে বা কাজ করিতে সকলেই সকল সময়ে পারে না। ভুল ভ্রান্ত হওয়া মানুষের স্বাভাবিক; "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"। কিন্তু এইরূপ ভুল ব্যক্তিরই বিশেষ করিয়া হয় সাধারণ লোকে ইহাই মনে করে। কদাচিৎ দেখা যায়, কোন কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা নিকৃষ্ট শ্রেণীবিশেষের উপর নানা ভঙ্গিতে নির্ব্বুদ্ধিতার বোঝা চাপাইয়া দিয়া থাকেন। যেমন, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নানাপ্রকার নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার কাহিনী যদিও স্বয়ং ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্ম্মাও রচনা করিয়াছেন, তথাপি সেটা বোধ হয়, ধনীরই মনস্তুষ্টির জন্য। ধনী যখন সমাজে প্রাধান্য উপভোগ করেন, তখন দরিদ্রকে নিয়া রঙ্গরস করা অস্বাভাবিক নয়। ঠিক তেমনই তাঁত, জোলা প্রভৃতিকে নিয়া নানারূপ রসের কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। তার মধ্যে বেশীর ভাগই ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা নিয়া রচিত।

এইরূপে দেখা যায়, ঘটনার প্রক্রম ভঙ্গরূপ যে মানসিক ব্যাধি, সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে সেটা অশিক্ষিত ব্যক্তি বিশেষ বা নিকৃষ্ট শ্রেণীবিশেষকে অতিক্রম করিয়া অন্যে সংক্রামিত হয় না। অর্থাৎ সমাজের যাঁরা শ্রেষ্ঠ, যাঁরা শিষ্ট, তাঁহাদের কার্য্যে বা বিশ্বাসে বা ধারণায় কোন গুরুতর নির্বুদ্ধিতা বর্ত্তমান থাকিতে পারে, ইহা আমরা সহসা মনেই করিতে পারি না। বরং শিষ্টদের আচারই অন্যের আদর্শ, শিষ্টদের বিশ্বাস ধারণাই অন্যের অনুকরণীয় "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"। আমরা সহসা ভাবিয়াই উঠিতে পারি না যে, যাঁহারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাঁহারা আবার ভুল করিবেন কি করিয়া। অবশ্যই ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দূরদৃষ্টিতে অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনও এক যুগে, কোনও এক সমাজে অতি বড় বিশিষ্ট যাঁরা, তাঁরাও অবস্থা বিশেষে এমন এক এক ভুল করিয়া বসেন, যার জন্য পরবর্ত্তীদের যথেষ্ট ভুগিতে হয়। ধর্ম্মের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট রহিয়াছে; কেন না, সেখানে পরবর্ত্তীরা পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে সাধারণতঃ ভ্রান্ত মনে করিবেন, ইহাই যেন নিয়ম। রাষ্ট্রের ইতিহাসেও ভুল ভ্রান্তির কথা রহিয়াছে। ইহার জন্য নথী পত্র ঘাটিয়া নজীর বাহির করা নিষ্প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক যে এরূপ বিশিষ্টদেরও ভ্রান্তি ধরিতে পারেন, তাহার মধ্যে মনস্তত্ত্বের একটা রহস্য নিহিত রহিয়াছে। ভুল আমরা সেই সব লোকেরই দেখিতে পাই, যাদের চেয়ে নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকি। প্রাচীনদের চেয়ে আমরা অনেক বিষয়ই বড়, এই বিশ্বাস আমাদের রহিয়াছে বলিয়াই আমরা উহাঁদের ভুল দেখিতে পাই। যেখানে সে বিশ্বাস নাই,—যেমন হিন্দু সমাজে,—সেখানে নবীনদের সহস্র ভুল চোখে পড়িলেও প্রাচীনদের বাক্য ঋষিবাক্য, সুতরাং অভ্রান্ত।

নিজের বেলার ব্যক্তি যে ভুল ধরিতে পারে এবং তজ্জন্য তাহার যে অনুশোচনা হয়, তাহার মধ্যেও ঐ একই নিয়ম। যে মুহূর্ত্তে আমি ভুল করি, তার চেয়ে, যে মুহূর্ত্তে আমি ভুল ধরি, সেই মুহূর্ত্তের আমি শ্রেষ্ঠ। কোনও এক অবস্থা বিশেষের ঊর্দ্ধে যে উঠিতে পারে না, সে কখনও নিজের ভুল দেখিতে পায় না। শিশু যখন যুবক হয়, তখনই শৈশবের ভুল তার চোখে পড়ে; যে চিরকালই শিশু থাকে, তাহার জগতে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

বর্ত্তমানে আমরা শিক্ষিত শ্রেণী সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিয়া আসিতেছি। আমাদের চিন্তা এবং কর্ম্মের গতি একটা বিশিষ্ট ধারা অনুসারে চলিতেছে। সেটাকে শ্রেষ্ঠ মনে করাই আমাদের স্বভাব। আর একটা মানসিক পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিবে। সুতরাং এখন যদি এমন দুঃসাহস কাহারও থাকে, যাহাতে সে আমাদের ভুল দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে শুধু যে মতভেদ হইবে, এমন নয়; নানা বিশেষণে তাহাকে বিশেষিত করিতে আমরা মোটেই নারাজ হইব না।

কিন্তু আমাদেরও ত সভা সমিতির ভিড়ের বাইরে, দুই এক মুহূর্ত্ত অবসর জোটে। সে সময় যদি তার্কিকদের জিগীষাটা পরিত্যাগ করিয়া একটু বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে ভুল কি একেবারেই চোখে পড়িবে না?

বর্ত্তমানে সভা সমিতি এবং খবরের কাগজে যে সকল বিষয় নিয়া ব্যস্ততা, বাগ্মিতা, চিন্তাশীলতা এবং স্বদেশ প্রেম একাধারে ফুটিয়া উঠিতেছে, সে গুলিকে সাধারণতঃ দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একদিকে দেখা যায় দেশের দুঃস্থ ও নিঃস্বদের জন্য একটা করুণার ধারা যেন ভাদরের গাঙ্গের মত থৈ থৈ করিয়া ছুটিয়াছে। আর একদিকে এই করুণা দানে ও ত্যাগে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে।

দান ও দয়া জিনিষটী চিরকালই ভাল। দাতাকে নানা দেশের লোক নানা ভাবে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিতেছে। 'দাতা শতং জীবতু"। আর দয়া—সে ত সকলের চেয়ে বড় ধর্ম্ম। সুতরাং জিনিষ দুইটী সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই।

কিন্তু এমন একটা যুগে আমরা আসিয়া পৌছিয়াছি, যখন একটু গভীর ভাবে বিষয়টী না দেখিলে আর চলে না। সেই জন্যই এত দীর্ঘ ভূমিকার পর আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে হইতেছে:——দাতা যে দান করেন,

তাঁহার সে শক্তি আসিল কোথা হইতে? এক জনের কেন এমন অবস্থা হইল যে, তাহার দান গ্রহণ করা প্রয়োজন; আর এক জনের কিসে এমন দানের শক্তি সঞ্চিত হইল? তা ছাড়া, দানেতে যে দয়ার প্রকাশ, ইহাই কি দয়া দেখাইবার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি? আর যাহাকে দয়া মনে করিয়া আমরা ধন্যবাদ দেই, তাহার ভিতর কি কোন কর্ত্তব্য বর্ত্তমান থাকিতে পারে না?

কথাটা অবশ্যই বলা মাত্রই পরিষ্কার হইয়া গেল না। কিন্তু মাঝ খানে আমরা একটা বাংলা প্রবাদ বাক্য মনে করিতে পারি। বাংলায় একটা কথা আছে, 'গরু মেরে জুতা দান'। জুতা দান করিবার বিধান শাস্ত্রে রহিয়াছে; কিন্তু হিন্দুর পক্ষে গোবধ মহাপাপ; গরু না মারিলে জুতা হয় না। তাই বলিয়া জুতা দানের জন্য গরু মারিলে, সে কার্য্যের কেহই প্রশংসা করিবে না। সুতরাং দানের দেশেও দানমাত্রেই অনিন্দ্য নয়।

ডাক্তার যদি ঔষধ বিশেষের পরীক্ষার জন্য কোন ও রোগীর ব্যাধি ইচ্ছা করিয়া দীর্ঘকাল অব্যাহত রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার সে প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করা কঠিন। তেমনই যদি কেহ অন্য এক জনকে নানা ভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিয়া, পরে একটু ত্যাগ বা দয়া দেখায়, তবে তাহাকেও প্রশংসা করিতে পারি না। লাথিটা মারিয়া জায়গাটীতে হাত বুলাইয়া দিলে, সেটা খুব মহত্ত্ব হইল না।

সমাজে ধনী ও নির্ধনের প্রভেদ রহিয়াছে। ইহা বিধির বিধান, না, মানুষের চক্রান্ত, সে প্রশ্ন এখানে তুলিতে চাই না। কিন্তু এই প্রভেদ রহিয়াছে বলিয়াই, নির্ধন সর্ব্বদাই বিপন্ন;—তাহার আহারের কষ্ট, বস্ত্রের কষ্ট, রোগে ঔষধ নাই, বিপদে আশ্রয় নাই। আর, ধনী যিনি, তিনি ইচ্ছা করিলে নির্ধনকে এই সকল দান করিতে পারেন। ধনী মাত্রেই দাতা নহেন; কিন্তু ধনীদের টাকায়ই বড় বড় ধর্ম্মশালা, হাসপাতাল, ইস্কুল কলেজ ইত্যাদি লোকহিতকর কাজ হইতেছে। ধনীদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, তাঁহাদের এ সব কাজে লোকের উপকার হয়; এবং 'রায়বাহাদুর' 'রাজা বাহাদুর' প্রভৃতি খেতাব দিয়াই হউক, অথবা শুধু সংবাদ পত্রের স্তম্ভে প্রশংসা বাক্য দ্বারাই হউক, সমাজ নানা ভাবে এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

কিন্তু যদি কোন ক্রমে ইহা প্রমাণিত হয়, যে, দরিদ্র যে দরিদ্র হইয়া রহিয়াছে, ইহা চন্দ্র সূর্য্যের গতিবিধির মত অলঙ্ঘ্য বিধান নহে, তাহা হইলেই জিজ্ঞাসা হইবে, সমাজ কতকগুলি লোককে চিরকাল অভাবে নিষ্পেষিত করিয়া মাঝে মাঝে করুণার কণা দেখাইয়া বাহাদুরী লইবে, এটা কি রকম ভদ্রতা?

একটা স্পষ্ট দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। আজ কাল দেশে হাসপাতালের স্তুতি সহস্রমুখে হইতেছে। হাসপাতাল স্থাপন করিয়া কিম্বা স্থাপিত হাসপাতালে টাকা দিয়া কয়-জনে কত যে খেতাব পাইয়াছেন, তাহার কোন হিসাব নাই। তারপর, রাজ সরকার বিলাত হইতে বড় বড় ডাক্তার আনিয়া জায়গায় জায়গায় বসাইয়া রাখিয়াছেন; ইঁহাদের বেতন চার অঙ্কের কম নয়। নগদ ষোল টাকা দক্ষিণা দিলে ইঁহারা লোকের বাড়ীতে যান। ইহা ছাড়া বিভিন্ন নামে অভিহিত বিভিন্ন পদবীতে আরূঢ় আরও কত চিকিৎসক দেশময় চৈত্র মাসে শিমুল তুলার মত ছড়াইয়া রহিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতেও অনেকের তৃপ্তি নাই; তাঁহারা প্রত্যেক গ্রামেই—এমন কি, সম্ভব হইলে, প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীর সামনেই একটী করিয়া দাওয়াই খানা এবং একজন করিয়া ডাক্তার দেখিতে চান। এই উচ্চ আদর্শ বাস্তবে পরিণত না হইলেও, দেশে চিকিৎসার বন্দোবস্ত যে রহিয়াছে—এবং গ্রামে তেমন না হইলেও সহরে যে উহা প্রচুর পরিমাণেই রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু দেশ হইতে অকাল মৃত্যু নির্ব্বাসিত হইয়াছে কি? ব্যাধি কি এক এক বৎসর এক এক রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিতেছে না? ডাক্তারেরা অবশ্যই তৎক্ষণাৎ লাটিন কিংবা গ্রীক্ কিংবা জাপানী অভিধান খুলিয়া তাহাকে একটা দুরূহ নামে অভিহিত করিয়া ফেলেন। কিন্তু নাম দেওয়া হইলেই রোগটী নিরুদ্দেশ হয় না, এবং লোকের কষ্টও তাহাতে এক বিন্দুও দূর হয় না।

আসল কথা, গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে হইবে কি? ব্যাধির কারণ দূর না করিয়া শুধু তাহার

চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে চলিবে কেন? এটা অবশ্যই সকলেই স্বীকার করেন, যে, এ দেশে যত প্রকার ব্যাধি আছে তাহার বেশীর ভাগেরই কারণ, অনাহার বা অল্পাহার এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস। এ সকলই ত অভাবের ফল। সেই অভাব দুর না করিয়া অভাব-জনিত ব্যাধির চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপন করা কি লাথি মারিয়া প্রণাম করার মত নয়? এক জনকে নানা ভাবে অভাবগ্রস্ত করিয়া রাখিব, অথচ তাহার কুটীরের সম্মুখে সিভিল সার্জ্জনের ত্রিতল অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিব, 'একটী সোনার মোহর দিলে ইনি তোমাকে একবার দেখিয়া আসিতে পারেন'—এটা কি রকম দয়া? কি রকম সদাশয়তা? ডাক্তার সাহেবের স্পর্শেই, লোকের চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয় না। মোক্ষ প্রাপ্তি অবশ্যই অনেক সময় ঘটে, কিন্তু সে মোক্ষ ত কেহ চায় না! অথচ এরই জন্য এই বিরাট্ ব্যবস্থা! দরিদ্রেরা প্রতিবারের দর্শনী দিবার জন্য যোলটী টাকা কোথায় পাইবে, তাহা আমরা ভাবি না। অথচ, সহরের মাঝে একজন বড় ডাক্তার প্রতিষ্ঠিত করিয়া কতই না বাহবা দাবী করিয়া বসি! তার চেয়ে যে টাকাটা খরচ করিয়া এত সব ডাক্তার এবং ঔষধ আমদানী করা হয়, সেটা যদি গরীব দুঃখীদের অন্নবস্ত্রের জন্য ব্যয় করা হইত, তাহা হইলে বেচারাদের বোধ হয় আর চিকিৎসার দরকারই হইত না।

সরকারের দেখাদেখি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিও দাওয়াই-খানা স্থাপন এবং ডাক্তার ও টীকাদার নিয়োগ করার জন্য উঠিয়া পাড়িয়া লাগিয়াছেন ইহাতে কাহারও আত্মীয় প্রতিপালনের সুবিধা হয়, এমন কথা বলি না। তবে ইহাতে কতকগুলি লোকের ভাত হয়। কিন্তু যাহাদের সুবিধার জন্য ইহাদের ভাতের বন্দোবস্ত হয়, তাহারা কোন উপকার পায় না। ইহাতে একটী নগ্ন ব্যক্তিরও গায়ে কাপড় উঠে না, একটী উপবাসীরও পেটে অন্ন পড়ে না; এবং ব্যাধির কারণ সম্পূর্ণ বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, একটী লোকেরও ব্যাধি কম হয় না; শুধু শুধু ব্যাধিতের ব্যয়সাধ্য অথচ সন্দিগ্ধফল চিকিৎসা এবং তার ফলে রোগীর আত্মীয়দের আরও দুরবস্থা। এই কথাটী আমরা এখন আর না ভাবিয়া পারি না।

এখন আর কাশীতে অন্নসত্র দিলে লোক তেমন চিনে না। বাড়ীতে অতিথিশালা রাখিলে কেহ 'রায় বাহাদুর' 'খান বাহাদুর' হয় না; তাই এসব এখন উঠিয়া গিয়া সব দানের টাকা আসিয়া জড় হইতেছে দাওয়াইখানায়। আর বছরে দুইবার করিয়া উপাধি-বর্ষণের পালা। যাঁরা সম্মান দান করেন, তারাই বা কি ভাবেন, আর যাঁরা সম্মান খুঁজেন, তাঁদেরই বা বুদ্ধি কি, ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু দেশের লোকে—এমন কি যারা কোনই উপকার পায় না, তারাও যে সঙ্গে সঙ্গে 'বেশ বেশ' বলে, ইহাই সকলের চেয়ে সেরা আশ্চর্য্য।

আবার একটা ধুয়া উঠিয়াছে, Maternity welfare;—কথাটা বাংলা করিলে আরও জমকালো হইবে, যথা 'মাতৃত্বের উপকার'। ইহার জন্য কতকগুলি প্রদর্শনী, অনেকগুলি বক্তৃতা এবং খবরের কাগজে হৈচৈ হইয়াছে। শিশুদের অকালমৃত্যু এবং প্রথম যাঁরা জননী হন, তাঁদের স্বাস্থ্যরক্ষা, ইহাই হইল এই হুজুগের উদ্দেশ্য। ইহাকে 'হুজুগ' বলাতে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ফলাফল দেখিয়া যদি কাজের গুণাগুণ বিচার করিতে হয়, তবে ইহা হুজুগ ভিন্ন আর কিছু নয়; আর, উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে ইহা হুজুগেরও নিম্ন পদবীতে স্থান পাইবে; কেন না, একাধিক স্থলেই ইহা বড়লোকদের সঙ্গে একটু আপ্যায়িত করার উপলক্ষ্য মাত্র।

এখানেও কারণ বর্ত্তমান রাখিয়া কার্য্যের প্রতীকারের চেষ্টা রহিয়াছে। কেন শিশুরা অকালে মরে? কেন জননীদের অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়? আবার সেই এক উত্তর—অস্বাস্থ্যকর জীবন পদ্ধতি এবং তাহারও ঐ একই কারণ, অভাব। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়া কতকগুলি ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দেশময় ছড়াইয়া দিলে জগতের কি যে উপকার হইবে, ভাবিয়া পাই না।

স্থলবিশেষে দাওয়াইখানায় যে প্রবঞ্চনা ও অপহরণ প্রভৃতি রহিয়াছে, তাহার কথা উত্থাপন করা এখানে

অপ্রাসঙ্গিক। কেন না, উহা ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের পরিচায়ক মাত্র; প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাহাতে কিছু প্রমাণিত হয় না। কিন্তু যে চিন্তাপদ্ধতি অনুসারে লোকে অন্নদানের চেয়ে ঔষধ দান এবং বস্ত্র দানের চেয়ে ব্যাণ্ডেজ দানকে বড় মনে করিতে শিখিয়াছে, সেটা যে ভ্রান্ত, এই কথাটাই আমরা বলিতে চাই। দানের প্রণালী সম্বন্ধে কোন কথা হইতেছে না। ইহা ব্যক্তিগত ভাবেও হইতে পারে, অথবা সংহত ভাবেও হইতে পারে। কিন্তু দানের সামগ্রী হিসাবে অন্ন যে ঔষধের চেয়ে বড়, এই কথাটা আমাদের এখন স্বীকার করা উচিত। বিশেষতঃ যেখানে ঔষধের প্রয়োজন হয় অন্নের অভাব হইতে, সেখানে লোকের অন্নকষ্টের যোল আনা কারণ বজায় রাখিয়া, ঔষধ দান করা দস্তুরমত নিষ্ঠুরতা।

দানের নামে আমরা এতই মুগ্ধ যে, দান দেখিলেই শত মুখে প্রশংসা না করিয়া পারি না। এবং সেই জন্য দানের সামগ্রীটা কি, এবং তাহার চেয়ে ভাল সামগ্রী আর কিছু আছে কিনা,—তাহা ভাবিবার অবকাশই আমাদের হয় না। তথাপি সাধারণ ভাবে ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এমন যদি কোন দেয় বস্তু থাকে, যাহা দান করিলে দ্বিতীয় আর একটী বস্তু দিবার প্রয়োজন হয় না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রথমটী দ্বিতীয়টীর চেয়ে শ্রেয়ঃ। সুতরাং ইহা যদি সপ্রমাণ হয় যে, গরীব লোকদের অন্ততঃ অনেক ব্যাধিরই কারণ অনাহার বা অল্পাহার, তাহা হইলে অন্নদান যে ঔষধ দানের চেয়ে বড়, ইহা স্বীকার করিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না।

কিন্তু ইহাতেও সমগ্র ভ্রান্তি অপনোদিত হইল না। দানের মধ্যে শুধু তাহার সামগ্রীটী দেখিলেই যথেষ্ট হইল না। দান করিবার সে শক্তিটী দাতা কোথায় পাইলেন, তাহাও একবার বিচার করা প্রয়োজন।

জমীদার প্রজার উপর কিংবা বড় উকীল তাঁহার মক্কেলের কিংবা বড় ডাক্তার তাঁহার রোগীর উপর জুলুম করেন, ইহা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু ইহা করিয়াও যদি তিনি প্রচুর ধনের অধিকারী হন এবং মরণকালে একটা সরাই কিংবা ডাক্তারখানা স্থাপন করেন, তবে লোকের মুখে তাঁহার প্রশংসা ধরিবে না। কিন্তু কেন? ইহার সোজা উত্তর, লোকে দানটাই দেখে; দানের টাকাটা কি করিয়া রোজগার করা হয়, সব সময় তাহা জানা যায় না। তাই, যেটুকু দেখা যায়, সেই টুকুরই গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু ইহা কি ঠিক? ইহা কি দূরদৃষ্টির পরিচায়ক?

একবার গঙ্গায় ডুব দিলেই কোটী কোটী জন্মের পাপ ক্ষালন হইয়া যায়, ইহা যাঁহারা বলিতেন, তাঁহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন কিনা, জানি না। কিন্তু সারাজীবন অপকর্ম্ম করিয়া হঠাৎ একদিন কেহ দশ হাজার টাকা হাতছাড়া করিলেই তাহার নামে একটা 'রামায়ণ' রচনা করিতে হইবে, একথা আমরা মানি না। সুতরাং দাতার দানশক্তির উপচয় হয় কিরূপে, তাহা ভাবিবার অধিকার আমাদের আছে। এবং ব্যক্তির বেলা যদি এ অধিকার আমাদের থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সমাজের বেলাও উহা রহিয়াছে।

সমাজে এক শ্রেণী থাকিবে চিরকালই প্রতিগ্রাহী, আর এক শ্রেণী হইবেন দাতা, ইহার মূলে কি কোনও হেতু নাই? একজন নিশ্চয়ই আর এক জনকে কখনও বলিতে পারে না, 'ওগো, তুমি দরিদ্রই থাক, তাহা হইলে, মাঝে ২ আমার মনে দয়াবৃত্তির বিকাশ হইবে।' কাজেই, দরিদ্রকে দেখিয়া ধনীর মনে দয়ার উদ্রেক হইলেও এই দয়াবৃত্তির উন্মেষের জন্য দরিদ্রের দারিদ্র্য কখনও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এবং দুঃখ দারিদ্র্যের লোপের সঙ্গে সঙ্গে দয়ারও যদি লোপ হয়, তবে সেটাকে একটা গুরুতর দুর্দ্দৈব মনে করিবার কোন হেতু নাই। সুতরাং দারিদ্র্যের যদি কোন কারণ থাকে এবং সে কারণ যদি দুরপনেয় না হয়, তবে দানের মাহাত্ম্যটা অত বড় গলায় কার্ত্তন করা উচিত নয়। দানের প্রয়োজন ও উপকারিতা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ সমাজে কতকগুলি লোক অভাবের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এবং যতক্ষণ তাহারা অভাবের নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত থাকে, ততক্ষণই তাহারা অন্যের অনুগ্রহের ভিখারী হয় এবং ততক্ষণই তাহারা দাতার শতায়ু কামনা করে। কিন্তু যদি কখনও তাহাদের মনের এমন পরিবর্ত্তন হয় যে,

যেটাকে এতদিন অনুগ্রহ মনে করা হইত, সেটাই ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তাহারা ভিক্ষা না চাহিয়া দাবী করিবে, এবং সে দাবী মঞ্জুর না হইলে মনে করিবে, সমাজ অবিচার করিল।

ঠিক এমনই একটা পরিবর্ত্তন ইউরোপে যে না হইয়াছে, তাহা নহে। সেখানে মজুরদের ধর্ম্মঘট ঝড় বৃষ্টির মত একটা নির্দ্দিষ্ট সাময়িক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। সেখানে চাকরেরা মাহিনা বৃদ্ধিটাকে 'হুজুরের দয়া' বলিয়া মনে করে না; এটা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্যের মধ্যে। তাহারা যদি কাজ করিতে পারে, এবং সে কাজে যদি সমাজের কোন উপকার হয়, তাহা হইলে তাহার দেহাচ্ছাদন এবং দুবেলা দুমুটো অন্নের সংস্থান কেন হইবে না? ইহাতে দান ও দয়ার কথা উঠিবে কেন?

আমাদের চাকরেরা অবশ্যই দুই টাকা মাহিনা বাড়িলেই এখনও বলে, 'হুজুরের দয়া'; কিন্তু তাহারাও নুতন বুলি শিখিতেছে, দয়া ভিক্ষার পরিবর্ত্তে দাবী করিতে শিখিতেছে। ধর্ম্মঘটের পালা এদেশেও আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের মধ্যেও আমাদিগের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমরা কি এমন কিছু করিতেছি যাহা না করিলে অন্যায় হইত না, না, শুধু এ যাবৎ অবহেলিত একটা কর্ত্তব্য কার্য্য মাত্র করিতেছি। এগার লক্ষ টাকা দান দেখিলেই আমরা ঢক্কা নিনাদে ভবপৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া তুলি; কিন্তু একবার ভাবিতে চাই না যে, প্রভূত ধনের অধিকারী যিনি দাতারূপে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন, অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রতি তাঁহার একটা কর্ত্তব্যও রহিয়াছে।

উচ্চ প্রশংসা আমরা সেইখানেই করি, যেখানে কর্ত্তা এমন কোন কাজ করেন, যাহা করিতে তিনি ন্যায়তঃ বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু যদি তিনি তাঁহার বিহিত কর্ত্তব্য টুকু মাত্র করেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন বিশিষ্ট প্রশংসার দাবী থাকে না। যে হেতু আমি কাহারও বাড়ীতে চুরি করি না, সুতরাং নববর্ষে আমাকে একটা খেতাব দেওয়া উচিত—একথা কেহ বলিতে পারে কি? যেহেতু আমি সাড়ে দশটায় আফিসে যাই এবং সাহেব চলিয়া গেলে প্রত্যাবর্ত্তন করি, যেই জন্য কোন উচ্চ প্রশংসার দাবী আমার করা চলে না। নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত কিছু যখন করা হয়, তখনই প্রশংসার দাবী সঙ্গত হয়।

সুতরাং লোকে যদি হঠাৎ এমনই একটা নূতন ধারণা ধরিয়া বসে যে, দাতার দানটা তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে, তাহা হইলে খবরের কাগজের সহস্র স্তুতিবাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে সাগরতীরে বালির বাঁধের মত নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবে। আর, 'যদি'ই বা বলি কেন? সত্য সত্যই কি দাতার কোন কর্ত্তব্য নাই?

ধোপা যে আমার কাপড় কাচে, সেটাকে আমি দয়া মনে করি না; কেন না, তাহাকে আমি পয়সা দেই। আর আমি যে তাহাকে পয়সা দেই, সেটাকেও সে দান মনে করে না, কেন না সে আমাকে কাজ দেয়। সমাজের উচ্চশ্রেণীদের সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীদের এমনই সম্বন্ধ। চা-বাগানে যে কুলিদের জন্য চিকিৎসালয় থাকে সেটা একটা অকারণ করুণার নিদর্শন নহে; কেন না, কুলিদের স্বাস্থ্য কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়। সেখানে ডাক্তারখানা করিয়া দিয়া কেহ যদি খেতাব না পান, তবে নিজের গ্রামে দিলেই এমন কি বিশেষ তারতম্য হইবে যে, সে জন্য তাঁহাকে স্তুতিবাদ করিতেই হইবে? স্তুতিবাদ না করিলে কেহ থলের মুখ খুলিবে না, জানি। কিন্তু মনে রাখা উচিত, থলে যাদের আছে, তাদের কর্ত্তব্যও আছে।

মনে হয়, দান ব্যাপারটাকে আমরা অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছি। ফলে হইয়াছে এই, কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ দান, আর কোন্‌টা নিকৃষ্ট, অনেক সময়ই আমরা তাহা জানি না। আমরা দেখি শুধু পরিমাণটা। এগার লাখ্। কি মহৎ দান! কিন্তু যিনি এগার লাখ দিলেন, তিনি যে নিঃস্ব হইয়া দান করেন নাই—তাঁহার যে আরও দশবার এরূপ এগার লাখ দিবার ক্ষমতা রহিয়াছে! কিন্তু যে ছেলেটা একটা পয়সা জলখাবার পাইয়া সেই পয়সাটাই দান করে! তাহারই দানটা কি প্রকৃত পক্ষে বড় নয়? যে শ্রেষ্ঠী সোনার থালা ভরিয়া হীরা মুক্তা দান করিয়াছিল, ভগবান্ বুদ্ধ তাহার দান স্বীকার করেন নাই; আর, যে অর্দ্ধনগ্না ভিখারিণী বনের

অন্তরালে তনু ঢাকিয়া নিজের পরিধানের ছিন্ন বস্ত্রটুকু দান করিয়াছিল, তাহারই দান বুদ্ধের মনস্তুষ্টি করিয়াছিল। পরিমাণে না হইলেও মূল্যে তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ দান।

পরিমাণ যেমন দানের মূল্য নিরূপণ করে না, দাতার শক্তির উপর যেমন উহার মূল্য প্রতিষ্ঠিত, তেমনই দানের সামগ্রীর উপরও উহার মূল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কেহ যদি চায় রুটী আর তাহাকে যদি দেওয়া হয় কয়েক খণ্ড পাথর, তাহা হইলে সে দানের কোন মাহাত্ম্য নাই। কেহ যদি চায় অন্ন আর তাহাকে যদি দেই আমরা ঔষধ, তবে তাহারই বা এমন কি মাহাত্ম্য? সুতরাং দানের বিচারে আমাদের সর্ব্বদাই দেখা উচিত, দাতার শক্তি এবং দানের সামগ্রী। আর তাই যদি আমরা করি, তাহা হইলে মনে হইবে, বড় লোকের বড় দানের চেয়ে দরিদ্রের ক্ষুদ্র দান অনেক মূল্যবান্। অবশ্যই যে ব্যক্তি জীবনে কখনও লক্ষ মুদ্রা দেখে নাই, সে যখন শোনে, আর একজন দশ লাখ বিনা সর্ত্তে দিয়া ফেলিল, তখন তাহার পক্ষে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের আশ্চর্য্য বোধের উপর কোনও কাজের নৈতিক মূল্য নির্ভর করে না।

শক্তি ও সামগ্রী ছাড়া সর্ব্বোপরি আমাদের মনে রাখা উচিত যে, দাতারও একটা কর্ত্তব্য রহিয়াছে; গ্রহীতার কোন দাবী নাই, কোন অধিকার নাই, কিছুই প্রাপ্য নাই, এরূপ মনে করিলে চলিবে কেন? দানের স্তুতিতে আধুনিক সমাজ যে দানোপজীবি প্রাচীন ব্রাহ্মণেরও এক কাঠি উপরে উঠিয়াছে, ইহা বড় শুভ লক্ষণ নহে। দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন আমাদের একটু সংযত হইয়া করা উচিত, সীমান্তে বোলশেভিক উপস্থিত!

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথ।

মহাত্মা গান্ধী এবার ২রা এপ্রিল তারিখে আমেদাবাদের সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই ও গুজরাট ভ্রমণেও বাহির হইয়াছেন।

গত ১৬ই চৈত্র বর্দ্ধমান হইতে বোম্বে মেলে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই যাত্রা করেন। পথে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই; কেবল গাড়ী যখন জাব্বালপুর প্রভৃতি বড় বড় ষ্টেশনে থামিতেছিল—তখন অনেক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথকে গাড়ীতে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ফুলের তোড়া এবং মালা দিয়া কবিকে সম্বর্দ্ধিত করিতেছিলেন।

গাড়ী বোম্বাই পৌঁছিলে, অনেক সম্ভ্রান্ত পুরবাসী রবীন্দ্রনাথকে ষ্টেশন হইতে লইবার জন্য আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বোম্বাইতে মাত্র ৭ ঘণ্টা কাল ছিলেন। কিন্তু এই সময়টুকুও তাঁর বিশ্রাম করিবার উপায় ছিল না, ক্রমাগত মান্যগণ্য ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে দিন বোম্বাই পৌঁছেন ঠিক সেই দিনই মহানুভব শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেব আফ্রিকা হইতে বোম্বাই পৌঁছেন। শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেব রবীন্দ্রনাথের চির-সঙ্গী এখানেও সঙ্গে রহিয়া গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই দিনই রাত্রি ৮টার সময় কোলাবা ষ্টেশন হইতে আমেদাবাদ যাত্রা করেন। পর দিবস প্রাতঃকালে গাড়ী যখন আনন্দ, নামেদাবাদ প্রভৃতি ষ্টেশনে থামিতেছিল, তখন সেখানে রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য রীতিমত ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা, শিক্ষকেরা, আফিসের কেরাণীরা, দোকানদাররা পর্য্যন্ত ফুলের তোড়া ও মালা হাতে করিয়া কবিকে একবার মাত্র দেখিবার জন্য ব্যগ্র।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথ গাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বক্ষ, কণ্ঠ, মস্তক ফুলে, মালায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল—আকাশ কবিবরের

জয়ধ্বনিতে পুলকিত হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি নাই বলিয়া তাহা শুনিতেও পাই নাই।

গাড়ী আমেদাবাদে যখন আসিল তখন রবীন্দ্রনাথের কক্ষটী ফুলে মালায় পরিপূর্ণ। ষ্টেশনে দারুণ ভিড়—চলা ফেরা একরকম প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের জন্য আগেই মোটর প্রস্তুত ছিল, তাহাকে লইয়া দ্রুতবেগে শাহিবাগের দিকে প্রস্থান করিল। শাহিবাগে আম্বালাল সারাভাই নামে একজন ধনী মিলওয়ালা থাকেন, রবীন্দ্রনাথ তাহারই অতিথি।

এই আমেদাবাদের শাহিবাগেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রথম সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন আর আজ চল্লিশ বৎসর পরে সেই সঙ্গীতের স্বর্ণ-সোপান বাহিয়া জীবনের ও জগতের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া যে আবার এখানে ফিরিয়া আসিবেন, তখন তিনি ইহা নিশ্চয়ই ভাবেন নাই। পরের দিন অর্থাৎ ২রা এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পরিষদে বক্তৃতা দিবার কথা। সভা ১২টার সময় আরম্ভ হইল। এই সভার সভাপতি ছিলেন বড়োদা ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-মন্ত্রী মহাশয়। ১২টা বাজিয়া ১৫ মিনিটের সময় রবীন্দ্রনাথ সভায় প্রবেশ করিলেন। ঘন ঘন জয়ধ্বনী ও করতালিতে সভাগৃহ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। সভামণ্ডপ অসম্ভব ভাবে জনপূর্ণ। চারিদিকে কেবল টুপি আর পাগড়ী। এক পাশে নির্দ্দিষ্ট মঞ্চের উপর ঋজুদেহ, শুভ্রকেশ রবীন্দ্রনাথ গরদের কাপড় ও চাদর পরিয়া এবং মাথায় কালো ভেলভেটের টুপি দিয়া উপবিষ্ট—পাশেই সংযত বসনে মহাত্মা গান্ধী। প্রথমে কাশী হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ আনন্দশঙ্কর ধ্রুব মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। উহা গুজরাটী ভাষায় লিখিত। উহার এক কাপি বাংলা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইলে বেলা ১টার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সমস্ত সভাগৃহ নীরব। সকলে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতেছে। প্রেসের প্রতিনিধিরা একপাশে খস্ খস্ করিয়া লিখিয়া যাইতেছে। মাথার উপর বিদ্যুতের পাখা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। আর কেবল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতোপম কণ্ঠস্বর সভামণ্ডপের দূরতম কোনটীকে পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল—মানুষের সব চেয়ে বড় প্রকাশ হচ্ছে—তার নিজের ভাব ব্যঞ্জনায়। সে যে আহার করে—তার ক্ষুৎ-প্রবৃত্তিটাই সব চেয়ে বড় নয় সেটাকে ঢেকে রাখ্‌বার জন্য সে তার আহার্য্যটাকে এবং পাত্রটাকে সুন্দর করতে চেষ্টা করে। বস্তুতঃ সৃজন করাই মানুষের কাজ, অনুকরণ করা নয়। আজ কাল্‌কার ব্যবসা বাণিজ্যের দিনে কি করে বস্তুটাই আমাদের কাছে বড় হ'য়ে উঠেছে—আমরা সৃষ্টি করতে ভুলছি। প্রয়োজনের ঘটটীকে ছাপীয়ে যে সুধা উছলে পড়ে—সেটার দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। চারদিকে প্রয়োজন এবং কলিযুগের কল্কি অবতারের দানব লৌহ হৃদয় কল জিনিষটা এমন হৃদয়হীন যে মানুষের মাঝে বিভীষিকা সৃষ্টি করে তুলে তার সৌকুমার্য্য নষ্ট করে' ফেলছে, সত্য এবং সুন্দরকে আচ্ছন্ন করতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হ'তে প্রায় ১—১৫ মিনিট লেগেছিল। সভাভঙ্গের পর তাড়াতাড়ি সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, কবি ও কর্ম্মী সভাত্যাগ করলেন্।

আমেদাবাদ গুজরাটের রাজধানী, এখানে গুজরাটের খাঁটী পরিচয় পাওয়া যায়, এই একটী মাত্র সহরে ৭৫টী মিল সারাদিন আকাশে কালিমায় কালিময়, চারদিকে মরুভূমির বালি-রৌদ্রে দগ্ধ প্রচুর পরিমানে বাব্‌লা গাছ আর প্রায়ই দেখা যায় সারিদিয়া উট চলিয়াছে। সহরটীর একপাশে সবরমতী নামে একটী নদী আছে। সেও যেন পথভুলেই এখানে এসেছে। কোন রকমে শীর্ণকায়া নদীটি বালু সৈকতের আচল খানি বুকের উপর টেনে তর্ তর্ করে' ধরে চলেছে।

৩রা তারিখে রবীন্দ্রনাথ সমবেত জন-সমূহকে

সম্বোধন করে' মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ইংরাজিতে একটী ছোট বক্তৃতা দেন; শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাহার হিন্দী করিয়া বলেন। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা সরলাদেবী "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী" গানটী গাহিয়াছিলেন। যে কয়দিন রবীন্দ্র নাথ এখানে ছিলেন তাঁহার তিল পরিমাণ সময়ও বিশ্রাম ছিল না। প্রায়ই তাঁহাকে দু'বেলা দুটো সভায় যোগ দিতে হইত। তা ছাড়া দুপুর বেলা এবং এবং সকাল বেলা অভ্যাগত ব্যক্তিগণের সহিত তাঁর দেখা করিতে হইত।

এই আমেদাবাদে মহাত্মা গান্ধীর একটী আশ্রম আছে, নাম—'সত্যাগ্রহ আশ্রম' এই আশ্রমেও একদিন রবীন্দ্রনাথ গিয়াছিলেন, আশ্রমটীর দুই ভাগ, একটী আশ্রম, অপরটী স্কুল; আশ্রমের অধিবাসীদের বেতনাদি লাগেনা—তাহারা দেশের কাজ করিয়া বেড়ায়। এখানে তাঁতে কাপড় বুনিবার খুব ভাল ব্যবস্থা আছে। আশ্রমের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্ত্রাদিই এখানে তাঁতে বুনিয়া এবং হাতে সেলাই করিয়া প্রস্তুত করা হয়।

স্কুলের ছেলেদের পড়িতে হয় কিন্তু কোন পরীক্ষা নাই। তাহাদের কেবল আহার্য্য খরচটা নেওয়া হয়—মাসিক ১৬৲ টাকা হিসাবে। স্কুলের ছেলেদের অনেক কাজই ভৃত্যে করে, কিন্তু আশ্রমের অধিবাসীদের সব কাজই নিজেদের হাতে করিয়া লইতে হয়। আশ্রম ও স্কুল উভয় স্থানেরই অধিবাসীদের থাকিবার জন্য ছোট ছোট টালির ঘর, মাটিতে বিছানা করিয়া শোবার ব্যবস্থা। ভোর ৪টার সময় উঠিয়া ছাত্র ও আশ্রমিকগণের উপাসনা বন্দনা শেষ করিয়া পাঠ ও কাজ করিতে হয়। ৬টার সময় সকলে দুগ্ধ পান করেন। বেলা ১০টার সময় মধ্যাহ্ন ভোজন এবং সূর্য্যাস্তের আগে শেষ ভোজন, রাত্রে পুনরায় ভজন গান করিয়া শয্যা গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার পত্নী এখানেই ছেলেদের সাথে একটী ছোট গৃহে থাকেন। মহাত্মাজীকে তাঁহার আশ্রম ও স্কুলের ছেলেরা বাপুজী অর্থাৎ পিতাজী বলিয়া ডাকে। বরমতী নদীর পাড়েই এই আশ্রমটী।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

আলোয় আঁধার।

(১)

ঘরে বাইরে আগুন আমার আগুন মনের মাঝে!
কত রকম চেষ্টা করি মন বসেনা কাজে!
বায়স যেমন আলস ভরে,
দুপুর বেলা কেঁদে মরে,
তেম্‌নি কোরে কাঁদছে সদাই আমার হৃদয় খানি!
অজানা এক মস্ত দুঃখের জেরটা কেবল টানি!

(২)

হাল্কা হাওয়ায় উচ্ছ্বসিত দীঘির শীতল জলে,
হাজার তপন সাঁতার কেটে ঢেউ তুলিয়া চলে!
হাঁসগুলো সেই দীঘির বুকে,
ভেসে বেড়ায় মনের সুখে,
ছুটছে মানুষ চোর্‌ছে গোরু সবুজ ঘাসের'পরে!
গাছের নীচে পল্লীযুবা গল্পগুজব করে!

(৩)

সাদা আকাশ সাদা চোখে তাকায় সবার পানে।
সিনান্ সারি' তাইতো নারী বুকে আঁচল টানে!
ফির্‌ছে ঘরে নতশিরে,
সিক্ত বসন হাঁসছে ধীরে,
মাথার উপর 'বৌ-কথা-ক' অম্‌নি গেল ডেকে!
পথ রাখিল বুকে বধূর চরণ-চিহ্ন এঁকে!

(৪)

আজ যে এত শোভার বাহার আমার চতুর্দ্দিকে,
অশ্রু-ধোওয়া আঁখির তারায় লাগ্‌ছে ফিকে ফিকে!
মরার মত বেঁচে আছি,
মর্‌তে পেলে হয়তো বাঁচি,
ভাঙা বুকের একতারাতে ব্যথার সুরই বাজে!
ঘরে বাইরে আগুন আমার আগুন মনের মাঝে!!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

আমরা প্রাত্যহিক সঞ্চয়ের অজস্র প্রাচুর্য্যে, সহস্রবিধ আয়োজনে, চিত্তের সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলিকে নিবিড়রূপে ঠাসিয়া রাখিয়াছি—কোনখানে লেশমাত্রও অবকাশ যাহাতে না থাকে, সে দিকে প্রয়াসের অন্ত নাই—এবং এই অচল ভাণ্ডার যাহাতে চিরদিনের মত অক্ষয় হইয়া থাকে, সেজন্য সমস্ত অনাগত বিপদ্ হইতে ইহাকে যক্ষের ধনের মত করিয়াই রক্ষা করিতেছি—যদি কখনো বাহিরে কোনো ঝড় বাদলের প্রবলতম সংঘাতে এই প্রচুরতম পুঞ্জীভূত স্তূপ, অকস্মাৎ ঘোর ধ্বংস-লীলায় শতদীর্ণ হইয়া যায়, সেই ভাবনায় জীবনকে গুরুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছি।

আবার অপর দিকে লোভের অন্তহীন তাড়না দ্বিগুণ হইতেও দ্বিগুণতর হইয়া উঠিতেছে—তাই প্রয়াসের পর প্রয়াসের অবিরত উত্তেজনায় সঞ্চয়ের পরিমাণ খতাইয়া দেখিবারও অবসর নাই—উপকরণ ভূরি পরিমাণে জমিতেছেই—কমিবার দিকে নজর দিতে গেলেও বিপদ্—তাই তিলতম অংশেরও হানি হইলে হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ হাহাকার আরো অত্যুগ্র হইয়া উঠে এবং সে জন্য বিধাতাকে ও স্বীয় অদৃষ্টকে কি বলিয়া দোষ দিব ও ধিকার দিব, তাঁর ভাষা খুঁজিয়া বাহির করাও দুষ্কর!

যেন ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়াই এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি, কোনো ক্ষুদ্র বস্তুরও লোভ ত্যাগ করা যেন আমাদের প্রকৃতিতে লেখে না—তাই চাওয়ার পর চাওয়ার আর বিরাম নাই—প্রার্থনার পর প্রার্থনা। "চাই চাই" এর সুতীব্র চীৎকারে গগনের সমস্ত রন্ধ্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ধরণীর বক্ষ দারুণতম বেদনার ভরে বিদীর্ণ হইয়া গেল।

সমস্ত বিশ্বের সমস্ত নির্ব্বিকার উদার শান্তিকে অভিহত করিয়া—চারিদিককার—ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত প্রবৃত্তি একেশ্বর হইয়া উঠিল। জগতের সমস্ত অহৈতুক আনন্দকে খর্ব্ব করিয়া মানুষের প্রয়োজন মানুষের স্বার্থ স্পর্দ্ধিত ধৃষ্টের মত আপনার সমুদ্ধত জয়স্তম্ভটাকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিল! মানুষের এই উদ্দাম কামনার সরোষ আস্ফালন, এই উদগ্র বাসনাবেগের ব্যগ্র হা হুতাসের সামনে ত্যাগীর সরল-শুভ্র সন্তোষ, সংযমীর ঋজুমুক্ত জীবনের দিব্যদ্যুতি পরিম্লান হইয়া গেল, প্রবৃত্তির জয়ঢাকটার উৎকট শব্দে ত্রিজগত কম্পান্বিত হইয়া উঠিল, তার কাছে বৈরাগীর উদাত্তগম্ভীর একতারাটী এতই ক্ষীণ হইয়াগেছে যে তাহার শান্ত সকরুণ মূর্চ্ছনাটী আর শ্রুতিপথে প্রবেশ করিতেছে না। কেবল একটী মাত্র সুর মানুষের মর্ম্মকে পীড়িত-মথিত করিয়া সঘন ঝঙ্কারে দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত করিতেছে—"চাই—চাই—চাই"!

মানুষের দুর্দ্দাম আকাঙ্ক্ষার এই অপরিমিত ঔদ্ধত্যের সামনে ভারতবর্ষের ঋষি একদিন অপরাহত প্রতিভার বলে, নির্ভীককণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন:—

অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি।
ততো সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অর্থাৎ অধর্ম্মের দ্বারা মানুষ বাড়িয়া ওঠে, অধর্ম্ম হইতে সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্ম্মের দ্বারা সে আপন শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু একেবারে গোড়া হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি ছত্র রক্ত নিষিক্ত অক্ষরে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পাপীর পরাক্রম যেদিন বিশ্ব পরমেশ্বরের সিংহাসন পার্শ্বে আপন গর্ব্বিত প্রতাপ জাহির করিয়াছে—সেদিনই বিধাতার অমোঘ শাসন বজ্রের আঘাতে তার দৃপ্ত মস্তক ধূলিতলে অবলুণ্ঠিত করিয়াছে।

তাই ত যুগে যুগে কত রাজ্য মহারাজ্য তৃণের মত ফুৎকার মাত্রে উড়িয়া গেল—কত দুর্দ্দমনীয় অহঙ্কার কালের নিষ্ঠুর প্রলয়াভিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। একদিন যাহারা সুখের সু-উচ্চ অচলে ধরাকে সরা বলিয়া জানিয়াছিল—তাহারা দুঃখের ক্ষুরধারনিশিত খরকণ্টকাপূর্ণ পথে আপনার সমস্ত পরমস্পর্দ্ধিত স্বাতন্ত্র্যকে উৎসৃষ্ট করিয়া দিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে তাহাদের পাপ লীলা পরিসমাপ্ত করিল।

শক্তি যেদিন অলীক দণ্ডের দুর্দ্দণ্ড আবেগে শান্তির যোগাশনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে সেদিন সে কিছুতেই

নিস্তার লাভ করে নাই। একের অমোঘ নিয়ম কে উল্লঙ্ঘণ করিয়া আপনার প্রতাপকে একান্ত করিয়া তুলিবে এমন কারো সাধ্য হয় নাই—যে শাসন বিশ্বের সমস্ত শক্তিকে ঘটনাকে অবস্থাকে অহরহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতেছে।

তাই তো বলা হইয়াছে :—

ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ

তাঁরই অটল নিয়মে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিতেছে—এবং মেঘ বায়ু ও মৃত্যু ধাবমান হইতেছে—তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছার দ্বারা তাড়িত নহে, তাঁহারই ন্যায়ের শাসনে পরিচালিত। যখনি কোনো শক্তি সবলে সেই শাসনকে—সেই নিয়মকে উপেক্ষার সহিত ছিন্ন করিতে যায়—তখনি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং—সেই ভীষণং ভীষণানাং তাঁহার রুদ্র দৃপ্ত দণ্ডাঘাতে সেই অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত শক্তির উদ্দাম আন্দোলনকে চিরতরে নিরস্ত করিয়া দেন।

তাই বলিতেছি, প্রবৃত্তি যতই প্রবল হউক্, বাসনা যতই প্রচণ্ড আকার ধারণ করুক্, একদিন তাহার পতন হইবেই—একদিন সমস্ত ভূরিপরিমাণ সঞ্চয় অপঘাত মৃত্যুর কঙ্কালাকীর্ণ মরুপ্রান্তরে ঘোরতম ধ্বংসাবসানে পর্য্যবসিত হইবেই!

আধুনিক য়ুরোপের পণ্ডিতগণ বলিতেছেন:—"হইলই বা ধ্বংস, যতদিন থাকি ততদিনই ত লাভ। মরিতে ত হইবেই কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের সুখটুকু ছাড়িব কেন? জীবনের কয়েকটা দিন বীরদর্পে সকলের উচ্চে, সকলের চেয়ে বড় হইয়াই কাটাইয়া দাও—তাই ত জীবনের চরিতার্থতা!"

কিন্তু ভারতবর্ষ বলিতেছে, যে সকলের চেয়ে বড় হওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য নহে; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিই না হয় হইলে, না হয় জগতের অগণ্য ধনরত্ন মণি মাণিক্য স্তূপাকারে পুঞ্জীকৃত করিয়া সমস্ত জীবনটা তাহার ভোগে একেবারে ঝুকিয়া দিলে কিন্তু—ততঃ কিম্? ততঃ কিম্? ততঃ কিম্?

তাই ভারতবর্ষ বলিতেছে, "যে নাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কূর্য্যাম্" মৃত্যুর দ্বারা আমরা কখনো বড়, হইতে পারি না—ধনরত্নই বল আর বাহ্য সুখসম্পদই বল এ সবই ত মৃত্যুরই রূপ! তাই ভারতের সবচেয়ে বড়, সব চেয়ে গূঢ় বৈরাগ্যের বাণী হইতেছে, বাহিরের সুখকে ত্যাগ কর—যদি বড় হইতে চাও, ত বড় হইতে হইবে বীর্য্যের দ্বারা—অন্তরের অন্তরতম সেই অপরিমেয় সম্পদের দ্বারা—যাহা অবিনশ্বর, যাহা নিত্য, যাহা সত্য!

তাই ভারতের শ্রেষ্ঠতম কথা হইতেছে—

"ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"

অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা লাভ করিবে; সুখ সম্ভোগকে ত্যাগ করিয়া পরমানন্দকে লাভ করিবে; অপরিমিত উপকরণ ত্যাগ করিয়া সরল শুভ্র সন্তোষকে লাভ করিবে বাহিরের ধন সম্পদকে ত্যাগ করিয়া অন্তের চরম তৃপ্তিকে লাভ করিবে।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যা জগৎ

জগতের যাহা কিছু সমস্তই ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন যাহা কিছু তাহাই ত মৃত্যু! তাই ভারতবর্ষ বলিতেছে—জগতের যাহা কিছু গ্রহণ করিবে—বৈরাগ্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা! ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—মৃত্যু হইতে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার পরিপূর্ণতার ভিতরেই সমস্তকে গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই সমস্তকে সমস্ত বলিয়াই না জানিয়া অখণ্ড একেরই অন্তর্গত করিয়া জানা হইবে—এবং সেই জানাই সত্য—সেই জানাতেই আমরা বড় হই—ভূরিপরিমিত সঞ্চয়ের দ্বারা নহে—কদাচ নহে!

পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষের কয়েকজন দার্শনিক প্রচার করিয়াছিলেন যে যাহা কিছু দেখিতেছ, শ্রবণ করিতেছ ও স্পর্শ করিতেছ, তাহা সমস্তই মৃত্যুরই রূপ—তাহা মিথ্যা—শুধু মিথ্যা নহে—অসম্ভব। অর্থাৎ এই জগৎ, ব্রহ্মের অবিদ্যা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব

"মায়াময় মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা"

কিন্তু মায়া ত চতুর্দ্দিকেই আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—তাহাকে অতিক্রম করিব কি করিয়া? সেই জন্যই মায়াকে নরমুণ্ড ও ছাগমাংস প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক কোনও মতে তাহাকে খুসী করিয়া তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই হইল সাধনা!

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ ব্রহ্মকে বিস্মৃত হইয়া মায়ারই উপাসনায় ব্যাপৃত রহিল—যে মায়া ব্রহ্মের প্রকাশ শক্তি নহে, যাহা স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভূত—যাহা বীভৎস ও বিকৃত। সে পূজার উপকরণ হইল সুরা ও পশু। ব্যাভিচারই হইল সাধনা, উন্মত্ততাই হইল মুক্তির সোপান।

ভারতবর্ষের ইহা বিকৃতিই বলিতে হইবে, কেননা ভারতবর্ষই এককালে বলিয়াছিল—

"অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যে হবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমোযউবিদ্যায়াংরতাঃ।"

যে লোক ব্রহ্মকে বাদ দিয়া মায়ার উপাসনা করে সে অন্ধকারে নিমগ্ন হয়, কিন্তু তদপেক্ষাও গাঢ়তম অন্ধকারে মগ্ন হয় তাহারা, যাহারা মায়াকে বাদ দিয়া ব্রহ্মের উপাসনায় রত থাকে। ভারতবর্ষের নিরাকার সাধনার শোচনীয় পরিণামের দিকে তাকাও—ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

সে যাক্। ভারতবর্ষের যাহা সত্যতম সাধনা—যাহা চিরন্তন তপস্যা, তাহাই হইয়াছে—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—জগৎকে পরিত্যাগ করিবে না, কিন্তু ইহাকে ব্রহ্মের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিবে এবং সেই ভাবেই ইহাকে গ্রহণ করিবে।

যুগের পর যুগে ভারতবর্ষে কত বিচিত্র মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে—কত অলীক কল্পনাজালে তাহার মানস-প্রকৃতি বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম যাহা সাধনা কিছুতেই তাহাকে বিলুপ্ত করা গেল না—তাহা আজও অটুট ও অচল রহিয়াছে।

আজ সমস্ত জগত যে-মৃত্যুর করাল-ছায়ায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে—একমাত্র ভারতবর্ষই তাহাকে অমৃতলোকের দিব্যালোকমন্দিরে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে—এই ভার তাহার উপরে আছে। যে সত্যকে লাভ করিয়া সে একদা অমর হইয়াছিল—সেই তাহার বহু-দিবস-লব্ধ সত্য আজ বিশ্বমানবের মুক্তিদান করিবে।

ভারতবর্ষই আজ জগৎকে দান করিবে—তাহার সুচির-সাধন-ধনটীকে, সে আজ শিখাইবে—মানুষের অন্তরের দিকে কি মহিমার—কি ভূমার অধিষ্ঠান, সে আজ শিখাইবে যে সেই ভূমার দ্বারা ওতপ্রোত করিয়া বিশ্বকে জানাই মুক্তি! এমনি করিয়াই সে বাহিরের সহিত ভিতরের মিলন-সেতু নির্ম্মাণ করিবে।

এযে কল্পনা নহে—সত্য; তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, সমুদ্রের এপার হইতে যে কোনো প্রতিভাবান্ এই সত্যটীকে বহন করিয়া ওপারে গিয়াছেন—পশ্চিম তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানে অর্চ্চিত পূজিত করিয়াছে—তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ গৌরবে বিভূষিত করিয়াছে। বর্ত্তমান কালের বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পঁচিশ বছর পূর্ব্বে বিবেকানন্দও উহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

ইহাতেই অন্তরে অন্তরে নিশ্চিত বুঝিতেছি—নৈশ অন্ধকার অপগত হইয়াছে—পূর্ব্ব-উদয়াচলের উচ্চতম-শিখরটীতে নব-আলোক উদ্ভাসিত হইল বলিয়া—বিশ্ব মানব জীবনের সৌভাগ্যাকাশে অদ্য যে নবপ্রভাতের উদ্বোধন সঞ্চারিত হইবে—তার যে আনন্দ কলকাকলী তাহা নৈশ-স্বপ্নের বিমুগ্ধ প্রলাপ নহে—তার যে চঞ্চলতা যে আকুলতা তাহা প্রবৃত্তিবেগের ক্ষণিক আক্ষেপ নহে। এজাগরণ মনুষ্যত্বের জাগরণ। অদ্য স্পষ্টই দেখিতেছি—সমস্ত বিশ্বলোক মুখরিত করিয়া অনতিবিলম্বেই যে কলধ্বনি বিশ্বগগনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হইবে, তাহারি অনুকরণ দিগ্দিগন্ত পরিনন্দিত করিবে—নিখিল বীণার তারে তারে মঞ্জুল ঝঙ্কারে। সেই নব-যৌবন জয় গানমন্দ্রিত হইবে বিশ্ব মহেশ্বরের সিংহাসন তলে—অন্য সকল-কল-নিনাদ উন্মথিত করিয়া।—সেই বাণী যৌবনের বাণী—ত্যাগের মহীয়সী বাণী—বৈরাগ্যের বাণী—সেই আনন্দ-সঙ্গীত-স্বনিত-লোকে যে নবারুণ ছটা বিচ্ছুরিত হইবে, তাহাতে সব অস্পষ্ট আলোক-ছায়া কুহেলিকাময়ী মায়া ঘুচিয়া যাইবে। এই উদ্বোধন প্রভাতের দিব্য জ্যোতির পানে চাহিয়াই কবি গাহিয়াছেন,—

"শূন্যে নবীন সূর্য্যজাগে!
ঐ যে তাহার বিশ্ব চেতন কেতন আগে!
জলচে নূতন দীপ্তি রতণ তিমির মথন শুভ্র-রাগে!
মশাল তব লুপ্তিধুলায় নিত্যদিনের সুপ্তিমাগে!
আনন্দলোক দ্বার খুলেচে আকাশ পুলকময়!
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

পিতৃ-ভক্তি।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই দুর্দ্দান্ত জর্ম্মণসেনা নান্সি আক্রমণ করিল। হটাৎ এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে নগরবাসীগণের আতঙ্কের আর সীমা রহিল না। নান্সির বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তা যুবকের ন্যায় পূর্ণ উদ্যম লইয়া মাতৃ ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নগরবাসীদিগকে প্রাণস্পর্শি ভাষায় স্বদেশের গৌরব কথা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণে দণ্ডায়মান থাকিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। নাগরীকগণও বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তার জীবন্ত ও জলন্ত উৎসাহ বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া শত্রুর গোলার সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পারিশে সংবাদ গিয়াছে, ইতিমধ্যে তথা হইতে সৈন্য-সাহায্য আসিয়া পঁহুছিলে তাহারাও পূর্ণ উদ্দমে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে; নতুবা অপ্রস্তুত অবরুদ্ধ নগরবাসীগণের পক্ষে এরূপ প্রবল শত্রুর সম্মুখে মৃত্যু ব্যতীত অন্য উপায় আর কি থাকিতে পারে?

*　　*　　*

কুমারী টেলিসিয়া বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তার একমাত্র কন্যা। এই মাতৃহারা কন্যাটীর আকর্ষণে বৃদ্ধ সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারেন নাই; টেলিসিয়াও পিতার এমন 'বাধুক' হইয়া পড়িয়াছিল যে পিতা ছাড়া এ বিশ্ব সংসারে সে আর কিছু বুঝিত না; ক্রমে তাহার বয়স অষ্টাদশ অতিক্রম করিলেও সে তাহার পিতার স্নেহ বন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া লইয়া গিয়া পৃথক সংসার পত্তনের চিন্তা করিতে পারে নাই, পিতার সেবায় নিজের দেহ মন সমর্পণ করিয়া রহিয়াছে।

বিপদ অকস্মাৎ গৃহদ্বারে সমুপস্থিত দেখিয়া টেলিসিয়া পিতার সহিত যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইল এবং পিতার সুরে সুর মিলাইয়া নগরবাসীদিগকে প্রদীপ্ত-কণ্ঠে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বৃদ্ধ পিতা ও যুবতী পুত্রীর মুখে জন্মভূমির গৌরব গাথা শ্রবণ করিয়া নান্সির আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আরো অধিকতর উৎসাহে মাতিয়া উঠিল, তাহারা তাহাদের অবরুদ্ধ অবস্থার যাবতীয় দারুণ দুঃখ কষ্ট, অভাব-অভিযোগ ভুলিয়া তাহাদের ভীষণ পরিণামের জন্য সানন্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

*　　*　　*

জর্ম্মণ সেনাপতি অনবরত চেষ্টা করিয়াও যখন কিছুতেই সেই দুর্ভেদ্য নগর বিধ্বস্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার সমস্ত ক্রোধ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নান্সির শাসন কর্ত্তার জন্য পুঞ্জিভূত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে সেই হতভাগ্য শাসন কর্ত্তাকে শূলে চড়াইয়া তাহার ঘোর অবিমৃষ্যকারিতার ফল প্রদান করিতে লাগিলেন।

*　　*　　*

উপর্য্যুপরি গোলার আঘাতে একদিন নগরপ্রাচীর উড়িয়া গেল। বাঁধমুক্ত জলস্রোতের ন্যায় শত্রু সৈন্য নগর প্লাবিত করিয়া ফেলিল। নান্সি অধিকৃত হইল।

নান্সির শাসন কর্ত্তা কোথায়? সেনাপতির পুঞ্জিভূত ক্রোধ সেই বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তাকে খুঁজিয়া খুজিয়া হয়রান্ হইয়া গেল; কেহই তাঁহার খোজ বলিয়া দিল না।

সেনাপতি নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা—সকলকে শৃঙ্খলিত করিয়া আনিয়া বলিলেন—"কে নান্সির শাসন কর্ত্তা, তোমরা আমাকে বলিয়া দাও! আমি তাহাকেই চাই, তোমাদিগকে আমি মুক্ত করিয়া দিতেছি।"

বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তা ও তাঁহার বীর দুহিতা সেই শৃঙ্খলিত জনগণের সহিত তথায়ই উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিল না।

জনমণ্ডলী নীরব। সেনাপতি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আদেশ করিলেন—"নগরবাসীদিগকে সমানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান কর এবং সেই শ্রেণীবদ্ধ নরনারীর প্রতি দশম ব্যক্তিকে শূলে চড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের পাপের সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে দাও।"

সেনাপতির আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান করা হইল। পুনরায় সেনাপতির পূর্ব্ব আদেশ সকলকে শুনাইয়া দেওয়া হইল—"কোথায় শাসন কর্ত্তা বলিয়া দাও—তোমাদিগকে এখনই মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইবে।"

তথাপি কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না।

*　　*　　*

গণনা আরম্ভ হইল। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ। দশম ব্যক্তিকে পৃথক করিয়া সেনাপতির সম্মুখে নেওয়া হইল। সেনাপতি প্রশ্ন করিলেন—"মরিতেই প্রস্তুত আছ, না শাসনকর্ত্তার খোঁজ বলিয়া দিবে ?"

নাগরীক উত্তর করিল—"মরিব।"

সেনাপতি ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিলেন—"তাহাই হউক।"

* * *

টেলিসিয়া পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। সে গণনা করিয়া দেখিল, তাহার পিতা গণনায় দশম স্থানীয় হন। সে পিতাকে তাহা না বলিয়া হটাৎ সরিয়া পড়িল, এবং পুনরায় আসিয়া পিতার অপর পার্শ্বে দাঁড়াইবার স্থান করিয়া লইল এবং পিতাকে এক পা সরাইয়া দিল। বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তা দুহিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না, তিনি তখন তাঁহার সামান্য তুচ্ছ জীবনটীর জন্য যে কত নিরপরাধ মহৎ জীবন নষ্ট হইতেছে, আকুল প্রাণে তাহারই চিন্তায় বিব্রত ছিলেন।

গণনা চলিয়া আসিয়া টেলিসিয়ার উপর পড়িল। দশম স্থানে টেলিসিয়া। টেলিসিয়া অম্লান বদনে পিতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছে। এইবার বৃদ্ধ পিতার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তখন কন্যার স্থান পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন।

বৃদ্ধ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"আমিই দশম স্থানে ছিলাম, অতএব আমিই বধ্য—আমাকেই তোমরা লইয়া যাও।"

টেলিসিয়া আপত্তি করিয়া বলিল—"তোমরা যাহাকে দশম স্থানে পাইয়াছ, তাহাকেই লইতে ন্যায়তঃ বাধ্য; আমিই দশম স্থানে প্রাপ্ত—"

ঘটনা বিচার্য্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইলে উভয়েই সেনাপতির সম্মুখে নীত হইলেন।

* * *

টেলিসিয়া বলিল—'মহাশয়, আমাকেই দশম স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আমিই বধ্য।—"

বৃদ্ধ পিতা কন্যার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"কে দশম স্থানীয় সে বিচার আর আপনাকে করিতে হইবে না, আপনি নগরের শাসন কর্ত্তাকে অন্বেষণ করিতেছেন, আমিই সেই ব্যক্তি, আপনি আমার প্রতি আপনার অভিরুচি মত শাস্তির ব্যবস্থা করুণ, আমার এই তুচ্ছ জীবনের জন্য এতগুলি নিরপরাধ নরনারীর জীবন লইবেন না—আমার এই ভক্ত বিশ্বাসী নগরবাসীদিগকে ও এই পিতৃ-ভক্ত কন্যাকে ছাড়িয়া দিন—"

* * *

বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তার সৌম্য মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ও পিতৃ-ভক্ত কন্যার অপূর্ব্ব পিতৃভক্তির কাহিনী শুনিয়া সেনাপতির পাষাণ হৃদয়ও সেই মুহূর্ত্তের জন্য যেন দ্রবিভূত হইয়া গেল। তিনি কয়েক মিনিটের জন্য টেলিসিয়ার সরল সুন্দর মুখ খানির উপর তাঁহার স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া—অর্দ্ধ কোষোন্মুক্ত অসি ধীরে ধীরে কোষ বদ্ধ করিয়া বলিলেন—

"আপনার পিতৃভক্তিরই জয় হইল।"

ভারতে ইংরেজ।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ও দিনেমারগণ ভারতের বিপুল বিভবে অঙ্গপুষ্টি করিতেছিল। ইংলণ্ডের দৃষ্টিও এই উপলক্ষে সুদুর ভারতের বিস্তৃত ধন ভাণ্ডারের উপর নিপতিত হইয়াছিল।

কথিত আছে, ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ও নাকি ইংলণ্ডের রাজা আলফ্রেড ভারতীয় রত্ন সংগ্রহের জন্য সিগেলমাস (Sighelmus) নামক সেরবারণের বিশপকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ঐ বিশপ মহোদয় ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর ধনরত্ন ও সুগন্ধ মসলা দি লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

উপর্য্যুক্ত ঘটনা সত্য হউক কি মিথ্যা হউক—ভারতবর্ষ যে রত্নগর্ভা একথা বৈদেশিকের নিকট চিরকাল বিদিত ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে পুর্ত্তগীজ—জলরাজ্যের অধীশ্বর, স্পেইন বাহুবল দৃপ্ত বিজয়ী নাবিক; এমন অবস্থায়

ইংলণ্ডের পক্ষে জলপথে প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে মনে করিয়া ইংলণ্ডীয় বণিকগণ ভারতে আগমনের নূতন পথ আবিষ্কারে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

তাঁহারা প্রথমতঃ এসিয়ার উত্তর উপকূল ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিন খানা সুদৃঢ় জাহাজ লইয়া সার হিউ উইলবি ইংলণ্ড ত্যাগ করিলেন। তখন সমুদ্র পথে জল দস্যুর ভয়ানক উপদ্রব। উইলবি জল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া লেপলণ্ডের উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তথায় শীতে ও অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সঙ্গী রিচার্ড চেনসেলার একখানা জাহাজ লইয়া মস্কোনগরে প্রত্যাগমন করেন। এইরূপ পরীক্ষান্তে ঐ পথ তুষারাবৃত ও বিপদ সঙ্কুল বলিয়া পরিত্যক্ত হয় এবং ইংলণ্ডবাসীগণ নূতন পথ আবিষ্কারের উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত হন।

এই সময় কোন একব্যক্তি স্থলপথে রুষ ও পারস্য রাজ্যের উপর দিয়া ভারতবর্ষে আগমনের সহজ উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য অগ্রসর হন। আর একদল ইংরেজ স্থলপথে কাস্পিয়ান অতিক্রম করিয়া বোগদাদ নগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন; তাঁহারাও ভারতবর্ষের সন্ধান করিতে না পারিয়া অবশেষে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। এইরূপে ইংলণ্ডের লোক অনেক চেষ্টা এবং বহু অর্থ নাশ করিয়াও অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোনও খোঁজ খবর করিতে পারেন নাই।

অধ্যবসায়ী ইংরেজ এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিফল মনোরথ হইয়াও নিরাশ হইলেন না। পুনরায় জল পথে ঘুরিয়া ভারতবর্ষ প্রাপ্তির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এবার আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া, আমেরিকার উপকূল ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিবার কথা স্থির হইল। কাবেট, ডেবিস, ক্রবিসার ও হডসন এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারাও সফল মনোরথ হন নাই। ১৫৭৬ হইতে ১৬১৬ পর্য্যন্ত ঐ পথ আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই ঐ পথে ভারতে আসিবার উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই।

এদিকে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত নাবিক স্যার ফ্রেনসিস ড্রেক দক্ষিণ সমুদ্র-পথে ভ্রমণ করিতে অভিলাষী হন। তিনি, ইতঃপূর্ব্বে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকার উপকূল প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন ঐ অর্থে পাঁচ খানা অর্ণবপোত বিবিধ সরঞ্জামে সজ্জিত করিয়া, ১৩ ডিসেম্বর প্লাইমাউথ পরিত্যাগ করিলেন। পর বৎসর আগষ্ট মাসে তিনি মেগেলন প্রণালীতে ও সে স্থান হইতে কালিফর্ণিয়া গমন করেন। অতঃপর তিনি মালকা রাজ্যেরও নানা স্থানে ঘুরিয়া ১৫৮০ অব্দের ২০ শে সেপ্টেম্বর প্লাইমাউথে উপনীত হইলেন। ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং এই ভূপ্রদক্ষিণ কারীকে সম্মান সূচক "নাইট" উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

ড্রেকের কৃতকার্য্যতায় ইংলণ্ডের বণিকবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। অনেকে তাঁহার পদানুসরণ করিতে অগ্রসর হইলেন। টমাস কেবেন্ডিস নামক একব্যক্তি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে পরিভ্রমণ মানসে বহির্গত হইলেন।

এদিকে ষ্টিভেন্স নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারী গোয়া নগরে আসিয়া ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া স্বদেশে তাহার এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের লোক ঐ বিবরণ কোন উপায়ে পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়া ভারতের জন্য একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

তখন জন নিউবেরী ও রলফ্ ফিচের অধিনায়কত্বে একদল ইংরেজ বণিক ভূমধ্যসাগর পথে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ইংলণ্ডের তদানিন্তন রাণী এলিজাবেথের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাণী উৎসাহের সহিত অনুমতি প্রদান করিয়া দিল্লীশ্বর আকবরের নিকট ও চীন রাজের নিকট দুইখানা অনুরোধ পত্র প্রদান করিলেন।

নিউবেরী ও ফিচ সহচরগণের সহিত ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কতক দিন আলিপ্পো ও বোগদাদে কাটাইয়া বসোরাতে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে অরমাজ যাইয়া কারবার

করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁহারা কোন বাধা প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে মাইকেল ষ্ট্রোপন নামক জনৈক ইটালিয়ান বণিক তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন, তাহার ষড়যন্ত্রে পর্ত্তুগীজরা নিউবেরী ও ফিচকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিল এবং তাঁহাদিগকে ভারতের পর্ত্তুগীজ অধিকৃত গোয়া নগরীতে বিচারের জন্য পাঠাইয়া দিল।

এইরূপ উপায়ে ইংরেজ প্রথম ভারতবর্ষের ভূমি স্পর্শ করিয়াছিলেন।

সংগ্রহ।

পতিরস্তা।

সকল দেশেই যে স্ত্রীলোকগণই পুরুষের প্রতি অনুরক্ত এবং সেই অনুরাগ যে সকল দেশেই সমপরিমাণে বিদ্যমান এমন নহে। পরন্তু সকল স্ত্রীলোকেই—যে সকল পুরুষের সহিত প্রেমে মত্ত হয় তাহাও নহে। কোন একটি বিশেষ গুণের পক্ষপাতি হইয়া পুরুষের প্রতি নারী জাতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। কথায় বলে "মানুষ গুণে বশ" সর্ব্বগুণ আবার এক ব্যক্তিতে সম্ভব নয়। গুণের মধ্যেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়, আবার গুণ গ্রাহকেরও ভিন্ন আভরুচ। "ভিন্নরুচিহি মানবাঃ।" সেই জন্য বিভিন্ন দেশের স্ত্রীলোকের পতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কি অভিরুচি কোন অভিজ্ঞ লেখকের লেখা হইতে আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

ফরাসী বিলাসিনীগণ বীর ও রসিক স্বামী কামনা করেন।

জার্ম্মাণ রমণীগণ স্থির প্রণয়ী ও চিরবিশ্বাসী পতিতে রত।

ওলন্দাজ কামিনীগণ যে স্বামী নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারেন, সেরূপ পতিতে রত। তাঁহারা চান যে এই সুখ স্বচ্ছন্দে কেহ না বিঘ্ন উৎপাদন করে, ইহাতেই তাহারা সুখী।

স্পেন নারীরা বৈর নির্য্যাতনকারী স্বামী ভাল বাসেন।

ইটালী রূপসীগণ কবিত্ব ও কল্পনাপূর্ণ ভর্ত্তা লাভে যত্নবতী।

দিনেমার ললনাগণ, স্বামী যদি তাহার শ্বশুরের দেশকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বসুখাধার বলেন তবে সেই স্বামীকে তাঁহারা খুব পছন্দ করেন।

রুষিয়ার সীমন্তিনীগণ—স্বামী যদি ইউরোপের পশ্চিম বিভাগীয় জাতিদিগকে অসভ্য ও দুরাচার বলিয়া ঘৃণা করেন, তবে সেইরূপ স্বামীই—তাঁহাদের প্রণয় উপযোগী।

ইংরাজ বীরাঙ্গনাগণ ধনবান স্বামী চাহেন।

আমেরিকার সোহাগিনীগণ বিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে।

নিগ্রো স্ত্রীগণ বনবাসী স্বামী চান।

আফ্রিকার সাকারাগণ নৃত্যগীত পারদর্শী স্বামীতে রত।

নিউবিয়ার বরবর্ণিনীগণ যে স্বামী নানারূপ রঙ্গ দ্বারা বেশ সাজিতে পারেন, এমন পতিই ভালবাসেন।

চীন নিতম্বিনীগণ চিত্রাঙ্কন ও কলাবিদ্যাভিজ্ঞ ভর্ত্তার ভক্ত।

জাপান বধূগণ বীর ও বাণিজ্যপ্রিয় প্রতি চান।

তিব্বত লক্ষ্মীরা সংস্কৃত ভাষাদক্ষ ধার্ম্মিক স্বামী লাভে দৃঢ়চিত্ত।

ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোক শিল্প বিদ্যা বিশারদ ভর্ত্তা ভালবাসেন।

কাশ্মিরী বিদুষীগণ সুসভ্য স্বামীর সেবাপরায়ণা, মাড়বারি মেয়েরা ধর্ম্মরত ও ঈশ্বরভক্ত পতি গ্রহণে ব্যস্ত।

পাশ্চমা নারীগণ বলবান পতি চান।

বোম্বায়ের স্ত্রীগণ ব্যবসায়-দক্ষ পতি লাভে কৃতসঙ্কল্পা।

মাদ্রাজ শ্যামাঙ্গীগণ ইংরাজী ভাষা দক্ষ পতি প্রিয়।

উৎকল যোষিৎগণ মূর্খ অথচ কৃষিকার্য্যে পারদর্শী এমন স্বামী চান।

বাঙ্গালী সতীগণ সর্ব্বাঙ্গে গহনা দিতে পারেন এমন স্বামী পছন্দ করেন।

আসামী সুকেশিনীগণ স্বদেশ ভক্ত ভর্ত্তা ভক্ত।

গারো মেয়েরা প্রতিহিংসাপরায়ণ পতিতে রত।

খসিয়া ও জয়ন্তীগণ যবন বিদ্বেষ ভাবাপন্ন স্বামী চান।

আরব সুলোচনাগণ—পর্ব্বতবাসী স্বামী ভালবাসেন।

কোল ও ভীল নারীগণ শত্রুদলনে সক্ষম স্বামীর সঙ্গ চান।

রাজপুত রমনীরা বীর ও অচল প্রতিজ্ঞ স্বামী ভক্ত।

জাট কুলকামিনীগণ সমরদক্ষ পতির পক্ষপাতিনী।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, DACCA

সৌরভ

অষ্টম বর্ষ। ময়মনসিংহ, ভাদ্র ১৩২৭। একাদশ সংখ্যা।

"চিত্রাঙ্গদা" কাব্য প্রসঙ্গ।

পুরাতন 'সাহিত্য' পত্রের পাতাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে ৺ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "কাব্যে নীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে রবি বাবুর 'চিত্রাঙ্গদা কাব্যের' বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহার উপর চোখ পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধ কবি-সমালোচক অস্কার্ ওয়াইল্ডের The Critic as Artist নামক গ্রন্থের কলাকুশলতা ও সমালোচনী শক্তির বিভিন্নতা বিষয়ক মন্তব্যগুলির কথা মনে পড়িল। বস্তুতঃ, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী দু'চার জন সৌভাগ্যবান্ সাহিত্যিকের কথা ছাড়িয়া দিলে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি এবং রসগ্রাহিনী সমালোচনা শক্তির একত্র সমাবেশ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি সাহিত্যে ড্রাইডেন্ কল্‌রিজ্, জার্ম্মানীতে গেটে, আমাদের দেশে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও কাব্য-সমালোচক বটেন। কিন্তু সচরাচরই দেখা যায়, প্রত্যেক কবির কাব্য-লক্ষ্মীই যেন এক একটি সীমাবদ্ধ বিশিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে বিচরণ করেন,যাহার বাহিরের সমুদয় জগৎ তাঁহার নিকট অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়,অথবা কুৎসিত অনাসৃষ্টি মাত্র। এবং ইহার কারণও ওয়াইল্ড নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই যে, শ্রেষ্ঠ কবিদের সমুদয় মানসিক শক্তি ও কল্পনাশক্তি নিজ নিজ সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণায় অভ্যুত্থান হইয়া হৃদগত আদর্শের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ট ভাবে আবদ্ধ, ও কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে যে অন্যবিধ আদর্শের সম্ভাবনীয়তাও তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন না। এ জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই কোন প্রতিভাবান্ কবি অপর কবির কাব্য সমালোচনা করিতে গিয়াছেন তখনই গুরুতর ভ্রম প্রমাদে পড়িয়াছেন। শেলী, বায়রন্, ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ, এমন কি দিব্যদৃষ্টি মিল্‌টনেও এই ত্রুটি লক্ষিত হয়। আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালও প্রতিভার ঐ স্বাভাবিক সসীমতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার আর যাহা শ্রেষ্ঠত্বই থাকুক না কেন, রবীন্দ্রনাথের যাহা বিশেষত্ব—প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের অপরোক্ষ অনুভূতি, এবং তাহা বিশ্লেষণের অসাধারণ শক্তি, তাহা তাঁহাতে (দ্বিজেন্দ্রলালে) নাই। রায়-কবিকে সাধারণ ভাবে Narrative poet, বর্ণনা-কুশল কবি—বলা যাইতে পারে। যে সকল বাহ্য ঘটনাবলী, কিংবা স্থূল অনুভূতি সাধারণের হৃদয় মনের অধিগম্য, তাহার বিশদ্ মনোহারী শব্দচিত্র অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত।—তাঁহার সরল হৃদয়ের আন্তরিকতার সংযোগে ঐ সকল বিষয়কেই তিনি সঙ্গীতময় ছন্দবৈচিত্রে এবং সরল আবেগময়ী ভাষার উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এ জন্যই তাঁহার 'হাসির গান' এবং স্বদেশ-প্রীতি-মূলক সঙ্গীত ও নাটকগুলি অপূর্ব্ব হইয়াছে। কিন্তু, কোন্ কোন্ গুপ্ত গিরি-গহ্বরের বাসনা-পঙ্কিল, আবদ্ধ বারিরাশি হইতে ক্ষীণ রেখায় ক্ষরিত হইয়া কত বন্ধুর শৈল পথের উপর দিয়া বহিয়া কত রাসায়নিক পদার্থের সহযোগে বিশুদ্ধ হইয়া পরিশেষে মানব-প্রেম পাবনী সুরধুনীতে পরিণত হয়,—মানব জীবনের ভিতরকার ইতিহাস কত বিরোধ-সংগ্রাম, কত আলো ও ছায়া, পাপ ও পুণ্য, উত্থান-পতন, কত আশা

নৈরাশ্য, অশ্রু ও হাস্য, কত মিলন ও বিরহের সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠে—এই সকল গূঢ় কাহিনী রবীন্দ্র নাথের কাব্যে কত বিচিত্র রাগিণীতে সঙ্গীত ময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে; অথচ এ সকলের আভাষ-ইঙ্গিত দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যাদিতে পাই না। বস্তুতঃ যেখানেই দ্বিজেন্দ্রবাবু জটিল চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়াছেন, সেই স্থানেই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার নুরজাহান চরিত্রে এবং 'সিংহল বিজয়ে' বিজয় সিংহ চরিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রতিভার এই বৈষম্য হেতু দ্বিজেন্দ্রবাবু রবিবাবুর 'যেতে নাহি দিব' উপভোগ করিতে পারেন, 'গোরার' সৌন্দর্য্য এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের আদর্শ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু "চিত্রাঙ্গদা" এবং অপরাপর যে সকল অনুপম কাব্যাদিতে রবীন্দ্রনাথ মানব হৃদয়ের অতলে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিকট দুর্ব্বোধ্য, অস্পষ্ট, দুর্নীতিপূর্ণ। এজন্যই তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের অর্জ্জুনকে "জঘন্য পশু," কুমারীর ধর্ম্মনাশ-কারী, এবং চিত্রাঙ্গদাকে ব্যাভিচারিণী উপযাচিকা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠ কাব্য-রসিক ৺প্রিয়নাথ সেন "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যের সৌন্দর্য্য এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুর অভিযোগগুলির ভিত্তিহীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে আর একটু আলোচনা বোধ করি বাহুল্য হইবে না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতের ন্যায্যতা এবং অন্যায্যতা পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে উক্ত কাব্যের গল্পাংশটিকে কাব্য-সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টন হইতে পৃথক করিয়া অনুসরণ করিব। ইহাতে রবিবাবুর অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে।

অপুত্রক মনিপুররাজের একমাত্র দুহিতা, পুত্ররূপে পালিতা ও শিক্ষিতা চিত্রাঙ্গদা—যে অন্তঃপুরবাস কিংবা লজ্জাভয় কাহাকে বলে জানিত না, যে মদনের 'পুষ্পধনু কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোনে' তার কোন সন্ধান রাখে নাই, যে শিখিয়াছিল শুধু ধনুর্বিদ্যা আর পুরুষের বেশে স্বেচ্ছামত ঘুরিয়া ফিরিয়া যুবরাজরূপে রাজকার্য্য করিতে—সেই চিত্রাঙ্গদা ঘটনাচক্রে কিংবা কামদেবের অমোঘ বিধানে মনিপুরের দুর্গম অরণ্যপথে ব্রহ্মচারী ব্রতধারী বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইল; আর যেই দেখিল, সেই মুহূর্ত্তে আবাল্যের সকল শিক্ষা দীক্ষা ভুলিয়া গেল—সেই "বীর্য্যশৈল-শৃঙ্গ 'পরে নিত্য একাকিনী রমণী" এই প্রথম জানিল সে নারী, এই প্রথম দেখিল, সম্মুখে পুরুষ মূর্ত্তি। এই অঘটন সংঘটনের হেতু স্বয়ং কামদেবই প্রকাশ করিয়াছেন—

> 'আমিই চেতন করে' দিই
> একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
> নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।"

তাই সেই পুরুষপ্রাণ, পৌরুষস্বভাব নারী তার নারী প্রকৃতি ফিরিয়া পাইল,—তার শৌর্য্যবীর্য্য স্পর্দ্ধাগর্ব্ব মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল, সে পার্থের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিল।

চিত্রাঙ্গদাত আত্মসমর্পণ করিল, কিন্তু সে যে কুরূপা। তাই তার শুধু "বীর্যমন্ত অন্তরের বলে," 'কিনাঙ্কিত কঠিন বাহুর' বন্ধনে পুরুষ আসিয়া ধরা দেবে কেন? মধুহীন কুসুমের ন্যায় কুরূপার প্রেমকে অর্জ্জুন-ভৃঙ্গ প্রত্যাখ্যান করিল;—লজ্জা বজ্রের মত চিত্রাঙ্গদার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার নারী মর্য্যাদা দারুণরূপে আহত হইল। কিন্তু এই আঘাতে তার সকল দম্ভ টুটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার এই জ্ঞানেরও উদয় হইল, অবলার বল, নিরস্ত্রের অস্ত্র, নারীসৌন্দর্য্য তাহার নাই। সে বুঝিল—

> 'অবলার কোমল মৃণাল বাহু দুটি
> এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল!
> ধন্য সেই মুগ্ধা মূর্খা ক্ষীণতনুলতা
> পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়লীনাঙ্গিনী
> সামান্যা ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
> মানে পরাভব বীর্য্যবল, তপস্যার
> তেজ!"—

চিত্রাঙ্গদা তার কুমার হৃদয়ের নবীনোচ্ছল প্রেমের অপমানের বেদনায় আজ প্রথম বুঝিল—

> "রমণীত—
> সহজেই অন্তরবাসিনী, সঙ্গোপনে
> থাকে আপনাতে; কে তারে দেখিতে পায়,
> হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
> প্রকাশ না পায় যদি!"

তাই, 'গুপ্ত প্রেম' কবিতার কুরূপা নারীর সেই ব্যথিত ক্রন্দনই যেন চিত্রাঙ্গদার হৃদয় মথিত করিয়া উঠিতেছে—

"তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে!
মনে গোপনে থাকে প্রেম যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে চাহিয়া দেখি তারে
কি বলে আপনারে দিব তায়।"

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ত দীনা, লীনা অন্তরবাসিনী রমণী নহে, যে সে 'মনেরি অন্ধকূপে' আপনার হৃদয়-কল্পলোকী প্রেমকে গুপ্ত রাখিয়া ব্যর্থতাকে অদৃষ্টের অব্যর্থ দান বলিয়া গ্রহণ করিবে? চিত্রাঙ্গদা বীরাঙ্গনা, পুরুষকার কাহাকে বলে তাহা সে জানে, তাই আপনার বীর্য্যমন্ত্র অস্ত্রের বলে প্রেমসাধনায় সিদ্ধ হইয়া অন্তরের নারীকে সার্থক করিবার জন্য তাহার এই অটল সঙ্কল্প:—

"এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে;
যে নারী নির্ব্বাক ধৈর্য্যে চির মর্ম্মব্যথা
নিশীথ নয়ন জলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসি তলে,
আজন্ম বিধবা, আমি সে রমণী নহি;
আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল!
আপনারে বারেক দেখাতে পারি যদি,
নিশ্চয় সে দিবে ধরা!"—

তাই চিত্রাঙ্গদা 'জন্মদাতা বিধাতার বিনা দোষের অভিশাপ নারীর কুরূপ' ঘুচাইয়া হৃদয়দেবতার পূজার জন্য সৌন্দর্য্য-কুসুম লাভ করিবার নিমিত্ত কঠোর ব্রত ধারণ করিল, এবং তপস্যার তাপে যৌবনকুসুম খিন্ন মলিন করিয়া দেবতার প্রসন্নতা লাভ করিল। ভুবন-বিজয়ী কামদেব ও ঋতুরাজ বসন্তের বরে, এখন চিত্রাঙ্গদা অপূর্ব্ব সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে, যেন মুহূর্ত্তের মাঝে অনন্ত বসন্ত তার অক্ষয় ভাণ্ডারের সমস্ত সৌরভ-শোভা চিত্রাঙ্গদার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিল, দেখিতে দেখিতে নবীন যৌবনোচ্ছ্বাসে তার সর্ব্ব দেহ 'লক্ষ্মীর চরণসদ্য পদ্মের মতন' অপূর্ব্ব পুলকভরে প্রস্ফুটিয়া উঠিল। সেই পূর্ব্বেকার কুরূপা, প্রত্যাখ্যাতা চিত্রাঙ্গদাই যখন আবার আপনার দেবদত্ত সুদুর্লভ সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য লইয়া অর্জ্জুনের কাছে উপস্থিত হইল, তখন সেই সন্ন্যাসী অর্জ্জুনই মুহূর্ত্তের মাঝে তাহার হৃদয়-দ্বারে 'প্রেমার্ত্ত অতিথি' হইয়া প্রার্থনা জানাইলেন:—

"যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থান দান, সেথা হতে
আর তারে করোনা বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্য সম।"

অর্জ্জুন ত আসিয়া ধরা দিল,—তাঁহার সকল পৌরুষগর্ব্ব বীরত্বের নিত্যকীর্ত্তিতৃষ্ণা, পূর্ণসৌন্দর্য্যরূপিনী চিত্রাঙ্গদার চরণতলে সমর্পণ করিল;—'পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর ভুবনবাঞ্ছিত অরুণ চরণ তলে লুটাইয়া পড়ে' সেইরূপ আপনার সর্ব্বস্ব লইয়া চিত্রাঙ্গদার চরণে লুটাইয়া পড়িল;—কিন্তু কই, চিত্রাঙ্গদাকেত এবার বাসনার বাগ্র অধৈর্য্যে আপনার হৃদয়দেবতাকে একেবারে বক্ষে আঁকড়িয়া ধরিতে দেখিনা? কেন? এই ঔদাসিন্যের, এই প্রত্যাখ্যানের কারণ কি প্রতিহিংসা বৃত্তি, অথবা লঘুচিত্ত নারীর প্রেমের ছলা কলা মাত্র? এই প্রত্যাখ্যানের মূলে তার নারীমর্য্যাদাবোধ, প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের তুচ্ছ রূপের প্রতি লালসা দেখিয়া দারুণ মর্ম্মব্যথা, মিথ্যারূপের দ্বারা সত্য নারী-হৃদয়ের সৌন্দর্য্যকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য আত্মগ্লানি; এবং সর্ব্বোপরি, আহত অভিমানের সঙ্গে প্রেমের, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণেচ্ছার দ্বন্দ্ব—এই সকল বিবিধ মনোবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাত দেখিতে পাই। বস্তুতঃ চিত্রাঙ্গদার এই প্রত্যাখ্যান বর্ণনার প্রতি বর্ণে কবি অতি কৌশলে চিত্রাঙ্গদার উৎকৃষ্ট নারী মাহাত্ম্য, তার হৃদয়ের প্রশস্ততা, প্রেমের সমুচ্চতা সুস্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছেন:—

"ধিক্, পার্থ ধিক্!
কে আমি, কি আছে মোর, কি দেখেছ তুমি,
কি জান আমারে! কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত! মুহূর্ত্তেকে সত্য ভঙ্গ

করি, অর্জ্জুনেরে করিতেছ অনর্জ্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎ-পল্ল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনী-নিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জ্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করে' ফেলে' সত্যের বন্ধন! কোথা গেল
প্রেমের মর্য্যাদা! কোথায় রহিল পড়ে'
নারীর সম্মান! হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার!
————যাও যাও ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর মিথ্যারে কোরোনা
উপাসনা। শৌর্য্য বীর্য্য মহত্ব তোমার
দিয়োনা মিথ্যার পদে! যাও, ফিরে যাও!"

অর্জ্জুনের প্রতি এই কঠোর সং্সনার ভিতরকার অর্থ:—

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে;
মনে কি করেছ বঁধু
ও হাসি এতই মধু,
প্রেমনা দিলেও—চলে
শুধু হাসি দিলে?

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা কি এতই হৃদয়হীনা যে আত্মাভিমানকেই বড় করিয়া অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া দিয়া থাকিতে পারে, যে অর্জ্জুনের অক্ষয়নাম সমস্ত জগৎ হ'তে লুণ্ঠন করিয়া তার সমস্ত কুমারীহৃদয়কে পূর্ণকরিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে; যে অর্জ্জুনের নয়নের দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হ'য়ে তাহাকে কাঁড়িয়া লইতে চাহিতেছে,—যাহার উত্তপ্ত হৃদয় সর্ব্বাঙ্গ টুটিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতে চাহিতেছে, যাঁহার অন্তরের ক্রন্দন-ধ্বনি যেন প্রতি অঙ্গে ধ্বনিত হইতেছে? আর, মান-অপমান, লজ্জা-সম্ভ্রম অশ্রু-ব্যথা—সর্ব্বস্ব যদি হৃদয়-দেবতার চরণে উৎসর্গ করিতে না পারিলাম তবে আর প্রেম হইল কই? তাই চিত্রাঙ্গদা তার রূপের সপত্নীকে স্বহস্তে সাজাইয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা-তীর্থের বাসর-শয্যায় পাঠাইয়া প্রতিক্ষণ অন্তরের অবমাননা ও দেহের সোহাগ দেখিয়া হিংসানলে নারী-হৃদয়টিকে আহুতি দিয়া অর্জ্জুনের ভোগ-তৃষা মিটাইতে স্বীকৃতা হইল।

এইরূপে অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার মিলন, দেহের সঙ্গে দেহের মিলন সংঘটিত হইল। তারপর বর্ষব্যাপী সম্ভোগ-কামনার তৃপ্তিহীন অনলে অবিশ্রাম আহুতি দান,—রাঙ্গা অধরের অমৃত-বিষেতে মাখা তপ্ত মদিরা পান, বাহুবন্ধে বন্দী হয়ে প্রণয়ের সুধাময় চিরপরাজয়, রাঙা পরশের রসে প্রবাস দিবসগুলি গেঁথে গেঁথে প্রিয়-কণ্ঠে মাল্য দান, রূপের চঞ্চলা মায়া মৃগীর পশ্চাৎ বাসনার মদমত্ত কুরঙ্গের উর্দ্ধশ্বাস প্রধাবন। কিন্তু এই ভোগের মধ্যে রহিয়া রহিয়া ভোক্তার হৃদয় কাঁটিয়া অতৃপ্তির দীর্ঘ শ্বাস শুনিতে পাই, এই সৌরভের বেড়া ভাঙ্গিবার জন্য, স্বপনের জাল ছিন্ন করিবার জন্য, সুখের সাগরে ডুবিতে ডুবিতে কোথাও ঠাঁই না পাইয়া, রুদ্ধ শ্বাস হইয়া মুক্তিকার জন্য পরাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে:—

স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধনা আমায়,—
স্বাধীন হৃদয় খানি দিব তব পায়।
——কড়ি ও কোমল।

কারণ, শুধু দেহের ক্ষণিক সৌন্দর্য্য, 'কেবল মেঘের সুবর্ণ-ছটা, গন্ধ কুসুমের, তরঙ্গের গতি' 'কিংশুকের' একটি-পল্লব-প্রান্তভাগে একটি শিশির কণা, কি মানব-হৃদয়ের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে পারে? মানুষের অন্তহীন তৃষা কি এই হাসিটুকু, এইকথা টুকু, নয়নের দৃষ্টিটুকু, প্রেমের আভাস টুকুতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? সে যে চায় সমগ্র-মানব হৃদয়টিকে নিঃশেষে আপনার আত্মার মধ্যে লাভ করিতে। যে পর্য্যন্ত মানুষের এই দুরাশা, আত্মার রহস্য লোকে প্রবেশ করিবার জন্য দুরাকাঙ্ক্ষা, না সফল হইয়াছে সে পর্য্যন্ত তার হৃদয়ের ক্রন্দন শান্ত হইবার নহে। তাই যতই চিত্রাঙ্গদা—

"হায় হায়, আজ এত হয়েছে অরুচি
নারীর সৌন্দর্য্যে, নারীতে খুঁজিতে চাও
পৌরুষের স্বাদ" ইত্যাদি—তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে অর্জ্জুনের

ব্যথিত হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছে ততই বাসনার মায়ালোক বর্জ্জন করিয়া চিরন্তন প্রেমের ধ্রুবলোকে সত্যের আশ্রয় পাইয়া আত্মাকে মুক্তিদান করিবার জন্য অর্জ্জুনের সমস্ত অন্তরাত্মা অসহ্য বেদনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে :—

"বুঝিতে পারিনে
আমি রহস্য তোমার! এত দিন আছি,
তবু যেন পাইনি সন্ধান! তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন-রত্ন,—আলিঙ্গন সুধা;
নিজে কিছু চাহনা, লহনা। অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে! তেজস্বিনি, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্য্যরাশি মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্ত্তি শুধু, নিপুণচিত্রিত
শিল্প যবনিকা।"

তাই অর্জ্জুনের হৃদয়ের প্রার্থনা :—

"সাধকের কাছে প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়া কায়া ধরি; তার পরে
সত্য দেখা দেয় ভূষণ বিহীন রূপে
আলো করি অন্তর বাহির! সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে।
আমার যে সত্য তাই লও। শ্রান্তিহীন
সে মিলন চির দিবসের।"

প্রার্থনা পূর্ণ হইল, দেহের মিলনের পর এতদিনে আত্মায় আত্মায় পূর্ণমিলন সঙ্ঘটিত হইল—মধু যামিনীর যৌবনোৎসবের অবসানে 'অক্ষয় অমর রমণী' নির্ম্মল দিবালোকে অবগুণ্ঠন মুক্তা হইয়া আপনার নগ্ন মাহাত্ম্যে, পুণ্য জ্যোতিতে শুভ কল্যাণী মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা হইলেন। যৌবন-দেবতা ঋতুরাজ বসন্তের সেই আশ্বাস বাণী—

"ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পরে যাবে তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে; হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাল্গুনী।"

সফল হইল—অর্জ্জুন ধন্য হইল।

(আগামীবারে সমাপ্য)।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

শ্রান্তা।

সই, পেলেত এখন পরিচয়?
নন্দের ছালিয়া, চিকণ কালিয়া
বড়ই কুটিল কু আশয়!

কি কহিব সই, করমের লেখা,
নহিলে সবি ত চক্ষে মোর দেখা—
বাঁকা কটি খানি ছিলত না ঢাকা?
বাঁকা সে নয়ন দ্বয়?

বাহিরে যে জন কুচকুচে কালো,
সে কিলো কখন হ'তে পারে ভাল?
চাহনিটী তার বাঁকা চির কাল,
বুঝিনু না সে সময়!

পিরীতি করিয়ে লম্পটের সনে
ফিরিতে হইল শুধু বনে বনে?
প্রদোষে এসেছি তার অন্বেষণে—
এখন অরুণোদয়!

জাগে নাই কেহ, এই অবসরে
চল সখি, যাই নিজ নিজ ঘরে,
ভ্রমলে হবে কি পুলিন উপরে?
কালা অতি নিরদয়!

চল মোরা গিয়ে যমুনাতে নাই,
ঝাপ দিয়ে জলে এ জ্বালা জুড়াই,
বাসি ফুল মালা ভাসাইয়া যাই,
আছেত কলঙ্ক ভয়?

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত।

মগধ অতি প্রাচীন রাজ্য। মহাভারতের সময় এইখানে জরাসন্ধ রাজত্ব করিতেন। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে ইনি যোগদান করিতে অস্বীকার করাতে ভীমসেন ইঁহাকে মল্লযুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাজগৃহ বা রাজগির বা গিরিব্রজ মগধের রাজধানী ছিল। তাহার পর আমরা মগধাধিপতি শিশুনাগের নাম শুনিতে পাই। এই বংশের পঞ্চম নরপতি বিম্বিসার বা শ্রেণিক এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার সময় অঙ্গ রাজ্য (আধুনিক ভাগলপুর ও মুঙ্গের) মগধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইঁহার অজাতশত্রু নামক এক পুত্র ছিলেন। ইনি বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় শাক্য মুনি মগধে নবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তিনি এই মহাপাপের কথা শুনিয়া অজাতশত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে নানা প্রকার ভৎর্সনা করেন। গঙ্গার উত্তর দিকে ঐ সময় লিচ্ছবি নামক এক অতি পরাক্রান্ত জাতি বাস করিত। ইহারা সুযোগ পাইলেই নদী পার হইয়া মগধে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিত। অজাতশত্রু ইহা নিবারণের জন্য গঙ্গার তীরে এক দুর্গ বেষ্টিত নগর স্থাপন করেন। ইহাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাটলিপুত্র।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে কোশল নামে এক রাজ্য ছিল। অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের মাতুল ইহার অধিপতি ছিলেন। এক সময় সমগ্র অযোধ্যা এবং গঙ্গা গণ্ডক ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থান কোশল রাজ্যের অধীন ছিল। ক্রমে ক্রমে এই বিপুল রাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

উপর্য্যুক্ত শিশু নাগের বংশে মহানন্দীন নামে এক জন রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ঔরসে ও এক শূদ্রার গর্ভে মহাপদ্ম নন্দ জন্মিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এই মহাপদ্মের মৃত্যুর পর তাঁহার আটজন পুত্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের কথা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি মগধ হইতে বিতাড়িত হইবার পর পঞ্জাবে যাইয়া আলেকসন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গ্রীকবীর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। আলেকসন্দরের পরিত্যক্ত গ্রীক সৈন্য সকল তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া কিয়দংশ স্বদেশাভিমুখে চলিয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ এইস্থানে থাকিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়া যায়। ইহার পর চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্য আক্রমন করেন এবং নন্দদিগকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। কথিত আছে, এই ব্যাপারে চাণক্য (কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত) নামক জনৈক ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে বিশেষ সাহায্য দান করেন। নন্দ ভূপতিরা এই ব্রাহ্মণকে কোনও সময় অপমানিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। চন্দ্রগুপ্ত মুরা নাম্নি জনৈক নীচ জাতীয়া রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার বংশ ইতিহাসে 'মৌর্য্য' বংশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

ঐ সময় ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ক্ষমতাশালী আর কোনও নরপতি ছিলেন না। তাঁহার অধীনে ৩০,০০০ অশ্বারোহী, ৯০০০ হস্তী সৈন্য, ২০০০ রথ এবং ৬০০০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। ইঁহার সাম্রাজ্য পূর্ব্বদিকে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ দিকে নর্ম্মদা, উত্তর দিকে হিমালয় এবং পশ্চিম দিকে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আলেকসন্দরের মৃত্যুর পর এসিয়া খণ্ডের সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার দুইজন সেনাপতির—এন্টিগোনশ এবং সেলিউকস্ নিকাটর—মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। প্রথমে বিজয় লক্ষ্মী এন্টিগোনশের প্রতি প্রসন্ন হয়েন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে (খ্রীঃ পূঃ ৩১২) সেলিউকস নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পশ্চিম এসিয়ার অধিকাংশ স্থান অধিকার করেন। পাঠক জানেন, আলেকসন্দর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়েন। সেলিউকস্ তাঁহার নিকট

জনৈক দূত পাঠাইয়া সিন্ধু নদের পশ্চিম কূলস্থ সমস্ত স্থান ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার এই অনুরোধে কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করিলেন না। সেলিউকস আলেকসন্দরের অতি প্রিয় সেনাপতি ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের এই ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েন এবং এক বিশাল সৈন্যদল লইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েন। সিন্ধুর পূর্ব্ব তীরের কোনও এক স্থানে হিন্দু সৈন্য গ্রীক সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। কয়েক ঘণ্টা ভীষণ যুদ্ধের পর সেলিউকস সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়েন। পরাজিত সৈন্যের সহিত প্রাচীন হিন্দুশক্তি কোনও দিন শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। তাহা যদি করিতেন, তাহা হইলে সে দিন সিন্ধু তীর হইতে বোধ হয় এক জন গ্রীকও স্বদেশে ফিরিয়া যাইত না। তাহার পর উভয় পক্ষ সন্ধি করিলেন। ইহার সর্ত্তানুসারে চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান প্রদেশ লাভ করিলেন এবং সেলিউকসের এক কন্যাকে তিনি পত্নী-ভাবে গ্রহণ করিলেন। শ্বশুরের সম্মানার্থ মগধরাজ ৫০০ সুশিক্ষিত হস্তী তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

আলেকসন্দরের দিগ্বিজয় কাহিনী গ্রীক ইতিহাস লেখকেরা অতি বিষদ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেলিউকসের কাহিনী বিবৃত করা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই। এই গ্রীক সেনাপতি যদি বিজয় লাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও এ বিষয়ে এ প্রকার উদাসীন থাকিতেন না।

সন্ধি হইবার পর সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের নিকট এক জন দূত প্রেরণ করেন। ইতিহাসে ইনি মিগাস্থিনিস্ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি কয়েক বৎসর মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে বাস করিয়া মগধ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কথা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার এই ইতিহাস হইতে আমরা চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার সাম্রাজ্য সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারি।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন :—

পাটলিপুত্র—এই মহা নগরী গঙ্গা ও সোন নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ইহা নয় মাইল ও প্রস্থে প্রায় দুই মাইল। ইহার চারিদিক সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। সমগ্র নগরের মধ্যে ৩৪টী ফটক; ঐ প্রাচীরের মধ্যে ৫৭০টি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমস্ত সহর অতি গভীর খাত দ্বারা সুরক্ষিত।

মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত যখন বাহিরে আসিতেন, তখন স্বর্ণনির্ম্মিত ও মণিমুক্তা খচিত শিবিকা ব্যবহৃত হইত। তাঁহার পরিচ্ছদ এমন সুন্দর ছিল যে, মেগাস্থিনিস্ তাঁহা বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যখন মহারাজ স্বীয় সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইতেন, তখন প্রায়ই হস্তী ব্যবহার করা হইত, সামান্য দূর যাইতে হইলে কখন কখন অশ্বে আরোহণ করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ষণ্ড প্রভৃতির যুদ্ধ দেখিতে খুব ভালবাসিতেন। কখন কখন এই সকল জন্তুর সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ হইত। এবং ইহাতে জয়লাভ করিলে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইত। অনেক সময় ১২ ০০০ হস্ত পরিমিত ভূমি গোলাকারে ঘেরা হইত। ইহার মধ্যে বড় বড় বলদের গাড়ীতে ঘোড়া এবং বলদ জুতিয়া ছাড়া হইত। সাধারণতঃ মধ্যে একটা ঘোড়া এবং দুই দিকে দুইটা বলদ জোতা হইত। এই দৌড়ে (race) যে শকট প্রথম হইত তাহার অধিকারীকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইত।

চন্দ্রগুপ্ত মধ্যে মধ্যে শীকারে বাহির হইতেন। ঐ সময়ে মহারাজ হস্তীর উপর এবং তাহার চারিদিকে সশস্ত্র রমণী সকল অশ্বের উপর গমন করিতেন। এই সকল রমণী পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনা হইত। যে পথে মহারাজ যাইতেন উহার উভয় পার্শ্ব রজ্জুদ্বারা রক্ষিত হইত। উহার মধ্যে জন সাধারণ যাইতে পারিত না।

প্রাসাদের ভিতর সমস্ত স্থান উপযুক্ত রমণীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইত। তাঁহারা উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সর্ব্বদা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মহারাজ সপ্তাহে একদিন প্রকাণ্ড দরবারে বসিয়া সাধারণের আবেদন প্রভৃতি গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত শীকার, যুদ্ধ কার্য্য বা পার্ব্বন উপলক্ষে প্রাসাদের বাহিরে আসিতেন।

চন্দ্রগুপ্ত প্রজাদিগের বিশেষ প্রিয় ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা কয়েকবার হইয়াছিল। এই জন্য তিনি কখনও দিবসে নিদ্রা যাইতেন না। দুই রাত্রি উপর্য্যুপরি তিনি এক কক্ষে শয়ন করিতেন না। তাঁহার শয়ন কক্ষের সঠিক সংবাদ তিনি কাহাকেও বলিতেন না। মুদ্রারাক্ষস নাটকে আমরা এই ঘটনা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারি।

সৈন্যাদি :—তাঁহার অধীনে ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী, ৯০০০ হস্তী এবং ৮০০ রথ ছিল। প্রত্যেক অশ্বারোহীর নিকট দুইটা বল্লম ও একখানা করিয়া চামরার ঢাল থাকিত। প্রত্যেক পদাতিকের হস্তে একখানি তরবারি এবং তীর ধনুক থাকিত। তীর এত সজোরে ছুটিত যে অতি সুদৃঢ় বর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া ফেলিত। প্রত্যেক রথের উপর দুইজন যোদ্ধা ও দুইজন চালক থাকিত। এবং হস্তীর উপর মাহুত ছাড়া তিনজন করিয়া তীরন্দাজ অবস্থান করিত। অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের সময় ৬৯০০০০ সৈন্য সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত।

সমস্ত সৈন্য বিভাগ (Military Department) ছয়ভাগে (Boards) বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বোর্ড পাঁচ জন কর্ম্মচারী দ্বারা পরিচালিত হইত। ছয়টি ভাগের নাম (১) নৌ বিভাগ (Admiralty)। যুদ্ধার্থ সমস্ত রণতরী ও নৌ সৈন্য ইহার অধীনে ছিল। (২) কমিসরিয়েট :– খাদ্যাদি সমস্ত এই বিভাগ কর্ত্তৃক ক্রয় ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। সাধারণ ভৃত্য, কুলি, কারিগর প্রভৃতি ইহার অধীন ছিল। (৩) পদাতিক সৈন্য বিভাগ (৪) অশ্বারোহী সৈন্য বিভাগ। (৫) হস্তী সৈন্য বিভাগ। (৬) রথ সৈন্য বিভাগ।

চন্দ্রগুপ্তের এই সৈন্য শাসন প্রণালী (War administration) দর্শনে আধুনিক য়ুরোপীয়েরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। সেই প্রাচীন যুগে যে ভারতীয় সভ্যতা চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল তাহা এই সকল বিষয় দেখিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অনেকে মনে করেন, যুদ্ধাদি কার্য্যে য়ুরোপীয়েরা চিরদিনই ভারতবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের এই শাসন প্রণালী ও সেলিউকসের পরাজয় দ্বারা আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, ভারতবাসীরা য়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা এ বিষয়েও ন্যূন ছিলেন না।

রাজ্য শাসন প্রণালী :— সমস্ত রাজধানী শাসনের জন্য এক সভা ছিল। ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগে পাঁচজন করিয়া অভিজ্ঞ ও প্রাচীন কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রত্যেক ভাগের (Board) কার্য্য প্রণালী নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

১ম বিভাগ—সহরের সমস্ত কারিকরের কার্য্য ইহার অধীন ছিল। তাহাদের পারিশ্রমিকের হার ইহা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত। যাহাতে শিল্পী কোনও প্রকার মন্দ দ্রব্য ব্যবহার না করে, সে বিষয়ে ইহার কর্ম্মচারীরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। সে সময়ে অনেকে অন্য শিল্পীদিগের হস্তাদি নষ্ট করিয়া নিজের শিল্প কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে চেষ্টা পাইতেন। এ প্রকার অন্যায় কার্য্যের জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

২য়—ভিন্নদেশীয় ভ্রমণকারী, সওদাগর প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রাখা ইহার প্রধান কার্য্য ছিল। প্রয়োজন হইলে এই বিভাগ হইতে পার্শ্ব রক্ষক, পথ প্রদর্শক, উপযুক্ত বাসস্থান, ভৃত্যাদি ও চিকিৎসক পর্য্যন্ত প্রবাসীদিগকে দেওয়া হইত। কোনও বিদেশী দেহত্যাগ করিলে তাহার দাহের বা কবরের এবং তাহার পর তাহার দ্রব্যাদি তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করা হইত। এই সকল বিবরণ হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, ঐ সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বহুতর লোক মগধে উপস্থিত হইতেন।

৩য়—এই বিভাগ কর্ত্তৃক জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব রাখা হইত। যাঁহারা চিরদিন প্রাচীন ভারতবাসীকে অর্দ্ধ অসভ্য বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তের এই বিভাগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেন। য়ুরোপেও—যাহার সভ্যতার জন্য পাশ্চাত্য জাতি আজকাল সর্ব্বদা দর্প করিয়া থাকেন,—এই বিভাগের প্রতিষ্ঠার কাল খুব পুরাতন নয়।

৪র্থ—বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রভৃতির সমস্ত কার্য্য এই বিভাগের অধীন ছিল। আমদানি ও রপ্তানির শুল্ক নির্ণয়, সমস্ত সাম্রাজ্যের জন্য একই প্রকার ওজন নির্দ্ধারণ প্রভৃতি ইহার কর্ম্মচারীরা স্থির করিতেন। কেহ যদি শুল্ক হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অন্যায় উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাহার অতি কঠিন শাস্তি হইত।

৫ম—সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্যের সমস্ত ভার এই বিভাগের অধীন ছিল।

৬ষ্ঠ—হাট, বাজার প্রভৃতির সমস্ত বন্দোবস্ত এই বিভাগের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রধান ২ নগরই ঠিক এই ভাবে শাসিত হইত। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের নগর সকল কি প্রকারে শাসিত হইত, তাহার উল্লেখ মেগাস্থিনিস্ করেন নাই। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার পূর্ব্বেও রাজ্য সকল এই প্রকারে শাসিত হইত। এ প্রকার শাসন প্রণালী যে চন্দ্রগুপ্ত একবারে আয়ত্ব করিয়াছিলেন তাহা কখনও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রগুপ্ত হয়ত স্বীয় শাসন প্রণালীর বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু মূল প্রণালীর জন্য যে তিনি পূর্ব্বতন নরপতিদিগের নিকট ঋণী ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সমস্ত সাম্রাজ্য কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক ভাগে (Province) একজন করিয়া রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) নিযুক্ত ছিলেন। সাধারণতঃ সম্রাটের নিকট আত্মীয়েরা এই পদ প্রাপ্ত হইতেন। মোগলদিগের সময়ও এই নিয়ম ছিল। তবে বাহিরের লোক যে একবারে নিয়োজিত হইতেন না, এমত নহে। মোগলদিগের সময় মানসিংহ, টোডরমল্ল, জয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দুরাও প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার পদ লাভ করিয়াছিলেন।

শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য প্রধান ২ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য একদল কর্ম্মচারী ছিলেন। মহারাজ অশোকের সময় ইহাঁরা 'পুলিসানি' ও 'পতিবেদকা' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানদিগের সময় ইহাঁদিগকে 'আস্‌বার নবীশ্' নামে অভিহিত করা হইত। ইহাঁরা সম্রাট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইতেন। কর্ম্মচারীদিগের কোনও অন্যায় কার্য্য দেখিলে ইহাঁরা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্রাটের কর্ণগোচর করিতেন। এরিয়ান নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহাসিক বলেন, "এই কর্ম্মচারীরা কখনও মিথ্যা রিপোর্ট করিতেন না, কারণ ভারতবাসীরা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলিতেন না। মিথ্যাকে তাঁহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।"

চন্দ্রগুপ্ত একবার সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সর্ব্বসমেত প্রায় ৪০০০০০ লোক ছিল। মেগাস্থিনিস্ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, "হিন্দুদিগের মত সন্নীতি পরায়ণ জাতি আমি আর দেখি নাই। এত লোক একত্র থাকিত বটে, কিন্তু অন্যায় আচরণের কথা প্রায়ই শুনিতে পাইতাম না। সামান্য চুরি ভিন্ন অপর কোন অপরাধের কথা আমি খুব শুনিয়াছি। কিন্তু এই সামান্য অপরাধেও খুব কঠিন সাজা দেওয়া হইত। চুরির জন্য প্রায়ই চরম শাস্তি হইত। কেহ কাহারও অঙ্গের হানি করিলে তাহারও ঐ অঙ্গ ছেদন করা হইত। মিথ্যা সাক্ষী দিলে হাত পা বা নাসিকা ছেদন করা হইত। ব্যভিচার অপরাধে মস্তক মুণ্ডন করিয়া ঢাক বাজাইতে ২ রাজ্য হইতে ব্যাভিচারিকে দূর করিয়া দেওয়া হইত। ইহার মত অপমানকর শাস্তি আর ছিল না।

জমির চতুর্থ ভাগের উৎপন্ন রাজা পাইতেন। মেগাস্থিনিসের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এ দেশের সনাতন হিন্দু প্রথা ভূমির ষষ্ঠাংশ রাজস্ব গ্রহণ। চন্দ্রগুপ্ত যে কিজন্য এই প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনও কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। মেগাস্থিনিস্ যাহা বলিবেন তাহাই যে মানিয়া লইতে হইবে এমত কোনও কথা নাই। এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরা সাত প্রকার জাতিতে বিভক্ত ছিলেন :—(১) দার্শনিক (বোধ হয় তিনি ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন), (২) কৃষক, (৩) পশুপালক, (৪) শিল্পী, (৫) সৈনিক পুরুষ, (৬) গুপ্তচর, (৭) মন্ত্রী। তাঁহার এই জাতি বিভাগ দর্শনে আমরা কি বলিব? এই ভাবের আরও অনেক কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সৈনিক কার্য্যে সচরাচর ক্ষত্রিয় জাতিকে নিযুক্ত করা হইত। কৃষক সম্প্রদায়কে কখনও এই কার্য্যে লওয়া হইত না। কৃষিকার্য্যের উপর সম্রাটের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইহার উন্নতির জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। যাঁহারা মনে করেন যে কৃষি কার্য্যের জন্য খাল প্রভৃতি খননের ব্যবস্থা নিতান্ত আধুনিক, তাঁহারা শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন যে, ইহার জন্য মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এক বিশেষ বিভাগ খুলিয়া ছিলেন। কৃষি কার্য্যের জন্য যেখানে জলের প্রয়োজন হইত, সেখানে খাল বা কূপ খনন করা হইত। অবশ্য ইহার জন্য শুল্ক আদায় করা হইত। অনেক স্থানে বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখা হইত। অনাবৃষ্টির সময় এই জল কৃষকদিগকে দেওয়া হইত। চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক পোষ্যগুপ্ত এই প্রকারে 'সুদর্শন' নামক এক কৃত্রিম হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের সময়ের বিবরণে আমরা এই জাতীয় হ্রদের উল্লেখ অনেক স্থানে দেখিতে পাই।

সাধারণ লোক অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও এক বা দুই ঘোড়ার রথ যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করিত। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা হস্তী, অশ্ব এবং চারি বা আট ঘোড়ার রথ ব্যবহার করিতেন। সাধারণ লোকের শেষোক্ত যান ব্যবহার করিলে শাস্তি হইত। রাস্তা ঘাটের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য একদল কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজপথ সকল যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখা হইত এবং প্রত্যেক অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর পাথর (Mile stone) বসান থাকিত।

অনেকে মনে করেন যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন নীতি গ্রীকদিগের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই রাজনীতির সহিত তৎকালীন গ্রীক রাজনীতির তুলনা করিলে এই কথা যে অমূলক তাহা আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারি। যদি আমরা আমাদের প্রাচীন পুস্তক সকল বেশ সাবধানের সহিত অনুসন্ধান করি, তাহা হইলেই আমরা আমাদের প্রাচীন রাজনীতির কথা জানিতে পারি। চন্দ্রগুপ্ত ঐ প্রাচীন হিন্দু রাজনীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের নিকট এ বিষয়ের জন্য তিনি বিন্দুমাত্রও ঋণী নহেন। সুখের বিষয় এই যে, ভিনসেন্টস্মীথ্ প্রমুখ প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখকগণও আমাদের এই মত সমর্থন করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ভারতের যে একজন অতি প্রতাপশালী সম্রাট্ ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় একছত্র মহারাজ চক্রবর্ত্তী ভারতে বড় একটা জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, আমাদের তৎসাময়িক পুস্তকে তাঁহার কথা আদৌ উল্লেখিত হয় নাই। এমন কি, তাহার পর প্রায় এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার নাম আমরা কোনও সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাই না। ইহার কোনও সঠিক কারণ বুঝিতে পারা যায় না। অনেকে বলেন, তিনি নীচ জাতীয় ছিলেন এবং তাঁহারই বংশে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাট অশোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারেরা তাঁহার নাম, পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে 'মুদ্রা রাক্ষস' নামক একখানি নাটক রচিত হয়। ইহার মধ্যে আমরা চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। সংস্কৃত সাহিত্যের আর কোনও পুস্তকে আমরা চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ পাই না। মুদ্রা রাক্ষস নাটক হইতে আমরা একটি কথা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারি—চন্দ্রগুপ্তের নাম ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাঁহারা সকল মনোরথ হইতে পারেন নাই। জনসাধারণ যে তাঁহার কথা বিস্মৃত হয়েন নাই, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণই—এই নাটকখানা।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

স্বর্গীয় পণ্ডিত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন।

বর্ত্তমান বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ সভার ধর্ম্মোপদেষ্টা, সংস্কৃত ভারতীর একনিষ্ঠ সেবক, ঋষিকল্প পণ্ডিত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। বিগত ২০শে আষাঢ় রাত্রি দুই ঘটিকার সময় পতিত পাবনী জাহ্নবী তীরে তাঁহার অমর আত্মা চির ঈপ্সিত দিব্য ধামে প্রয়াণ করিয়াছে। তাঁহার অভাবে আজ বঙ্গদেশের যে নিদারুণ ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

কৃতিরত্ন মহাশয় বাঙ্গালা ১২৫০ সালের ১০ই মাঘ

নগরে জন্মগ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্মদান করিয়া যে সেরপুর দেশ বিদেশে সম্পূজিতা, পণ্ডিত দুর্গাসুন্দরও সেই সেরপুরের গৌরব ও পূজা এতদিন উজ্জল রাখিয়াছিলেন। আজ সেরপুরের এই শেষ উজ্জল নক্ষত্রটীও চিরতরে অস্তমিত হইল। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে ইঁহার অভাব খুব সহজে পূরণ হইবে না। হিন্দুসমাজ ইঁহার অভাব পদে পদে অনুভব করিবেন।

কৃতিরত্ন মহাশয়ের পিতা ৺ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ও সেরপুরের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কাশীরাম ন্যায়ালঙ্কার মুর্শিদাবাদ হইতে এখানে আসিয়া স্থানীয় বৈদ্য ভূম্যধিকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষ রমানাথ মজুমদার মহাশয়ের গুরুপদ স্বীকার করিয়া সেরপুরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বাৎস্য গোত্রীয়, বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

কৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার পিতৃদেবের টোলেই আরম্ভ হইয়াছিল। পিতৃদেবের নিকট ব্যাকরণের প্রাথমিক প্রকরণ শেষ করিয়া সেরপুরের স্বর্গীয় হরসুন্দর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট তিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। অতঃপর নবদ্বীপ যাইয়া নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত স্বর্গীয় ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া কৃতিরত্ন মহাশয় ৺কাশীধামে গমন করেন; তথায় যাইয়া ষড়দর্শনের আলোচনা করিয়া তৎবিষয়েও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অতঃপর জন্মভূমি সেরপুরে আসিয়া চতুষ্পাঠি স্থাপন করত জ্ঞান বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় সেরপুরের অবস্থা অত্যন্ত উন্নত হইয়া দাঁড়ায়। ইতঃপূর্ব্বেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য হরসুন্দর তর্করত্ন মহাশয় ও চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (পরে মহামহোপাধ্যায়) মহাশয় নিজ নিজ গৃহে টোল স্থাপন করিয়া বহুদূরবর্ত্তী স্থানের শিক্ষার্থীদিগকেও শিক্ষা দিতেছিলেন, এইবার কৃতিরত্ন মহাশয়ও গৃহে আসিয়া টোল স্থাপনা করিয়া বসিলেন। তখন সেরপুর প্রকৃতই বাণীর বিনোদকুঞ্জে পরিণত হইল।

এই সময় এই তিন টোলে প্রায় শতাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তখন সেরপুরের টোল সমূহের সুনাম এতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে নবদ্বীপ এবং বিক্রমপুর হইতে পাঠ শেষ করিয়া আসিয়াও অনেক শিক্ষার্থী একবার সেরপুরে পাঠ করিয়া যাইবার ইচ্ছা সম্বরণ করিতে পারিতেন না। সেরপুরের "স্মৃতির ব্যবস্থা" এই সময় নবদ্বীপ ও কাশীর ব্যবস্থার ন্যায় সম্মানিত হইত; কোন কোন স্থলে সেসকল স্থানের ব্যবস্থা লইয়াও সেরপুরের ব্যবস্থা না পাইলে লোকে তাহা অসম্পূর্ণ মনে করিত। সেরপুরের সেই গৌরবের অম্পদ সমূহ ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়াগেল।

ইঁহারা যে কেবল সেরপুরের—ময়মনসিংহের বা বাঙ্গালারই গর্ব্বের আস্পদ ছিলেন তাহা নহে; সমগ্র ভারতের ইঁহারা গৌরবের সামগ্রী ছিলেন।

কৃতিরত্ন মহাশয় সেরপুর ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বহরমপুরের রাণী আন্নাকালী জুবিলি চতুষ্পাঠির কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বহরমপুর লইয়া যান। এইস্থানে কৃতিরত্ন মহাশয় স্বীয় কৃতিত্ব প্রকাশের সুবিধা পান। তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দর্শনে বহরমপুর সংস্কৃত পরীক্ষা সমিতি তাঁহাকে তাহার সভাপতিত্বে বরণ করিলেন।

বহরমপুর হইতে কৃতিরত্ন মহাশয় কলিকাতা বিশুদ্ধানন্দ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে রঘুবীর বেদান্ততীর্থ, যোগী ঝা, প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণ এবং ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ৺রামধারী ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

এই সময় তিনি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যোগে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে পরিচিত হন এবং সেই সোসাইটির অনুরোধে সোসাইটির প্রকাশিত "প্রজ্ঞাপারমিতা" গ্রন্থের সম্পাদন করেন। এই ব্যাপারেই কৃতিরত্ন মহাশয়ের নাম পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠে। কলিকাতায় তিনি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া সম্মান লাভ করিতে থাকেন।

বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার শাস্ত্র ব্যবস্থাপকের পদে বৃত হন, এই সময় ইঁহার ব্যবস্থাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইতেছিল এবং ইনিই বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিত বলিয়া সম্মান লাভ করিতেছিলেন।

কৃত্তিরত্ন মহাশয় সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সদস্য ছিলেন এবং কিছুকাল কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেও অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে গৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষারও পরীক্ষক ছিলেন।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা প্রথম ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের অধিবেশনে কৃত্তিরত্ন মহাশয়কেই সভাপতি পদে বরণ করিয়া তাঁহার সমুচিত মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন।

গত ১৩২১ সালে মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ জমিদার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় বঙ্গের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে স্বর্ণ কেয়ূর প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। যথা কালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সভাপতিত্বে ময়মনসিংহ দুর্গাবাড়ীতে এক পণ্ডিত সম্মেলন হয়। বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহুত হনে। এই সভায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কৃত্তিরত্ন মহাশয়ই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক বলিয়া সম্মানিত হন এবং তাঁহাকেই রাজর্ষি মহোদয়ের প্রদত্ত—রৌপ্যাধারে স্বর্ণকেয়ূর ও স্বর্ণগ্রথিত রুদ্রাক্ষমালা প্রদান করা হয়।

তিনি কয়েকখানা সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, দুর্ভাগ্য বসতঃ তাহা এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

তাঁহার জীবনে তিনি অভাব সহ্য করিতে কম করেন নাই। এ অভাবের ভিতর প্রভূত অর্থের প্রলোভনও তাঁহার সম্মুখে কম দেখা দেয় নাই। কিন্তু তিনি তীব্র অভাবেও কাহাকে ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যবস্থা প্রদান করিয়া ন্যায়ের পথ লঙ্ঘন করেন নাই। আজীবন নির্ভিক ভাবে চলিয়া কর্ম্মময় ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

তিনি ৭৪ বৎসর বয়সে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। চারিদিন মাত্র রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। রোগাক্রান্তের পরদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত শশিকুমার বিদ্যাভূষণ আসিয়া পঁহুছিবা মাত্রই তাহাকে বলিলেন—"আমাকে গঙ্গায় নিলি না?" তাহার এই উপদেশ মত তখনই তাঁহাকে মোটর গাড়িতে 'গঙ্গাবাসে' নেওয়া হয়। মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে ও দশমিনিট পূর্ব্বে গঙ্গানীরে তনু স্পর্শ করান হয়।

তাঁহার তিন পুত্র বর্ত্তমান। ভগবান তাঁহাদিগের শোকার্ত্ত প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

শ্রীদুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ।

সমস্যা।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধুবাবু যে দিন দুঃখিনীকে পতিতার জীবনের দুঃখময় ফল বুঝাইতে গিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, দুঃখিনীর মন সেদিন হইতেই দুর্ব্বিসহ যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সেইদিন হইতে সে লক্ষ্য করিয়াছিল, যেন বাড়ী শুদ্ধ সকলেই তাহাকে তেমনি ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে। এই অশ্রদ্ধা ও অবহেলার কথা মনে করিয়া সে প্রায়ই একা একা বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিত।

নগেনের বিছানা হইতে গঙ্গার দূরবর্ত্তী চলন্ত ঊর্ম্মিলীলা বেশ সুন্দর দেখা যাইত। দুঃখিনী সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিত, আর আকাশ পাতাল চিন্তা করিয়া দিন কাটাইত।

বিধু তাহার এ ভাব লক্ষ্য করিয়া একদিন সস্নেহে বলিয়াছিলেন—"দুঃখিনী, repentence যার হয়, দয়াল প্রভু তাহার সহায় হন। তোমাকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে যেতে পাল্লে আমার বেনারস আসা স্বার্থক হতো। তুমিও জীবনের গতি নির্ণয় করে নিজের প্রয়োজনকে সম্যক প্রকারে অনুভব করে, আয়ত্ত করে নিতে পাত্তে এবং জীবনকে সফলতার Goal এ নিয়ে যেয়ে পৌঁছে দিতে পাত্তে।"

দুঃখিনী সেদিনও কোন উত্তর দেয় নাই। উত্তরের জন্য বিধু খুব লালায়িত ছিল না, দুঃখিনীর যে অনুশোচনা হইয়াছে, ইহা ভাবিয়াই সে আশান্বিত ছিল!

নগেনের অবস্থার খুব উন্নতি দেখা যাইতেছিল না। সে, কথা বলিতে পারিত বটে, কিন্তু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবা

কি নড়িবার শক্তি তাহার একেবারেই ছিল না। ব্রহ্মচারী তাহার শরীরে তাজা রক্ত প্রবেশ করাইবেন, বলিয়া গিয়াছেন। তাহার জন্ম একটু শক্তির প্রয়োজন। আর এক সপ্তাহ মধ্যে শরীর সেরূপ উপযুক্ত হইবে, ইহাই তাঁহার আশা।

দুঃখিনী নগেনের মনে প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই নিরীহ প্রাণীটী কি প্রকারে, কোন সংস্রবে তাহার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া মৌরসি পাট্টার অধিকার লইয়া বসিল—সে অনেক সময় চক্ষু বুঁজিয়া তাহা চিন্তা করিত। সে যখনই চক্ষু মেলিয়া চাহিত, তখনি তাহাকে—নিঃশব্দে তাহার ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে,—দেখিতে পাইত। যে তাহারই সেবায় এইরূপ আত্মত্যাগ করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানা নগেন নিতান্ত অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাই দুঃখিনী তাহার নিকট একটী প্রহেলিকার সামগ্রীই রহিয়া গেল। সে নিজেই তাহার নিকট তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, ইহা মনে করিয়াই সে আর কাহারও নিকট কোন কথা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নাই।

আটটায় বৃদ্ধা গঙ্গায় চলিয়া যান, বিধুও তাঁহার 'পলিসির' অনুসন্ধানে ও এজেন্সির কার্য্যে বাহির হন; তারপর ব্রহ্মচারীর নিকট রোগীর দৈনিক সংবাদ প্রদান করিতে যান।

নগেন চক্ষু মেলিয়াই দেখিল দুঃখিনী তাহার সেই অধিকৃত স্থানেই বসিয়া আছে।

নগেন তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

দুঃখিনী নীরবে কাঁদিতে ছিল—চক্ষের জলে তাহার রক্তিম গণ্ড ভাসিয়া যাইতেছিল।

নগেন ধীরে ধীরে দুঃখিনীর ডান হাত খানা টানিয়া লইয়া বলিল—"তুমি কাঁদিতেছ!"

দুঃখিনী তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া চামচ দ্বারা বেদানার রস তাহার মুখে তুলিয়া দিল।

দুঃখিনীর সহিত নগেনের আজ এই প্রথম আলাপ। নগেন ধীরে ধীরে বলিল—"তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?"

দুঃখিনী বেদানার বাটীর দিকে চক্ষু রাখিয়া বলিল—"দুঃখিনী।"

নগেন—"দুঃখিনী, তুমি যেই হও, আমার পরম বন্ধুর কার্য্য—আত্মীয়ার কার্য্য করিতেছ, সুতরাং তোমার দুঃখের কারণ আমার জানিবার অধিকার আছে। ক্ষুদ্র শক্তি হইলেও আমি যদি তাহার কিছু করিতে পারি—"

নগেন কথা বলিয়া কাহিল হইয়া পড়িল। দুঃখিনী কোন উত্তর দিল না। নগেন কয়েকবার শ্বাস ফেলিয়া পুনরায় বলিল—"বলিবে কি? আমি তাহার কি করিতে পারি?"

দুঃখিনী তাহার স্বাভাবিক কোমল স্বরে বলিল—"আপনাকে অধিক কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

সে মধুর ধ্বনি নগেনের অন্তর মধুময় করিয়া দিল। সে এরূপ কথা আরও শুনিতে চায়। এরূপ কথা দিন ভরিয়া শুনিলে বিনা ঔষধে, বিনা রক্ত প্রয়োগেই তাহার রোগ উপশম হইবে—ইহাই যেন তাহার দৃঢ় বিশ্বাস।

নগেন বলিল—"তুমি কথা বলিলেতো আমাকে আর বলিতে হয় না।

দুঃখিনী নীরবে নীচের দিকে চাহিয়া রহিল।

নগেন কিছুক্ষণ দুঃখিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় ডাকিল—"দুঃখিনী।"

দুঃখিনী নগেনের মুখের দিকে চাহিয়া আবার মাথা নোওয়াইয়া ফেলিল।

নগেন বলিল—"বল দুঃখিনী, আমার যদি সাধ্য থাকে, আমি তোমার দুঃখের ভার মাথা পাতিয়া লইব।"

নগেনের সহানুভূতিতে দুঃখিনীর দুঃখের ভার অনেক খানি লাঘব হইল। তাহার সহৃদয়তার তার অন্তর শীতল হইল—কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষু হইতে দু ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল।

নগেনের দৃষ্টি দুঃখিনীর মুখের উপর স্থাপিত ছিল; তাহার চক্ষে জল দেখিয়া নগেন হাত তুলিয়া তাহা মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"ছিঃ দুঃখিনী কাঁদিও না, ও তে আমার দুঃখ হয়। আমি বরং তোমাকে আর ও কথা জিজ্ঞাসা করিব না।"

দুঃখিনীর কপোল স্পর্শ করিয়া নগেন দুর্ব্বল হইয়া

পড়িল, তাহার হৃৎপিণ্ড দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিল।

দুঃখিনী উঠিয়া একখানা অয়েল ক্লথ আনিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"সাড়ে নয়টা হইয়াছে, এখন মাথা ধুইয়া দিব।"

নগেন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, শব্দ করিল না।

দুঃখিনী ধীরে ধীরে তাহার মাথা তুলিয়া উপাধান ঠেলিয়া মাথার নীচে অয়েল ক্লথ ঝুলাইয়া দিল; ধীরে, অতি সাবধানে ঠাণ্ডা করা গরম জল মাথায় ঢালিয়া মাথা ধুইয়া দিল। তারপর শুকনা নেকড়া দিয়া মুছিয়া দিয়া নিজ হাতেই মুখ চোখ ধুইয়া দিল।

নগেন ডাকিল—"দুঃখিনী!"

দুঃখিনী নিকটে আসিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইল।

নগেন কহিল—"কোথায় যাও, এইখানে বসো।"

দুঃখিনী মৃদুস্বরে বলিল—"আপনার পথ্য প্রস্তুত করিতে।"

নগেন—"তুমি বসো, ঠাকুর মা কোথায়?"

দুঃখিনী—"তিনি মন্দিরে। পথ্য আনিব না?"

নগেন—"তুমি আমার জন্য আর কত খাটিবে?"

দুঃখিনী—"স্নানের পরই যে দুধ বার্লি দিতে হয়।"

নগেন চুপ করিয়া রহিল। দুঃখিনীর মন ব্যথায় ভরিয়া গেল। "তিনিও কি আজ আমার ছোঁয়া গরম দুধ বার্লি খাইবেন না?" দুঃখিনীর হৃদয়ে এ আঘাত অত্যন্ত গুরুতর পীড়া দিতেছিল—সে দাঁড়াইয়াছিল—মেজেতে বসিয়া পড়িল—তারপর মনের আঘাতে চক্ষুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—দরদর ধারায় অশ্রু-প্লাবনে তাহার গণ্ড বহিয়া যাইতে লাগিল।

নগেন ডাকিল—"দুঃখিনী, এ দিকে আইস।"

দুঃখিনী উঠিয়া নিকটে যাইয়া দাঁড়াইল।

নগেন ধীরে ধীরে বলিল—"দুঃখিনী, আবার কাঁদিতেছ; বসো—এদিকে বসো,—বাতাস দাও।"

দুঃখিনী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল।

নগেন বলিল—"তোমার চক্ষের জল আমার ব্যথা বৃদ্ধি করে। তুমি কি তাহা ভালবাস?" বলিয়া নগেন দুঃখিনীর কাপড়ের অঞ্চল দিয়াই ধীরে ধীরে তাহার চোখ মুছিয়া দিল। দুঃখিনী চুপ করিয়া রহিল। একটু নড়িলও না।

নগেন দুঃখিনীর বাম হাতের কাঁচের চুড়ি গুগাছি নখে খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—"এখন পথ্য করিবার সময় হইয়াছে কি?"

দুঃখিনী—"আমিই আনিব কি?"

নগেন—"সে তোমার ইচ্ছা।"

দুঃখিনী—"আপনি বলিলেই আনিতে পারি।"

নগেন—"দাও, কিন্তু খাইয়া কি হইবে, আর কি বাঁচিব দুঃখিনী?"

দুঃখিনী—"আপনি কথা বলিবেন না—এতে শরীর আরো দুর্ব্বল হইয়া যায়।"

নগেন—"তুমি যদি কথা বল, তবে তো আমাকে এত কথা বলিতে হয় না।

দুঃখিনী ষ্টোভে পথ্য গরম করিয়া নগেনকে পথ্য করাইল।

নগেন বলিল—"দুঃখিনী, আজ আমার শরীর অনেক ভাল বোধ হইতেছে। তুমি কথা কও, আমি শুনি। তবেই আমার শরীর শুধরাইবে। তোমার কথাই আমার ঔষধ।"

বৃদ্ধা মন্দির হইতে আসিয়াছেন দেখিয়া নগেনের জিহ্বার ক্রিয়া বন্ধ হইল, কিন্তু তাহার তৃষিত দৃষ্টি দুঃখিনীর নির্ম্মল সৌন্দর্য্য সাগরেই ডুবিয়া রহিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রবিবারে পারুলের প্রস্তাবিত উদ্যান সম্মিলন হইয়াছিল। এই সম্মিলনে বাহিরের লোক কেহ ছিল না। পারুলদের ভাই বোনেরা ছিল, আর ছিল যতীন বোস ও শৈলেন।

যে উদ্দেশ্যে পারুল এই উদ্যান সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিল, সে উদ্দেশ্য তাহার সফল হয় নাই—বকুল ধরা দেয় নাই। সে দিন সে শৈলেনের ফরমাইস মত দিদির সঙ্গে বেশ মনোযোগ দিয়া গান গাহিয়াছে।

যতীন বোসের দুই একটা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে—তাঁহার নিকট যেমন মাথা নিচু করিয়া সসম্মানে পাঠ দেয় সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছে।

এই সম্মিলনে বকুল ব্যতীত আর সকলেই যাহার তাহার মনের কথা খুলিয়া বেশ বক্তৃতা করিয়াছিলেন! যতীন বোস তাঁহার বক্তৃতায় ইয়ুরোপীয় বলসেভিক ভাবের প্রাচুর্য্যে যে তথায় স্ত্রী জাতির মধ্যে অস্বামিক ভাব (Nationalisation of women) প্রবল হইয়া উঠিতেছে—ইহার সহিত সাফ্রেজিষ্ট ভাবের সমন্বয় করিয়া—তাহা বাঙ্গালার সমাজে বিস্তৃত হইলে এই বঙ্গ সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইবে—তাহার একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করেন এবং এই সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের মহিলা বিভাগের অনাবশ্যক ইয়ুরোপীয় ভাব প্রবণতার উল্লেখ করিয়া তাহা দ্বারা সমগ্র বঙ্গ সমাজের ভবিষ্যৎ অকল্যানের বিষয় গুলি ইঙ্গিতে দেখাইয়া দেন।

শৈলেনও বঙ্গসমাজের কয়েকটী ভবিষ্যৎ সমস্যার উল্লেখ করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিল। শৈলেন বলিয়াছিল—"দারিদ্র্য, কলকারখানার আবির্ভাব, অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি—এদেশে জীবন সংগ্রাম বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সকল কারণে এদেশের ঘরে ঘরে বিলাতের দৃশ্য দেখা যাইবে—দেশীয় পারিবারিক প্রথা লুপ্ত হইয়া গিয়া হোটেলে আহার বিহারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

সমাজের উপকারের জন্যই একদিন মানব সমাজে বিবাহ রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, পুনরায় দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই সেই বিবাহ বন্ধন তুলিয়া দিতে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। এ সমস্যা প্রাচ্য সমাজের একটী বিষম সমস্যা।

বঙ্গসমাজে আমাদের আয়ের পন্থা অপেক্ষা ব্যয়ের প্রয়োজন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছে—দেশের জন বৃদ্ধি ধনবৃদ্ধির পরিমাণকে অতিক্রম করিয়াছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় স্ত্রীসমস্যাও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে, personality বা ব্যক্তিত্বের ভাব আমাদের মহিলা সমাজে যেরূপ দ্রুতগতিতে সংক্রামিত হইতেছে, ২৫।৩০ পুরুষের অধীনে থাকিতে চাহিবে, তেমন মনে হয় না। এ সমস্যাগুলি আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। বঙ্গীয় মহিলাদিগেরই এ সকল বিষয়ে বেশী করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন—কেননা তাঁহারাই বাঙ্গালার শান্তিকুঞ্জের মূর্ত্তিমতী চিৎশক্তি।"

পারুল "বঙ্গীয় মহিলা সমাজে ভগ্নীভাবের প্রসার" সম্বন্ধে বলিয়াছিল—"মাতৃত্ব ও পত্নীত্ব বঙ্গসমাজে যত অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে—পর সেবার ভাব বা ভগিনী ভাব তত ফুটিয়া উঠে নাই। সে ভাবের ভিতরই সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ। মাতৃত্ব ও পত্নীত্বে আত্মভাবের—স্বার্থ সম্পর্কেরই সম্পূর্ণ বিকাশ।

বঙ্গীয় মহিলা জীবনকে আমরা যতই পরসেবায় বিলাইয়া দিব, ততই জাতীয় জীবনে আমরা শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিব। ভগবানের কার্য্যও বেশী পরিমাণে করিতে পারিব। বাঙ্গালার সমস্ত কন্যাদিগকে যে পত্নী এবং মাতাই হইতে হইবে, তাহা ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নহে। কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া জনসেবা দ্বারাও জগতের কল্যাণ করিতে হইবে। তাহার জন্য আমাদের সমাজেরও লোক আবশ্যক। বঙ্গীয় মহিলা সমাজের অন্ততঃ শতকরা কয়েকজন সেবাধর্ম্মে নিজকে দীক্ষিত করুন—বর্ত্তমান যুদ্ধ তাহার প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র এবং সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত ইয়ুরোপীয় ভগ্নীরা তাহার আদর্শ।"

দুর্গাদাস বাবু শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"বক্তৃতার কথায় আর প্রকৃত কার্য্যে—এ দুইতে অনেক প্রভেদ। যতীন আমেরিকা যাউক, ইহার মধ্যে সব বক্তৃতার ভাব তলাইয়া যাইবে। আর না হয়, তাহা দ্বারা একটা ব্যবসায়ই আরম্ভ করা যাইবে। জার্ম্মেনিতে গেলেই ভাল হইত, তা যখন আর হইল না, আমেরিকাই যাউক।"

ইহার পর যতীন বোস্ চলিয়া গিয়াছেন। তাহাকে দুর্গাদাস বাবু পুত্র কন্যাগণের সহিত গিয়া হাওড়া ষ্টেসনে আশীর্ব্বাদ করিয়া তুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনী এখন নগেনের ইঙ্গিতে তাহাকে দিন ভরিয়া যুদ্ধের সংবাদ পড়িয়া শুনায়। নগেন ঘুমাইয়া পড়িলে বা শুনিয়া শুনিয়া অবসাদ বোধ করিলে দুঃখিনী মনে মনে পড়িয়া স্মরণ করিয়া রাখে, নগেনের ঘুম ভাঙ্গিলে বা অবসাদের অবসানে, গল্প করিয়া তাহা শুনাইয়া দেয়। ইহাতে নগেনের খুব ফুর্ত্তি—এই ফুর্ত্তি তাহার শরীরের এবং মনের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। সে নিজকে ইহাতে খুব সুস্থ অনুভব করিয়া থাকে।

দুঃখিনীই এখন বলিতে গেলে তাহার আরোগ্যের ঔষধ, শক্তির পথ্য।

নগেন দুঃখিনীর দক্ষিণ হস্ত খানা ধরিয়া তুলিয়া নিজ বুকের উপর রাখিয়া বলিল—"দেখ, দুঃখিনী আজ বুকটাও যেন বেশ পরিষ্কার।"

দুঃখিনী বুকে হাত রাখিয়াই বলিল—"আজ বিকালে আপনার শরীরে রক্ত প্রবেশ করাইবেন; তারপর আপনার শরীর সারিতে আর সময় লাগিবে না।"

নগেন বলিল—আজ যে আমার শরীরে রক্ত প্রবেশ করাইবে, তাহা তোমাকে কে বলিল দুঃখিনী।"

দুঃখিনী—"বাবা ব্রহ্মচারী কাল রাত বলিয়া গিয়াছেন।"

নগেন—"রক্ত কোথায় পাইবেন, তোমাকে বলিলেন কি?"

দুঃখিনী মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"সেজন্য কি ঠেকা হইবে।"

নগেন উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—"রক্ত কি যে সে ই দিতে পারে, না যাহার তাহারই নেওয়া যাইতে পারে? তিনি কাহার রক্ত দিবেন, তাহা কি বলিয়াছেন?"

দুঃখিনী—নগেনের মুখের দিকে চাহিয়াই বলিল—"আমিই রক্ত দিব—কোন আপত্তি করিবেন না।"

নগেন মুখ কাল করিয়া বলিল"—তোমার বড় বেশী সাহস হইয়াছে।"

দুঃখিনী চমকিয়া গেল। মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনে কেবলি চিন্তা হইতে ছিল—তিনি আমার রক্তের দোষই ভাবিতেছেন। হায়, হায় আমার গতি কি হইবে?

নগেন বলিল—"ব্রহ্মচারী বাবাতো কাল আমাকে একথা বলেন নাই। তোমাকে কখন বলিলেন?"

দুঃখিনী ধীরে ধীরে বলিল—"আমাকে বাহিরে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন।"

নগেন—তিনি কি তোমাকে রক্ত দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন?

দুঃখিনী "না। তিনি রক্ত হইলেই এখন রোগ আরাম হইবে বলায়—আমি নিজ হইতেই স্বীকার করিয়াছি।"

নগেন—"রক্ত কিরূপে টানিয়া লওয়া হয় ও তাহার পরিণাম কি, তাহা তুমি জান কি?

দুঃখিনী—"বাবার নিকট সব শুনিয়াছি—তিনি আমাকে সকলই বলিয়াছেন।"

নগেন—"শরীরের রক্ত দান করিয়া এইরূপ শয্যা লইয়া দিন কাটাইলে—তোমাকে দেখিবে কে? আর তোমার কে আছে?"

দুঃখিনী চুপ করিয়া রহিল। তাহার রক্তই যদি দোষিত তবে তাহার আর উত্তর কি?

নগেন বলিল—"সে সব চিন্তা করিয়াছ কি? উত্তর দাও।

দুঃখিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমার রক্তই যদি আপনি দোষিত মনে করেন, তবে আর উত্তর দিবার কি আছে?

নগেন দুঃখিনীর হটাৎ দমিয়া যাইবার কারণ বুঝিতে পারিয়া তাহার হাতখানা টানিয়া পুনরায় বুকের উপর রাখিয়া বলিল "বুকটা ধরিয়া রাখ।"

দুঃখিনী বুকের উপর হাত রাখিলে নগেন বলিল—

"তোমার রক্তের বিচার আমি করিতে পারি না—আমার মনের ভাব তাহা নহে দুঃখিনী। তুমি রক্ত দিবে, সেই রক্তে আমি শক্তি লাভ করিব, আর তুমি চির রোগী হইয়া পঁচিয়া মরিবে, এরূপ অকৃতজ্ঞ ও নৃশংস ব্যবহার আমার দ্বারা হইবে না, আমি করিতে পারিব না—তোমাকেও করিতে দিব না।"

দুঃখিনী সাহস পাইয়া বলিল—"খুব অল্প রক্তেই হইবে, ওতে আমাদের খাটুনির শরীর নষ্ট হইবে না, বরং ভালই হইবে। আমার শরীরে নাকি দিবার পরিমাণ রক্ত আছে।"

নগেন—"খাটুনির শরীরে রক্তের প্রয়োজন বেশী। ও কিছুতেই হইবে না। আমি তোমার শুশ্রূষাতেই সারিয়া উঠিব। তোমার ন্যায় বন্য কুসুমকে বৃন্তচ্যুত করিয়া জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা যেন কদাপি না হয়।"

নগেনের কথায় দুঃখিনীর হৃদয়ে বড়ই সান্ত্বনা আসিয়াছিল। সে চোখে অশ্রু, মুখে হাস্য লইয়া বলিল—"বন্য কুসুম নিষ্প্রয়োজনেই ঝরিয়া পড়ে, তাহা যদি দেব পূজার প্রয়োজনে আইসে, তবে তাহার জীবন স্বার্থক হয়; বৃথা ঝরিয়া পড়েনা।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"এ বোধ হয় সংবাদ পত্র পাঠের ফল?"

দুঃখিনী লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। এই সময় বিধু বাবু আসিয়া খবর দিলেন—ব্রহ্মচারী বাবা ৩½টা ৪টার মধ্যে এসে 'ওপারেসন' করবেন।

বিধু এখন আর সাহিত্যিকের ভাষায় ব্যূহ রচনা করিয়া কথা বলেন না। নগেন তাহাকে শোধরাইয়া দিয়াছে, বুঝাইয়া দিয়াছে—ওরূপ কথা সহজ বোধ্য নহে—সুতরাং ব্যবসারের কথায় তাহা নিতান্ত অনোপযোগী। বিধু সেই হইতে তাহা কিছু কিছু করিয়া ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

নগেন বিধুকে ইঙ্গিতে বসিতে বলিল। বিধু বসিয়া বলিল—যুদ্ধের সংবাদ বড়ই ভয়ানক, ক্যেলে অধিকার করেছে, উপায় নেই।

নগেন্ হাসিয়া বলিল—"আমাদিগকে ইহার জন্য কি করিতে হইবে?"

বিধু—"আমাদিগকে পরাৎপরের নিকট মনঃসংযোগ করে উপাসনা কত্তে হবে।"

নগেন—"তাহাতে কি হইবে?"

বিধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আপনি বল্‌চেন কি? আমরা যা চিন্তাই কত্তে পারিনে Prayer তাই যে আমাদিগকে দিতে পারে। 'More things are brought by prayer than this world dreams of এ মত আমার নয়—েটাবার্টের।" ও লোকটাও জর্ম্মাণ।

নগেন বলিল—"বিধু বাবু, আপনাকে রোজ কষ্ট দিতেছি, আমার শরীর শীঘ্র সারিবেন, আপনি কত কাল অপেক্ষা করিবেন? আপনার বড়ই ক্ষতি হইতেছে।"

বিধু হাসিয়া বলিল—"নিরাশ হ'লে চল্‌বেনা। আমি এখানে বেশ আছি, আপনার শুশ্রূষা কত্তে পারলেতো একটা কাজই হ'তো। জন-সেবা পীড়িতের সেবা—সে কি কম সৌভাগ্যের বিষয়! তাতো হচ্চে না, হচ্চে স্বার্থ সিদ্ধি! Policy ও agencyর কাজটা Beneresএ মন্দ হলোনা নগেন বাবু!" বলিয়া বিধু হাসিয়া উঠিলেন। তারপর থামিয়া বলিলেন—"বন্ধু বান্ধবের আশীর্ব্বাদে আপনার আর অধিক কষ্ট পেতে হইবেনা—আপনি সেরে উঠ্‌বেন আর কি?"

নগেন মনে মনে এই সরল বন্ধুটীর প্রসংশা করিয়া প্রকাশ্যে বলিল—"কেউতো আমাকে আশীর্ব্বাদ করে না বিধু বাবু, আর আশীর্ব্বাদেরও লোক ভাল হ... পরম আয়ুর জোরওতো প্রচুর থাকা চাই।"

বিধু বলিল—"আশীর্ব্বাদ কি বলছেন! এই দেখুন, দুর্গাদাস বাবুর letter রোজ আসছে; যখনই প্রয়োজন, টাকা পাঠাচ্ছেন—পারুল, শৈলেন প্রতিদিন আপনার অবস্থার জন্য চিঠি লেখে অস্থির করে তুল্লে। এখানে এই দুঃখিনী কতো খাটছে—ওরতো তুলনাই নেই ঠাকুর মা সেদিন নাকি—ও কি বলে, তার কাছে—ধন্না দিয়ে ছিলেন আর কি চান্? এতলোকের আশীর্ব্বাদ কি বৃথাই যেতে পারে? মহামতী টলষ্টয় বলেছেন All men live not by the care they take of themselves, but by the love there is in men. আত্ম চেষ্টা অপেক্ষা পরের আশীর্ব্বাদের শক্তি যে কত বেশী!"

নগেন লক্ষ্য করিল, বিধু বিশেশ্বরের নাম লইতেছেন না। সে বলিল—"ঠাকুর মা কোথায় ধন্না দিলেন বিধু বাবু?

বিধু হাসিয়া বলিল—থাক্ থাক্—ও সব আলোচনা এখন।

নগেন—থাকিবে কেন? আপনার মুখে সে নামটী লইতেই হইবে।

বিধু বলিল—বিশ্বেশ্বরের নাম লইতে আপত্তি নেই কিন্তু ইহাতে পৌত্তলিকতাকে সম্মান করা হয়, তারপর একটা—বিধু মুখ বিকৃত করিল।

নগেন জোরে হাসিতে পারিল না; নতুবা সে হাসিয়া সকল ঘর কাঁপাইয়া তুলিত।

মৃদু হাস্য করিয়া নগেন বলিল—"দুর্গাদাস বাবু সপরিবারে কিন্তু এই * * * দেবতাটীর মাথায় বিল্বপত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন।"

বিধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"বল্‌চেন কি! অবাক কল্লেন যে?"

নগেন বলিল "এগুলি কিন্তু' আপনাদের ভারি কু-সংস্কার!"

এই অবসরে দুঃখিনী স্নানে চলিয়া গিয়াছিল। বিধু অবসর বুঝিয়া অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। বিধু বলিল—

"দেখুন নগেনবাবু, ও দুঃখিনীকে কিন্তু আর ছেড়ে যাওয়া হবে না, ওকে আমাদের orphangeএ রাখ্‌ব, জীবনটা ওর সৎপথে যাবিত হবে। আমি ওকে দুদিন পতিতা জীবনের পরিণাম বিষয়ে বলেছি—ওর রিপেণ্টেন্স হয়েছে। কেঁদেচে—"

নগেন—"ওর সম্বন্ধে কি আপনি কিছু জানিয়াছেন নাকি?"

বিধু—"কিছুই না। বেনারেসের মেয়ে—ওদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে হয় না, ওসবকে ঘৃণাও কত্তে নেই—পাপকেই ঘৃণা।

নগেন বলিল—"তার এখনও তেমন বয়স হয় নাই। আপনি সেরূপ কোন কথা বলিবেন না, তাতে ওর দুঃখ হয়। ওর সম্বন্ধে যা হয়, ব্রহ্মচারীই করিবেন।"

বিধুর নিকট ব্রহ্মচারীর বরাতটা ভাল লাগিল না। সে বলিল—'ব্রহ্মচারী ওর কি করবেন? ও Beneres থাকলেই নষ্ট হবে, বলে দিচ্ছি; ওকে নিয়ে যেতে হবে। নেহাৎ যদি কেউ সমাজে নাই নিতে চায়, আমিই বরং তার ভার গ্রহণ কর্ত্তে রাজি হব। মেয়ে টি জানেন কি—খাটে বেশী, খায় কম; ভাবে বেশী, কথা বলে কম, এরূপ লোক সহজে পোষা যায়।

নগেন হাসিয়া বলিল—বকুলের কি মত হইবে?"

বিধু দুঃখিত হইয়া বলিল—"সেওতো আপনি—নগেন বাবু উড়িয়ে দিলেন। এই না চিঠি, গত বুধবারে বোম্বে Mailএ যতীন বোস্ America চলে গেল; আপনি একটু বল্লেই হতো?" বলিয়া বিধু তাহার পকেট হইতে এক গাদা চিঠি বাহির করিলেন।

নগেন বলিল "এ শৈলেনের চিঠি না?"

বিধু—"হ্যাঁ, শৈলেন লিখেচেন, তিনি চেষ্টা করেও বিদেয় পেলেন না। যাই হক অক্টোবরে আপনার সঙ্গে গিড়িডিতে দেখা করবেন।"

নগেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"অক্টোবরে গিড়িডিতে! সে কেমন?"

বিধু—ওকে যে প্রিন্সিপ্যাল মেডিকেল হসপিটেলে দুমাসের জন্য ৫০৲ টাকায় হাব এসিষ্টান্টের কাজে নিযুক্ত করেচে।

নগেন—"গিড়িডিতে কেন?"

বিধু—দুর্গাদাস বাবুর পরিবার অক্টোবরে তাঁদের গিড়িডির বাড়ীতে changeএ আসচেন; আপনার শরীর একটু সেরে উঠলেই আপনাকে গিড়িডিতে নিয়ে যেতে দুর্গাদাস বাবু লিখেচেন।

নগেন—"ওসব কোন খবরইতো আপনি আমাকে দেন না?"

বিধু—"এত দিন ব্রহ্মচারীর নিষেধ ছেল—কোন কাগজ পত্র বা চিঠি পত্র দিতে বা জানাতে।"

নগেন—"ও কাগজগুলি কি?"

বিধু উৎসাহের সহিত বলিল—"ভারি হোপফুল নিউস্—আশার কথা! শুনুন"—বলিয়া বিধু একখানা ছাপার কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিল—

অন্ন ও বস্ত্র সমস্যা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা—

নগেন বলিল—"রক্ষা করুন—মুখে বলিয়া ফেলুন, এত শুনিবার ধৈর্য্য আমার নাই।"

বিধু—"সেই জন্যইতো চিঠিপত্র দিতে নিষেধ ছেলো, মোট কথা—দুর্গাদাস বাবু মিকানিকস্ শিখ্‌তে যতীন বোসকে আমেরিকা পাঠিয়েছেন; এদিকে বেঙ্গল কটন-মিলস্ স্থাপনের এই হেণ্ডবিলস্ দিয়ে ১০ টাকা করে ৫০

হাজার টাকার সেয়ার চাচ্ছেন।" Miniature formএ আপাততঃ একলক্ষ টাকা কেপিটাল নিয়েই সুতোর কল আরম্ভ হবে। বাকী ৫০ হাজারের share তিনি নিজে নিচ্ছেন। ওদিকে মুসল পাহাড়ে ও বিল টিপারায় প্রচুর জমি নিয়েছেন, ওতে তুলো হবে—A grand aggrandisement. এখন দয়াল প্রভুর ইচ্ছে। টাকার অভাব হবে না। এ কদিনেই এখানে আমি ২০ হাজার টাকার share বিক্রয় করুম। ডাঃ ব্যাকৃচি ১০৲ হাজারের share একাই নেবেন।" বলিয়া বিধু বাবু উৎসাহের হাসি হাসিলেন।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"শুভসংবাদ বটে! এখন দেখুন, যদি তুলার চাষে রাজি হন, না হয় আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। যতীন বোস তো আর তুজনকেই নিবেন না। আর একটা চেয়ার তো ভেকেন্টই রইল!"

বিধু বলিলেন—"আপনার শুভ চেষ্টা, আর আমার অদৃষ্ট।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণের চেষ্টায় পীরপুরের অনেক বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় নাই।

একটা শ্রাদ্ধ ও একটা বিবাহ তিনি—উভয় সমাজকে বাদ দিয়া—এমন ভাবে স্থির করিয়া করাইয়াছেন যে দরিদ্র কর্ম্মকর্ত্তাদের একটী পয়সাও ধার করিতে হয় নাই। অবশ্য লোক নিন্দাকে এই সব ব্যাপারে বরণ করিয়া না লইতে পারিলে হয় না—তাহা কর্ম্মকর্ত্তারা ঋণগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে করিয়াছেন। উপায় নাই।

নমশূদ্র সমাজে একটা বিধবা বিবাহ হইয়াছিল। তাহা লইয়া গ্রামে ও নমশূদ্র সমাজে দলাদলির সোচনা হইয়াছিল—শাস্ত্রী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ও জমিদারের নায়েবকে উপস্থিত রাখিয়া সেই বিধবার হাতে নমশূদ্র সমাজের সকলকেই অন্ন গ্রহণ করাইয়া তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন।

পীরপুর স্কুলের বালকেরা সেবক সমিতির সভ্য হইয়া প্রতি গৃহ হইতে রোজ মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে; তাহাতেও মাসে ২৫৲ ৩০৲ টাকা আদায় হইতেছে।

যুদ্ধে পাটের বিক্রি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় দরিদ্র কৃষকদিগকে ঐ অর্থ হইতে ঋণ দান করিয়া সাহায্য করা হইতেছে। এইরূপ নানা উপায়ে শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণ গ্রামের দরিদ্রদিগের সাহায্য করিয়া আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

পাটের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠায় জয়নগরের খাজানা বন্ধ হইয়াছে; খামারের আত ধান্যও প্রজারা খাইয়া ফেলিয়াছে. সুতরাং তারাচরণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, হাত পাতিবারও ঠাঁই নাই। উপায় হীন হইয়া তিনি গ্রামের মামলা জুটাইয়া টনির কার্য্য করিতেছেন।

শৈলেন কলিকাতা পঁহুছিয়াই তারাচরণকে একখানা কার্ড লিখিয়া জানাইয়াছিল যে—তাঁহার দুর্ব্বাক্য বজ্রের ন্যায় তাঁহার পুত্রের বক্ষে আঘাত করিয়াছে—এবং সে সেই দিন হইতে প্লেগে শয্যাশায়ি হইয়াছে।"

চিঠিপাইয়া প্রথমে তারাচরণের রাগ হইয়াছিল, পরে তিনি চিন্তিত হইলেন। চিন্তা ব্যতীত কোন প্রতিকারের তাঁহার তখন ক্ষমতা ছিল না; কাশীতে যাইবার অর্থতো তাঁর নিকট ছিলই না। ছেলের বিপদ জানাইয়া কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া গেলেও—বাড়ীর আর উপায় ছিল না। অভাবে পড়িয়া স্ত্রীর গহনাগুলি পর্য্যন্ত তিনি বন্ধক রাখিয়া সংসার চালাইয়াছেন—এখন নিরুপায় সুতরাং ছেলের শুভ কামনা ব্যতীত তাঁহার অন্য করণীয় আর কি হইতে পারে?

তারাচরণ শৈলেনের নিকট হইতে কাশীর ঠিকানা জানাইয়া নগেনের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন—প্রায় পনর দিন পরে—বিধুভূষণ শর্ম্মার স্বাক্ষর করা এক চিঠিতে তিনি নগেনের বিস্তৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন।" ইহার পর চিঠিদ্বারাই পুত্রের সংবাদ জানিতেছেন; ইহার বেশী তাঁহার করিবার ক্ষমতা ছিল না—করিতেও তিনি কিছু পারেন নাই।

পূজার পূর্ব্বে তারাচরণ বিপদে পড়িয়া গেলেন। ছেলেদের স্কুলের বেতন চলিতেছে না—না হয় কিছু দিন স্কুল বাধা হইবে। ছেলে মেয়েদের কাপড় নাই—না হয় ঘরের বাহির না হইবে। কিন্তু ঘরে যে একটী পয়সাও

নাই, পাইবারও কোথায় উপায় নাই—ঘরে ঘরে হাও-লাত হইয়াছে—তাহার উপায় কি ?

নিতান্ত উপায় হীন হইয়া তারাচরণ আড়াই হাজার টাকায়ই শ্যামগ্রামে নগেনের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়া পাঁচ শত টাকা অগ্রিম লইয়া আসিলেন, আপাততঃ জাত বাঁচিল।

টাকা আনিয়াই তারাচরণ কাশী যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা আবল্যে যাইতে পারিলেন না। প্রথম দীননাথের ফৌজদারী মোকদ্দমার তদ্বির—তাহাকে স্থানীয় তদন্তে উপস্থিত থাকিতে হইবে দ্বিতীয়—নাথু পোদ্দারের ঘর জালানি মোকদ্দমার তিনি প্রথম সাক্ষী। ৩য়—আদালত বন্ধের দিনে ছুটা মোকদ্দমা দায়ের করাইতেই হইবে ; না করাইলেই নয় ৪র্থ—জয়নগর না গেলেই নয় যে—পূজায় নিশ্চয়ই প্রবাসী বাবুরা বাড়ীতে আসিয়া শাস্ত্রী বস্তাভূষণের যোগে সমাজ সমস্যা মিটাইতে চেষ্টা করিবেন—তাঁহার অনুপস্থিতি সে ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই সঙ্গত হইবে না—ইত্যাদি।

সুতরাং তিনি মনে করিলেন, কাচারী খুলিলে তমাদির আরজি গুলি দাখিল করাইয়াই কাশী যাওয়া সঙ্গত এবং নিশ্চিত।

পূজার বন্ধে বাস্তবিকই সমাজ-সমস্যা লইয়া একটু আন্দোলন হইয়াছিল ; ফল কিছুই হয় নাই। তারাচরণ উপস্থিত না থাকিলে কি হইত, তাহা বলা যায় না।

এই সময় পীরপুর মধ্য ইংরেজী স্কুলটীকে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত করিবার চেষ্টা হইল। তারাচরণ খুব অগ্রণী হইয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। রিক্তহস্ত হইয়াও যথাসাধ্য চাঁদা স্বাক্ষর করিলেন। সকলের সমবেত চেষ্টায় অর্থের অভাব রহিল না।

তখন তারাচরণ পুত্রের জন্য চাকুরী প্রার্থী হইলেন। নগেনের প্রতি শত্রু মিত্র সকলেরই স্নেহ ছিল—নূতন লোক বলিয়া হেড মাষ্টারের পদ হইল না ; তাহার জন্য ৬০৲ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ রক্ষিত হইল। তারাচরণের ভরসা হইল ; যাহাই হউক উপবাসতো আর করিতে হইবে না। স্থির হইল জানুয়ারী হইতে নূতন ক্লাশ খোলা হইবে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অগ্রহায়ণে নগেন কাশী হইতে কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছিল। নগেনের শরীরে সামান্য কিছু রক্ত প্রবেশ করাইতে হইয়াছিল। তাহা তাহার অমতে, কেবল ব্রহ্মচারীর ও দুঃখিনীর আগ্রহেই হইয়াছিল। অতি সামান্য রক্তই লওয়া হইয়াছিল, অথবা তাহাতে তাহার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

গিড়িডি যাওয়া ব্রহ্মচারীর অভিপ্রায় না হওয়ায় তাহাকে গিড়িডি যাইতে হয় নাই। বিদায় কালে ব্রহ্মচারী দুঃখিনীকে নিজ পালিতা কন্যা বলিয়া নগেনের হস্তে সমর্পন করিয়া গিয়াছেন। নগেন ন্যায় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে। এ বিষয় বিধু তাহাকে যথেষ্ট সাহস দিতে ক্রটী করে নাই।

নগেন প্রিলিমিনারি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। শৈলেন খুব প্রসংশার সহিতই উত্তীর্ণ হইয়াছে। সেজন্য প্রিন্সিপ্যাল শৈলেনকে কার্য্যে পাকা করিয়া লইয়াছেন—বেতনও একশত টাকা হইয়াছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শৈলেন সে শৃঙ্খল উন্মুচন করিতে পারে নাই। আপাততঃ কিছু সম্বল হইলে শীঘ্রই করিবে, ভরসা করিতেছে। শৈলেন পূজায় বাড়ী যাইতে পারে নাই ; তাই একমাসের ছুটীতে বাড়ী গিয়াছে।

নগেন ও দুঃখিনীকে দুর্গাদাস বাবু পুত্র কন্যাগণ সহ ষ্টেশনে গিয়া আদর করিয়া নিজ বাসাতেই আনিয়া রাখিয়াছেন।

দুঃখিনীর স্বভাবে দুর্গাদাস বাবুর স্ত্রী একেবারে মুগ্ধা হইয়া গিয়াছেন। পারুল ও বকুল নূতন সাথী পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল। দুঃখিনীর কথা লইয়া পারুল ও বকুল নগেনকে খুব জব্দ করিত ; আবার দুঃখিনীকেও ঠাট্টায় তামাসায় জ্বালাইয়া মারিত, নগেন তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিত ; দুঃখিনী তাহাতে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। পারুল দুঃখিনীকে 'সই' বলিয়া আদর করিত। দুঃখিনী পারুল ও বকুলের ন্যায় বাড়ীর বাহিরে যাইত না—সে গৃহিণীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া তাহার সহিত কাজ কর্ম্ম করিত।

যুদ্ধের প্রাবল্যে যখন ইয়ুরোপীয় বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইল তখন দুর্গাদাস বাবুর এবং আরও কতিপয় জন নায়কের অর্থে ও উদ্যোগে কলিকাতায় একটা সওদাগরী ব্যবসায়ের সূচনা হইয়াছিল। ক্রমে দুই তিন মাসের মধ্যেই তাহার ভবিষ্যৎ বেশ আশাপ্রদ মনে হইতে লাগিল।

দুর্গাদাস বাবু নগেনকে সেই স্বদেশী সওদাগরী আফিসে একশত টাকা বেতনের একজন এসিষ্টাণ্ট করিয়া দিলেন। আর বিধুবাবুকে আগরতলা তুলার চাষের বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

চাকুরী লইয়া নগেন নূতন বাড়ী ভাড়া করিল। কিন্তু দুর্গাদাস বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ইতোমধ্যে বদ্রিনারায়ণ হইতে বাবা যোগজীবন ব্রহ্মচারীর এক চিঠি পাইয়াছিলেন। সে চিঠিতে দুঃখিনীর সম্বন্ধে ২।১ টা কথা ছিল। সেই চিঠির কথা ও অন্যান্য নানা বিষয় ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"শৈলেন বাড়ী হইতে আসুক, তারও থাকিবার ভাল ব্যবস্থা নাই—দুইজনে এক বাসা করিয়া থাকিও, খরচ কম লাগিবে। টালিগঞ্জে যদি থাক, সে ও মন্দ হইবে না—অনর্থক বাড়ী ভাড়া কেন দিবে?"

নগেন কোন উত্তর করিতে পারিল না; নূতন বাড়ীতেও তাহার যাওয়া হইল না।

প্রকৃতির প্রতি।

(১)

কে তুমি গো দেখ্‌ছো ভুবন চাঁদের চোখে চেয়ে!
সকল প্রাণী আকুল হোলো দিঠির আলো পেয়ে।
সবুজ পাতার রং-মহালে,কোকিল ডেকে মন মাতালে,
শিহরিয়া উঠ্‌লো হিয়া পুলকে গান গেয়ে।

(২)

তরুর কচি কোমল পাতায় রঙের ঝিলিমিলি।
পাখীরা সব কূজন করে—মধুর কিলিকিলি।
হাওয়াতে আজ স্বপনভাসে,শিউলি সুবাস ছুটে আসে,
গন্ধে শেষে অন্ধকোরে মনটি কেড়ে নিলি।

(৩)

জ্যোস্না গুলে কি আঙুলে দিলি আলিম্পন।
ঘর বাড়ী মোর হাসছে পেয়ে হাতের পরশন।
তুমি কাহার প্রেমেরলাগি, দিনযামিনী আছ জাগি',
আজ অবধি শেষ হোলো না পূজার আয়োজন।

(৪)

লক্ষ তারার আলো জ্বলে গগন-চাঁদোয়ায়।
দিগ্‌বধূরা দাঁড়ায় ঘিরে দৃষ্টি-সীমানায়।
তুমি আপন ধ্যানে মগন, প্রাণে পুলক—অশ্রু নয়ন,
কোয়াসার শ্বেত ওড়্‌নাখানি অঙ্গেশোভা পায়।

(৫)

পরাণের কাণ সজাগ আজি, শুনাও বন্দনা।
ঝঙ্কারিয়া উঠুক হিয়া পেয়ে মূর্চ্ছনা!
গাইছ কি সুর আকুল-করা, ধরি ধরি যায় না ধরা!
কাণটি পেতে বোসে আছি, আরতো অন্ধ না!

(৬)

কবে তোমার গোপন কথায় জাগ্‌বে আমার প্রাণ!
তোমার প্রেমের কণা পেয়ে ভুল্‌বো অভিমান্!
কাট্‌বে আমার অমানিশা, থাক্‌বে না আর সুখের তৃষা,
গেয়ে যাবো পুলক-ভরা পাগল-করা গান!

(৭)

পূজার প্রসূন নাইকো আমার, কণ্ঠে নাই সে বাণী।
আঘাত-পাওয়া কান্না-ভরা আছে হৃদয়খানি।
তোমার সাথে পূজ্‌তে তাঁকে, ডাক্‌ছো বটে মধুর ডাকে,
নাও না তবে আপন কোরে হাত দুখানি টানি'।

(৮)

মলিন বোলে সবাই যবে ভাঙ্‌লো আমার মন!
তখন তুমি দেখা দিলে, দিলে আলিঙ্গন!
কেন এখন পথের মাঝে, কাঁদাও নানান্ বাজেকাজে!
পূরাও আমার প্রাণের আশা ভালোবাসার জন!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ভুল।

বেলুড় মঠের যাত্রী লইয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন পূর্ণগতিতে ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে হাওড়া অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় স্থিরভাবে আসন লইয়', আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া জগদীশ বাবু বলিলেন —"কি ঝঞ্ঝাট, দেখ দেখি!"

বিনোদ বাবু বলিলেন—"যাক, একটা কাজ হয়ে গেলো তো—ঝঞ্ঝাট তো জীবনে চিরদিনই রয়েছে।"

তারপর বিনোদ বাবু একটু অনুসন্ধিৎসুনেত্রে জগদীশ বাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি, টিক খানা যে দেখচি না; ফেলে এলেন নাকি—জগদীশ বাবু?"

জগদীশ গর্ব্বিত হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তুমি কি মনে করো বিনোদ বাবু, ভুল! আমার ভুল! চিত্রগুপ্তের হিসাবে ভুল!" জগদীশ হাতের বষ্টিখানা উঠাইয়া ধরিয়া পুনরায় সগৌরবে গর্ব্বের হাসি প্রকাশ করিলেন।

বিনোদ বলিলেন—ভুলের কথা, সেতো মানুষেরই হয়। যার ভুল হয় না, বুঝ্‌তে হ'বে—হয় সে দেবতা, নয় সে পশু।" কথাটী বলিয়া বিনোদ তাহার সরল মনের সাদা ভাব হাসির লহর তুলিয়া ব্যক্ত করিলেন।

জগদীশ দর্পভরে বলিলেন—"আর ভুল হয় না আমাদের—এই একাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টের তত্ত্বধা়কদের; দেখ্‌চো তো—ভুল হ'লে কি এত মোটা মাইনে দিয়ে গভর্ণমেণ্ট এতগুলি কুপোষ্য পোষতো কোন্ দিন দূর করে বের করে দিত—!"

* * *

দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্যাসেঞ্জার ছিলেন, আর একটী ভদ্রলোক। তিনি জগদীশ বাবুর গর্ব্বিত ভাবে ও কথায় আকৃষ্ট হইয়া নিজের সোনার চসমার ভিতর হইতে উৎসুক দৃষ্টি জগদীশের মুখের উপর স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি?"

জগদীশ সেই জিজ্ঞাসু ভদ্রলোকটীর আগ্রহকে তাচ্ছল্যের সহিত উপেক্ষা করিয়া নিজকে অপেক্ষাকৃত আরও একটু গম্ভীর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন।

জগদীশের এই কষ্ট-সাধ্য অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য ভদ্রলোকটীর মনে যেন বেশ আমোদ প্রদান করিতেছিল; তিনি তেমনি ভাবে উৎসুক দৃষ্টিতেই তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিনোদ বাবু ভদ্রলোকটীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"ইনি একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের হেড্ এসিষ্টেণ্ট—বাবু জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত।"

ভদ্রলোকটী সসম্ভ্রমে তাঁহাকে দেশী কায়দায় অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"বটে! যা হোক দেখা হ'লো, পরিচয় হলো। আচ্ছা মসায় বলুন দেখি, আমাদের T. A. বিলটার এই এত কাল পরে এরূপ নির্দ্দয় ভাবে গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থাটা হলো কেন? টাকা যে কবে, কোন যুগে হজম হয়ে গিয়েছে—এখন এত দিন পরে ফেরত দেওয়া কি সহজ কথা নাকি?"

জগদীশ স্বীয় গাম্ভীর্য্য আরও সমাহিত করিয়া বলিলেন—"গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা বলচেন, সেটার ভেতর সেরূপ অন্তিম উৰ্দ্ধশ্বাসের অবস্থা কিছু ছেলো বলেই সে ব্যবস্থা হয়েচে—ও সব কথা অফিসের বাইরে কেন—"

ভদ্রলোকটী লজ্জিত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"দেখুন, সে হচ্ছে যার তার গরজে; গরজ বড় বালাই—আর মানুষ সহজেই ঝঞ্ঝাট ঘুচাইতে চায়—এটাও মানুষের স্বাভাবিক একটা ধর্ম্ম—"

জগদীশ বাবু ভদ্রলোকটির কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই বিনোদ বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ভুলের কথা বল বিনোদ বাবু, ভুলের কথা শুনলে আশ্চর্য্য হবে —আমরা যদি না থাকতুম—অবশ্য আমাদের ডিপার্টমেণ্টের কথাই হচ্চে—তবে গভর্ণমেণ্টের অর্থের যে লুট হচ্ছিল—তা—বেদম চলতো—সে কথা ভাবতেও হৃৎকম্প হয়। আর এই T. A. বিলগুলি—এগুলিতো এক একটা প্রকাণ্ড জোচ্চুরী। অথচ এ জোচ্চুরী গুলি করেন তাঁরা, যারা সরকারের মোটা মাইনের সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী—ইঁহারাই আবার সম্ভ্রান্ত! এঁরা যদি সম্ভ্রান্ত, বলি তবে জোচ্চোর কে?"

ভদ্রলোকটী বিনোদ বাবুর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"পরম আপ্যায়িত হলেম।"

জগদীশ বাবুর কথার ইঙ্গিতে ভদ্রলোকটী লজ্জিত হইয়াছেন দেখিয়া বিনোদ বাবু বলিলেন—"ঘোর জুয়াচোর না হলে কি পরের চুরী জুয়া চুরী কেউ সহজে ধরতে পারে? আমাদের হয় ছোট ভুল, আমরা করি ছোট চুরী; আর একাউন্টস্ ডিপার্টমেণ্টে হচ্চে দিনে দুপুরে ডাকাতি; আর ভুল, সেতো কথায় কথায়——

কথাটা শেষ না করিয়াই বিনোদবাবু সজোরে ঢেউ তুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোকটী ছিলেন খুব আলাপী লোক। তিনি এই অপ্রিয় আলোচনার দিক হইতে আলোচ্য বিষয়টীকে ফিরাইয়া লইবার জন্য এবার গম্ভীর ভাবে বিনোদবাবুকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা গিয়েছিলেন কোথায়?"

সিগারেটে আগুন ধরাইতে ধরাইতে বিনোদবাবু উত্তর করিলেন—"দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলুম—জগদীশবাবুর শিশু পুত্রের মানত আদায় কত্তে। ওঁর অনেকগুলো ছেলে মেয়ে নষ্ট হয়ে হয়ে শেষ একটি ছেলে টিকেচে—সেও এই সবে এক বছরে পা দিয়েচে। ওঁর স্ত্রী, ছেলের জন্য দক্ষিণেশ্বরে মানত করেছিলেন—তাই সব শুদ্ধ সেখানেই আসা গেছিল।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন—ফেইরি ষ্টিমারে দক্ষিণেশ্বর তো বেশ সুবিধায় যেতে পারেন—

"হিসেব খানার বড় কর্ত্তা হিসেব পত্র জমাখরচ করে দুটোই করে নিলেন, দুটোর ঝঞ্ঝাটই ভোগ করা গেল—এসেছিলাম ষ্টিমারে দক্ষিণেশ্বর, এখন যাচ্ছি রেলে বেলুর হ'তে।

বিনোদ উচ্চহাস্য করিলেন।

* * * *

গাড়ী হাওড়া আসিয়া থামিল।

ষ্টেসনে একজন কেরাণী দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী যে স্থানে থামে তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল; গাড়ী থামিবা মাত্র সে তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী দিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বেলুর ষ্টেশনে কেউ একটী শিশু সন্তান ফেলে রেখে এসেছেন কি?"

জগদীশ বাবু তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া কেরাণীকে বলিলেন "সে গরজ তোমার কেন এত বাবা, যে কোলের শিশুকে রেখে আসতে পারে, সে হয়ত তার নিজেকেও হারিয়ে ফেলেছে—এমনি ভুলও হয় হে?"

কেরাণী উত্তর করিল—"আমার কর্ত্তব্য আমি করে গেলুম মসায়, সেকেণ্ড ক্লাশের প্যাসেঞ্জারদের জানাবার জন্য এ 'টেলি' বেলুর হতে এসেছে—"

বিনোদ বাবু ইতি মধ্যেই নামিয়া মেয়ে গাড়ীর দিকে গিয়াছিলেন, তিনি হাঁকাইতে হাঁফাইতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে—খোকা ওঁর কোলে নেই, তিনি বলচেন, খোকা ছেলো আপনার কোলে—

জগদীশ একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়া শুষ্ক কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"এঁ্যা নেই, বল কি, আমি তাঁর সম্মুখেই যে ষ্টেসন রুমের সোফা'তে খোকাকে শুইয়ে রাখলুম—।"

ভদ্রলোকটী বিনোদ বাবুর দিকে চাহিয়া সহানুভূতির সুরে বলিলেন—"ছি—ছি—ছি! শুধু পরের ভুলই দেখেন—এমন ভুলও লোকের হয়?"

মেয়ে গাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। জগদীশ বাবুর মাতা, স্ত্রী, ভগিনী কাঁদিয়া প্লেট ফরমে এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এদিকে জগদীশ হতাস ভাবে ষ্টেসনের সেই কেরাণীটার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোকটী বলিলেন—"মসায়, ওই যে প্লেট ফরমে গাড়ী প্রস্তুত, এখনি ছাড়বে—উঠে পড়ুন বেলুড় বলে। একটা ছোট ভুল হয়েছে মাত্র—গোলমাল করে আর একটা বড় ভুল করবেন না—এ গাড়ীটা মিস্ করবেন না।"

* * *

আফিসের কর্ম্মে জগদীশ বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, এই সময় চাপরাসি আসিয়া একখানা কার্ড উপস্থিত করিল। কার্ড দেখিয়া জগদীশ সম্মুখের টেবিলটিকে অতি তাড়া-

তাড়ি পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন ; তারপর চাপরাসিকে বলিলেন—"সেলাম জানাও সাহেব কো।"

সাহেবি পোষাকে সজ্জিত আগন্তুক মিষ্টার মিত্রকে দেখিয়া জগদীশ বাবু লজ্জিত হইলেন—সেই কন্যকার তাঁহাদের সজীব বেলুড়ের যান্ত্রিক। তিনি এত বড় কাজ করেন !

জগদীশ উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলে ভদ্রলোকটী পরিচিতের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"শিশুটিকে নিরাপদেই পেয়েছিলেন তো ?"

জগদীশ লজ্জার হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে হাঁ, ভগবানের ইচ্ছেয় নিরাপদেই ছেলো।"

"আমাদের সেই T. A. বিলটা নিয়েই বড় সাহেবের নিকট আসাগেছিল, আপনার খবরটাও নিয়ে গেলুম।" বলিয়া ভদ্রলোকটী মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—"ভুলটী কিন্তু বেশ ক্ষুদ্রই ছিল !"

জগদীশ লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আর লজ্জা দেবেন না।"

রজক ও রাসভ।

রজক রাসভে কহে—"বোঝা আরো দিব ?
বোঝা বহা তোমাদের জাতের স্বভাব।"
রাসভ কহিল—"প্রভো ! যত দাও নিব,
এ নহে স্বভাব দোষ—স্বাধীনতাভাব।"

শ্রীঃ—
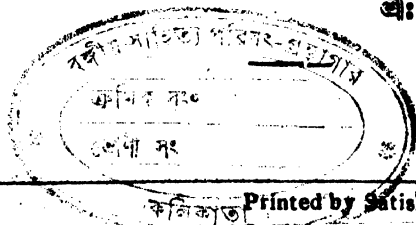
গ্রন্থ-সমালোচনা।

বিক্রমপুরের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মূল্য কাপড়ে বাঁধা ৩৲ তিন টাকা।

এই গ্রন্থে বিক্রমপুরের কয়েকটী প্রসিদ্ধ গ্রামের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিক্রমপুর, ইতিহাস-প্রখ্যাত প্রাচীন স্থান। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। ইহার পল্লী ভুমির সহিত কত কত মহাত্মার বাল্য জীবনের খেলা ধূলার স্মৃতি বিরাজিত, ইহার পুত রেণু কণার সহিত কত ঐতিহাসিক উপকরণ অলক্ষ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সুপ্রসিদ্ধ পরগণার কতিপয় প্রধান প্রধান গ্রামের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, সাহিত্য, শিল্পকথা, প্রবচন এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মনস্বি ব্যক্তি দিগের জীবন কথা আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থখানা লিখিত হওয়ায় এই গ্রন্থ কেবল যে বিক্রমপুরবাসীরই মনোরঞ্জনের জিনিষ হইয়াছে তাহা নহে, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত কাহিনী প্রকাশিত করিয়াছে সুতরাং ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই নিকট এই গ্রন্থ আদরের সামগ্রী হইবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। ইতঃপূর্ব্বে গ্রন্থকার তাহার বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখিয়া যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন সমালোচ্য গ্রন্থখানা তাঁহার সেই পূর্ব্বার্জ্জিত যশঃ অক্ষুন্ন রাখিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলি একটু সংক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থে কয়েকখানা চিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছাপা পরিষ্কার।

স্বস্তিকা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ছয় আনা।

এই গ্রন্থে কয়েকটী আধ্যাত্মিক কবিতা আছে। কবিতাগুলিতে ভক্তের প্রাণের ব্যগ্রতা বর্ত্তমান। পাঠকগণ স্বস্তিকাপাঠে স্বস্তি লাভ করিতে পারিবেন।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, DACCA

অষ্টম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, আশ্বিন ১৩২৭। { দ্বাদশ সংখ্যা।

'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য প্রসঙ্গ।

"চিত্রাঙ্গদা" কাব্যে অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার যে সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার স্থূল রেখা গুলি (out-line) মাত্র উপরে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু ইহার ভিতরে সূক্ষ্ম বর্ণ বৈচিত্র্যের রশ্মিপাতে যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের ছবি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং মানব-হৃদয়ের সুনিপুণ বিশ্লেষণে যে প্রেমের রহস্য-লোক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে কাব্য খানা আগা গোড়া পাঠ করা আবশ্যক। কারণ, কাব্য-সৌন্দর্য্য বুঝিবার জিনিষ, বুঝাইবার নহে। শ্রেষ্ঠ কাব্য পাঠের ফলে পাঠকের চিত্তে যে এক সমগ্র, সুনিবিড় আনন্দ সঞ্চিত হইয়া তাহাকে বিস্ময়-পুলকিত ও সমুন্নত করিয়া তোলে তাহা সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব, যেমন বৈজ্ঞানিকের যন্ত্র সাহায্যে কুসুমের সৌরভ-সুষমা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব।

যাহাহউক উপরে রবীন্দ্রনাথের অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের যে আভাস দিতে চেষ্টা করিলাম, ভরসা করি তাহা হইতে দ্বিজেন্দ্র বাবুর উক্ত কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য গুলির অমূলকতা অনেক পরিমাণে সুস্পষ্ট হইবে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর অভিযোগ সংক্ষেপতঃ তিনটি, যথা:— (১) রবি বাবুর চিত্রাঙ্গদা 'উপযাচিকা', 'ব্যভিচারিণী'— তাহার চরিত্র অস্বাভাবিক। (২) "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যে [illegible] অর্জ্জুনকে 'ভণ্ড পশু করিয়া' চিত্রিত করা হইয়াছে—"[illegible] রবি বাবুর হাতে পড়িয়া অনায়াসে একটা [illegible] সর্ব্বনাশ করিয়েছেন।" (৩) 'পবিত্র নাই, সঙ্কোচ নাই, ধর্ম্ম নাই, সর্ব্বকাল কেবল ভোগ, ভোগ—আর তার নির্লজ্জ বর্ণনা।'—একটি একটি করিয়া এই উক্তিগুলির মূল্য কি আর একটু বিচার করিয়া দেখিব।

প্রথমতঃ চিত্রাঙ্গদার কথা। অর্জ্জুনকে দেখিবামাত্র কুরূপা বীরাঙ্গনার প্রেম ভিক্ষার প্রতি, এবং দেবতার বরে রূপের ব্রহ্মাস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া অর্জ্জুনের বীর-হৃদয়কে পরাজয় করার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রধানতঃ উক্ত বিশেষণ গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা কুমারী ছিল, সে ক্ষত্রিয় ললনা ছিল,—এবং চিত্রাঙ্গদা যেমন আবাল্যের শিক্ষার গুণে লজ্জা সঙ্কোচের ধার ধারিত না, তেমনি তার ঐ বাহিরের শিক্ষার আবরণের ভিতর প্রকৃতির দান, নারী-হৃদয়টি গুপ্ত ছিল—এই কথা গুলি দ্বিজেন্দ্র বাবু ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহ-বিধি প্রাচীন ক্ষত্রিয় সমাজে যে dead letter এ পরিণত হয় নাই তার প্রমাণ শকুন্তলাদি প্রাচীন কাব্য। ঐ সকল কাব্য ও প্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি, ক্ষত্রিয় পুরুষ-রমণীর মনের মিলন হইলেই শুধু মাল্য বিনিময়ে তাহারা বৈধ বিবাহ-সূত্রে মিলিত হইতে পারিত, তজ্জন্য কোনরূপ অনুষ্ঠান কিম্বা পিতা মাতার সম্মতির প্রয়োজন হইত না। আর, প্রকৃতির লীলা-নিকেতন মণিপুরের বিজনারণ্যে মাল্য রচনার জন্য পুষ্পের কোন অপ্রাচুর্য্য ছিল না, তার প্রমাণও অর্জ্জুনের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হই—"দেখিতেছি পুষ্প-বৃন্ত ধরি কোমল অঙ্গুলি গুলি রচিতেছে মালা।"

তাই, অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার যে অভিপ্রেত মিলনকে এত

অনায়াসে বৈধ মিলনে পরিণত করা যাইত তাহাকে তাঁহারা অবৈধ রাখিয়া দিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু ত দেখিতে পাইনা। বস্তুতঃ তাঁহাদের মিলন যে বিধি সঙ্গত ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ কাব্যের উপসংহার ভাগে প্রাপ্ত হই, পরে তাহা দেখাইব।

তারপর, প্রাচীন স্বয়ংবর প্রথার তাৎপর্য্যও কি এই নহে যে, ক্ষত্রিয় কুমারী আপনার মনোনীত ক্ষত্র বীরের প্রেম ভিক্ষা করিয়া লইবার অধিকারিণী ছিলেন? অধিকন্তু, অর্জ্জুন যে-সে বীর ছিলেন না—তিনি "ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর" ছিলেন। এই অর্জ্জুনের চরণে ধরণীর যে কোন রাজ-কুল-দুহিতার পক্ষে জীবন-যৌবন, লজ্জা-সম্ভ্রম উৎসর্গ করিয়া দেওয়াকে অস্বাভাবিক বা অধর্ম্ম আচরণ বলিয়া কোন নিরপেক্ষ, মানবহৃদয় তত্ত্বজ্ঞ বিচারকই ব্যাখ্যা করিবেন না। হয়ত বলিবে, সেই পুরুষ-স্বভাবা চিত্রাঙ্গদার পক্ষে হঠাৎ অর্জ্জুনকে দেখিবা মাত্র তাঁর প্রেমে পড়া অস্বাভাবিক,—অন্তত ইহা প্রেম হইতে পারে না, প্রেমের বিকৃতি—কাম মাত্র। কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, কবি বার বার আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন চিত্রাঙ্গদা প্রেমহীনা পাষাণ-হৃদয়া ছিল না—

"স্নেহে নারী, বীর্য্যে সে পুরুষ।"
* * *
এক দেহে
"তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজ-মাতা, বীর্য্যে যুবরাজ!
* * *
দুষ্টনগরের
বিজয় লক্ষ্মীর মত আর্ত্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয়দান। দরিদ্রের
সংকীর্ণ দুয়ারে, রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃ রূপ
ধরি' সেথা করিছেন দয়া বিতরণ।
সিংহিনীর মত চারিদিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা, ভয়হীন প্রসন্নহাসিনী,
বীর্য্যসিংহ পরে চড়ি জগদ্ধাত্রীদয়া।"

এই স্নেহরূপিনী, তেজস্বিনী, বীর-রমণী বীরেন্দ্র কেশরী অর্জ্জুনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবে না ত কে করিবে? বস্তুতঃ চিত্রাঙ্গদার প্রেম যে যাদুকরের মন্ত্রে শূন্য হইতে মুহূর্ত্তেকে সুফল বৃক্ষে পরিণত হয় নাই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত কবি নানা রূপে আমাদিগকে দিয়াছেন:—

"এই পার্থ? আজন্মের বিস্ময় আমার!
* * *
এই সেই পার্থবীর!
যাগ্য দুরাশায় কতদিন করিয়াছি
মনে, পার্থ-কীর্ত্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে, সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য,
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।"

আমরা জানি, এইরূপ বিস্ময়ই প্রণয়ের অগ্রদূত। তাই দেখিতে পাই, অর্জ্জুনের দূরশ্রুত বীরত্বকাহিনী চিত্রাঙ্গদার বীরত্বপ্রিয় হৃদয়কে পূর্ব্ব হইতেই বিস্ময়রসে সিক্ত করিয়া আপনার দিকে উন্মুখ করিয়া রাখিয়া ছিল; এবং যেইমাত্র চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনের সেই "ধনুর্দ্ধর ঘন শ্যাম" আপনাতেআপনিঅটল মূর্ত্তি' স্বচক্ষে দেখিল, অমনি রমণীর বিস্ময় রমণী-প্রেমে রূপান্তরিত হইল—বীরত্বের কঠিন শৈলবন্ধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রেমের নির্ঝরিণী ছুটিয়া সমস্ত কুমারীহৃদয়টিকে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়াদিল;—অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনের কাছে পুরুষের ছদ্মবেশে বীরত্বের পরিচয় না দিয়া পরিপূর্ণ নারীত্বের পরিচয় দিল। এবং ইহাইত স্বাভাবিক, ইহাইত নারী-ধর্ম্মের সহজ প্রকাশ।

প্রত্যাখ্যাতা, কুরূপা চিত্রাঙ্গদা কিরূপে প্রেম-তপস্যায় দেবতার প্রসন্নতা লাভ করিয়া হৃদয়-দেবতার পূজার উপচার স্বরূপ দুর্লভ সৌন্দর্য্য-কুসুম অর্জ্জন করিল, এবং অবশেষে প্রেমের প্রভাবে অর্জ্জুনের বীরকীর্ত্তিকে পরাজয় করিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। চিত্রাঙ্গদার এই প্রেম-সাধনার সিদ্ধিলাভকেই সম্ভবত সুরুচিবাদী সমালোচকগণ কুল-ললনার অনাচরণীয় অশিষ্ট বিলাস-চাতুরী বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন; কিন্তু যাঁহারা রুচিগ্রস্ত

মন তাঁহারা চিত্রাঙ্গদার এই প্রেম-সাধনায় কুমারী-হৃদয়ের সেই একনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ প্রেমেরই পরিচয় পাইবেন যাহার প্রেরণায় কুমারী উমা উমাপতিকে লাভ করিবার জন্য যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছিলেন; যে একনিষ্ঠার প্রভাবে সাবিত্রী পিতা-মাতার অনুরোধ-উপরোধ, অশ্রু-উপদেশ উপেক্ষা করিয়া স্বল্পজীবী সত্যবানকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর অমোঘ বিধান-কেও ব্যর্থ করিয়া সতীত্বরূপিণী বলিয়া নারীকুলের চিরপূজ্যা হইয়াছেন। এই চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের প্রতি নানারূপ ঘৃণ্য বিশেষণ প্রয়োগদ্বারা নারী-প্রকৃতির উপর যে কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে তাহা আজ আমরা নীরব ঔদাসিন্য দ্বারা মানিয়া লইলেও সর্ব্বদর্শী কালের বিচারে এই অপরাধের মার্জ্জনা নাই, ইহা নিশ্চিত।

এখন রবীন্দ্রনাথের অর্জ্জুন-চরিত্রের দিকে আর একবার দৃষ্টি করুন। চিত্রাঙ্গদার নিজ মুখেই অর্জ্জুন শুনিয়াছেন, যে গুপ্ত কামনা সাধনের জন্য চিত্রাঙ্গদা একমনে শিবপূজায় রত হইয়াছিল সেই কামনার ধন অন্য কেহই নহে স্বয়ং—

"অর্জ্জুন, গাণ্ডীব-ধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম
করিয়া লুণ্ঠন লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারী-হৃদয় পূর্ণ করি'।"

এই অর্জ্জুন নামে দীক্ষিতা কুমারীর আত্মহারা প্রেমের প্রতিদান করিয়া যদি রবীন্দ্রনাথের অর্জ্জুন 'অনর্জ্জুন' হইয়া থাকেন—নারীর ধর্ম্ম-নাশী জঘন্য পশু হইয়া থাকেন তবে মহাভারতের অর্জ্জুনও একাধিকবার এইরূপ পশুত্বের পরিচয় দিয়াছেন। নারী-সৌন্দর্য্যের নিকট সন্ন্যাস-ব্রতধারী অর্জ্জুনের ব্রতভঙ্গের দৃষ্টান্ত মহাকবি বেদব্যাস অনেকবারই প্রদর্শন করিয়াছেন; কারণ তিনি সবিশেষ জানিতেন, অলোকসামান্যা নারীর প্রেম-সৌন্দর্য্যে প্রকৃত বীরেরই ন্যায্য দাবি আছে। কর্ম্মশ্রান্ত মানবের যেমন ক্লান্তিহারিণী নিদ্রার শীতল অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রকৃতিদত্ত অধিকার আছে, তেমনি রমণীর অলোক প্রেম-লোকের সুধা পানে বীরের কীর্ত্তি-ক্লিষ্ট জীবনকে সঞ্জীবিত করিবার বিধিদত্ত স্বত্ব রহিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর কথার ভঙ্গিতে মনে হয় রবি বাবুর অর্জ্জুন যেন কামান্ধ পশুর ন্যায় কুমারী চিত্রাঙ্গদাকে প্রলোভিত ও পথভ্রান্ত করিয়া, তাহার রূপের মদিরাটুকু নিঃশেষে পান করিয়া, অবশেষে তাহাকে নিঃসহায়া পথের ভিখারিণী করিয়া শূন্য পাত্রের মত ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মূল কাব্যে আমরা ইহার ঠিক বিপরীত প্রমাণ প্রাপ্ত হই। রূপ-সম্ভোগ যখন অত্যন্ত তিক্ত হইয়া অর্জ্জুনের চিত্তকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে তখনও তাঁহার দাম্পত্য কর্ত্তব্য-বোধ ও একনিষ্ঠা দেখিতে পাই—

"আমি যেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হ'তে, স্বপ্ন-লব্ধ অমূল্য রতন।
রাখিবার স্থান তার নাহি এ ধরায়;
ধরে রাখে এমন কিরীট নাই কোথা,
গেঁথে রাখে হেন সূত্র নাই, ফেলে যাই
হেন নরাধম নহি; তারে লয়ে তাই
চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহু
বদ্ধ হয়ে পড়ে' আছে কর্ত্তব্যবিহীন।"

আবার, চিত্রাঙ্গদার ভূষণবিহীন সত্য রমণী-হৃদয়টিকে লাভ করিবার জন্য ভোগশ্রান্ত অর্জ্জুনের অন্তরের ব্যাকুল ক্রন্দন শুনিয়া চিত্রাঙ্গদার নেত্র-কোণে যখন আনন্দ মিশ্রিত বেদনাময় অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল, তখনকার অর্জ্জুনের উক্তিটিও দেখুন—

"অশ্রু কেন
প্রিয়ে? বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই
ব্যাকুলতা? বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে?
তবে থাক্! তবে থাক্! ওই মনোহর
রূপ পুণ্যফল মোর! এই যে সঙ্গীত
শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্ত সমীরে
এ যৌবন-যমুনার পরপার হ'তে,
এই মোর বহুভাগ্য! এবেদনা মোর
সুখের অধিক সুখ, আশার অধিক
আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়, তাই তারে
হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয় প্রিয়ে।"

উদ্ধৃত বাক্যগুলির প্রত্যেকটি কথায় বীর-হৃদয়ের

যে নিবিড় স্নেহশীলতা, গভীর সমবেদনা,—এবং প্রেমবশে দারুণ অতৃপ্তিকেই তৃপ্তি, বেদনাকেই সুখ, নৈরাশ্যকেই আশার সফলতা বলিয়া মানিয়া লইবার যে উদারতার পরিচয় পাই ইহা "অনস্ত পতঙ্গের" পরিচায়ক কিনা সুধীবৃন্দ বিচার করিবেন। ইহার পর আমরা দেখিয়াছি কিরূপে বর্ষব্যাপী শান্তিহীন ভোগের পর, দেহের বাহ্য মিলনের পর, অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদা আত্মায় আত্মায় মিলনে, চিরদিবসের শ্রান্তিহীন অক্ষয় মিলন-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ "কড়ি ও কোমলের" যৌবন-স্বপ্নাবিষ্ট কবির ভোগ-সন্তপ্ত চিত্তে নারী-সৌন্দর্য্য যে অপার্থিব পুণ্যময়ী মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহা অর্জ্জুন-হৃদয়েরও মানসী প্রতিমা ঃ—

"এনহে খেলার ধন, যৌবনের আশ,
বলোনা ইহার কানে আবেশের বাণী ;
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিওনা টানি ;
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।"

এখন "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যের যে ভোগ বর্ণনা পাঠে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল লজ্জায় মাথা তুলিবার অবসর পান নাই তাহারই কথা বলিব। আমরা কিন্তু অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার এই যৌবন-সম্ভোগ বর্ণনার মত এমন সুরুচি-সঙ্গত, বিশুদ্ধ অথচ সমুজ্জ্বল কবিত্বময়ী ভোগ-বর্ণনা অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের যে পূর্ব্বরাগ ও সম্ভোগ বর্ণনা পাই, ভক্তির ভাবে গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আশ্রয় না লইলে, শুধু কাব্য হিসাবে তাহা 'কামগন্ধে' ভরপুর বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা-নৈপুণ্যে, রুচির শুচিতায়, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যানুভূতি ও মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ বর্ণনায়, সম্ভোগের মধ্যে যাহা কিছু স্থূল, অসুন্দর তাহার আভাস-ইঙ্গিতও প্রাপ্ত হই না। অনুভূতির যে তীব্রতা এবং সৌন্দর্য্যোপলব্ধির যে সমগ্র দৃষ্টি কবি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা তাহা তাঁহার নায়ক অর্জ্জুন-চরিত্রেও পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তাই অর্জ্জুনের যৌবন-সম্ভোগ যেমন বাসনার উদগ্র আবেগে কেলি-সমুজ্জ্বল, তেমনি ভোগেরই অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তীব্রতম ভোগ-বিরতি, বা বৈরাগ্য ভোক্তার হৃদয় দীর্ণ করিয়া, ভোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখাইয়া সম্ভোগ-বর্ণনাটিকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ এই কাব্যে যৌবন-সম্ভোগের সঙ্গে নৈসর্গিক শোভা ও অলৌকিক নারী-সৌন্দর্য্যের আত্মবিস্মৃত গভীর উপভোগ একীভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব সম্ভোগ-তীর্থ সৃষ্ট হইয়াছে। এই ভোগের চিত্রকে কবি উদারমুক্ত নীলাকাশতলে,—পুষ্পগন্ধামোদিত, বিহগকূজিত, ভ্রমর-গুঞ্জিত, চন্দ্র-সূর্য্যালোকিত আবেষ্টনের মধ্যে,—বিজনারণ্যের শ্যাম শোভার প্রচ্ছদপটে, বিচিত্রবর্ণে অঙ্কিত করিয়া ব্যক্তিগত সম্ভোগকে বিশ্ববিস্তৃত উদারতা ও শোভনতা দান করিয়াছেন। তাই অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ-বর্ণনার মধ্যে নিখিলের চিরন্তন যৌবনোৎসব যেন আহরিত, কেন্দ্রীভূত, জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রাঙ্গদার মদন-বসন্তের নিকট হইতে অলৌকিক রূপ-লাবণ্য লাভের রূপকের তাৎপর্য্যও এই। তাই চিত্রাঙ্গদার রূপের 'অলোক আলোক মাঝে' আকাশের সকল আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে,—তার স্খলিত-বসন, অম্লান-নূতন শুভ্র সৌন্দর্য্যের পরে দ্বাদশীর শশী সমস্ত হিমাংশু ঢালিয়া দিয়া সার্থকতা লাভ করিতেছে—তার বক্ষের প্রতিস্পন্দনে বন-বনান্তের আনন্দ মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছে—প্রতি দৃষ্টির আলোকে 'মধ্যাহ্নের রবি-রশ্মি-রেখাগুলি' রঙিন হইয়া উঠিতেছে,—নবনীনিন্দিত বাহুবল্লরীর আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকৃতির লতাবল্লরী নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। এক কথায়, অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার যৌবনোৎসবের সঙ্গে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন এক গভীর আনন্দের সমবেদনায় উৎসবময়ী হইয়া উঠিয়াছে!

নারী-সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথে যেমন চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে অন্যত্র তাহা দেখিতে পাইব না। তাঁহার কাব্যে নারীর দুই চিরন্তন মূর্ত্তি দেখিতে পাই ;—একটি, রূপসী প্রেয়সীর মূর্ত্তি, অপরটি, পুণ্যময়ী কল্যাণী মূর্ত্তি। "যুগ-যুগান্তর হ'তে বিশ্বের প্রেয়সী" রূপিণী নারীর পরিপূর্ণতা দেখিতে পাই "চিত্রা" কাব্যের উর্ব্বশীতে—

সেই অখিল মানস-স্বর্গে 'অনন্তরঙ্গিনী', 'যৌবনে গঠিতা' পূর্ণ প্রস্ফুটিতা' উর্বশীতে—যার নগ্নতার পাদপদ্ম বিকশিত বিশ্ববাসনার অরবিন্দমাঝে' চিরবিরাজিত, যাহার বিলোল 'কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল', যাহার লীলা নৃত্যের—

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।

যাহার
'মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম, মুগ্ধ কবি ফিরে
লুব্ধচিত্তে, উদার সঙ্গীতে!'

আবার, "রাত্রে ও প্রভাতে" নামক কবিতাখণ্ডে নারীর দুই মূর্ত্তিকেই পাশা পাশি দেখিতে পাই। যে নারী ভোগের 'মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে' প্রেয়সী রূপে ফেনিলোজ্জ্বল যৌবনসুরা পান করিয়াছিলেন তিনিই যখন 'নির্ম্মল বায় শান্ত উষায় নির্জ্জন নদীতীরে' স্নানশেষে শুভ্রবসনা মঙ্গলময়ী দেবীবেশে, সীথিমূলে অরুণ সিন্দুর লেখা আঁকিয়া, বাম করে শুভ্র পুষ্পভার বহিয়া শুচিহাস্তে সুমুখে উদিত হন তখন পুরুষের ভক্তি-নম্র হৃদয়তলে সকল কাম বাসনা বিলয় হয়। নারীর এই কল্যাণী বিজয়িনী মূর্ত্তির পূর্ণাভিব্যক্তি "চিত্রার" 'বিজয়িনী' কবিতায়, যেখানে বিশ্ববিজয়ী পুষ্পধনুকে নতজানু হয়ে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে নতশিরে বিজয়িনী নারীর পদপ্রান্তে পুজোপচার স্বরূপে পুষ্পশরভার সমর্পণ করিতে দেখি। *

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে একই সঙ্গে এই দুই নারীর আভাস প্রাপ্ত হই। তার যৌবনে গঠিত, সুললিত নবনীকোমল সৌন্দর্য্যের অন্তর্দ্দেশে যে কল্যাণী দেবী সঙ্কুচিতা হইয়া ছিলেন তিনি পুণ্যপ্রভায় পূর্ণ প্রস্ফুটিতা হইয়া আত্ম-স্বরূপে প্রকাশিতা হইবার জন্য কিরূপ চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাহার সত্য মূরতির দর্শন লাভের জন্য ভোগশ্রান্ত অর্জ্জুনের অন্তরাত্মা কিরূপ অধীর হইয়াছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ ভোগ-বর্ণনার ছত্রে ছত্রে, দারুণ অতৃপ্তির মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাসে এবং অশ্রান্ত ক্রন্দনের মধ্যে সুব্যক্ত। এবং অবশেষে, কাব্যের উপ-সংহার ভাগে, যৌবনসুষমার ছদ্মবেশ ছিন্ন করিয়া, অব-গুণ্ঠন মুক্তা চিত্রাঙ্গদা যখন নির্ম্মল প্রভাতালোকে আত্ম-প্রকাশ করিল, তখন দেখিলাম, সেই 'তুলতের জীবনের অকলঙ্ক শোভার স্থানে' কোথা হইতে অক্ষয় অমর এক রমণী আসিয়া দাঁড়াইল! অর্জ্জুনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা চিত্রাঙ্গদার সত্য পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম। কিন্তু ইহা কথঞ্চিৎ পরিচয় মাত্র, সম্পূর্ণ নহে। 'কারণ আপনার পরিচয় দেওয়া বহুধৈর্য্যে, বহুদিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ, জন্ম-জন্মান্তের ব্রত।' চিত্রাঙ্গদা এই জন্মজন্মান্তের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া কিরূপে আপনার সত্যকার পরিচয় দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে তাহা তাহার নিজ মুখেই শুনুন:—

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
নহি দেবী, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায় সেও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে সত্য পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জ্জুন করি' তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে প্রিয়তম!
আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্র-নন্দিনী।"

উদ্ধৃত বাক্যগুলির প্রত্যেক বর্ণে যে আদর্শ পত্নীত্বের গর্ব্ব, যে মাতৃ কর্ত্তব্যের আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে, এবং

* Haggard প্রণীত "She" ও "The World's Desire" নামক উপন্যাসদ্বয়ে বর্ণিত বিশ্ববাসনা-রূপিণী নারীর চিত্র, এবং Hugo প্রণীত "Ninety-Three" নামক উপন্যাসের মাতৃচিত্রের কথা আমি ভুলিয়া যাই নাই। তবে এই সকল চিত্রের তুলনায় সমালোচনার অবসর এই স্থলে নাই। —— লেখক।

"আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্র-নন্দিনী" এই সংক্ষিপ্ত কথাগুলিতে যে পিতৃকুলের গৌরব-বোধ সূচিত হইতেছে, তাহা কি কোন কুলত্যাগিনী ব্যভিচারিণীতে সম্ভবে? অথচ দ্বিজেন্দ্রলাল অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার সম্মিলনকে অবৈধ সম্ভোগ বলিতেছেন। বস্তুতঃ আমাদের মতে, এই কাব্যের মধ্যে আধুনিক বিবাহ-পদ্ধতির লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, তন্ত্র-মন্ত্র, ঢাক-ঢোল প্রভৃতির সমাবেশ দ্বারা সমগ্র কাব্যের সহজ গতি ও পরিণতির পথে বাধা জন্মাইয়া রসাভিব্যক্তির ব্যাঘাত ঘটাইলে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শিল্পীর পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইত। প্রতিভার লক্ষণই এই—ইহা সর্ব্বথা অনাবশ্যককে বর্জ্জন করিয়া থাকে—কোন্ স্থলে কোন্‌টি এবং কতটুকু প্রয়োজন ও শোভন, এই ওজনের সূক্ষ্ম বোধ সকল প্রতিভাবান্ শিল্পীই প্রকৃতির হাত হইতে পাইয়া থাকেন। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের এই উপসংহারে অতি কৌশলে, প্রসঙ্গ ক্রমে দুএকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের ইঙ্গিতে অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার যৌন-সম্মিলন যে বৈধ উপায়ে ঘটিয়াছিল, তাঁহারা যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া স্থূলদৃষ্টি পাঠকের সর্ব্ববিধ সংশয় দূর করিয়া দিলেন।

আবার উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে চিত্রাঙ্গদার যে পত্নীত্বের ও মাতৃত্বের আদর্শ প্রাপ্ত হই, আধুনিক ভারতবর্ষ, আমাদের নারী-জীবনে সেই আদর্শের সফলতার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছে। এই আদর্শের প্রেরণায় বঙ্গ-গৃহের লজ্জাবনতা, লীলাঙ্গিনী ললনাকুল শুধু 'যামিনীর নর্ম্ম-সহচরী' না থাকিয়া 'দিবসের কর্ম্মসহচরী' হইয়া উঠিলে,—প্রেমের সঙ্গে কর্ম্ম, সেবার সঙ্গে সাহচর্য্য, সৌন্দর্য্য ও শীলতার সঙ্গে শৌর্য্য সম্মিলিত করিয়া পূর্ণ নারী-মহিমায় ফুটিয়া উঠিলে,—এক কথায়, আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ বীরজায়া ও বীরমাতারূপে স্তন্যের সঙ্গে বীর-শিক্ষার বীজ বঙ্গ-সন্তানের ধমনীতে আশৈশব সঞ্চালিত করিয়া দিলে আমাদের গৃহে গৃহে দ্বিতীয় অর্জ্জুন জন্মলাভ করিবে এবং তখনই আমাদের জাতীয় জীবনের সকল দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, ক্ষুদ্রতা দূর হইবে; তখনই কবি বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করিয়া যে দারুণ হৃদয়-ব্যথা প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"শত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।"

তাহার উপশম হইবে।

এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম "চিত্রাঙ্গদা" কাব্য দুর্নীতিপূর্ণ, পাপের উজ্জ্বল চিত্র নহে,—এই কাব্যে মহাভারতের অর্জ্জুন আপনার পার্থ-গৌরব হইতে চুল পরিমাণেও বিচ্যুত হন নাই। রবীন্দ্র-নাথের অর্জ্জুন একাধারে বীর এবং প্রেমিক—তাহাতে ক্ষাত্র বীরের কাঠিন্যের সঙ্গে প্রেমের কারুণ্য মিশিয়া চরিত্রগত সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। আবার, ব্যাসদেবের কাব্যের উপেক্ষিতা চিত্রাঙ্গদা, সেই অস্পষ্ট রেখারূপিণী চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের তুলিকার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সমস্ত বিশ্বের সৌরভ-শোভায়, আলোকে পুলকে সুগঠিতা সৌন্দর্য্য-প্রতিমা হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নহে,—রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে জগতের চিরন্তন নারী-রহস্য যেন তার সকল বৈচিত্র্য, শোভা ও পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা লইয়া সহস্রদল পদ্মের ন্যায় আপনাআপনি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই কাব্য পাঠে আমরা বুঝিলাম, রূপ-যৌবন ফুল দলের লঘু লাবণ্যের মত ক্ষণভঙ্গুর হইলেও তাহা নিরর্থক নহে—তাহা দেবতার দান; কারণ যৌবন-সম্পদের বাহ্য উপচারেই প্রেমদেবতার উদ্বোধন,—ভোগের মদিরা হইতেই সর্ব্বত্যাগিনী প্রীতির অমৃত উদ্ভূত হয়—কামের পঙ্ক হইতেই প্রেমের স্বর্ণকমল জন্ম-লাভ করে, যাহা 'কেহ দেয় দেবতা-চরণে, কেহ রাখে প্রিয়জন তরে।' এক কথায়, যে "অরূপ রতনের" জন্য মানুষ সৃষ্টির আদি হইতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে 'রূপ সাগরে ডুব দিয়াই' সেই অরূপ পরম সুন্দরের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মঙ্গলাকর শ্রেষ্ঠ কাব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা নীরবতা দ্বারা মানিয়া লইয়া আমরা যে সাহিত্যিক অনৃতের পাপভাগী হইতেছি তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য কি সাহিত্য-সমাজপতিগণ অগ্রসর হইবেন না?

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।
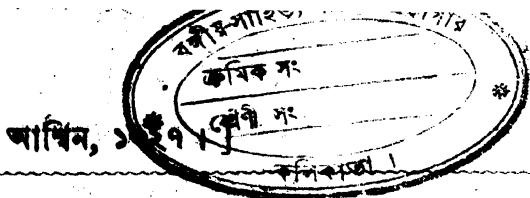
সমস্যা ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

নগেন বলিল—"এখন তো তবু একটু ভালই দেখায়, যাহা হইয়াছিলাম, আর ধানের ভাত খাইব, ভরসা ছিল না।"

শৈলেন নিজের ত্রুটী দেখাইয়া বলিল—"আমিতো ভাই গিয়া যে একবার দেখিয়া আসিব, সে অবসরও করিতে পারিলাম না।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"এই বুঝি স্বাধীনতার বক্তৃতার পরিণাম।"

শৈলেন—"তা কি করিব ভাই, প্রিন্সিপ্যাল বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া ডাকাইয়া লইল। অস্বীকার করি, শেষ বেটা ফেল করিয়া দেয়—আমি নানা দিকে ঠেকিয়া কাজ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আর না করিলেও খাওয়ার তো সংস্থান চাই; বাড়ী হইতে আর কত আনা চলে?"

নগেন বলিল—সে তো ঠিক। আমাদের কলেজের জীবনে ঐটীই কিন্তু আমাদের স্মরণ থাকে না।

শৈলন বলিল—এখন যদি বৎসর খানেক চাকুরীতে থাকিয়া একটা Dispensary দেওয়ার টাকাটাও জমে, তবেই—আর না।

নগেন বলিল—"তারপর—বাড়ীর, আমাদের বাড়ীর অবস্থা কেমন? বাবা তো চাকুরী ঠিক করিয়াছিলেন—যাই নাই বলিয়া খুব রাগ হইয়াছেন, না?"

শৈলেন—'খুব। না গিয়া কিন্তু ভালই করিয়াছ। গ্রামে, বিশেষ নিজ গ্রামে কি চাকুরী করিতে আছে? ওতে সম্মানও থাকে না, শেষ বিড়ম্বনাও যথেষ্ট।"

নগেন—"এ মাস হইতে ৫০৲ টাকা করিয়া তাঁহাকে মাসে মাসে দিব। তাতেই বোধ হয় সুদ চলিয়া খোরাকীও চলিয়া যাইবে। চাকুরী না হইলে এখন আমাকেও সামান্য বিপদে পড়িতে হইত না!"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"কাকাতো শ্যামগ্রাম বিবাহ ঠিক করিয়া টাকাও লইয়া আসিয়াছেন। বলিলেন, মাঘ ফাল্গুনেই তোমার বিবাহ।"

নগেন চমকিয়া উঠিয়া বলিল—তিনি নিজেই বলিয়াছেন কি?

শৈলেন—হাঁ, তিনি আসিবার দিনও আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন। তোমার শরীর কাতর, তাই এতদিন তাহা লিখেন নাই। এখন মাষ্টারীতে যাও নাই বলিয়া রাগ করিয়া বোধ হয় লিখেন নাই। বাড়ী গেলেই সব নিজে বলিবেন, এরূপ বোধ হয় ইচ্ছা ছিল।"

নগেন কতক্ষণ শৈলেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—সে যেন এই সমস্যার উপায়ই দেখিতে ছিল না।

শৈলেন বলিল—"ভাবিলে আর কি হইবে? এখন তোমার কথা বল।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নগেন বলিল। "মিলনের ভাবটা, প্রকৃতির আবাহন টা—আমার ভিতরে যেন ভাল জমিয়া উঠিতেছে না। অন্তর প্রকৃতির তেমন সাড়া না পাইলে আমি বিবাহ করিতে পারিব না—সে বার তাহা পরিষ্কার বলিয়া আসিয়াছি।"

পারুলদের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাই দুই ভগ্নীতে কোথায় গিয়াছিল। আসিয়া শৈলেনকে দেখিয়াই পারুল হাসিয়া বলিল—"নূতন খবর কি শৈলেন দা? বাড়ীতে গেলে বুঝি আর মনেই হয় না। চিঠিগুলির পর্য্যন্ত উত্তর দিলেন না!" কথাগুলি বলিয়া পারুল যেন রাগ করিয়া তাহার কোঠায় চলিয়া গেল।

বকুল বলিল—"আমাদের একটী নূতন সাথী হইয়াছে কিন্তু শৈলেন দা!"

শৈলেন বুঝিল 'পাখী'। বলিল—'কি পাখী? কেমন, দেখি?"

নগেন হাসিল, পারুলও আসিয়া হাসিয়া কুটপাট হইল; বকুল হাততালি দিয়া শৈলেনকে জব্দ করিয়া দিল।

শৈলেন দরবারে জব্দ হইয়া বাড়ীর ভিতরে মাসি মাকে দেখিতে চলিল। পারুল ও বকুল সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

শৈলেন বারান্দায় যাইয়াই হটাৎ যেন কি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর ফিরিয়া আসিল। বকুল হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

পারুল বলিল "পাখী দেখিলেন ?"

বকুল হাসিয়া বলিল—"পাখীর মালিক কিন্তু নগেন বাবু। ও পাখী আমাদের ন্যায় উড়িয়া চড়ে না। পিঞ্জরে থাকে।"

গৃহিণী আসিয়া শৈলেনের সহিত হলে দেখা করিলেন। তাহার গাল মুখ হাতাইয়া দিয়া তাহার কুশল মঙ্গল, বাড়ীর সকলের কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা বাদ করিলেন।

গৃহিণী চলিয়া গেলে, নগেন বলিল—"অনেক পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে, চল না একটু স্কোয়ারে যাইয়া বসি—একটু নির্জ্জন—।

পারুল বলিল—"আমরা চলিয়া যাইতেছি, এখানেই আপনারা বসুন না—নয় বাবার রিডিং রুমেই গিয়া বসুন।"

বকুল হাসিয়া বলিল—এখন নগেন বাবুর কত কথা, পাখীর কথা, গোপনীয় কথা, ঘর গৃহস্থীর কথা, ও সকল কথা কি আর ঘরে হয় ?

নগেন হাসিয়া বলিল—"আমার পক্ষে সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটু ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে; সে জন্যই বিকালে স্কোয়ারে যাইয়া থাকি। চা'র সময় চলিয়া আসিব, গান শুনিব, উপাসনা করিব—সবই করিব। চল শৈলেন।

পারুল বলিল—"শৈলেন দাকে নিয়া আসিবেন কিন্তু।"

গোলদীঘীর হাতার ভিতর এক খানা বেঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া শৈলেন প্রশ্ন করিল—"পাখী ধরিলে কোথায় ?"

নগেন হাসিয়া বলিল—"বাবা বিশ্বেশ্বরের দান।"

শৈলেন—"এ দান মিলিল কি প্রকারে ?"

নগেন দুঃখিনী সম্বন্ধে যতটুকু জানিত, সবিস্তারে শৈলেনের নিকট বলিয়া শেষ বলিল—দুঃখিনীর সম্বন্ধে যতই বেশী জানিতে যাই, ততই তাহার সম্বন্ধে আমার না জানার জিদটার পরিমাণই বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে; সুতরাং দুঃখিনী কে তাহার নিজ সম্বন্ধে অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করা আমি প্রয়োজন মনে করি নাই। ৬ কাশী ধামে এরূপ অজ্ঞাত কুলশীলা কুমারী ও যুবতীর অভাবই নাই; তবে গুরুদেব বলিয়াছেন—বলিয়া নগেন যুক্ত করে তাহার গুরুকে উদ্দেশে প্রণাম করিল—দুঃখিনী তাঁহার পালিতা ব্রাহ্মণ কন্যা, নিষ্পাপ চরিত্র—ইহার উপর কথা বলিবার আমার কিছু ছিল না, সুতরাং কোন বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিবারও প্রয়োজন মনে হয় নাই।

শৈলেন—"এখন ইহাকে রাখিবে কি প্রকারে ? যুবতী, ব্রাহ্মণ কন্যা—সমস্যা খুব সহজ কি ?"

নগেন বলিল—তুমি আসিলে এক খানা ছোট কোঠা-বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিব, এরূপই দুর্গাদাস বাবুর মত।

শৈলেন—এই যুবতীকে লইয়া আমরা দুজন থাকিব, একি খুব যুক্তি সঙ্গত মত ? ইহা অপেক্ষা তুমি ইহাকে গুরুর দান বলিয়া সরল অন্তঃকরণে দ্বিধা শূন্য মনে গ্রহণ কর, সে উত্তম। কোন কথা থাকিবে না।

নগেন বলিল—"তাহা অসম্ভব। আমার পক্ষে এখন বাবার মনে নূতন করিয়া আঘাত দেওয়ার চেষ্টা অসম্ভব—আমি তাহা পারিব না। দুঃখিনীকে পাত্রান্তরে সমর্পণ করাই আমার ইচ্ছা। বিধু বাবু তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত—।"

শৈলেন—"এ সম্বন্ধে তুমি ইহার মত লইয়াছ কি ? তোমার গুরুদেবেরই বা আদেশ কি ?

নগেন—"গুরুদেব সেই রূপই উপদেশ দিয়াছিলেন—দুঃখিনীর মত অপ্সরূপ হইতে পারে না।"

শৈলেন—হিন্দু সমাজে ইহার কোন গতি হইতে পারে না ?

নগেন—"অসম্ভব—গুরুদেব তাহা প্রত্যাশা করেন নাই, দুঃখিনীও তাহা করে না। তুমি যদি পার, চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার। আমার বাবা সমাজপতি—আমি এইরূপ ব্যাপারের সংস্রবে নিজকে অধিকতর অগ্রসর করাইয়া পিতার মস্তক অবনত করাইতে এখন আর ইচ্ছা করি না।"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"তোমার এই পরিবর্ত্তন কত দিন হইতে ? দুর্গাদাস বাবুর জামাই হইবার ইচ্ছা কি ইহার মধ্যেই চলিয়া গেল ?

নগেন বলিল—"রোগে ভুগিয়া শারিরীক অবস্থার সাথে মানসিক অবস্থাও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে।

শরীর ও মন পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে কোন নূতন চিন্তা ও নূতন হাঙ্গামা মাথায় ঢুকাইতে সাহস করি না।"

শৈলেন—"তবে শ্যামগ্রামের জমিদার মহেই—মাথা বিকাইবে?"

নগেন—"বাবা যদি নিজকে বিপন্নই করিয়া থাকেন, তবে আর অন্য উপায় কি?"

শৈলেন হতাশ ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'বুঝিলাম।'

এই সময় আর একটী ভদ্রলোক আসিয়া তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিল—"শৈলেন, কবে আসিলে হে? তারপর, কি কথা হইতেছে?"

শৈলেন হাসিয়া উত্তর করিল—"আসিয়াছি আজই; হইতেছে কথা—তোমাদের সম্বন্ধেই।"

ভদ্রলোকটীর নাম রমেশ বাবু, তিনি ব্রাহ্ম সমাজের লোক, পূর্ব্ব-নিবাস পীরপুর—শৈলেনদের এক গ্রামেই।

রমেশ বলিলেন—"আমাদের সম্বন্ধে? সে কেমন?"

শৈলেন—"এই—বিধু শর্ম্মার কথা; লোকটা বাড়ী বাড়ী গিয়া ধন্না দিতেছে, অথচ তোমাদের সমাজে একটা মেয়ে তাহার জন্য জুটিল না; ব্রাহ্ম সমাজের এই সাম্য নীতির কথাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।" বলিয়াই শৈলেন উচ্চ হাস্য করিল।

রমেশ হাসিয়া বলিল—"ও বন্দোপসাগরের কথা বলিও না। সে নিজে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, অথচ ঘুরে সে কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ের খোঁজে, এদিকে অবস্থাতো—ন অন্নং ন বস্ত্রং।"

শৈলেন—"ব্রাহ্ম সমাজের এ কৌলিন্য-কাঞ্চন-সমস্যা আর হিন্দু সমাজের জাতি ভেদ সমস্যা বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজকে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথে লইয়া যাইবার পক্ষে কি পরিমাণ সাহায্য করিতে পারে—দু জনাতে বসিয়া আমরা আজ তাহারই হিসাব নিকাশ করিতেছি।"

রমেশ হাসিয়া বলিল—আলোচনার উদাহরণ হইতেছে বোধ হয়—বিধু বন্দোপসাগর একদিকে, আর শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণের কথিত হিন্দুসমাজের কলহ আর একদিকে, না?

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"ঠিক ধরিয়াছ।"

নগেন বলিল—"হিন্দুসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজ উভয় সমাজেরই অধঃপতনের দিন খুব নিকটবর্ত্তী বলিয়া আমার মনে হইতেছে। আমার মনে হয়, আমরা যতই আমাদের নামের অগ্রে ও পশ্চাতে 'সাধু, ভাই' 'রাজর্ষি', 'আনন্দ' ইত্যাদি বিশেষণ জুড়িয়া নিজকে শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক বলিয়া জাহির করিতে যাইতেছি, ততই নিজকেতো দশের মধ্যে অপদস্থ করিতেছিই সমাজকেও হীন করিয়া ফেলিতেছি। রবিবাবু নাকি এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন—

নিজেরে করিতে সম্মান দান, কেবলি নিজেরে করি অপমান

রমেশ গম্ভীর ভাবে বলিল—"এরূপ মনেকরা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়। ইহা ঠিক আদার ব্যাপারি হইয়া জাহাজের খবর নেওয়ার ন্যায় অনধিকার চর্চ্চা। তুমি কি জানহে ব্রাহ্ম-সমাজের? আগে সমাজকে শ্রদ্ধাকর, ভালবাস, তার ভিতর প্রবেশ করিয়া হিতাহিত বিবেচনা কর, তারপর দোষ ত্রুটীর কথা বল—তোমার কথার মূল্য হইবে। যাতে তোমার শ্রদ্ধানাই, যার গূঢ়মর্ম্ম তোমার পক্ষে অনধিগম্য—তার সম্বন্ধে তোমার মতের মূল্য কি?

শৈলেন বলিল—"তা হইতে পারে; কিন্তু তোমার ব্যাভিচার যদি আমাকে কলঙ্কিত করিবার উপক্রম করে—সমগ্র দেশ ও জাতির পক্ষে অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার বিরুদ্ধে বলিবার পক্ষে অধিকারী অনধিকারীর বিচার অনাবশ্যক। আমি আদর্শ সমাজেরই পক্ষপাতী। ব্রাহ্মসমাজও বুঝিনা, হিন্দুসমাজও বুঝি না। আদর্শ লোক চাই। আমি জানিতে চাই—রাজা যাহার বীজ বপন করিয়াছিলেন, আর মহর্ষি যাহার মূলে বারি সিঞ্চন করিয়াছিলেন—সেই উন্নতশীল কল্পবৃক্ষ আজ এই প্রায় এক শতাব্দীর ভিতর দেশ ও জাতিকে কোন বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন? আর রঘুনন্দনের নাগপাসে অষ্টে পৃষ্ঠে-বদ্ধ অতি সাবধানী রক্ষণশীল সমাজইবা এ জাতিকে কোন অপার্থিব জাতীয় আদর্শ দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন?"

রমেশ ভাল বক্তৃতা দিতে পারিত, সে তখন উত্তেজিত হইয়া ভয়ানক বক্তৃতা আরম্ভ করিল। তাহার বক্তৃতা শুনিয়া লোক জমিয়া গেল। তখন সে লাফাইয়া বেঞ্চের উপর দাঁড়াইল। অবস্থা বুঝিয়া শৈলেন ও নগেন ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মেডিকেল কলেজের সম্মুখে কলেজ ষ্ট্রীটের উপর শৈলেন ও নগেন একটী বাড়ী ভাড়া লইয়াছে। দ্বিতলের উপর ছ'টী কোঠা আছে, বারান্দার এক কোণে রান্নাঘর। নীচে জলের কল ও পায়খানা, বাড়ীর মাঝের ছুটী কোঠা ১৪৲ টাকার উপর নিজেদের জন্ত রাখিয়া দু ধারের ৪টী কোঠা অন্ত দুজন ভদ্রলোককে পুনঃ ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝের কোঠার সমুখেরটিতে নগেন ও শৈলেন থাকে, ভিতরের কোঠায় দুঃখিনী থাকে ও জিনিস পত্র রক্ষিত হয়। নীচের তলায় একটি পুস্তকালয়।

ছোকরা চাকর গজেন্দ্র মাহাতি, নিবাস মেদিনীপুর, শৈলেনদের মেসের চাকরের ভাই। গজেন্দ্র রাত্রে আহারের পর তাহার দাদার সহিত গিয়াই শয়ন করে।

একদিন দ্বিপ্রহরে বারটার পর শৈলেন ও দুঃখিনীর মধ্যে এইরূপ আলাপ হইতেছিল।

শৈলেন—"দুঃখিনী আমার কথার উত্তর দাও, আমার প্রস্তাবে তোমার সম্মতি আছে কি?"

দুঃখিনী মাটির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"আমাকে ক্ষমা করিবেন, নগেন বাবুর ব্যবস্থার উপর আমার নিজের কোন মত থাকিতে পারে না। আমি অন্ত কাহারও কোন ব্যবস্থায় বা পরামর্শে স্বীকার হইতে পারি না। ধর্ম্মতই পারি না। তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।"

শৈলেন—"বরং আরো ভাবিয়া দেখ।"

দুঃখিনী চুপ করিয়া রহিল। উত্তর দিল না।

শৈলেন বলিল "দুরাশা! নগেন যে তোমাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইতে পারে, এমন বিশ্বাস আমার নাই। তাহার অবস্থা আমি তোমার চেয়ে ঢের বেশী জানি।"

দুঃখিনী নীরব। তাহার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল।

শৈলেন—"সে কি তোমার নিকট সম্মতি দিয়াছে?"

দুঃখিনী কাঁদিয়া ফেলিল,—তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"আমার প্রতি রাগ করিবেন না, আমার অবস্থা আপনি বিবেচনা করিয়া আমাকে উপদেশ দিবেন; আমাকে যাহা বলিতে হয় বলিবেন। আপনাকেও আমি নগেন বাবুরই মত পরমাত্মীয় মনে করি। আমার গতি কি হইবে, এক ভগবান ব্যতীত আর কেহ তাহা জানে না—কিন্তু আমি এখন একমাত্র নগেন বাবুকেই জানি। তিনি কি এতদিন পরে দুই হাতে ঠেলিয়া আমাকে ফেলিয়া দিতে পারিবেন? দুঃখিনীর জন্ত ভগবানের চক্ষু না থাকিতে পারে—তাঁহার তো ধর্ম্ম আছে? বাবা যে তাঁহারই হাতে আমাকে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন।"

শৈলেন—"আজ রাতেই যাহা হয় হইবে, নগেনের বাপ যে ব্যবস্থা করিবেন, নগেন তাহা উপেক্ষা করিতে কখনই পারিবে না। কেননা, তিনি তাহার বিবাহের টাকা অগ্রিম লইয়া আনিয়া খাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা জমিদার, তিনি টাকা ফেরৎ দিলেই যে তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে, এমন নহে। ফেসাদ ঘটাইবে।

দুঃখিনীর চক্ষে জলধারা বহিতেছিল। সে বলিল—"তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়া, পিতার অবাধ্য করিয়া, আমি কোন অনুরোধ করিব না। বরং আমাকে লইয়া তিনি বিপদে না পড়েন, তাহা করিতেই আমি সর্ব্বদা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি। আমার অদৃষ্টে, তিনি যে ব্যবস্থা করিবেন তাহাই হইবে। চারটা ভাত সিদ্ধ করিয়াই না হয় তাহার নিকট থাকিব। এ অধিকার হইতেও কি তিনি বঞ্চিত করিবেন?

শৈলেন—"ইহাই তোমার তবে শেষ পণ?"

দুঃখিনী—"আপনি রাগ করিবেন না। আমার কোন পণ নাই। বাবার ইচ্ছায় আমি নগেন বাবুর অধীন আছি, নগেনবাবু এখন আমার ব্যবস্থা যাহা করিবেন—"

দুঃখিনী আর বলিতে পারিল না—কাঁদিয়া আকুল হইল।

শৈলেন হস্পিটেল হইতে আসিয়াছিল, আবার হস্পিটালে চলিয়া গেল।

দুঃখিনীর মনে আজ শান্তি নাই। শৈলেন যাহা বলিয়াছে—এখন ভাবিতে বসিয়া দুঃখিনী দেখিল, তাহা ঠিক— নিতান্তই দুরাশা, উন্মত্ত যৌবনের অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টিহীন কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই না। সৌন্দর্য্য মোহে, কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে, সে নগেনের চিত্ত যতখানি অধিকার করিয়া লইয়া বসিয়াছে—পিতার দৃঢ় আদেশ, ও সমাজের তীব্র কষাঘাতের বিভীষিকার নিকট তাহা কতক্ষণ টিকিবে?

আজ নগেনের পিতা আসিয়াছেন। রাত তাঁহাদের দীর্ঘ আলোচনায় দুঃখিনীর ক্ষুদ্র জীবনের একমাত্র আশ্রয় স্থলটী ভীষণ ভূকম্পের প্রবল ধ্বংশের ন্যায় ধসিয়া পড়িবে। হায়, হায়, তখন তাহার গতি কি হইবে?

দুঃখিনী সারা দ্বিপ্রহর তাহাই চিন্তা করিয়া কখন ফুঁপাইয়া কাঁদিয়াছে—কখনও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে চাহিয়াছে। সমস্ত দিনের কান্নায় তাহার চক্ষুটি জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

নগেন আফিস হইতে আসিয়া দুঃখিনীর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। দুঃখিনী তাহাকে দেখিয়া নতমুখে চলিয়া গেল।

হাত মুখ ধুইয়া নগেন ডাকিল "পাখি!"

দুঃখিনী জলখাবারের লইয়া আসিল।

নগেন বলিল—তোমার মুখ চোখ এমন রক্ত জবার মত দেখায় কেন? কাঁদিয়াছ কি?

দুঃখিনী—"কান্না লইয়াই যখন আসিয়াছি, তখন হাসি আর কোথায় পাইব?"

নগেন "বাবা তোমার হাতের খাইবেন না, আমাকে আজ রান্না করিতে হইবে। শৈলেন আসিয়াছে কি?"

দুঃখিনী নীচের দিকে চাহিয়া হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—"বারটা একটায় একবার আসিয়াছিলেন, পরে আর আসেন নাই।"

নগেন জল খাবার খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে বলিল—বাবা আমার বিবাহ ঠিক করিয়াছেন, শুনিতেছি ফাল্গুনেই বিবাহ, বিবাহের পণও কতক তিনি অগ্রিম লইয়াছেন—এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

দুঃখিনীর চক্ষে জল সঞ্চিত হইতেছিল, এইবার গণ্ড প্লাবিত করিয়া ধারা বহিল। দুঃখিনী দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল।

নগেন দুঃখনীর দিকে চাহিয়াই বলিল "আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি বল?"

দুঃখিনী নিজ হাটুর উপর কপোল নিন্যস্ত করিয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। কোন কথা বলিল না।

নগেন কথা বলিতে যাইতেছিল, কথা মুখে আটকাইয়া গেল। সে গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—"তোমার এবং আমার মিলন, যাহা আমরা আশা করিতেছিলাম—ভগবানের তাহা অভিপ্রায় নহে। হিন্দুসমাজে থাকিয়া সেরূপ ব্যবস্থা অসম্ভব।"

দুঃখিনী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুজল মুছিয়া বলিল—"আপনাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া, আমার পক্ষেও আর অসম্ভব।"

নগেনের বাবা দ্বিপ্রহরে তাহাদের বাড়ীতে আহার করেন নাই। সহরে বামনীদের হাতে তিনি আহার করেন না, এমন অবস্থায় দুঃখিনীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব কে তাহার নিকট উপস্থিত করিবে? অথচ দুঃখিনী নগেনের চিত্ত এতদিনে সম্পূর্ণভাবেই অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তাহা শুধু তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যের খাতিরেই নহে; হৃদয়ের মাধুর্য্যে, প্রীতির অমৃতত্বে, নারীর নারীত্ব ও মহত্বে সে নগেনকে আপনার করিয়া লইয়াছিল।

নগেনের বয়স অবশ্যই রাতারাতি দ্বিগুণ হইয়া যায় নাই। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইয়া সে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। পিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া অজ্ঞাত কুলশীলা কোন যুবতীকে গ্রহণ করিবার চপলতা তাহার কল্পনা হইতে ক্রমে অপসারিত হইতেছিল। আজ তাহার পিতা যখন আসিয়া দুঃখিনীকে রান্না করিতে দেখিয়া উকীলের বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তখন আর তাহার সান্ত্বনা রহিল না। সে মুহূর্ত্ত হইতেই জাতি-সমস্যা মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আজ সমস্ত দিন ভরিয়া নগেন কেবল দুঃখিনীর কথাই ভাবিয়াছে—তাহার সর্ব্বোপরি নির্ম্মল-স্বভাব, কোমল প্রকৃতি, গভীর প্রেম, উচ্চ আত্মত্যাগ। কিন্তু ইহার কিছুকেই সে তাহার পিতার সম্মানের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না। পিতার মাথা হেঁট করাইয়া দুঃখনীর পাণি গ্রহণের নজির সে কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারিতেছিল না। অথচ দুঃখিনীকে ধর্ম্মতঃ অগ্রাহ্যও সে করিতে পারে না। অনোন্যপায় হইয়া নগেন ধীরে ধীরে বলিল—"হিন্দুসমাজে তোমার বিবাহ হইতে পারে না দুঃখিনী!"

দুঃখিনী তেমনি মৃদু প্রতিধ্বনী করিয়া বলিল—"হিন্দু

সমাজেই আমার বিবাহ হইয়াছে—ব্রহ্মচারী বাবাই আমাকে আপনার হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমার আর অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে না।"

নগেন হাসিয়া বলিল—তিনিতো তোমার বিবাহ দিয়া যান নাই, তোমার রক্ষার ভার দিয়া গিয়াছেন। আমি তোমাকে কোন সৎপাত্রে পাত্রস্থ করি, গুরুদেবের তাহাই ইচ্ছা।"

দুঃখিনী অপেক্ষা কৃত একটু তীব্রভাবে বলিল—গুরুদেবের তাহা ইচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু আপনার তেমন ছিল না, তাই আপনি আমার নারী মর্য্যাদায় আঘাত করিয়াছেন, আমিও আপনার ব্যবহার তেমন ভাবেই গ্রহণ করিয়াছি।"

নগেন লজ্জিত হইয়া বলিল—"আমি কি কখনও তোমার প্রতি মর্য্যাদার হানিকর কোন কার্য্য করিয়াছি?"

দুঃখিনী—"সেরূপ কোন কার্য্য না করিলেও আপনার কথা বার্ত্তা ও ব্যবহার আমাদের মধ্যে অন্যভাবের ছিল না। এখন অন্য ভাবের হইলে তাহাতে স্বভাবতঃই নারীমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ হয়।"

নগেন—মনে মনে নিজের ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।"

দুঃখিনী বলিতে লাগিল—পিতাকে উপেক্ষা করিতে আপনি পারেন না—কদাচ তাহা করিবেনও না। আমাকেও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আমি আপনার ধর্ম্ম পত্নী। আমার মান সম্ভ্রম—

দুঃখিনী আর বলিতে পারিল না। কাদিয়া ফেলিল।

নগেন বলিল—"আমি তোমাকে কদাপি উপেক্ষা করিব না। কিন্তু দাম্পত্য ব্যবহারইবা তোমার সহিত চলিবে কি প্রকারে? এ যে মহা সমস্যা।"

এই সময় শৈলেন—আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের কথা এইখানেই থামিয়া গেল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তারাচরণ ফাল্গুনের মধ্যভাগে বিবাহের দিন স্থির করিয়া পুত্রের সম্মতি জানিতে আসিয়াছেন। বাসায় আসিয়া তিনি যে অবস্থা ও ব্যবস্থা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাহার পুত্রের প্রতি আর ভরসা রহিল না। রাঁধুনী যুবতী বামুন ঠাকুরাণটীর প্রতি চাহিয়া—তিনি এতদিন নানা মুখে যে রটনা শুনিয়াছিলেন—সে ব্যাপার যে সত্য, তাহা বুঝিবার পক্ষে তাহার আর কোনই অসুবিধা হইল না।

তারাচরণ প্রথম জীবনে বিস্তর অনাচার করিলেও এখন সমাজপতি হইয়া আর অনাচারে পা দিবেন না, ভাবিয়াই প্রাতঃকালে তাহার এক বাল্যবন্ধুর গৃহে আহার করিবেন বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

বিকালে নগেন রান্না করিতে গেল, শৈলেন তাঁহাকে যাইয়া লইয়া আসিল।

রাত্রিতে আহারান্তে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে তারাচরণ বলিলেন—"তারাগ্রামের বিবাহই স্থির করিয়াছি।"

নগেন নীচের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পিতার কথায় সম্মতি দিয়া বলিল—"আচ্ছা।"

তারাচরণ সাহস পাইয়া বলিলেন—"আড়াই হাজারই দিবে—পাঁচ শত টাকা অগ্রিমই দিয়াছে—"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—"সেই টাকাটা কি সান্যাল বাবুকে দিয়াছেন?"

তারাচরণ একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"খুচরা ঋণ গুলি পরিশোধ করিয়াছি। গত ভাদ্রে চাউল কিনিতে হইয়াছিল—আউস ফসল মারা যাওয়ায় এমন বিপদই গিয়াছে—তার উপর পাটের বাজার একদম বন্ধ—"

নগেন পিতার বক্তব্য ও কৈফিয়ত শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া বলিল—"এখন আমগ্রামে কিছু চাউল কিনিয়া রাখিলে বোধ হয়—"

তারাচরণ দম ছাড়িয়া বলিলেন—"টাকা হইলেতো সেরূপ বন্দোবস্ত করা ভালই ছিল। কিন্তু গ্রামের যেরূপ অবস্থা—রাখিতে সাহস হয় না।"

নগেন বলিল—তবে কাজ নাই। যুদ্ধ থামিলে চাউল প্রভৃতি দেশজাত কৃষি ফসল অপেক্ষাকৃত সস্তাই থাকিবে।

তারাচরণ—১৩ই ফাল্গুন বিবাহের তারিখ স্থির হইয়াছে। বিবাহের খরচের আন্দাজ কিছু এখন রাখা প্রয়োজন, তাহা রাখিতেই হইবে

নগেন ধীরে ধীরে শৈলেনের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল—"ফাল্গুনে বিবাহ!"

নগেনের অবস্থা বুঝিয়া শৈলেন বলিল—"ফাল্গুনে! অসম্ভব কাকা! এখন ইহাদের বসিবার অবসর নাই। এই সবে কারবারের আরম্ভ, টাকা জলের মত খরচ হইয়া যাইতেছে—এই ফাল্গুনে—অসম্ভব!"

তারাচরণ ব্যস্ত ভাবে বলিলেন"—মেয়ের বয়স চৌদ্দ, কিছুতেই তাঁরা ফাল্গুন পার হইতে দিবেন না; সম্মুখে অকাল; আর শুভস্য শীঘ্রং—এই সকল শুভকার্য্যে আপত্তি উচিত না। সে আর কদিনেরইবা কাজ, এক সপ্তাহ বিদায়—বিবাহ ফাল্গুনেই হইবে।"

তারাচরণ দুঃখিনীর রূপ লাবণ্য ও বয়স দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন, এখন শৈলেনের আপত্য শুনিয়া মনের সন্দেহ গভীর হইয়া উঠিল। তিনি হুকায় দম টানিয়া পুনরায় বলিলেন—"না বাবা তোমা:দর সঙ্গ ভাল নহে; বয়স কালে তোমাদের এত প্রলোভনের মধ্যে বাস করা আমি সঙ্গত মনে করিতেছি না। তোমরা একটা বামুন ঠাকুর রাখিয়া লও—বিবাহটা ফাল্গুনেই হইবে।

দুঃখিনীর প্রতি এই ইঙ্গিতে শৈলেন ও নগেন উভয়েই লজ্জিত হইল। কেহ কোন প্রতি-উত্তর করিল না। তারাচরণও এ সম্পর্কে আর অধিক বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি বিবাহের কথাই বলিতে লাগিলেন।

"বিবাহ এমন স্থানেই ঠিক করিয়াছি—যাহার সম্বন্ধে লোকে টু কথাটী বলিতে পারিবেনা। তাঁরা ধনে মানে দেশের সমাজের প্রধান ব্যক্তি। আবার ছেলে কি যাহার তাহার মেয়ে বিবাহ করিতে পারে?"

নগেন মাথা হেট করিয়া রহিল। শৈলেনও এখন নূতন কোন কথা উত্থাপনের সময় নহে মনে করিয়া তারাচরণের আত্ম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাহিনীই শুনিতে লাগিল।

তারাচরণ হুকায় এক এক বার টান দিতে লাগিলেন, আর কাসিতে কাসিতে নিজ পিতৃপুরুষের উচ্চ সম্বন্ধ বাদের কথা এবং পিতা-মাতা গুরুজনের প্রতি ভক্তি থাকাই যে জীবনের প্রকৃত উন্নতির মূল, সে সম্পর্কে সদৃষ্টান্ত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।"

তারাচরণ থামিলে নগেন ধীরে ধীরে বলিল—"আপনি তাঁহাদিগকে তারিখ পরিবর্ত্তনের কথা লিখিয়া দেখুন, যদি স্বীকার না করেন, তবে এখানেই কার্য্য হইবে; বিদায়ে যাইতে পারিব না।"

তারাচরণ—অগত্যা পুত্রের কথায় স্বীকৃত হইলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনী শৈলেনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে শৈলেন পারুলের ভালবাসার গভীরতা মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল। পারুল অধীর ভাবে তাহার মনের কোন চাঞ্চল্য ভাব শৈলেনের নিকট প্রকাশ না করিলেও, পারুল যে শৈলেনকে খুব প্রীতির চক্ষে, খুব স্নেহের চক্ষে, এমন কি ভালবাসার চক্ষে দেখিত, তাহা তাহার প্রত্যেকটী কথায়ও ব্যবহারে অনুভূত হইত।

শৈলেনের মনে পারুলের সেই সকল ব্যবহার এক একটী করিয়া উদয় হইতে লাগিল, আর শৈলেন যেন পারুলের সেই স্নেহ প্রীতির নিকট কিছু কিছু করিয়া অবনত হইতে লাগিল।

দুঃখিনীর প্রতি শৈলেনের মন বিদ্রোহী হয় নাই। দুঃখিনী নগেনের জীবনে যে একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—নগেন তাহা বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। নগেন ইহাও শৈলেনকে একদিন বলিয়াছিল—যে তাহার পিতা যিনি সমাজের নেতা হইবার প্রলোভন ছাড়িতে পারেন নাই—বিষম দারিদ্র্যও যাহাকে তাহা হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই- তিনি তাঁহার পুত্রের এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় কখনও দিবেন না। আর সেও পিতার মর্ম্মে নির্দ্দয় আঘাত দিয়া, সমাজের সম্মুখে পিতার উন্নত মস্তক অবনত করাইয়া—এরূপ সমাজদ্রোহীর কার্য্য করিতে পারিবে না। যদি সে দুঃখিনীকে কোন সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করিতে পারে তবেই সে নিজে বিবাহ করিবে, নতুবা পিতা বিবাহ করাইলেও দুঃখিনীর স্থান না হওয়া পর্য্যন্ত সে দুঃখিনীর মতই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিবে।

মন্থর জীবনের এই বিষম সমস্যা সমাধান করিবার জন্যই শৈলেন অগ্রসর হইয়াছিল।

শৈলেনের প্রস্তাবের উত্তরে দুঃখিনী যাহা বলিয়াছে, তাহাতে শৈলেন মনে তখন একটু আঘাত অনুভব করিয়া থাকিলেও সে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

চাকুরী পাইয়া অর্থ উপার্জন করিয়া শৈলেনের মনে যৌবনের চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। দুঃখিনীর সংসর্গ হইয়াছিল এই চাঞ্চল্যের ইন্ধন। এই সময় শৈলেনের বউদি যে একেবারেই তাহার কথা ভুলিয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার মামুলি আব্দার—"জীবনে বসন্ত আসিয়াছে কি?" "কাল কুকিলা ডাকিয়াছে কি?" "জোছনা ফুটিয়াছে কি?" তখনও চলিতেছিল। শৈলেনের নিকট ঐরূপ 'পরের মুখে ঝাল খাওয়ার' সখ নেহাতই ছেলে খেলা বলিয়া মনে হইতেছিল। তাই সে এইবার তাহার বৌদির চিঠির এক কড়া উত্তর লিখিয়া দিয়া পুনরায় যাইয়া পারুলদের চা বৈঠকের নিয়মিত সভ্য হইয়া বসিল।

শৈলেন ও নগেন পৃথক বাসায় গিয়াছে পর আর শৈলেন দুর্গাদাস বাবুর বাড়ী আইসে নাই; নগেন যা দুই এক দিন আসিয়াছে—কারবারের কথা লইয়াই আসিয়াছে; ভাল করিয়া বসিয়া কথা বলিবারও অবসর হয় নাই। সে জন্য পারুল ও বকুল একটু দুঃখিত ছিল।

শৈলেনকে পুনরায় পাইয়া তাহারা প্রথমে তাহাকে ঠাট্টা করিয়াই অস্থির করিয়া তুলিল। তারপর প্রীতির ভাবে গ্রহণ করিল।

শৈলেন এখন প্রতিদিন দুর্গাদাস বাবুর বাড়ীর বৈকালিক চা-পান বৈঠকে উপস্থিত থাকে। তারপর রাত্রি ৮টা, কখন কখন ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত তথায় থাকে; উপাসনায় যোগদান করে; সঙ্গীত শ্রবণ করে; মেয়ে ছেলে দিগকে পড়াও বলিয়া দেয়।

পারুল ও বকুল তাহার ব্যবহারে পূর্ব্বের ন্যায় মুগ্ধ। কোন দিন কোন কারণে শৈলেন উপস্থিত না হইতে পারিলে উভয়েই সমান দুঃখিত হয়, তত্ত্ব লইবার জন্য লোক পাঠাইয়া দেয়।

শৈলেন এখন তাহাদের নিকট পূর্ব্বাপেক্ষাও বেশী আপনার জন হইয়া উঠিয়াছে। নগেনের অভাব তাহারা তাহাকে পাইয়া একেবারেই অনুভব করিতেছে না।

শৈলেনের মনটা তবু যেন ভরিয়া উঠিতে ছিল না। একদিন শৈলেন পারুলকে একাকী পাইয়া বলিল—"পারুল, আমার মনটা যেন বড়ই খালি খালি বোধ হইতেছে—কি যেন একটা কি রকম,—কিছুই বুঝিতেছি না।"

পারুল হাসিয়া বলিল—"বসন্তের হাওয়া বহিলেই ভরিয়া যাইবে।"

শৈলেন বলিল—"বসন্তের হাওয়াও বেশ ছুটিয়াছে—কিন্তু তবু যেন—ফাঁকা—শূন্য—উতলা—উদাস—"

পারুল হাসিয়া একটু সুর টানিয়া বলিল—"ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী" তবে সে উতলা-উদাসী ফাঁকা স্থান টুকু ভর্ত্তি করিয়া নিন্ না—"

শৈলেন—কল্পনায় না কার্য্যে?

পারুল—যেমন খুসি।

শৈলেন একটু গভীর ভাবে কথাটা শেষ করিয়া ফেলিল। বলিল—"এই সুবসন্তে তোমাদের কুঞ্জবনে একদিন দু বোনের গান শুনিবার সৌভাগ্য হইতে পারে কি?"

পারুল বলিল—সচ্ছন্দে! কালই চলুন না!

শৈলেন পারুলের সহিত একটু অগ্রসর হইয়া নিম্ন স্বরে বলিল—"প্রয়োজন যে কেবল তোমারই পারুল!"

পারুল বলিল—"তাই হবে। আপনি কাল যখন আসিবেন তখনই যাইব।"

ধন্যবাদ দিয়া শৈলেন সেদিন বিদায় হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে গাড়ী লইয়া আসিয়া শৈলেন পারুলকে লইয়া গেল।

কুঞ্জবনের একটী উচ্চ বৃক্ষ শাখার পত্রান্তরালে বসিয়া তখন কাল কোকিল তান ধরিয়া কুহু ডাকিতেছিল। গন্ধরাজের উগ্র গন্ধ ও গোলাপের মৃদু মধুর গন্ধ মিশিয়া কুঞ্জবনের গগন পবন সুরভিত করিতেছিল।

পারুল পাতাসহ একটী গোলাপ ফুল তুলিয়া শৈলেনের পকেটে গাঁথিয়া দিল, আর একটী তাহার হাতে দিল; একটী নিজ হাতে লইয়া আসিয়া একখানা আসনে উপবেশন করিল।

শৈলেন কুঞ্জবনের ঠিক মধ্যস্থলে—পরিচ্ছন্ন শষ্পাসনে বসিয়া পারুলকে সেখানে আসিয়া বসিতে বলিল। পারুল আসিয়া নামিয়া বসিল। বাগানের মালী হারমোনিয়ামটী তাহাদের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"গাও, একটী খুব নূতন সাময়িক গান গাও, তরলও না হয় জমাটও না হয়।

পারুল অপাঙ্গে হাসি জমাইয়া হারমোনিয়ে সুর ধরিল, তার পর গাইতে লাগিল—

আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলিগো, সকালবেলার মল্লিকা,
আমায় চেন কি?
চিনি তোমায় চিনি নবীন পান্থ
বনে বনে উড়ে তোমার রঙ্গীন বসন প্রান্ত।
ফাগুন রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী
তোমার পথে আমরা ভেসেছি॥
ঘর ছাড়া এই পাগলটাকে, এমনকরে কেগো ডাকে,
করুণ গুঞ্জরী।
যখন বাজিয়ে বিণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরী।
আমি তোমায় ডাক দিয়েছি ওগো উদাসী
আমি আমের মঞ্জরী।
তোমায় চোখে দেখার আগে, তোমার স্বপন চোখে লাগে
বেদন জাগে গো
আমি না চিনতেই ভালবেসেছি॥
যখন ফু ড়য়ে বেলা, চু কয়ে খেলা তপ্ত ধূলির পথে
যাব ঝরা ফুলের রথে, তখন সঙ্গ কে লবি?
লব আমি মাধবী।
যখন বিদায় বাঁশীর সুরে সুরে, শুকনো পাতা যাবে উড়ে
তখন সঙ্গে কে রাব?
আমি রব উদাস হব; ওগো উদাসী?
আমি তরুণ করবী।
বসন্তের এই ললিত রাগে, বিদায় ব্যথা লুকিয়ে জাগে
ফাগুন দিনে গো
আমি কাঁদন ভরা হাসি হেসেছি।"

শৈলেন দক্ষিণ হাতে গোলাপটী নাকের কাছে ধরিয়া কাত হইয়া বাম হাতের উপর ভর দিয়া শুইয়া মুগ্ধ চিত্তে শুনিতেছিল। গান শেষ হইলে বলিল—"সুন্দর গানটী, তোমার নিকট যতক্ষণ থাকি মনটা বেশ থাকে, বাকী দিনটা যেন কি একটা অভাবের ভাবে একেবারে কাটিতেই চায় না।"

পারুল হাসিয়া বলিল—"সে আমার সৌভাগ্য।"

শৈলেন ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"জীবনকে শান্তিতে রাখিবার উপায় কি? কোন ব্যবস্থা বলিয়া দিতে পার কি?"

পারুল হাসিয়া বলিল—"এ মন্দ নয়, ডাক্তার আপনি আর রোগের ব্যবস্থা করিব আমি? এবার দেখিতেছি, ডাক্তারিই পড়িতে হইবে।"

শৈলেন বলিল—"আমার ইচ্ছা, তুমি নার্সিংক্লাশে ভর্ত্তি হও। তাহা হইলেই যেন তুমি তোমার সে দিনকার বক্তৃতার উচ্চ আদর্শে জীবনকে পরিচালন করিতে পারিবে।"

পারুল আগ্রহের সহিত বলিল—ঠিক বলিয়াছেন। শৈলেন দা, আমি 'মেট্রিক' দিয়াই নার্সিংক্লাশে ভর্ত্তি হইব! আমরা আমাদের পাঠ্য পুস্তকে টলষ্টয়ের "Where Love is, God is" গল্পে পড়িয়াছি—একমাত্র জন সেবাই ভগবানের সেবা। আমরা নাকি ভগবানের কার্য্যেই এই জগতে আসিয়াছি—নিজের নিজের সংসার করিবার জন্ম নহে।"

শৈলেন—"তা ঠিক, কিন্তু সংসার করা যে ভগবানের ইচ্ছা নয়, সেটা বোধ হয় ঠিক নয়—

পারুল—"তা হোক্। তথাপি যেন আমার মনে হয়, যে আমাদিগকে কেবলি স্ত্রী ও মাতা হইলে চলিবে না। জনসেবা যে উচ্চভাব জাগ্রত করে সে ভাবই জাতীয় জীবনে অধিক শক্তি সঞ্চয় করে। এ ভাবটা ইয়ুরোপের আমদানী—একটা অনুকরণ করিবার মত বিষয়। প্রাচীন ভারতে এই স্বেচ্ছা সেবার ভাবটা ছিল বলিয়া জানা যায় না—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় কিন্তু।"

শৈলেন বলিল—"ঠিক ধরিয়াছ তুমি, স্বেচ্ছা সেবার প্রথা প্রাচীন ভারতের অনুষ্ঠান সমূহে দেখিতে পাওয়া

যায় না। কবি নবীন সেন তাঁহার কুরুক্ষেত্রে বোধ হয় প্রথম তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর এখন হরিশ্চন্দ্র নারায়ণের সেরা কথাটারও একটু বেশ চল্‌তি দেখা যায়; এটা আধুনিক ভাব।

পারুল—"যুদ্ধের নৃশংসতার কথা যতই বলেন—যুদ্ধ ক্ষেত্রের ঐ নার্সিং প্রথাটা খৃষ্ট জগৎকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ভারতীয় রমণী সমাজে এই ভাবটী সংক্রামিত হয়—আমার প্রাণের ইচ্ছা।"

শৈলেনের নিকট এত সকল কথা ভাল লাগিতে ছিল না, সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি দাম্পত্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী নও?"

পারুল বলিল—"দাম্পত্য ধর্ম্মের আমি কোন দিন বিরোধী নহি। দাম্পত্য ধর্ম্মে জাতি সৃষ্টি হয়, জাতির সৃষ্টিই না হইলে তাহার শক্তি সঞ্চয় হইবে কোথা হইতে? আমার মত, নারী জাতির অন্ততঃ শতকরা কয়েক জন সেবা ধর্ম্মে বিক্রীত হউক।

শৈলেন—"আমাদের সমাজে যাহারা বিধবা আছেন, তাহাদের ভিতর কি ঐ ভাব কম দেখা যায়? বরং খুব অধিকই দেখা যায়।

পারুল বলিল—ঐ সেবাভাব কেবল নিজ পরিবারের ভিতর—কেবল কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির ভিতরই ক্রিয়া করে, বাহিরে তাহা যাইতে পারে না।"

শৈলেন—'তাহাদিগের হাতে সমাজ সেবার ভার ন্যস্ত করিলেইতো ভাল হয়।"

পারুল বলিল—"পরিবারের কর্ত্তা তাঁহার পরিবারের বিধবাকে নিজ সম্মান হানীর ভয়ে পর সেবায় দেন না; অথচ নিজ পরিবারেও পুত্র কন্যাহীন বিধবার অবস্থা অতি শোচনীয়।"

শৈলেন বলিল—"ইহার আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। প্রথমতঃ আমাদের সমাজের পুরুষেরা খুব কাল্‌চার্ড (Cultured) নহেন; নারী জাতির উপর কিরূপ শ্রদ্ধার সহিত দৃষ্টি করিতে হয়, [illegible] এইখানে আর একটী কথা উঠে—সেই [illegible] এদেশে স্ত্রীর স্বাধীনতাও নিরাপদ নহে। [illegible] কারণে বিধবারা বাড়ী বাড়ী যাইয়া বা গ্রামান্তরে যাইয়া পর সেবায় রত হইতে পারেন না। স্ত্রীলোকেরাও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারেন না। এ বিষয়ে আমাদের এই শোচনীয় সমাজ 'মুখেতে মধু, কণ্ঠভরা বিষ।'

পারুল বলিল—"আপনি কি আপনাদের মেয়েদের বিপদে আপদেও ঘুমটা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পক্ষপাতী?"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—'নিশ্চয় না। টিকেট কিনিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া দৈব ক্রমে নিজে গাড়ীতে উঠিতে না পারিলে যে মেয়েগুলি লজ্জায় ঘুমটা টানিয়া বসিয়া থাকিয়া গাড়ীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া যাইবে, এরূপ লজ্জাশীলতার ও পরাধীনতার আমি পক্ষপাতী নহি।"

কথা শেষ করিয়া শৈলেন পারুলের ডান হাতখানা টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—

"এখন তোমার নিজের সম্বন্ধে—স্পষ্ট কথায়—বল দেখি—তুমি বিবাহ করিবে কি না?"

পারুল হাসিয়া বলিল—"বিবাহটা আমার নিকট নিতান্তই যেন একটা উদ্ভট কাণ্ড বলিয়া মনে হয় শৈলেন দা।"

শৈলেন—"তবে করিবে না?"

"আপাততঃ না।" বলিয়া পারুল হাসিয়া উঠিল। সন্ধ্যার বাতাসে হাসনা হেনার গন্ধ ছুটিতে ছিল। শৈলেন বলিল—"হাসনা হেনার গন্ধটা আজ কিন্তু বৃথা গেল না।"

পারুল—"ফুলের গন্ধ কি লোকের উপভোগের জন্যই শুধু—তাহইলে যে ভগবানের ব্যবস্থাকে দোষারূপ করিতে হয় শৈলেন দা।"

শৈলেন—"তবে ফুলের ফুটিয়া ও গন্ধ বিস্তার করিয়া সার্থকতা কি?"

পারুল—"তার ফোটাতেই সার্থকতা।" গন্ধ বিলানতেই সার্থকতা।

শৈলেন—"সৃষ্টির উদ্দেশ্য তো বুঝিতে হইবে।"

পারুল—"তবে ফুলের ফোটার উদ্দেশ্য—তার নিজের নিকট—এ সৌন্দর্য্য প্রকাশ ও গন্ধ বিস্তার করা, ভক্তের নিকট তাহা তুলিয়া দিয়া পূজার সার্থক; সার্থপর

প্রেমিকের নিকট—তাহার প্রেমাস্পদের গলদেশের শোভা বৃদ্ধি করা। কিন্তু এগুলি সব যে মানুষের কাল্পনিক উদ্দেশ্য—ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়। ভগবান মানুষের জন্যই ব্যস্ত নহেন; তিনি তাঁহার অপরূপ প্রকৃতি সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত। তাহার উদ্দেশ্য অপ্রকাশ। আমার বোধ হয় মানুষ নিজ প্রয়োজনে ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া তাঁহার সৃষ্টিকে বিফল করিয়া দিতেছে।"

পারুল যে এত তর্ক করিবে, শৈলেন তাহা ভাবে নাই; তাহার এত দিনের ব্যবহারেও তাহা প্রকাশ পায় নাই। তাহাদের সহবাসেই যে তাহার এই অভ্যাস হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত, সুতরাং সেজন্য শৈলেন তাহাকে দোষ না দিয়া প্রীতির ভাবেই বলিল "দাম্পত্য জীবনওতো স্বেচ্ছা সেবার অন্তরায় নয়।"

পারুল হাসিয়া বলিল—খুব অন্তরায়। এর ভিতর স্বেচ্ছা ভাবটা আছে, কিন্তু দাম্পত্য জীবনে ভারতীয় স্ত্রীর Personality (ব্যক্তিত্ব) নাই, সুতরাং স্বেচ্ছা—সেখানে স্বেচ্ছাচারিতা। এদেশে স্ত্রীলোকের এরূপ স্বেচ্ছা বিহারে কোন স্বামী প্রশ্রয় দিবেন না; দিতে পারেন না। আপনি দিবেন কি?"

শৈলেন গম্ভীর ভাবে বলিল—"কার্য্যের বিচার তাহার উদ্দেশ্য দিয়া, এরূপ সৎ উদ্দেশ্য যাহাতে নিহিত, তেমন কার্য্যে কোন স্বামী স্ত্রীকে উৎসাহ না দেয়।"

পারুল হাসিয়া বলিল—এ তো হইতেছে বক্তৃতার কথা শৈলেন দা. কোন কাজের কথা নয়। যদি তা হইত, তবে দেশের সেবা কার্য্যে ইয়োরোপীয় Red-crossএর মহিলারা আসে কেন, আমাদের দেশে কি মাতা ভগ্নী নাই? ঘরে ঘরেই আছে। কিন্তু ওই ভাবটা নাই। 'মাছও ধরিব, জলও ছুঁইব না'। ঠিক এই ভাব থাকিলে এ সকল মহৎ কার্য্য হয় না। এর জন্য রীতিমত সমাজ চাই।"

সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া গিয়া জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল শৈলেন বলিল—"চল এখন যাওয়া যাউক। রাত্রি হইয়া গেল। বাড়ীতে কিছু বলিবে না কি?"

পারুল বলিল—"রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত হইতে পারে, বলিয়া আসিয়াছি।"

শৈলেন বলিল—"যাই হউক, তোমার মতে আমি সায় দিতে পারিলাম না। স্বেচ্ছা সেবায় তোমার ইচ্ছা থাকিলে দাম্পত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াও যে কেন তুমি তাহা করিতে পারিবে না, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

পারুল একটু দুঃখিত হইয়া বলিল—"নারীর যৌবন কি কেবল পুরুষের উপভোগের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া ভবে আপনি মনে করেন? তার কি আর কোন সার্থকতা নাই? পুরুষ যৌবনে জগতের কত কল্যাণ সাধন করিতেছে, কেন নারীর—"

শৈলেন নিজকে একটু অপমানিত বোধ করিয়া রুক্ষ ভাবে বলিল—"যথেষ্ট হইয়াছে, আর কাজ নাই, চল এখন।"

পারুল হাসিয়া বলিল—"রাগ করিবেন না শৈলেন দা। কই, গান তো শুনিলেন না আপনি, একটা উপসংহার গাইয়া চলুন—"

পারুল হারমোনিয়ামে সুর টানিয়া বলিল—"শৈলেন দা, এই জ্যোৎস্নার সার্থকতা সম্বন্ধেই আমাদের কবি-ভগিনী কিরূপ গাহিয়াছেন শুনুন—

"এখন চাঁদিনী মধুর যামিনী সে যদিগো শুধু আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা সে যদিগো ভালবাসিত।
এ মধু বসন্তে এত শোভা হাসি, এ নব যৌবনে এত রূপরাশি,
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি সে যদি গো শুধু চাহিত।
মিথ্যা বিধি তুমি, মিথ্যা তব সৃষ্টি,
কেন এ সৌন্দর্য্যে নাহিতব দৃষ্টি,
হলাহলে ভরা প্রেমসুধা মিষ্টি, তবে, কেন প্রাণ তৃষিত।

গানের মিষ্ট সুরে শৈলেন গ্লানি, অপমান ভুলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বাগানের মালি দুইজনের হাতে দুটী ফুলের মালা ও ফুলের স্তবক দিয়া সেলাম করিল। শৈলেন তাহাকে পুরস্কৃত করিল।

পারুল তাহার হাতের মালা গাছটী শৈলেনের গলে পড়াইয়া দিল। শৈলেন তাহার হাতের মালা গাছ পারুলের গলে দিতে যাইয়া থামিয়া গেল।

পারুল মাথা নোয়াইয়া বলিল—"দিন না, ও সকল কুসংস্কারের ধার ধারিবেন না।"

শৈলেন কম্পিত হস্তে তাহার মালা গাছটী পারুলের গলায় দিয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

না ; দেখিলেন, অত্যন্ত শৈথিল্য। হস্তবায়ু তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করিলেন, হৃদ্‌যন্ত্র যথারীতি চলিতেছিল ; অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই উহার ঘুম ভাঙ্গিল না ! মিঃ কপ্ ভীত চিত্তে তাহার টুপিটি তুলিয়া লইয়া আফিসে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কর্ত্রী ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "সদর দরজা বেশী জোড়ে বন্ধ করিয়ো না, খোকার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

মিঃ কপ্ কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতেই কবাট বন্ধ করিলেন। এবং শিশুটির আর জাগিবার সম্ভাবনা নাই, চিন্তা করিতে করিতে রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন।

"যদি সে ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ঘুমাইতে থাকে, তবে কি হইবে ? মনে করুন অর্দ্ধ শতাব্দী এইরূপ ভাবে ঘুমাইয়া একেবারে বৃদ্ধাবস্থায় জাগ্রত হইল, মাতাপিতা কে, তাহা জানিল না, সংসার সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা নাই !"

এই চিন্তায় মিঃ কপ্ উন্মাদের মত হইয়া উঠিলেন ; Rip—Van-Winkle এর কথা তাঁহার স্মরণ হইল। কিছু দিন পূর্ব্বে যাদুঘরে তিনি এক বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলেন, সে বিশবৎসর ব্যাপিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, কেবল মাঝে মাঝে কয়েক মিনিটের জন্য জাগিয়া খাইতে চাহিত। ভাবিলেন, হয়তো তাঁহাদের মৃত্যুর পর শিশুটিকে কোনও যাদুঘরে লইয়া রাখিয়া দিবে। এই সব চিন্তায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আফিসে যাইয়া দুই একটা কাজ হাতে লইলেন কিন্তু কোনটাই সুসম্পন্ন করিতে পারিলেন না ; অবশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, মিসেস্ কপ্ একটু উদ্বেগ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন "ওগো বড়ই আশ্চর্য্য খোকা এখনও জাগিল না, বোধ হয় শারীরিক শ্রান্তির জন্য এরূপ হইয়াছে ; আহা বেচারি ! আমি কিন্তু একটু চিন্তিতই হইয়া পড়িয়াছি।"

মিঃ কপ্ আরও ভীত হইলেন ; উপরে গিয়া স্ত্রীর অসাক্ষাতে খোকার পায়ে একটা পিন্ ফুটাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হইল না। কয়েকবার এই প্রকার প্রক্রিয়া করিয়া অবশেষে উহাকে জাগ্রত করিবার সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, মিঃ কপ্ পুনরায় আফিসে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং তথায় বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব না স্ত্রীর নিকট যাইয়া সকল কথা স্বীকার করিব ?

কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহার স্ত্রী নিজেই তথায় আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "ওগো, খোকা এখন পর্য্যন্তও ঘুমাইতেছে, আমি কিছুতেই উহাকে জাগাইতে পারিলাম না ; উহাকে ডাকিয়া, ঝাঁকাইয়া, সব রকম করিয়া দেখিয়াছি, কিছুতেই উহার নিদ্রা ভাঙ্গিল না ; উহার হইল কি ? ভয় হয়, বুঝিবা ভিতরে সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়াছে !"

"হয়তো খোকা দিনের বেলা একটু বেশী ঘুমাইয়া লইতেছে, তাহা হইলে রাত্রে অধিকক্ষণ জাগিয়া ইহার মত সুদ আদায় করিয়া লইবে।" অতিকষ্টে ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্য আনিয়া, একটু রসিকতা করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ কপ্ এই কথা গুলি বলিলেন।

"মিঃ কপ্, এসব কথা লইয়া তামাসা করিতে তোমার লজ্জা বোধ করা উচিত ; মনে কর খোকা যদি এইরূপ ঘুমন্ত অবস্থাতেই মরিয়া যায়। আমার বিশ্বাস বেচারা সত্যই মৃত্যু মুখে অগ্রসর হইতেছে, তুমি এখনই ডাক্তারের জন্য যাও।"

মিঃ কপ্ অবিলম্বে ডাক্তারের জন্য ছুটিলেন এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার গিলের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার শিশুকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কেস্‌টা একটু অদ্ভুত ; আমার বিশ্বাস খোকা আফিমের দ্বারা এরূপ অভিভূত হইয়াছে।

মিসেস্ কপ্ সন্দেহচক্ষে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি ঘুমাইবার পর কি তুমি উহাকে আফিম্ খাওয়াইয়াছিলে ?"

মিঃ কপ্ ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া বলিলেন, "তোমার দিব্য, কিছুই খাওয়াই নাই।"

মিসেস্ কপের মনে পড়িল, গতরাত্রে তিনি শিশুটিকে মিঃ কপের নিকট রাখিয়া নীচে গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া অবধি উহাকে এরূপ ঘুমন্ত দেখিতেছেন ! পুনরায় উগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ঠিক বলিতেছ উহাকে কিছুই খাওয়াও নাই ?"